ছন্দ

ছন্দ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী
কলিকাতা

সম্পাদকের নিবেদন

প্রথম সংস্করণের ‘বিজ্ঞপ্তি’তে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, ‘বাংলা ছন্দ সম্বন্ধে যতকিছু আলোচনা করেছি এই গ্রন্থে প্রকাশ করা হল’। বস্তুতঃ বাংলা ছন্দ সম্বন্ধে তিনি ‘যতকিছু’ আলোচনা করেছিলেন সব ছিল না সে সংস্করণে। ১৩২১ সালের পূর্ববর্তী কোনো আলোচনাই ছিল না। পরবর্তী কালেরও কিছু-কিছু আলোচনা বাদ পড়েছিল। বর্তমান সংস্করণে রবীন্দ্রনাথের ছন্দবিষয়ক সমস্ত আলোচনা সংকলনের প্রয়াস করা গেল। ১৩২১ সালের পূর্ববর্তী এবং গ্রন্থপ্রকাশের (১৩৪৩) পরবর্তী অনেক রচনাই প্রথম সংকলিত হল। অনেকগুলি চিঠিপত্রও প্রথম প্রকাশিত হল। তবে নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত ছন্দবিষয়ক টুকরো-টুকরো প্রাসঙ্গিক মন্তব্য সংগ্রহের কোনো প্রয়াস করা হয়নি।

প্রথম প্রকাশের সময়ে প্রবন্ধগুলি কালানুক্রমিকভাবে সাজানো ছিল না। বর্তমান সংস্করণে অনেকাংশেই রচনার কালক্রম অনুসৃত হল। ‘যে মানুষ সুদীর্ঘ কাল থেকে চিন্তা করতে করতে লিখেছে তার রচনার ধারাকে ঐতিহাসিকভাবে দেখাই সংগত।’— রবীন্দ্রস্বীকৃত এই নীতি অনুসারেই প্রবন্ধগুলিকে নূতন করে সাজানো হল। তবে বিষয়বস্তুর সংগতিরক্ষার প্রয়োজনে কোনো কোনো স্থলে এই নীতির কিছু ব্যতিক্রম করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে ‘পাঠপরিচয়’ বিভাগের ভূমিকাংশ এবং গ্রন্থশেষের ‘কালক্রম’ অংশ দ্রষ্টব্য।

এই গ্রন্থের প্রবন্ধগুলি দীর্ঘকাল ধরে চিন্তা করতে করতে লেখা, সুপরিকল্পিতভাবে একসঙ্গে লেখা নয়। ফলে চিন্তায় এবং ভাষায় সর্বত্র সংগতি রক্ষিত হয়নি। তৎসত্ত্বেও এই রচনাধারার মধ্যে একটি অনতিলক্ষিত ঐক্যসূত্র আছে। কালক্রম অনুসরণ করে অভিনিবেশ-

সহকারে বিচার করলে সে ঐক্যের সন্ধান পাওয়া যায়। গ্রন্থসম্পাদনা-কালে সে দিকেই সবচেয়ে বেশি দৃষ্টি রাখা হয়েছে। আমার বিশ্বাস পৃথিবীর আর কোনো দেশেই রবীন্দ্রনাথের মতো ছন্দস্রষ্টার আবির্ভাব হয়নি। এ হেন মহাছন্দশিল্পীর ছন্দবিশ্লেষণ যে পরম শ্রদ্ধার সহিত বিবেচনীয় তাতে সন্দেহ নেই। তথাপি ছন্দবিচারের ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে মতভেদ ঘটা অসম্ভব নয়। পরমরবীন্দ্রানুরাগী জে. ডি. এণ্ডারসন এবং কবি সত্যেন্দ্রনাথকেও এ-রকম মতভেদের সম্মুখীন হতে হয়েছিল।

এসব কারণে 'ছন্দ' গ্রন্থখানি সম্পাদন করা ও পাঠকের কাছে সুগম করা সহজসাধ্য নয়। তথাপি চেষ্টার ত্রুটি করা হয়নি। বহুসংখ্যক পাদটীকা এবং সুবিস্তৃত গ্রন্থপরিচয় ও নির্দেশিকার সাহায্যে বইখানিকে স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করার এবং জিজ্ঞাসু পাঠকের অধিগম্য করার যথাসাধ্য প্রয়াস করা হয়েছে। এই উদ্দেশ্যে প্রধানতঃ দুটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ রাখা হয়েছে।

এক, পরিভাষা। ছন্দবিশ্লেষণ করা উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথকে বহু পারিভাষিক, অর্ধপারিভাষিক ও অপারিভাষিক শব্দের প্রয়োগ করতে হয়েছে। অনেকগুলি পরিভাষাই তাঁর স্বকৃত। কিন্তু এগুলি সর্বত্র সমভাবে একই অর্থে প্রযুক্ত হয়নি। তা ছাড়া, একই অর্থ বোঝাতে বিভিন্ন শব্দের প্রয়োগও দেখা যায়। এসব কারণে তাঁর মূল অভিপ্রায়টি পাঠকের কাছে অনেকাংশে প্রচ্ছন্ন থেকে যায়। এই অস্পষ্টতা ও বিভিন্নার্থকতা থেকে মুক্ত করে তাঁর অভিপ্রায়কে সুব্যক্ত করার প্রয়াস করা হয়েছে পাদটীকায় ও 'সংজ্ঞাপরিচয়' বিভাগে। নির্দেশিকার অন্তর্গত 'পরিভাষা' অংশ এবং উক্ত 'সংজ্ঞাপরিচয়'-এর সহায়তা নিয়ে অনুধাবন করলে রবীন্দ্রনাথের ছন্দতত্ত্বের স্বরূপ উপলব্ধি করা সহজ হবে বলে আশা করি। রবীন্দ্রনাথের পরিভাষা ও ছন্দোনীতির

ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অনেক স্থলেই স্বকীয় পরিভাষার সহায়তা নিতে বাধ্য হয়েছি। ফলে শেষোক্ত পরিভাষাগুলিরও সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে হয়েছে। এই নীতি অবলম্বন না করলে রবীন্দ্রনাথের ছন্দতত্ত্বের সামগ্রিক ব্যাখ্যা অসম্ভব হত।

দুই, ইতিহাস। রবীন্দ্রনাথের ছন্দবিষয়ক অধিকাংশ (বিশেষতঃ দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্বের) প্রবন্ধের পেছনেই রয়েছে কোনো-না-কোনো উপলক্ষের প্রেরণা। স্বতঃপ্রবৃত্ত রচনার সংখ্যা খুব কম। সেই উপলক্ষের ইতিহাস জানা থাকলে প্রবন্ধগুলি অনুধাবন করা সহজ হবে, এই বিবেচনায় 'পাঠপরিচয়' বিভাগে সে ইতিহাস যথাসম্ভব সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করতে চেষ্টিত হয়েছি। আশা করি তাতে পাঠকের শুধু ছন্দজিজ্ঞাসা নয়, কৌতূহল -নিবৃত্তিরও সহায়তা হবে। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক জে. ডি. এণ্ডারসনের পত্রাবলীর কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই বিদেশী বাংলাসাহিত্যানুরাগী ছন্দজিজ্ঞাসুর পত্রাবলী শুধু রবীন্দ্রনাথের ছন্দচর্চার ইতিহাস জানার পক্ষে নয়, বাংলা ছন্দের স্বরূপ অনুধাবনের পক্ষেও বিশেষ মূল্যবান্। বস্তুতঃ তাঁকেই বাংলার প্রথম যথার্থ ছান্দসিক বলে অভিহিত করা যায়। এই গুরুত্বের বিষয় বিবেচনা করে রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত এণ্ডারসনের পত্রাবলীর বহু প্রাসঙ্গিক অংশ 'পাঠপরিচয়' বিভাগে উদ্‌ধৃত করা গেল। আশা করি তাতে বাংলার ছন্দচিন্তা সমৃদ্ধতর হবে।

এই গ্রন্থের সম্পাদনায় ব্রতী হয়ে প্রতিপদেই এ কাজের দুঃসাধ্যতার বিষয় উপলব্ধি করতে হয়েছে। তা ছাড়া, দীর্ঘকাল ধরে নানা প্রতিকূলতার মধ্যে ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হতে হয়েছে। এসব কারণে কোনো কোনো বিষয়ে কিছু-কিছু অপূর্ণতা ও অসমতা থেকে যাওয়া বিচিত্র নয়। ভবিষ্যতে সুযোগ পেলে পূর্ণতা- ও সমতা-বিধানের প্রয়াস করা

যাবে। ভবিষ্যৎ সংস্করণে ‘পরিশেষ’ বিভাগের কোনো কোনো রচনাকে মূলগ্রন্থে স্থান দিয়ে এবং এই বিভাগের লেখাগুলিকে ‘সম্পূরণ’ বিভাগের লেখাগুলির সঙ্গে একত্র মিলিয়ে কালক্রম-অনুসারে সাজিয়ে নিলেই এই সংস্করণের প্রধান অসমতার নিরসন হবে। ‘কালক্রম’ অংশের রচনাবিন্যাস অনেকাংশেই এই সমতাবিধানের সহায়ক হতে পারবে।

এই গ্রন্থ সম্পাদনের ও মুদ্রণের বিভিন্ন পর্যায়ে অনেকের কাছ থেকেই কিছু-না-কিছু সহায়তা পেয়েছি। সব পর্যায়ের সঙ্গে যাঁরা অল্পাধিক পরিমাণে জড়িত তাঁদের মধ্যে আমার প্রাক্তন ছাত্র ও সহকর্মী শ্রীমান্ অমিয়কুমার সেনের অকুণ্ঠ সহকারিতার কথা সর্বপ্রথমে স্মরণীয়। তার পরেই রবীন্দ্রসদনের সহকর্মী শ্রীশোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রীচিত্তরঞ্জন দেবের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ‘ছন্দ’ গ্রন্থ সম্পাদনার প্রাথমিক ব্যবস্থাদি করে দিয়েছিলেন শ্রীপুলিনবিহারী সেন। মূলগ্রন্থের প্রুফসংশোধনের ভার গ্রহণ করে শ্রীসুধীরচন্দ্র কর কিছুপরিমাণে আমার দায়িত্বলাঘব করেছিলেন। সম্পাদনার প্রথম পর্যায়ে আমার প্রাক্তন ছাত্র ও সহকর্মী শ্রীসরোজকুমার বসু এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাবিভাগের প্রধান অধ্যাপক শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয়ের কাছ থেকেও কোনো কোনো বিষয়ে সাগ্রহ সহায়তা পেয়েছিলাম। সম্পাদনার শেষ পর্যায়ের সহায়কদের মধ্যে সর্বপ্রথমেই উল্লেখ করা কর্তব্য আমার প্রাক্তন ছাত্র ও বর্তমানে সিউড়ি বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যাপক শ্রীমান্ নীলরতন সেনের স্বতঃপ্রবৃত্ত সহযোগিতার কথা। আমার জামাতা শ্রীমান্ ভবতোষ দত্ত কোনো কোনো বিষয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করে আমার শ্রমলাঘব করেছেন। অধ্যাপক সহকর্মী শ্রীদুর্গেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামও এই স্থলে উল্লেখ করা কর্তব্য। আমার উৎসাহী ছাত্র শ্রীমান্ রামবহাল

তেওয়ারী ও শ্রীমান্ বসন্তকুমার চক্রবর্তীর সাগ্রহ সহকারিতা আমাকে বিশেষ আনন্দ দান করেছে। সম্পাদনার কোনো-না-কোনো কাজের সঙ্গে যাঁরা কিছুপরিমাণেও যুক্ত হয়েছেন তাঁদের মধ্যে আছেন আমার দুইজন অধ্যাপক সহকর্মী শ্রীজীবনকৃষ্ণ চৌধুরী ও শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ রায়, আমার প্রাক্তন ছাত্র ও বর্তমানে পাঠভবনের অধ্যাপক শ্রীমান্ পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায় এবং প্রাক্তন ছাত্র শ্রীমান্ শ্রীমন্তকুমার জানা। বাংলা পুঁথিবিভাগের সহকর্মী শ্রীপঞ্চানন মণ্ডলের নামও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। শ্রীকানাই সামন্তের ছন্দজিজ্ঞাসা ও অভিজ্ঞতা সময়ে সময়ে আমার কাজে লেগেছে। শ্রীসুকুমার বসু মহাশয় তাঁর কাছে রক্ষিত 'বিচিত্রা' ক্লাবের আমন্ত্রণলিপিগুলি আমাকে ব্যবহার করতে দিয়েছিলেন দীর্ঘকাল পূর্বেই। এই আমন্ত্রণলিপিগুলির সহায়তা পেয়েই সত্যেন্দ্রনাথের 'ছন্দ-সরস্বতী' ও রবীন্দ্রনাথের 'ছন্দের অর্থ' প্রবন্ধ পাঠের তারিখ নিশ্চিতরূপে নির্ণয় করা সম্ভব হয়েছে। 'পাঠপরিচয়' প্রসঙ্গে যথাস্থানে তার পরিচয় দেওয়া হয়েছে। তা ছাড়া, শ্রীযুক্ত বসু-মহাশয় কয়েকখানি আমন্ত্রণলিপির ফটোচিত্র তুলতে সম্মতি দিয়েও আমাকে উপকৃত করেছেন। ইদানীং আমার অনুরোধে তিনি 'বিচিত্রা'র স্মৃতিকথা লিখে আমার হাতে দেন। উক্ত আমন্ত্রণলিপির দুখানি চিত্রসহ তা প্রকাশিত হয়েছে বিশ্বভারতী পত্রিকায় (১৩৬৯ বৈশাখ-আষাঢ়)। এই প্রবন্ধটি নানা দিক্ থেকেই গবেষকদের কাজে লাগবে। 'গদ্যছন্দ' ,প্রবন্ধের পাঠপরিচয় প্রসঙ্গে এটির কথা যথাস্থানে উল্লিখিত হয়েছে। বিচিত্রার আমন্ত্রণলিপি তথা ছন্দপাণ্ডুলিপির সবগুলি চিত্রই তুলে দিয়েছেন স্কুল অব প্রিন্টিং টেক্নোলজি প্রতিষ্ঠানের অধ্যাপক সুদক্ষ ফটোশিল্পী শ্রীজ্ঞানরঞ্জন সেন। পাণ্ডুলিপি-ব্যবহারে এবং অন্য কোনো কোনো বিষয়ে আনুকূল্য করেছেন বিশ্বভারতী রবীন্দ্রসদনের

পরিচালক শ্রীমোহনলাল বাজপেয়ী। গ্রন্থখানির প্রকাশ ও সৌষ্ঠব-সম্পাদনে শ্রীগোপেশচন্দ্র সেন ও শ্রীসুশীল রায়ের সযত্ন আগ্রহের কথাও সানন্দে স্মরণীয়। সর্বশেষে স্মরণ করি শান্তিনিকেতন মুদ্রণবিভাগের সহকর্মী শ্রীযতীন্দ্রনাথ বিশ্বাস, শ্রীবিভূতিভূষণ মিত্র ও শ্রীবলরাম সাহার অকুণ্ঠ সহযোগিতার কথা। শেষোক্ত সহকর্মীর সুবিবেচনা ও কর্মনৈপুণ্য আমার বিশেষ প্রীতি ও সন্তোষের হেতু হয়েছে। এঁদের সকলকেই যথাযোগ্যভাবে আমার আন্তরিক স্নেহ, প্রীতি ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।

রবীন্দ্রভবন
বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন
বিজয়া দশমী, ২২ আশ্বিন ১৩৬৯

প্রবোধচন্দ্র সেন

অধ্যায়সূচি

পরিশেষ

বিবিধ

চিঠিপত্র

ভাষণ

গ্রন্থপরিচয়

সম্পূরণ

নির্দেশিকা

চিত্রসূচি

উৎসর্গ

কল্যাণীয়

শ্রীমান্ দিলীপকুমার রায়কে

বিজ্ঞপ্তি

বাংলা ছন্দ সম্বন্ধে যত কিছু আলোচনা করেছি এই গ্রন্থে প্রকাশ করা হোলো। শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন ও শ্রীযুক্ত অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে এই বিষয় নিয়ে আমার কিছু তর্কবিতর্ক হয়েছে, সেই তাঁদের তর্কের উত্তর এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করেছি। এই উপলক্ষ্যে বলা আবশ্যক, তাঁদের সঙ্গে আমার কিছু কিছু মতভেদ সত্ত্বেও বাংলা ছন্দের বিচারে তাঁদের প্রবীণতা আমি শ্রদ্ধার সঙ্গেই স্বীকার করে থাকি। তাঁদের সঙ্গে কিছু কিছু মতভেদ সত্ত্বেও এই বিষয়ে তাঁদের কৃতিত্বকে আমি সম্মান করি। ইতি ২০ শ্রাবণ

১৩৪৩

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শান্তিনিকেতন

বাংলা ছন্দ

অধ্যাপক জে. ডি. এণ্ডারসনকে লিখিত দুখানি পত্র।

১

আপনি বলিয়াছেন আমাদের উচ্চারণের ঝোঁকটা বাক্যের আরম্ভে পড়ে। ইহা আমি অনেক দিন পূর্বে লক্ষ্য করিয়াছি। ইংরেজিতে প্রত্যেক শব্দেরই একটি নিজস্ব ঝোঁক আছে। সেই বিচিত্র ঝোঁকগুলিকে নিপুণভাবে ব্যবহার করার দ্বারাই আপনাদের ছন্দ সংগীতে মুখরিত হইয়া উঠে। সংস্কৃত ভাষায় ঝোঁক নাই, কিন্তু দীর্ঘহ্রস্ব স্বর ও যুক্ত-ব্যঞ্জনবর্ণের মাত্রাবৈচিত্র্য আছে। তাহাতে সংস্কৃত ছন্দ ঢেউ খেলাইয়া উঠে। যথা—

অস্ত্যুত্তরস্যাং দিশি দেবতাত্মা

উক্ত বাক্যের যেখানে যেখানে যুক্তব্যঞ্জনবর্ণ বা দীর্ঘস্বর আছে সেখানেই ধ্বনি গিয়া বাধা পায়। সেই বাধার আঘাতে আঘাতে ছন্দ হিল্লোলিত হইয়া উঠে।

যে ভাষায় এইরূপ প্রত্যেক শব্দের একটি বিশেষ বেগ আছে সে ভাষার মস্ত সুবিধা এই যে, প্রত্যেক শব্দটিই নিজেকে জানান দিয়া যায়, কেহই পাশ কাটাইয়া আমাদের মনোযোগ এড়াইয়া যাইতে পারে না। এইজন্য যখন একটা বাক্য (sentence) আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয় তখন তাহার উচ্চনীচতার বৈচিত্র্যবশত একটা সুস্পষ্ট চেহারা দেখিতে পাওয়া যায়। বাংলা বাক্যের অসুবিধা এই যে, একটা ঝোঁকের টানে একসঙ্গে অনেকগুলা শব্দ অনায়াসে আমাদের কানের উপর দিয়া পিছলাইয়া চলিয়া যায়; তাহাদের প্রত্যেকটার সঙ্গে সুস্পষ্ট পরিচয়ের সময় পাওয়া যায় না।[১] ঠিক যেন আমাদের একান্নবর্তী পরিবারের মতো। বাড়ির কর্তাটিকে স্পষ্ট করিয়া অনুভব করা যায়। কিন্তু তাঁহার

১ দ্রষ্টব্য: পরবর্তী 'বাংলা শব্দ ও ছন্দ' প্রবন্ধ।

পশ্চাতে তাঁহার কত পোষ্য আছে, তাহারা আছে কি নাই, তাহার হিসাব রাখিবার দরকার হয় না।

এইজন্য দেখা যায়, আমাদের দেশে কথকতা যদিচ জনসাধারণকে শিক্ষা এবং আমোদ দিবার জন্য, তথাপি কথকমহাশয় ক্ষণে ক্ষণে তাহার মধ্যে ঘনঘটাচ্ছন্ন সংস্কৃত সমাসের আমদানি করিয়া থাকেন। সে-সকল শব্দ গ্রাম্যলোকেরা বোঝে না। কিন্তু এই-সমস্ত গম্ভীর শব্দের আওয়াজে তাহাদের মনটা ভালো করিয়া জাগিয়া উঠে। বাংলা ভাষায় শব্দের মধ্যে আওয়াজ মৃদু বলিয়া অনেক সময় আমাদের কবিদিগকে দায়ে পড়িয়া অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করিতে হয়।[১]

এইজন্যই আমাদের যাত্রার ও পাঁচালির গানে ঘন ঘন অনুপ্রাস ব্যবহারের প্রথা আছে।[২] সে অনুপ্রাস অনেক সময় অর্থহীন এবং ব্যাকরণবিরুদ্ধ; কিন্তু সাধারণ শ্রোতাদের পক্ষে তাহার প্রয়োজন এত অধিক যে, বাছবিচার করিবার সময় পাওয়া যায় না। নিরামিষ তরকারি রাঁধিতে হইলে ঝালমসলা বেশি করিয়া দিতে হয়, নহিলে স্বাদ পাওয়া যায় না। এই মসলা পুষ্টির জন্য নহে; ইহা কেবলমাত্র রসনাকে তাড়া দিয়া উত্তেজিত করিবার জন্য। সেইজন্য দাশরথি রায়ের রামচন্দ্র যখন নিম্নলিখিত রীতিতে অনুপ্রাসচ্ছটা বিস্তার করিয়া বিলাপ করিতে থাকেন—

অতি অগণ্য কাজে ছি ছি জঘন্য সাজে
ঘোর অরণ্য মাঝে কত কাঁদিলাম।—

তাহাতে শ্রোতার হৃদয় ক্ষুব্ধ হইয়া উঠে। আমাদের বন্ধু দীনেশবাবু-কর্তৃক পরমপ্রশংসিত কৃষ্ণকমল গোস্বামী মহাশয়ের গানের মধ্যে

১ দ্রষ্টব্য: পরবর্তী 'বাংলা শব্দ ও ছন্দ' (১২৯৯) এবং 'ছন্দবিচার' (১৩৩৯) প্রবন্ধে মধুসূদনের 'যাদঃপতিরোধঃ যথা চলোর্মি-আঘাতে' ইত্যাদি ধরণের শব্দপ্রয়োগ-প্রসঙ্গ।

২ দ্রষ্টব্য: 'বিবিধ' বিভাগে 'বাংলা ছন্দে অনুপ্রাস' নিবন্ধ।

নিম্নলিখিত প্রকারের আবর্জনা ঝুড়ি ঝুড়ি চাপিয়া আছে। তাহাতে কাহাকেও বাধা দেয় না।

পুনঃ যদি কোনক্ষণে দেখা দেয় কমলেক্ষণে
যতনে করে রক্ষণে জানাবি তৎক্ষণে।

এখানে কমলেক্ষণ এবং রক্ষণ শব্দটাতে এ-কার যোগ করা একেবারেই নিরর্থক; কিন্তু অনুপ্রাসের বন্যার মুখে অমন কত এ-কার উ-কার স্থানে অস্থানে ভাসিয়া বেড়ায় তাহাতে কাহারো কিছু আসে যায় না।

একটা কথা মনে রাখিতে হইবে, বাংলা রামায়ণ, মহাভারত, অন্নদামঙ্গল, কবিকঙ্কণচণ্ডী প্রভৃতি সমস্ত পুরাতন কাব্য গানের সুরে কীর্তিত হইত। এই জন্য শব্দের মধ্যে যাহা কিছু ক্ষীণতা ও ছন্দের মধ্যে যাহা কিছু ফাঁক ছিল সমস্তই গানের সুরে ভরিয়া উঠিত; সঙ্গে সঙ্গে চামর দুলিত, করতাল চলিত এবং মৃদঙ্গ বাজিতে থাকিত। সেই সমস্ত বাদ দিয়া যখন আমাদের সাধুসাহিত্য-প্রচলিত ছন্দগুলি পড়িয়া দেখি, তখন দেখিতে পাই একে তো প্রত্যেক কথাটিতে স্বতন্ত্র ঝোঁক নাই, তাহাতে প্রত্যেক অক্ষরটি একমাত্রা বলিয়া গণ্য হইয়াছে। [যেমন—

মহাভারতের কথা অমৃত সমান।

ইহাতে চোদ্দটি অক্ষরে চোদ্দ মাত্রা। সকল শব্দই মাথায় সমান। বাংলা দেশটি যেমন সমভূমি তাহার পয়ার ত্রিপদী ছন্দগুলিও সেইরূপ; কোথাও ওঠানামা করিতে হয় না।]

গানের পক্ষে ইহাই সুবিধা। বাংলার সমতল ক্ষেত্রে নদীর ধারা যেমন স্বচ্ছন্দে চারিদিকে শাখায় প্রশাখায় প্রসারিত হইয়াছে, তেমনি সম-মাত্রিক ছন্দে সুর আপন প্রয়োজন মতো যেমন-তেমন করিয়া চলিতে পারে। কথাগুলা মাথা হেঁট করিয়া সম্পূর্ণ তাহার অনুগত হইয়া থাকে।

কিন্তু সুর হইতে বিযুক্ত করিয়া পড়িতে গেলে এই ছন্দগুলি একেবারে বিধবার মতো হইয়া পড়ে। এই জন্য আজ পর্যন্ত বাংলা কবিতা পড়িতে হইলে আমরা সুর করিয়া পড়ি। এমন কি, আমাদের গদ্য-আবৃত্তিতেও যথেষ্ট পরিমাণে সুর লাগে। আমাদের ভাষার প্রকৃতি অনুসারেই এরূপ ঘটিয়াছে। আমাদের এই অভ্যাসবশত ইংরেজি পড়িবার সময়েও আমরা সুর লাগাই; ইংরেজের কানে নিশ্চয়ই তাহা অদ্ভুত লাগে।

কিন্তু আমাদের প্রত্যেক অক্ষরটিই যে বস্তুত একমাত্রার এ কথা সত্য নহে। যুক্ত বর্ণ এবং অযুক্ত বর্ণ কখনই একমাত্রার হইতে পারে না।

কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান্।

"পুণ্যবান্" শব্দটি "কাশীরাম" শব্দের সমান ওজনের নহে। কিন্তু আমরা প্রত্যেক বর্ণটিকে সুর করিয়া টানিয়া টানিয়া পড়ি বলিয়া আমাদের শব্দগুলির মধ্যে এতটা ফাঁক থাকে যে, হালকা ও ভারী দুই রকম শব্দই সমমাত্রা অধিকার করিতে পারে। [যে সভায় চৌকি পাতিয়া মানুষ বসে, সেখানে প্রত্যেক চৌকির পরিমাপ সমান, সেই চৌকিতে যে মানুষগুলি বসে তাহারা মোটাই হউক, আর রোগাই হউক, সমান জায়গা জোড়ে। কিন্তু ফরাসের উপর গায়ে গায়ে যদি বসিতে হয় তবে ভিন্ন ভিন্ন লোক আপনার দেহের ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণমতো স্থান দখল করে। আমাদের পয়ার-ত্রিপদীতে শব্দগুলি অত্যন্ত সভ্য হইয়া চৌকির উপর বসিয়া গেছে।]

Equality, Fraternity প্রভৃতি পদার্থগুলি খুব মূল্যবান্ বটে, কিন্তু সেইজন্যই ঝুটা হইলে তাহা ত্যাজ্য হয়। আমাদের সাধুছন্দে বর্ণগুলির মধ্যে যে সাম্য ও সৌভ্রাত্র দেখা যায় তাহা গানের সুরে সাচ্চা হইতে পারে, কিন্তু আবৃত্তি করিয়া পড়িবার প্রয়োজনে তাহা ঝুটা। এই কথাটা অনেকদিন আমার মনে বাজিয়াছে। কোনো কোনো কবি

ছন্দের এই দীনতা দূর করিবার জন্য বিশেষ জোর দিবার বেলায় বাংলা শব্দগুলিকে সংস্কৃতের রীতি অনুযায়ী স্বরের হ্রস্ব দীর্ঘ রাখিয়া ছন্দে বসাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। ভারতচন্দ্রে তাহার দুই একটা নমুনা আছে,। যথা—

মহারুদ্র বেশে মহাদেব সাজে।

বৈষ্ণব কবিদের রচনায় এরূপ অনেক দেখা যায়। [যেমন—

সুন্দরি রাধে, আওয়ে বনি
ব্রজরমণীগণ-মুকুটমণি !]

কিন্তু এগুলি বাংলা নয় বলিলেই হয়। ভারতচন্দ্র যেখানে সংস্কৃত ছন্দে লিখিয়াছেন, সেখানে তিনি বাংলা শব্দ যতদূর সম্ভব পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং বৈষ্ণব কবিরা যে ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন তাহা মৈথিলী ভাষার বিকার।

আমার বড়ো দাদা মাঝে মাঝে এ কাজ করিয়াছেন, কিন্তু তাহা কৌতুক করিয়া। যথা—

ইচ্ছা সম্যক্ ভ্রমণ-গমনে কিন্তু পাথেয় নাস্তি।
পায়ে শিক্লী মন উড়ু উড়ু এ কি দৈবেরি শাস্তি !

বাংলায় এ জিনিস চলিবে না; কারণ বাংলায় হ্রস্বদীর্ঘস্বরের পরিমাণভেদ সুব্যক্ত নহে। কিন্তু যুক্ত ও অযুক্ত বর্ণের মাত্রাভেদ বাংলাতেও না ঘটিয়া থাকিতে পারে না। [এই কথা মনে রাখিয়া বহুকাল হইল আমি "মানসী" নামক কাব্যগ্রন্থে বাংলা ছন্দে যুক্তবর্ণকে দুইমাত্রা গণ্য করিয়া ছন্দ রচিবার দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছি; এখন তাহা প্রচলিত হইয়াছে।]

সংস্কৃতের সঙ্গে বাংলার একটা প্রভেদ এই যে, বাংলার প্রায় সর্বত্রই শব্দের অন্তস্থিত অ-স্বরবর্ণের উচ্চারণ হয় না। যেমন— ফল, জল, মাঠ, ঘাট, চাঁদ, ফাঁদ, বাঁদর, আদর ইত্যাদি। ফল শব্দ বস্তুত একমাত্রার

কথা। অথচ সাধু বাংলা ভাষার ছন্দে ইহাকে দুই মাত্রা বলিয়া ধরা হয়। অর্থাৎ ফলা এবং ফল বাংলা ছন্দে একই ওজনের। এইরূপে বাংলা সাধুছন্দে হসন্ত জিনিসটাকে একেবারে ব্যবহারে লাগানো হয় না। অথচ জিনিসটা ধ্বনি উৎপাদনের কাজে ভারি মজবুত। হসন্ত শব্দটা স্বরবর্ণের বাধা পায় না বলিয়া পরবর্তী শব্দের ঘাড়ের উপর পড়িয়া তাহাকে ধাক্কা দেয় ও বাজাইয়া তোলে। "করিতেছি" শব্দটা ভোঁতা। উহাতে কোনো সুর বাজে না। কিন্তু "কর্চি" শব্দে একটা সুর আছে। "যাহা হইবার তাহাই হইবে" এই বাক্যের ধ্বনিটা অত্যন্ত ঢিলা; সেই জন্য ইহার অর্থের মধ্যেও একটা আলস্য প্রকাশ পায়। কিন্তু যখন বলা যায় "যা হবার তাই হবে" তখন "হবার" শব্দের হসন্ত "র" "তাই" শব্দের উপর আছাড় খাইয়া একটা জোড় জাগাইয়া তোলে; তখন উহার নাকী সুর ঘুচিয়া গিয়া ইহা হইতে একটা "মরিয়া" ভাবের আওয়াজ বাহির হয়। বাংলার হসন্তবর্জিত সাধু ভাষাটা বাবুদের আদুরে ছেলেটার মতো মোটাসোটা গোলগাল; চর্বির স্তরে তাহার চেহারাটা একেবারে ঢাকা পড়িয়া গেছে, এবং তাহার চিক্কণতা যতই থাক্, তাহার জোর অতি অল্পই।

কিন্তু বাংলার অসাধু ভাষাটা খুব জোরালো ভাষা, এবং তাহার চেহারা বলিয়া একটা পদার্থ আছে। আমাদের সাধু ভাষার কাব্যে এই অসাধু ভাষাকে একেবারেই আমল দেওয়া হয় নাই; কিন্তু তাই বলিয়া অসাধু ভাষা যে বাসায় গিয়া মরিয়া আছে তাহা নহে। সে আউলের মুখে, বাউলের মুখে, ভক্ত কবিদের গানে, মেয়েদের ছড়ায় বাংলা দেশের চিত্তটাকে একেবারে শ্যামল করিয়া ছাইয়া রহিয়াছে। কেবল ছাপার কালির তিলক পরিয়া সে ভদ্রসাহিত্যসভায় মোড়লি করিয়া বেড়াইতে পারে না। কিন্তু তাহার কণ্ঠে গান থামে নাই, তাহার বাঁশের বাঁশি বাজিতেছেই। সেই সব মেঠো-গানের ঝরনার তলায়

বাংলা ভাষার হসন্ত-শব্দগুলা নুড়ির মতো পরস্পরের উপর পড়িয়া ঠুন্‌ঠুন্‌ শব্দ করিতেছে। আমাদের ভদ্রসাহিত্যপল্লীর গম্ভীর দিঘিটার স্থির জলে সেই শব্দ নাই ; সেখানে হসন্তর ঝংকার বন্ধ।

আমার শেষ বয়সের কাব্য রচনায় আমি বাংলার এই চলতি ভাষার সুরটাকে ব্যবহারে লাগাইবার চেষ্টা করিয়াছি। কেননা দেখিয়াছি চলতি ভাষাটাই স্রোতের জলের মতো চলে, তাহার নিজের একটি কলধ্বনি আছে। "গীতাঞ্জলি" হইতে আপনি আমার যে লাইনগুলি তুলিয়া দিয়াছেন তাহা আমাদের চলতি ভাষার হসন্ত সুরের লাইন।

আমার্‌ সকল্‌ কাঁটা ধন্য করে
ফুট্‌বে গো ফুল্‌ ফুট্‌বে।
আমার্‌ সকল্‌ ব্যথা রঙিন হয়ে
গোলাপ্‌ হয়ে উঠ্‌বে।

আপনি লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন এই ছন্দের প্রত্যেক গাঁঠে গাঁঠে একটি করিয়া হসন্তের ভঙ্গি আছে। "ধন্য" শব্দটার মধ্যেও একটা হসন্ত আছে। উহা "ধন্‌ন" এই বানানে লেখা যাইতে পারে। এইটে সাধুভাষার ছন্দে লিখিলাম—

যত কাঁটা মম সফল করিয়া ফুটিবে কুসুম ফুটিবে।
সকল বেদনা অরুণ বরনে গোলাপ হইয়া উঠিবে।

অথবা যুক্তবর্ণকে যদি একমাত্রা বলিয়া ধরা যায় তবে এমন হইতে পারে—

সকল কণ্টক সার্থক করিয়া কুসুম স্তবক ফুটিবে।
বেদনা যন্ত্রণা রক্তমূর্তি ধরি গোলাপ হইয়া উঠিবে।

এমনি করিয়া সাধুভাষার কাব্যসভায় যুক্তবর্ণের মৃদঙ্গটা আমরা ফুটা করিয়া দিয়াছি এবং হসন্তর বাঁশির ফাঁকগুলি সীসা দিয়া ভর্তি করিয়াছি। ভাষার নিজের অন্তরের স্বাভাবিক সুরটাকে রুদ্ধ করিয়া দিয়া বাহির হইতে সুর যোজনা করিতে হইয়াছে। সংস্কৃত ভাষার

জরি-জহরতের ঝালরওয়ালা দেড় হাত দুই হাত ঘোমটার আড়ালে আমাদের ভাষাবধূটির চোখের জল মুখের হাসি সমস্ত ঢাকা পড়িয়া গেছে, তাহার কালো চোখের কটাক্ষে যে কত তীক্ষ্ণতা তাহা আমরা ভুলিয়া গেছি। আমি তাহার সেই সংস্কৃত ঘোমটা খুলিয়া দিবার কিছু সাধনা করিয়াছি, তাহাতে সাধুলোকেরা ছি ছি করিয়াছে। সাধু লোকেরা জরির আঁচলাটা দেখিয়া তাহার দর যাচাই করুক; আমার কাছে চোখের চাহনিটুকুর দর তাহার চেয়ে অনেক বেশি; সে যে বিনামূল্যের ধন, সে ভট্টাচার্যপাড়ার হাটে বাজারে মেলে না।...

সবুজপত্র—১৩২১ জ্যৈষ্ঠ

২

... সম্মুখসমরে পড়ি বীরচূড়ামণি
বীরবাহু—

এই বাক্যটি আবৃত্তি করিবার সময়ে আমরা "সম্মুখ" শব্দটার উপর ঝোঁক দিয়া সেই এক-ঝোঁকে একেবারে "বীরবাহু" পর্যন্ত গড়গড় করিয়া চলিয়া যাইতে পারি। আমরা নিশ্বাসটার বাজে-খরচ করিতে নারাজ, এক নিশ্বাসে যতগুলা শব্দ সারিয়া লইতে পারি ছাড়ি না।

আপনাদের ইংরেজি বাক্যে সেটা সম্ভব হয় না কেননা আপনাদের শব্দগুলা বেজায় রোখা মেজাজের। তাহারা প্রত্যেকেই ঢুঁ মারিয়া নিশ্বাসের শাসন ঠেলিয়া বাহির হইতে চায়। She was absolutely authentic, new, and inexpressible—এই বাক্যে যতগুলি বিশেষণপদ আছে সব কটাই উঁচু হইয়া উঠিয়া নিশ্বাসের বাতাসটাকে

ফুটবলের গোলার মতো এক মাথা হইতে আর এক মাথায় ছুঁড়িয়া ছুঁড়িয়া চালান করিয়া দিতেছে।

প্রত্যেক ভাষারই একটা স্বাভাবিক চলিবার ভঙ্গি আছে। সেই ভঙ্গিটারই অনুসরণ করিয়া সেই ভাষার নৃত্য অর্থাৎ তাহার ছন্দ রচনা করিতে হয়। এখন দেখা যাক আমাদের ভাষার চাল-চলনটা কী রকম।

আপনি বলিয়াছেন, বাংলা বাক্য উচ্চারণে বাক্যের আরম্ভে আমরা ঝোঁক দিয়া থাকি। এই ঝোঁকের দৌড়টা যে কতদূর পর্যন্ত হইবে তাহার কোনো বাঁধা নিয়ম নাই, সেটা আমাদের ইচ্ছা। যদি জোর দিতে না চাই তবে সমস্ত বাক্যটা একটানা বলিতে পারি, যদি জোর দিতে চাই তবে বাক্যের পর্বে পর্বেই ঝোঁক দিয়া থাকি "আদিম মানবের তুমুল পাশবতা মনে করিয়া দেখো"— এই বাক্যটা আমরা এমনি করিয়া পড়িতে পারি যাহাতে উহার সকল শব্দই একেবারে মাথায় মাথায় সমান হইয়া থাকে। আবার উত্তেজনার বেগে নিম্নলিখিত মতো করিয়াও পড়া যাইতে পারে,—আদিম মানবের তুমুল পাশবতা মনে করিয়া দেখো। এই বাংলা-শব্দগুলির নিজের কোনো বিশেষ দাবি নাই, আমাদের মর্জির উপরেই নির্ভর। কিন্তু "Realize the riotous animality of primitive man"—এই বাক্যে প্রায় প্রত্যেক শব্দই নিজ নিজ একসেন্টের ধ্বজা গাড়িয়া বসিয়া আছে বলিয়া নিশ্বাস তাহাদিগকে খাতির করিয়া চলিতে বাধ্য।

বাংলা ছন্দে যে পদবিভাগ হয় সেই প্রত্যেক পদের গোড়াতেই একটি করিয়া ঝোঁকালো শব্দ কাপ্তেনি করে এবং তাহার পিছন পিছন কয়েকটি অনুগত শব্দ সমান তালে পা ফেলিয়া কুচ করিয়া চলিয়া যায়। এইরূপ এক-একটি ঝোঁক-কাপ্তেনের অধীনে কয়টা করিয়া মাত্রা-সিপাই থাকিবে ছন্দের নিয়ম অনুসারে তাহার বরাদ্দ হইয়া থাকে।

পয়ারের রীতিটা দেখা যাক। পয়ারটা চতুষ্পদ ছন্দ। আমার বিশ্বাস, পয়ার শব্দটা পদ-চার শব্দের বিকার। ইহার এক-একটি পদ এক-একটি ঝোঁকের শাসনে চলে।

মহাভারতের কথা। অমৃতসমান॥
কাশীরামদাস কহে। শুনে পুণ্যবান্।

"অমৃতসমান" ও "শুনে পুণ্যবান্" এই দুই অংশে ছয়টি অক্ষর দেখা যাইতেছে বটে, কিন্তু মাত্রাগণনায় ইহারা আট। ঐখানে লাইন শেষ হয় বলিয়া দুটি মাত্রাপরিমাণ জায়গা ফাঁক থাকে। যাহারা সুর করিয়া পড়ে তাহারা "মান" এবং "বান্" শব্দের আকারটিকে দীর্ঘাকার করিয়া ঐ ফাঁক ভরাইয়া দেয়।

এক-একটি ঝোঁকে কয়টি করিয়া মাত্রা আগলাইতেছে তাহা দেখিয়াই ছন্দের বিচার করিতে হয়। নতুবা যদি মোটা করিয়া বলি যে, এক-এক লাইনে চোদ্দটা করিয়া অক্ষর থাকিলে তাহাকে পয়ার বলে তবে নানা ভিন্নপ্রকারের ছন্দকে পয়ার বলিতে হয়। নিম্নলিখিত ছন্দে প্রত্যেক লাইনে চোদ্দটা অক্ষর আছে।—

ফাগুন যামিনী, প্রদীপ জ্বলিছে ঘরে।
দখিন বাতাস মরিছে বুকের পরে।

ইহাকে যে পয়ার বলি না তাহার কারণ ইহার এক-একটি ঝোঁকের দখলে ছয়টি করিয়া মাত্রা। ইহার ভাগ নিচে লিখিলাম।—

ফাগুন যামিনী। প্রদীপ জ্বলিছে। ঘরে।

চোদ্দ-অক্ষরী লাইনের আরো দৃষ্টান্ত আছে।—

পুরব মেঘমুখে। পড়েছে রবি-রেখা।
অরুণ রথচূড়া। আধেক গেল দেখা।

এখানে স্পষ্টই এক-এক ঝোঁকে সাতটি করিয়া মাত্রা। সুতরাং পয়ারের তুলনায় প্রত্যেক পদে ইহার একমাত্রা কম।

তবেই দেখা যাইতেছে, আটমাত্রার ছন্দকেই পয়ার বলে। আট মাত্রাকে দুখানা করিয়া চারমাত্রায় ভাগ করা চলে, কিন্তু সেটাতে পয়ারের চাল খাটো করা হয়। বস্তুত লম্বা নিশ্বাসের মন্দগতি চালেই পয়ারের পদমর্যাদা। চার চার মাত্রায় পা ফেলিয়া পয়ার যখন দুলকি চালে চলে তখন তাহার পায়ে পায়ে মিল থাকে। যেমন—

বাজে তীর, পড়ে বীর ধরণীর পরে।

এরূপ ছন্দ হালকা কাজে চলে; ইহা যুক্ত-অক্ষরের ভার সয় না এবং সাতকাণ্ড বা অষ্টাদশ পর্ব জুড়িয়া লম্বা দৌড় ইহার পক্ষে অসাধ্য। চৌপদীটা পয়ারের সহোদর বোন। আট মাত্রায় তাহার পা পড়ে, কেবল তাহার পায়ে মিলের মলজোড়ার ঝংকারটা কিছু বেশি।

বাহিরের চেহারা দেখিয়া ছন্দের জাতিনির্ণয় করায় যে প্রমাদ ঘটিতে পারে তাহার একটা দৃষ্টান্ত এইখানে দিই। একদিন আমার মাথায় একটা ছয়মাত্রার ছন্দ আসিয়া হাজির হইয়াছিল। তাহার চেহারাটা এই রকম।—

প্রথম শীতের মাসে, শিশির লাগিল ঘাসে,
হুহু করে হাওয়া আসে, হিহি করে কাঁপে গাত্র।

গোটাকয়েক শ্লোক যখন লেখা হইয়া গেছে তখন হঠাৎ হুঁশ হইল যে, আকারে-আয়তনে চৌপদীর সঙ্গে ইহার কোনো তফাত নাই, অতএব পাঠকেরা আট মাত্রার ঝোঁক দিয়াই ইহা পড়িবে। তখন আমি হাল ছাড়িয়া দিয়া চৌপদীর দস্তুরেই লিখিতে লাগিলাম। এই ছন্দটিকে ছয়মাত্রার কায়দায় পড়িতে হইলে নিম্নলিখিত মতো ভাগ হয়।—

। ।
প্রথম শীতের। মাসে—।

। ।
শিশির লাগিল। ঘাসে—।

আমাদের দেশের সংগীতের তাল যদি আপনার জানা থাকে তবে

এক কথায় বলিলেই বুঝিবেন চৌপদীতে কাওয়ালির লয়ে ঝোঁক দিতে হয় এবং আমি যে ছন্দটা লক্ষ্য করিয়া লিখিতেছিলাম তাহার তাল একতালা। কাওয়ালি দুইবর্গ মাত্রার তাল, এবং একতালা তিনবর্গ মাত্রার।

ত্রিপদীরও মোটের উপর আটমাত্রার চাল। যথা—

ভবানীর কটুভাষে। লজ্জা হৈল কীর্তিবাসে।
ক্ষুধানলে কলেবর। দহে।

তৃতীয় পদে দুটামাত্রা বেশি আছে; তাহার কারণ, যে চতুর্থ পদটি থাকিলে এই ছন্দের ভারসামঞ্জস্য থাকিত সেটি নাই। "ক্ষুধানলে কলেবর" পর্যন্ত আসিয়া থামিতে গেলে ছন্দটা কাত হইয়া পড়ে এইজন্য "দহে" একটা যোগ করিয়া ছোটো একটি ঠেকা দিয়া উহাকে খাড়া রাখা হইয়াছে। চতুষ্পদ জন্তুর পায়ের তেলোটা চওড়া হয় না, কিন্তু মানুষের খাড়া শরীরের টলটলে ভারটা দুই পায়ের পক্ষে বেশি হওয়াতেই তাহার পদতলটা গোড়ালি ছাড়াইয়া সামনের দিকে খানিকটা বিস্তীর্ণ; সেইটুকুই ত্রিপদীর ঐ শেষ দুটো অতিরিক্ত মাত্রা।

এইরূপ অনেকগুলি ছন্দ দেখা যায় যাহাতে খানিকটা করিয়া বড়ো মাত্রাকে একটি করিয়া ছোটো মাত্রা দিয়া বাধা দিবার কায়দা দেখা যায়। দশ মাত্রার ছন্দ তাহার দৃষ্টান্ত। ইহার ভাগ আট+দুই, অথবা চার+চার+দুই।

মোর পানে। চাহ মুখ। তুলি।
পরশিব। চরণের। ধূলি।

ছয় মাত্রার ছন্দেও এরূপ বড়ো-ছোটোর ভাগ চলে। সেই ভাগ ছয়+দুই অথবা তিন+তিন+দুই। যেমন—

আঁখিতে। মিলিল। আঁখি।
হাসিল। বদন। ঢাকি।
মরম-বারতা শরমে মরিল
কিছু না রহিল বাকি।

উক্ত ছন্দে তিনের দল বুক ফুলাইয়া জুড়ি মিলাইয়া চলিতেছিল, হঠাৎ মাঝে মাঝে একটা খাপছাড়া দুই আসিয়া তাহাদিগকে বাধা দিয়াছে। এইরূপে গতি ও বাধার মিলনে ছন্দের সংগীত একটু বিশেষ ভাবে বাজিয়া উঠিয়াছে। এই বাধাটি গতির অনুপাতে ছোটো হওয়া চাই। কারণ, বড়ো হইলে সে বাধা সত্য হয় এবং গতিকে আবদ্ধ করে, সেটা ছন্দের পক্ষে দুর্ঘটনা। তাই উপরের দুইটি দৃষ্টান্তে দেখিয়াছি চারের দল ও তিনের দলকে দুই আসিয়া রোধ করিয়াছে, সেই জন্য ইহা বন্ধনের অবরোধ নহে, ইহা লীলার উপরোধ। দুইয়ের পরিবর্তে এক হইলেও ক্ষতি হয় না। যেমন—

প্রতিদিন হায়। এসে ফিরে যায়। কে?

অথবা

মুখে তার। নাহি আর। রা।
লাজে লীন। কাঁপে ক্ষীণ। গা।

বাংলা ছন্দকে তিন প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। দুই বর্গের মাত্রা, তিন বর্গের মাত্রা এবং অসমান মাত্রার ছন্দ।

দুই বর্গ মাত্রার ছন্দ, যেমন পয়ার, ত্রিপদী, চৌপদী। এই সমস্ত ছন্দ বড়ো বড়ো বোঝা বহিতে পারে, কেননা দুই, চার, আট মাত্রাগুলি বেশ চৌকা। এইজন্য পৃথিবীতে পা-ওয়ালা জীবমাত্রেরই, হয় দুই, নয় চার, নয় আট পা। বাংলা সাহিত্যে ইহারাই মহাকাব্যের বাহন।

চাকার গুণ এই যে একবার ধাক্কা পাইলে সেই ঝোঁকে সে গড়াইয়া

চলে, থামিতে চায় না। তিন মাত্রার ছন্দ সেই চাকার মতো। দুই *সংখ্যাটা স্থিতিপ্রবণ, তিন সংখ্যাটা গতিপ্রবণ।*

নবীন। কিশোরী। মেঘের। বিজুরী। চমকি। চলিয়া। গেল।

এখানে তিন মাত্রার শব্দগুলি একটা আরএকটার গায়ের উপর গড়াইয়া পড়িয়া ঠেলা দিয়া চলিয়াছে, থামানো দায়। অবশেষে একটি দুইমাত্রা আসিয়া তাহাকে ক্ষণকালের জন্য ঠেকাইয়াছে।

দুই মাত্রার সঙ্গে তিনমাত্রার মিলনে অসমমাত্রার ছন্দের উৎপত্তি। ৩+২, ৩+৪, ৫+৪ মাত্রার ছন্দ তাহার দৃষ্টান্ত।—

৩+২

কাঁপিলে পাতা, নড়িলে পাখি
চমকি উঠে চকিত আঁখি।

৩+৪

তরল জলধর বরিষে ঝরঝর
অশনি গরগর হাঁকে।

৫+৪

বচন বলে আধো-আধো,
চরণ চলে বাধো-বাধো,
নয়ন তলে কাঁদো-কাঁদো চাহনি।

তিন মাত্রার ছন্দের ন্যায় অসমমাত্রার ছন্দও স্বভাবত চঞ্চল। মাত্রার অসমানতাই তাহাকে কেবল টলাইতে থাকে। প্রত্যেক পদ পরবর্তী পদের উপর ঠেস দিয়া আপনাকে সামলাইতে চেষ্টা করে। বস্তুত তিনমাত্রাও অসমমাত্রা, তাহার উপাদান দুই+এক।

কারণ ছন্দের মূল মাত্রা দুই, তাহা এক নহে। নিয়মিত গতিমাত্রই দুই সংখ্যাকে অবলম্বন করিয়া। তাই স্তম্ভ, যাহা থামিয়া থাকে, তাহা এক হইতে পারে; কিন্তু জন্তুর পা বলো, পাখির পাখা বলো, মাছের পাখনা

বলো, দুইয়ের যোগে তবে চলে। সেই দুইয়ের নিয়মিত গতির উপরে যদি একটা একের অতিরিক্ত ভার চাপানো যায় তবে সেই গতিতে একটা অনিয়মের বেগ পড়ে, সেই অনিয়মের ঠেলায় নিয়মিত গতির বেগ বাড়িয়া যায় এবং তাহার বৈচিত্র্য ঘটে। মানুষের শরীর তাহার দৃষ্টান্ত। চারপেয়ে মানুষ যখন সোজা হইয়া দাঁড়াইল তখন তাহার কোমর হইতে মাথা পর্যন্ত টলমলে এবং কোমর হইতে পদতল পর্যন্ত মজবুত হওয়াতে এই দুইভাগের মধ্যে অসামঞ্জস্য ঘটিয়াছে। এই অসামঞ্জস্যকে ছন্দে সামলাইবার জন্য মানুষের গতিতে মাথা হাত কোমর পা বিচিত্র হিল্লোলে হিল্লোলিত হইতেছে। চার পায়ের ছন্দ ইহার চেয়ে অনেক সরল।

অতএব বাংলা ছন্দকে সমমাত্রা, অসমমাত্রা এবং বিষমমাত্রায় শ্রেণী-বদ্ধ করা যাইতে পারে। শুধু বাংলা কেন, কোনো ভাষার ছন্দের আর কোনোপ্রকার ভাগ হইতে পারে বলিয়া মনে করিতে পারি না। তবে প্রভেদ হয় কিসে? মাত্রাগুলির চেহারায়।

সংস্কৃত ভাষায় অসমান স্বর ও ব্যঞ্জনগুলিকে কৌশলে মিলাইয়া সমান মাত্রায় ভাগ করিতে হয়, তাহাতে ধ্বনির বৈচিত্র্য ও গাম্ভীর্য ঘটে। যথা—

বদসি যদি | কিঞ্চিদপি | দন্তরুচি | -কৌমুদী |
হরতি দর | -তিমিরমতি | -ঘোরম্ ।[১]

ইহা পাঁচমাত্রা অর্থাৎ বিষমমাত্রার ছন্দ। বাঙালি জয়দেব তাঁহার গানে সংস্কৃতভাষার যুক্তবর্ণের বেণী যথাসম্ভব এলাইয়া দিতে ভালো-বাসিতেন, এইজন্য উপরের উদ্‌ধৃত শ্লোকাংশটি যথেষ্ট ভালো দৃষ্টান্ত নহে।

১ জয়দেব : গীতগোবিন্দ, গীত ১৯।১। দ্রষ্টব্য : 'মাত্রাবৃত্ত', সংজ্ঞাপরিচয়-বিভাগ।

তবু ইহাতে আমার কথাটি বুঝা যাইবে। ইহার প্রত্যেক ঝোঁকে যে পাঁচমাত্রা পড়িয়াছে তাহার ভাগ এইরূপ।—

১+১+১+১+১ | ২+১+১+১ | ২+১+১+১ | ২+১+২ |
১+১+১+১+১ | ১+১+১+১+১ | ২+২+- ।

বাংলাভাষার সাধুছন্দে একের মাঝে মাঝে দুই বসিবার জায়গা পায় না, একথা পূর্বেই বলিয়াছি। উপরের কবিতাটুকু বাংলায় তরজমা করিতে হইলে নিম্নলিখিত-মতো হইবে।—

বচন যদি | কহ গো দুটি | দশনরুচি | উঠিবে ফুটি, |
ঘুচাবে মোর | মনের ঘোর | তামসী।

একটি ইংরেজি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক।—

Ah, distinctly | I remember, |
It was in the bleak December. |[১]

এটি চৌপদী ছন্দ। ইহার মাত্রাগুলিকে ছাড়াইয়া দেখা যাক।—

১ ২ ৩ ৪ ১ ২ ৩ ৪
Ah dis tinct ly | I re mem ber.

ইহার এক-একটা ঝোঁকে চারিটি করিয়া মাত্রা।[২] কিন্তু অসমান শব্দগুলিকে ভাগ করিয়া এই মাত্রাগুলি তৈরি হইয়াছে এবং distinct শব্দের tinct এবং remember শব্দের mem অংশটি নিজের একসেন্টের সড়কি আস্ফালন করিতেছে।

ইহাই সাধু বাংলায় হইবে।—

আহা মোর মনে আসে
দারুণ শীতের মাসে।

১ এডগার অ্যালান পো : *The Raven*।

২ দ্রষ্টব্য : এই দুই লাইনের অধ্যাপক এণ্ডারসন্-কৃত বিশ্লেষণ ('পাঠপরিচয়'-বিভাগ, ২১ জুলাই ১৯১৪ তারিখে লেখা পত্র) এবং 'ছন্দের অর্থ' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথকৃত বিশ্লেষণ। ওই দুই স্থলেই প্রতি ঝোঁকে দুই মাত্রা করে ধরা হয়েছে।

ইংরেজ কবি ইচ্ছা করিলেও এমনতরো নখদন্তহীন মাত্রায় ছন্দ রচিতেই পারেন না, কারণ তাঁহাদের শব্দগুলি কোণওয়ালা।

ইচ্ছা করিলে যুক্ত-অক্ষরের আমদানি করিয়া আমরা ঐ শ্লোকটাকে শক্ত করিয়া তুলিতে পারি। যেমন—

স্পষ্ট স্মৃতি চিত্তে ভাসে
দুরন্ত অঘ্রান মাসে
অগ্নিকুণ্ড নিবে আসে
নাচে তারি উপচ্ছায়া।

এখানে বাংলার সঙ্গে ইংরেজির প্রধান প্রভেদ এই যে, বাংলা শব্দগুলিতে স্বরবর্ণের টান ইংরেজির চেয়ে বেশি। কিন্তু আমার প্রথম পত্রেই লিখিয়াছি সেটা কেবল সাধুভাষায়; বাংলার চলতি ভাষায় ঠিক ইহার উলটা। চলতি ভাষার কথাগুলি শুচিভাবে পরস্পরের স্পর্শ বাঁচাইয়া চলে না, ইংরেজি শব্দেরই মতো চলিবার সময় কে কাহার গায়ে পড়ে তাহার ঠিক নাই।

পূর্বপত্রেই লিখিয়াছি বাংলা চলতি ভাষার ধ্বনিটা হসন্তের সংঘাতধ্বনি, এই জন্য ধ্বনিহিসাবে সংস্কৃতের চেয়ে ইংরেজির সঙ্গে তাহার মিল বেশি। তাই এই চলতি ভাষার ছন্দে মাত্রাবিভাগ বিচিত্র। বাংলা প্রাকৃতের একটা চৌপদী নিচে লিখিলাম।—

কই পালঙ্ক, কইরে কম্বল,
কপ্‌নি-টুক্‌রো রইল সম্বল,
একলা পাগ্‌লা ফির্‌বে জঙ্গল,
মিট্‌বে সংকট ঘুচ্‌বে দ্বন্দ্ব।

ইহার সঙ্গে Ah distinctly I remember শ্লোকটি মিলাইয়া দেখিলে দেখা যাইবে ধ্বনির বিশেষ কোনো তফাত নাই।

ইহার সাধু পাঠ এইরূপ —

শয্যা কই বস্ত্র কই,
কী আছে কৌপীন বই.
একা বনে ফিরে ঐ,
নাহি মনে ভয় চিন্তা।

সাধু ও অসাধুর মাত্রাভাগ নিচে নিচে লিখিলাম মিলাইয়া দেখিবেন।—

১	২	৩	৪	১	২	৩	৪
কই ।	পা ।	লঙ্ ।	ক ॥	রুই ।	রে ।	কম্ ।	বল্ ॥
শ ।	য্যা ।	ক ।	ই ॥	বস্ ।	ত্র ।	ক ।	ই ॥

১	২	৩	৪	১	২	৩	৪
কপ্ ।	নি ।	টুক্ ।	মো ॥	রই ।	ল ।	সম্ ।	বল্ ॥
কী ।	আ ।	ছে ।	কৌ ॥	পী ।	ন ।	ব ।	ই ॥

১	২	৩	৪	১	২	৩	৪
এক্ ।	লা ।	পাগ্ ।	লা ॥	ফির্ ।	বে ।	জঙ্ ।	গল্ ॥
এ ।	কা ।	ব ।	নে ॥	ফি ।	রে ।	ও ।	ই ॥

সাধুভাষার ছন্দটি যেন মোটা মোটা ফাঁকওয়ালা জালের মতো, আর অসাধুটির একেবারে ঠাসবুনানি।

ইংরেজিতে সমমাত্রার ছন্দ অনেক আছে, তাহার একটি দৃষ্টান্ত পূর্বেই দিয়াছি। অসমমাত্রা অর্থাৎ তিনমাত্রার দৃষ্টান্ত। যথা—

১	২	৩	১	২	৩
One |	more |	un ||	for |	tu |	nate ||

১	২	৩	১	২	৩
Wea |	ry |	of ||	breath	—	— ||

ইংরেজিতে বিষমমাত্রার একটি উদাহরণ দিতে পারিলেই আপাতত আমার পালা শেষ হয়। একটি মনে পড়িতেছে।—

১	২	৩	৪	৫
When |	we |	two |	par |	ted |

	১	২	৩	৪	৫
(In)	si |	lence |	and |	tears |	— |

১ ২ ৩ ৪ ৫
Half | bro | ken | heart | ed |

১ ২ ৩ ৪ ৫
(To) se | ver | for | years | — |

এই শ্লোকটির দুই লাইনকে মিলাইয়া এক লাইন করিয়া পড়িলে ইহার ছন্দকে তিন মাত্রায় ভাগ করিয়া পড়া সহজ হয়। কিন্তু বিষম-মাত্রার লয়ে ইহাকে পড়িলে চলে বলিয়াই এই দৃষ্টান্তটি প্রয়োগ করিয়াছি, বোধ করি এরূপ দৃষ্টান্ত ইংরেজি ছন্দে দুর্লভ।

দেখা গিয়াছে ইংরেজি ছন্দে ঝোঁক পদের আরম্ভেও পড়িতে পারে, পদের শেষেও পড়িতে পারে। আরম্ভে, যেমন—

O the dreary | dreary moorland |
O the barren | barren shore |

পদের শেষে, যেমন—

And are ye sure || the news is true ||
And are ye sure || he's well ||

বাংলায় আরম্ভে ছাড়া পদের আর কোথাও ঝোঁক পড়িতে পারে না।

একলা পাগলা ফিরবে জঙ্গল

কিংবা

একলা পাগলা ফিরবে জঙ্গল

এমনটি হইবার জো নাই।

আমার কথাটি ফুরাল। ইংরেজি ছন্দকে আমি বাংলা ছন্দের রীতি-অনুসারে ভাগ করিয়া দেখিয়াছি, সেটা ভালো হইল কিনা জানি না। ইংরেজি ছন্দতত্ত্ব আমার একদম জানা নাই বলিয়াই বোধ করি

এরূপ দুঃসাহস আমার পক্ষে সহজ হইয়াছে। কারণ চাণক্য যাহাদিগকে কথা কহিতে বারণ করেন তাহারাই আগেভাগে কথা কহিয়া বসে; *আপনারাও জানেন angelরা প্রবেশ করিতে ভয় পান এমন জায়গা আছে, কিন্তু foolদের কোথাও বাধা নাই। এরূপ সতর্কতায় সকল সময়েই যে এঞ্জেলরা জেতেন তাহা নহে,* অনেক সময়েই ঠকিয়া থাকেন; অবুঝ হঠকারিতায় অপর পক্ষের কখন কখন জিত হইবার সম্ভাবনা আছে এই আমার ভরসা। আপনার পক্ষে বোঝা সহজ হইতে পারে বলিয়াই আমি ইংরেজি দৃষ্টান্তগুলি ব্যবহার করিয়াছি, ইহাতে আমার বিদ্যা প্রকাশ না হইয়া বিদ্যা ফাঁস হইয়া যাইতে পারে। ... ইতি ১৮ আষাঢ় ১৩২১।

সবুজপত্র—১৩২১, শ্রাবণ

সংগীত ও ছন্দ

অনেকদিন হইতেই কবিতা লিখিতেছি, এইজন্য যতই বিনয় করি না কেন, এটুকু না বলিয়া পারি না যে, ছন্দের তত্ত্ব কিছু কিছু বুঝি। সেই ছন্দের বোধ লইয়া যখন গান লিখিতে বসিলাম, তখন চাঁদ সদাগরের উপর মনসার যে-রকম আক্রোশ, আমার রচনার উপর তালের ওস্তাদী দেবতা তেমনি ফোঁস করিয়া উঠিলেন। আমার জানা ছিল ছন্দের মধ্যে যে-নিয়ম আছে তাহা বিধাতার গড়া নিয়ম, তা কামারের গড়া নিগড় নয়। সুতরাং তার সংযমে সংকীর্ণ করে না, তাহাতে বৈচিত্র্যকে উদ্‌ঘাটিত করিতে থাকে। সেই কথা মনে রাখিয়া বাংলা কাব্যে ছন্দকে বিচিত্র করিতে সংকোচ বোধ করি নাই।

কাব্যে ছন্দের যে কাজ, গানে তালের সেই কাজ। অতএব ছন্দ যে-নিয়মে কবিতায় চলে তাল সেই নিয়মে গানে চলিবে এই ভরসা করিয়া গান বাঁধিতে চাহিলাম। তাহাতে কী উৎপাত ঘটিল একটা দৃষ্টান্ত দিই। মনে করা যাক আমার গানের কথাটি এই।—

কাঁপিছে দেহলতা থরথর,
চোখের জলে আঁখি ভরভর।
দোদুল তমালেরি বনছায়া
তোমার নীলবাসে নিল কায়া,

বাদল নিশীথেরি ঝরঝর
তোমার আঁখি'পরে ভরভর।

যে কথা ছিল তব মনে মনে
চমকে অধরের কোণে কোণে।

নীরব হিয়া তব দিল ভরি
কী মায়া-স্বপনে যে, মরি মরি,
নিবিড় কাননের মরমর
বাদল নিশীথের ঝরঝর।

এ ছন্দে আমার পাঠকেরা কিছু আপত্তি করিলেন না। তাই সাহস করিয়া ঐটেই ঐ ছন্দেই সুরে গাহিলাম। তখন দেখি যাঁরা কাব্যের বৈঠকে দিব্য খুশি ছিলেন তাঁরাই গানের বৈঠকে রক্তচক্ষু। তাঁরা বলেন, এ-ছন্দের এক অংশে সাত আর-এক অংশে চার, ইহাতে কিছুতেই তাল মেলে না। আমার জবাব এই, তাল যদি না মেলে সেটা তালেরই দোষ। ছন্দটাতে দোষ হয় নাই, কেন তাহা বলি। এই ছন্দ তিন এবং চার মাত্রার যোগে তৈরি। এইজন্যই "তোমার নীলবাসে" এই সাত মাত্রার পর "নিল কায়া" এই চারমাত্রা খাপ খাইল। তিন মাত্রা হইলেও ক্ষতি হইত না। যেমন, "তোমার নীলবাসে মিলিল।" কিন্তু ইহার মধ্যে ছয় মাত্রা কিছুতেই সইবে না। যেমন, "তোমারি নীলবাসে ধরিল শরীর।" অথচ প্রথম অংশে যদি ছয়ের ভাগ থাকিত তবে দিব্য চলিত। যেমন, "তোমার সুনীল বাসে ধরিল শরীর"। এ আমি বলিতেছি কানের স্বাভাবিক রুচির কথা। এই কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিবার পথ। অতএব এই কানের কাছে যদি ছাড় মেলে তবে ওস্তাদকে কেন ডরাইব?

আমার দৃষ্টান্তগত ছন্দটিতে প্রত্যেক লাইনেই সবসুদ্ধ ১১ মাত্রা আছে। কিন্তু এমন ছন্দ হইতে পারে যার প্রত্যেক লাইনে সমান মাত্রাবিভাগ নাই। যেমন—

বাজিবে, সখি, বাঁশি বাজিবে,
হৃদয়রাজ হৃদে রাজিবে।
বচন রাশি রাশি কোথা যে যাবে ভাসি'
অধরে লাজহাসি সাজিবে।

নয়নে আঁখিজল করিবে ছলছল
সুখবেদনা মনে বাজিবে।
মরমে মুরছিয়া মিলাতে চাবে হিয়া
সেই চরণযুগ-রাজীবে।

ইহার প্রথম দুই লাইনে মাত্রা ভাগ ৩+৪+৩=১০। তৃতীয় লাইনে ৩+৪+৩+৪=১৪। আমার মতে এই বৈচিত্র্যে ছন্দের মিষ্টতা বাড়ে। অতএব উৎসাহ করিয়া গান ধরিলাম। কিন্তু এক ফের ফিরিতেই তালওয়ালা পথ আটক করিয়া বসিল। সে বলিল, "আমার সমের মাশুল চুকাইয়া দাও।" আমি তো বলি এটা বে-আইনি আবোয়াব। কান মহারাজার উচ্চ আদালতে দরবার করিয়া খালাস পাই। কিন্তু সেই দরবারের বাহিরে খাড়া আছে মাঝারি শাসনতন্ত্রের দারোগা। সে খপ করিয়া হাত চাপিয়া ধরে, নিজের বিশেষ বিধি খাটায়, রাজার দোহাই মানে না।

কবিতায় যেটা ছন্দ, সংগীতে সেইটেই লয়। এই লয় জিনিসটি সৃষ্টি ব্যাপিয়া আছে; আকাশের তারা হইতে পতঙ্গের পাখা পর্যন্ত সমস্তই ইহাকে মানে বলিয়াই বিশ্বসংসার এমন করিয়া চলিতেছে অথচ ভাঙিয়া পড়িতেছে না। অতএব কাব্যেই কি গানেই কি এই লয়কে যদি মানি তবে তালের সঙ্গে বিবাদ ঘটিলেও ভয় করিবার প্রয়োজন নাই।

একটি দৃষ্টান্ত দিই।—

ব্যাকুল বকুলের ফুলে
ভ্রমর মরে পথ ভুলে'।
আকাশে কী গোপন বাণী
বাতাস করে কানাকানি,
বনের অঞ্চলখানি
পুলকে উঠে দুলে দুলে।

বেদনা সুমধুর হয়ে
ভুবনে গেল আজি বয়ে।
বাঁশিতে মায়া তান পুরি
কে আজি মন করে চুরি,
নিখিল তাই মরে ঘুরি
বিরহসাগরের কূলে।

এটা যে কী তাল তা আমি আনাড়ি জানি না। এবং কোনো ওস্তাদও জানেন না। গণিয়া দেখিলে দেখি প্রত্যেক লাইনে নয় মাত্রা। যদি এমন বলা যায় যে, না-হয় নয় মাত্রায় একটা নূতন তালের সৃষ্টি করা যাক তবে আর-একটা নয় মাত্রার গান পরীক্ষা করিয়া দেখা যাক।—

যে কাঁদনে হিয়া কাঁদিছে
সে কাঁদনে সেও কাঁদিল।
যে বাঁধনে মোরে বাঁধিছে
সে বাঁধনে তারে বাঁধিল।
পথে পথে তারে খুঁজিনু
মনে মনে তারে পূজিনু,
সে পূজার মাঝে লুকায়ে
আমারেও সে যে সাধিল।
এসেছিল মন হরিতে
মহাপারাবার পারায়ে,
ফিরিল না আর তরীতে
আপনারে গেল হারায়ে।
তারি আপনার মাধুরী
আপনারে করে চাতুরী,
ধরিবে কি ধরা দিবে সে
কী ভাবিয়া ফাঁদ ফাঁদিল॥

এও নয় মাত্রা কিন্তু এর ছন্দ আলাদা। প্রথমটার লয় ছিল তিনে

ছয়ে, দ্বিতীয়টার লয় ছয়ে তিনে। [আরো একটা নয়ের তাল দেখা যাক।

আঁধার রজনী পোহাল
জগৎ পূরিল পুলকে,
বিমল প্রভাত-কিরণে
মিলিল দ্যুলোকে ভূলোকে।

নয় মাত্রা বটে কিন্তু এ ছন্দ স্বতন্ত্র। ইহার লয় তিন তিন তিনে। ইহাকে কোন্ নাম দিবে?] আরো একটা দেখা যাক।

দুয়ার মম পথ পাশে
সদাই তারে খুলে রাখি।
কখন তার রথ আসে
ব্যাকুল হয়ে জাগে আঁখি।
শ্রাবণ শুনি দূর মেঘে
লাগায় গুরু গরগর,
ফাগুন শুনি বায়ুবেগে
জাগায় মৃদু মরমর,
আমার বুকে উঠে জেগে
চমক তারি থাকি থাকি।
কখন তার রথ আসে
ব্যাকুল হয়ে জাগে আঁখি।
সবাই দেখি যায় চলে
পিছন পানে নাহি চেয়ে
উতল রোলে কল্লোলে
পথের গান গেয়ে গেয়ে।
শরৎ মেঘ ভেসে ভেসে
উধাও হয়ে যায় দূরে,
যেথায় সব পথ মেশে
গোপন কোন্ সুরপুরে,—

স্বপনে ওড়ে কোন্ দেশে
উদাস মোর প্রাণ-পাখি।
কখন তার রথ আসে
ব্যাকুল হয়ে জাগে আঁখি।

[এও তো আরেক ছন্দ। ইহার লয় পাঁচে চারে মিলিয়া। আবার এইটেকে উলটাইয়া দিয়া চারে পাঁচে করিলে নয়ের ছন্দকে লইয়া নয়-ছয় করা যাইতে পারে।] চৌতাল তো বারো মাত্রার ছন্দ। কিন্তু এই বারো মাত্রা রক্ষা করিলেও চৌতালকে রক্ষা করা যায় না এমন হয়। এই তো বারো মাত্রা।—

বনের পথে পথে বাজিছে বায়ে
নূপুর রুনুরুনু কাহার পায়ে।
কাটিয়া যায় বেলা মনের ভুলে,
বাতাস উদাসিছে আকুল চুলে,
ভ্রমর মুখরিত বকুলছায়ে
নূপুর রুনুরুনু কাহার পায়ে।

ইহা চৌতালও নহে, একতালাও নহে, ধামারও নয়, ঝাঁপতালও নয়। লয়ের হিসাব দিলেও তালের হিসাব মেলে না। তালওয়ালা সেই গরমিল লইয়া কবিকে দায়িক করে।

কিন্তু হাল আমলে এ সমস্ত উৎপাত চলিবে না। আমরা শাসন মানিব, তাই বলিয়া অত্যাচার মানিব না। কেননা যে-নিয়ম সত্য সে-নিয়ম বাহিরের জিনিস নয়, তাহা বিশ্বের বলিয়াই তাহা আমার আপনার। যে-নিয়ম ওস্তাদের তাহা আমার ভিতরে নাই, বাহিরে আছে; সুতরাং তাকে অভ্যাস করিয়া বা ভয় করিয়া বা দায়ে পড়িয়া মানিতে হয়। এই রূপ মানার দ্বারাই শক্তির বিকাশ বন্ধ হইয়া যায়। আমাদের সংগীতকে এই মানা হইতে মুক্তি দিলে তবেই তার স্বভাব তার স্বরূপকে নব নব উদ্ভাবনার ভিতর দিয়া ব্যক্ত করিতে থাকিবে।

সবুজপত্র—১৩২৪ ভাদ্র

ছন্দের অর্থ

শুধু কথা যখন খাড়া দাঁড়িয়ে থাকে তখন কেবলমাত্র অর্থকে প্রকাশ করে। কিন্তু সেই কথাকে যখন তির্যক্‌ ভঙ্গি ও বিশেষ গতি দেওয়া যায় তখন সে আপন অর্থের চেয়ে আরও কিছু বেশি প্রকাশ করে। সেই বেশিটুকু যে কী তা বলাই শক্ত। কেননা তা কথার অতীত, সুতরাং অনির্বচনীয়। যা আমরা দেখছি শুনছি জানছি তার সঙ্গে যখন অনির্বচনীয়ের যোগ হয় তখন তাকেই আমরা বলি রস। অর্থাৎ সে-জিনিসটাকে অনুভব করা যায়, ব্যাখ্যা করা যায় না। সকলে জানেন এই রসই হচ্ছে কাব্যের বিষয়।

এইখানে একটা কথা মনে রাখা দরকার, অনির্বচনীয় শব্দটার মানে অভাবনীয় নয়। তা যদি হত তাহলে ওটা কাব্যে অকাব্যে কুকাব্যে কোথাও কোনো কাজে লাগত না। বস্তু পদার্থের সংজ্ঞা নির্ণয় করা যায়, কিন্তু রস পদার্থের করা যায় না। অথচ রস আমাদের একান্ত অনুভূতির বিষয়। গোলাপকে আমরা বস্তুরূপে জানি, আর গোলাপকে আমরা রসরূপে পাই। এর মধ্যে বস্তু-জানাকে আমরা সাদা কথায় তার আকার আয়তন ভার কোমলতা প্রভৃতি বহুবিধ পরিচয়ের দ্বারা ব্যাখ্যা করতে পারি, কিন্তু রস পাওয়া এমন একটি অখণ্ড ব্যাপার যে তাকে তেমন করে সাদা কথায় বর্ণনা করা যায় না; কিন্তু তাই বলেই সেটা অলৌকিক অদ্ভুত অসামান্য কিছুই নয়। বরঞ্চ রসের অনুভূতি বস্তুজ্ঞানের চেয়ে আরো প্রবলতর গভীরতর। এই জন্য গোলাপের আনন্দকে আমরা যখন অন্যের মনে সঞ্চার করতে চাই তখন একটা সাধারণ অভিজ্ঞতার রাস্তা দিয়েই করে থাকি। তফাত এই, বস্তু-অভিজ্ঞতার ভাষা সাদা কথার বিশেষণ, কিন্তু রস-অভিজ্ঞতার ভাষা

আকার ইঙ্গিত সুর এবং রূপক। পুরুষমানুষের যে-পরিচয়ে তিনি আপিসের বড়ো বাবু সেটা আপিসের খাতাপত্র দেখলেই জানা যায়, কিন্তু মেয়ের যে-পরিচয়ে তিনি গৃহলক্ষ্মী সেটা প্রকাশের জন্যে তাঁর সিঁথের সিঁদুর, তাঁর হাতে কঙ্কণ। অর্থাৎ এটার মধ্যে রূপক চাই, অলংকার চাই, কেননা কেবলমাত্র তথ্যের চেয়ে এ যে বেশি, এর পরিচয় শুধু জ্ঞানে নয়, হৃদয়ে। ঐ যে গৃহলক্ষ্মীকে লক্ষ্মী বলা গেল এইটেই তো হল একটা কথার ইশারামাত্র ; অথচ আপিসের বড়ো বাবুকে তো আমাদের কেরানি-নারায়ণ বলবার ইচ্ছাও হয় না, যদিও ধর্মতত্ত্বে বলে থাকে সকল নরের মধ্যেই নারায়ণের আবির্ভাব আছে। তাহলেই বোঝা যাচ্ছে আপিসের বড়ো বাবুর মধ্যে অনির্বচনীয়তা নেই ; কিন্তু যেখানে তাঁর গৃহিণী সাধ্বী সেখানে তাঁর মধ্যে আছে। তাই বলে এমন কথা বলা যায় না যে, ঐ বাবুটিকেই আমরা সম্পূর্ণ বুঝি আর মা-লক্ষ্মীকে বুঝিনে, বরঞ্চ উলটো। কেবল কথা এই যে, বোঝবার বেলায় মা-লক্ষ্মী যত সহজ বোঝাবার বেলায় তত নয়।

"কেবা শুনাইল শ্যাম নাম।" ব্যাপারটা ঘটনা হিসাবে সহজ। কোনো এক ব্যক্তি দ্বিতীয় ব্যক্তির কাছে তৃতীয় ব্যক্তির নাম উচ্চারণ করেছে। এমন কাণ্ড দিনের মধ্যে পঞ্চাশবার ঘটে। এইটুকু বলবার জন্যে কথাকে বেশি নাড়া দেবার দরকার হয় না। কিন্তু নাম কানের ভিতর দিয়ে যখন মরমে গিয়ে পশে, অর্থাৎ এমন জায়গায় কাজ করতে থাকে যে-জায়গা দেখা শোনার অতীত, এবং এমন কাজ করতে থাকে যাকে মাপা যায় না, ওজন করা যায় না, চোখের সামনে দাঁড় করিয়ে যার সাক্ষ্য নেওয়া যায় না, তখন কথাগুলোকে নাড়া দিয়ে তাদের পুরো অর্থের চেয়ে তাদের কাছ থেকে আরো অনেক বেশি আদায় করে নিতে হয়। অর্থাৎ আবেগকে প্রকাশ করতে গেলে কথার মধ্যে সেই আবেগের ধর্ম সঞ্চার করতে হয়। আবেগের ধর্ম হচ্ছে বেগ। কথা

যখন সেই বেগ গ্রহণ করে তখনই আমাদের হৃদয়ভাবের সঙ্গে তার মিল ঘটে।

এই বেগের কত বৈচিত্র্যই যে আছে তার ঠিকানা নেই। এই বেগের বৈচিত্র্যেই তো আলোকের রং বদল হচ্ছে, শব্দের সুর বদল হচ্ছে, এবং লীলাময়ী সৃষ্টি রূপ থেকে রূপান্তর গ্রহণ করছে। এমন কি সৃষ্টির বাইরের পর্দা সরিয়ে ভিতরের রহস্যনিকেতনে যতই প্রবেশ করা যায় ততই বস্তুত্ব ঘুচে গিয়ে কেবল বেগই প্রকাশ পেতে থাকে। শেষকালে এই কথাই মনে হয় প্রকাশবৈচিত্র্যের মূলে বুঝি এই বেগবৈচিত্র্য। যদিদং সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতং।

মানুষের সত্তার মধ্যে এই অনুভূতিলোকই হচ্ছে সেই রহস্যলোক যেখানে বাহিরের রূপজগতের সমস্ত বেগ অন্তরে আবেগ হয়ে উঠছে, এবং সেই অন্তরের আবেগ আবার বাহিরে রূপ গ্রহণ করবার জন্যে উৎসুক হচ্ছে। এই জন্যে বাক্য যখন আমাদের অনুভূতিলোকের বাহনের কাজে ভর্তি হয় তখন তার গতি না হলে চলে না। সে তার অর্থের দ্বারা বাহিরের ঘটনাকে ব্যক্ত করে, গতির দ্বারা অন্তরের গতিকে প্রকাশ করে।

শ্যামের নাম রাধা শুনেছে। ঘটনাটা শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু যে-একটা অদৃশ্য বেগ জন্মাল তার আর শেষ নেই। আসল ব্যাপারটাই হল তাই। সেই জন্যে কবি ছন্দের ঝংকারের মধ্যে এই কথাটাকে দুলিয়ে দিলেন। যতক্ষণ ছন্দ থাকবে ততক্ষণ এই দোলা আর থামবে না। "সই, কেবা শুনাইল শ্যাম নাম।" কেবলি ঢেউ উঠতে লাগল। ঐ কটি কথা ছাপার অক্ষরে যদিও ভালো মানুষের মতো দাঁড়িয়ে থাকার ভান করে, কিন্তু ওদের অন্তরের স্পন্দন আর কোনো দিনই শান্ত হবে না। ওরা অস্থির হয়েছে, এবং অস্থির করাই ওদের কাজ।

আমাদের পুরাণে ছন্দের উৎপত্তির কথা যা বলেছে তা সবাই

জানেন। দুটি পাখির মধ্যে একটিকে যখন ব্যাধ মারলে তখন বাল্মীকি মনে যে-ব্যথা পেলেন সেই ব্যথাকে শ্লোক দিয়ে না জানিয়ে তাঁর উপায় ছিল না। যে-পাখিটা মারা গেল এবং আর যে-একটি পাখি তার জন্যে কাঁদল তারা কোন্‌কালে লুপ্ত হয়ে গেছে। কিন্তু এই নিদারুণতার ব্যথাটিকে তো কেবল কালের মাপকাঠি দিয়ে মাপা যায় না। সে যে অনন্তের বুকে বেজে রইল। সেই জন্যে কবির শাপ ছন্দের বাহনকে নিয়ে কাল থেকে কালান্তরে ছুটতে চাইলে। হায়রে, আজও সেই ব্যাধ নানা অস্ত্র হাতে নানা বীভৎসতার মধ্যে নানা দেশে নানা আকারে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু সেই আদিকবির শাপ শাশ্বতকালের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে রইল। এই শাশ্বতকালের কথাকে প্রকাশ করবার জন্যেই তো ছন্দ।

আমরা ভাষায় বলে থাকি, কথাকে ছন্দে বাঁধা। কিন্তু এ কেবল বাইরে বাঁধন, অন্তরে মুক্তি। কথাকে তার জড়ধর্ম থেকে মুক্তি দেবার জন্যেই ছন্দ। সেতারের তার বাঁধা থাকে বটে কিন্তু তার থেকে সুর পায় ছাড়া। ছন্দ হচ্ছে সেই তার-বাঁধা সেতার, কথার অন্তরের সুরকে সে ছাড়া দিতে থাকে। ধনুকের সে ছিলা, কথাকে সে তীরের মতো লক্ষ্যের মর্মের মধ্যে প্রক্ষেপ করে।

গোড়াতেই ছন্দ সম্বন্ধে এতখানি ওকালতি করা হয়তো বাহুল্য বলে অনেকের মনে হতে পারে। কিন্তু আমি জানি এমন লোক আছেন যাঁরা ছন্দকে সাহিত্যের একটা কৃত্রিম প্রথা বলে মনে করেন। তাই আমাকে এই গোড়ার কথাটা বুঝিয়ে বলতে হল যে, পৃথিবী ঠিক চব্বিশ ঘণ্টায় ঘূর্ণিলয়ে তিনশো পঁয়ষট্টি মাত্রার ছন্দে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে, সেও যেমন কৃত্রিম নয়, ভাবাবেগ তেমনি ছন্দকে আশ্রয় করে আপন গতিকে প্রকাশ করবার যে চেষ্টা করে সেও তেমনি কৃত্রিম নয়।

এইখানে কাব্যের সঙ্গে গানের তুলনা করে আলোচ্য বিষয়টাকে পরিষ্কার করবার চেষ্টা করা যাক।

সুর পদার্থটাই একটা বেগ। সে আপনার মধ্যে আপনি স্পন্দিত হচ্ছে। কথা যেমন অর্থের মোক্তারি করবার জন্যে, সুর তেমন নয়, সে আপনাকেই আপনি প্রকাশ করে। বিশেষ সুরের সঙ্গে বিশেষ সুরের সংযোগে ধ্বনিবেগের একটা সমবায় উৎপন্ন হয়। তাল সেই সমবেত বেগটাকে গতিদান করে। ধ্বনির এই গতি-বেগে আমাদের হৃদয়ের মধ্যে যে গতি সঞ্চার করে সে একটা বিশুদ্ধ আবেগ মাত্র, তার যেন কোনো অবলম্বন নেই। সাধারণত সংসারে আমরা কতকগুলি বিশেষ ঘটনা আশ্রয় করে সুখে দুঃখে বিচলিত হই। সেই ঘটনা সত্যও হতে পারে, কাল্পনিকও হতে পারে, অর্থাৎ আমাদের কাছে সত্যের মতো প্রতিভাত হতে পারে। তারই আঘাতে আমাদের চেতনা নানা রকমে নাড়া পায়, সেই নাড়ার প্রকারভেদে আমাদের আবেগের প্রকৃতিভেদ ঘটে। কিন্তু গানের সুরে আমাদের চেতনাকে যে নাড়া দেয় সে কোনো ঘটনার উপলক্ষ্য দিয়ে নয়, সে একেবারে অব্যবহিত ভাবে। সুতরাং তাতে যে আবেগ উৎপন্ন হয় সে অহৈতুক আবেগ। তাতে আমাদের চিত্ত নিজের স্পন্দনবেগেই নিজেকে জানে, বাইরের সঙ্গে কোনো ব্যবহারের যোগে নয়।

সংসারে আমাদের জীবনে যে সব ঘটনা ঘটে তার সঙ্গে নানা দায় জড়ানো আছে। জৈবিক দায়, বৈষয়িক দায়, সামাজিক দায়, নৈতিক দায়। তার জন্যে নানা চিন্তায় নানা কাজে আমাদের চিত্তকে বাইরে বিক্ষিপ্ত করতে হয়। শিল্পকলায়, কাব্যে এবং রসসাহিত্যমাত্রেই আমাদের চিত্তকে সেই সমস্ত দায় থেকে মুক্তি দেয়। তখন আমাদের চিত্ত সুখ দুঃখের মধ্যে আপনারই বিশুদ্ধ প্রকাশ দেখতে পায়। সেই প্রকাশই আনন্দ। এই প্রকাশকে আমরা চিরন্তন বলি এই

জন্তে যে, বাইরের ঘটনাগুলি সংসারের জাল বুনতে বুনতে নানা প্রয়োজন সাধন করতে করতে সরে যায় চলে যায়, তাদের নিজের মধ্যে নিজের কোনো চরম মূল্য নেই। কিন্তু আমাদের চিত্তের যে আত্মপ্রকাশ তার আপনাতেই আপনার চরম, তার মূল্য তার আপনার মধ্যেই পর্যাপ্ত। তমসাতীরে ক্রৌঞ্চবিরহিণীর দুঃখ কোনো-খানেই নেই, কিন্তু আমাদের চিত্তের আত্মানুভূতির মধ্যে সেই বেদনার তার বাঁধা হয়েই আছে। সে ঘটনা এখন ঘটছে না, বা সে ঘটনা কোনো কালেই ঘটেনি এ কথা তার কাছে প্রমাণ করে কোনো লাভ নেই।

যাহোক, দেখা যাচ্ছে গানের স্পন্দন আমাদের চিত্তের মধ্যে যে-আবেগ জন্মিয়ে দেয় সে কোনো সাংসারিক ঘটনামূলক আবেগ নয়। তাই মনে হয় সৃষ্টির গভীরতার মধ্যে যে একটি বিশ্বব্যাপী প্রাণকম্পন চলছে, গান শুনে সেইটেরই বেদনাবেগ যেন আমরা চিত্তের মধ্যে অনুভব করি। ভৈরবী যেন সমস্ত সৃষ্টির অন্তরতম বিরহব্যাকুলতা, দেশমল্লার যেন অশ্রুগঙ্গোত্রীর কোন্ আদিনির্ঝরের কলকল্লোল। এতে করে আমাদের চেতনা দেশকালের সীমা পার হয়ে নিজের চঞ্চল প্রাণধারাকে বিরাটের মধ্যে উপলব্ধি করে।

কাব্যেও আমরা আমাদের চিত্তের এই আত্মানুভূতিকে বিশুদ্ধ এবং মুক্তভাবে অথচ বিচিত্র আকারে পেতে চাই। কিন্তু কাব্যের প্রধান উপকরণ হল কথা। সে তো সুরের মতো স্বপ্রকাশ নয়। কথা অর্থকে জানাচ্ছে। অতএব কাব্যে এই অর্থকে নিয়ে কারবার করতেই হবে। তাই গোড়ায় দরকার এই অর্থটা যেন রসমূলক হয়। অর্থাৎ সেটা এমন কিছু হয় যা স্বতই আমাদের মনে স্পন্দন সঞ্চার করে, যাকে আমরা বলি আবেগ।

কিন্তু যেহেতু কথা জিনিসটা স্বপ্রকাশ নয়, এই জন্যে সুরের মতো কথার সঙ্গে আমাদের চিত্তের সাধর্ম্য নেই। আমাদের চিত্ত বেগবান্,

কিন্তু কথা স্থির। এ প্রবন্ধের আরম্ভেই আমরা এই বিষয়টার আলোচনা করেছি। বলেছি, কথাকে বেগ দিয়ে আমাদের চিত্তের সামগ্রী করে তোলবার জন্যে ছন্দের দরকার। এই ছন্দের বাহনযোগে কথা কেবল যে দ্রুত আমাদের চিত্তে প্রবেশ করে তা নয়, তার স্পন্দনে নিজের স্পন্দন যোগ করে দেয়।

এই স্পন্দনের যোগে শব্দের অর্থ যে কী অপরূপতা লাভ করে তা আগে থাকতে হিসাব করে বলা যায় না। সেইজন্যে কাব্যরচনা একটা বিস্ময়ের ব্যাপার। তার বিষয়টা কবির মনে বাঁধা, কিন্তু কাব্যের লক্ষ্য হচ্ছে বিষয়কে অতিক্রম করা; সেই বিষয়ের চেয়ে বেশিটুকুই হচ্ছে অনির্বচনীয়। ছন্দের গতি কথার মধ্য থেকে সেই অনির্বচনীয়কে জাগিয়ে তোলে।

রজনী শাঙনঘন, ঘন দেয়া-গরজন,
রিমিঝিমি শবদে বরিষে।
পালঙ্কে শয়ান রঙ্গে বিগলিত চীর অঙ্গে
নিন্দ যাই মনের হরিষে।

বাদলার রাত্রে একটি মেয়ে বিছানায় শুয়ে ঘুমচ্ছে বিষয়টা এইমাত্র, কিন্তু ছন্দ এই বিষয়টিকে আমাদের মনে কাঁপিয়ে তুলতেই এই মেয়ের ঘুমোনো ব্যাপারটি যেন নিত্যকালকে আশ্রয় করে একটি পরম ব্যাপার হয়ে উঠল—এমন কি, জর্মন কাইজার আজ যে চার বছর ধরে এমন দুর্দান্তপ্রতাপে লড়াই করছে সেও এর তুলনায় তুচ্ছ এবং অনিত্য। ঐ লড়াইয়ের তথ্যটাকে একদিন বহুকষ্টে ইতিহাসের বই থেকে মুখস্থ করে ছেলেদের একজামিন পাস করতে হবে; কিন্তু 'পালঙ্কে শয়ান রঙ্গে বিগলিত চীর অঙ্গে নিন্দ যাই মনের হরিষে', এ পড়া-মুখস্থ করার জিনিস নয়। এ আমরা আপনার প্রাণের মধ্যে দেখতে পাব, এবং যা দেখব সেটা একটি মেয়ের বিছানায় শুয়ে ঘুমোনোর চেয়ে অনেক বেশি।

এই কথাটাকেই আরেক ছন্দে লিখলে বিষয়টা ঠিকই থাকবে কিন্তু বিষয়ের চেয়ে বেশি যেটা, তার অনেকখানি বদল হবে।

শ্রাবণমেঘে তিমিরঘন শর্বরী,
বরিষে জল কাননতল মর্মরি।
জলদরব-ঝংকারিত ঝঞ্ঝাতে
বিজন ঘরে ছিলাম সুখতন্দ্রাতে,
অলস মম শিথিল তনুবল্লরী।
মুখর শিখী শিখরে ফিরে সঞ্চরি।

এই ছন্দে হয়তো বাইরের ঝড়ের দোলা কিছু আছে কিন্তু মেয়েটির ভিতরের গভীর কথা ফুটল না। এ আরেক জিনিস হল।

ছন্দ কবিতার বিষয়টির চারদিকে আবর্তন করছে। পাতা যেমন গাছের ডাঁটার চারদিকে ঘুরে ঘুরে তাল রেখে ওঠে এও সেই রকম। গাছের বস্তুপদার্থ তার ডালের মধ্যে গুঁড়ির মধ্যে মজ্জাগত হয়ে রয়েছে, কিন্তু তার লাবণ্য, তার চাঞ্চল্য, বাতাসের সঙ্গে তার আলাপ, আকাশের সঙ্গে তার চাউনির বদল এ সমস্ত প্রধানত তার পাতার ছন্দে।

পৃথিবীর আহ্নিক এবং বার্ষিক গতির মতো কাব্যে ছন্দের আবর্তনের দুটি অঙ্গ আছে, একটি বড়ো গতি আর একটি ছোটো গতি। অর্থাৎ চাল এবং চলন। প্রদক্ষিণ এবং পদক্ষেপ। দৃষ্টান্ত দেখাই।

শরদচন্দ্র পবন মন্দ, বিপিন ভরল কুসুমগন্ধ

এরই প্রত্যেকটি হল চলন। এমন আটটি চলনে এই ছন্দের চাল সারা হচ্ছে। অর্থাৎ ছয়ের মাত্রায় এ পা ফেলছে এবং আটের মাত্রায় ঘুরে আসছে। 'শরদচন্দ্র' এই কথাটি ছয় মাত্রার, 'শরদ' তিন এবং 'চন্দ্র'ও তিন। বলা বাহুল্য, যুক্ত অক্ষরে দুই অক্ষরের মাত্রা আছে, এই কারণে 'শরদচন্দ্র' এবং 'বিপিন ভরল' ওজনে একই।

১	২	৩	৪
শরদচন্দ	পবন মন্দ,	বিপিন ভরল	কুসুমগন্ধ,
৫	৬	৭	৮
ফুল্ল মল্লি	মালতি যুথি	মত্তমধুপ-	ভোরনী।

প্রদক্ষিণের মাত্রার চেয়ে পদক্ষেপের মাত্রার পরেই ছন্দের বিশেষত্ব বেশি নির্ভর করছে। কেননা এই আট পদক্ষেপের আবর্তন সকল ছন্দেই চলে। বস্তুত এইটেই হচ্ছে অধিকাংশ ছন্দের চলিত কায়দা। যথা—

১	২	৩	৪
মহাভার-	তের কথা	অমৃত স-	মান
৫	৬	৭	৮
কাশীরাম	দাস কহে	শুনে পুণ্য-	বান্।

এও আট পদক্ষেপ।

	১	২	৩	৪
[(To-)	night the	winds be-	gin to	rise
	৫	৬	৭	৮
(And)	roar from	yonder	dropping	day.

এই কবিতার প্রদক্ষিণের মাত্রাভাগও আট, আবার

১	২	৩	৪
When we two	parted in	silence and	tears
৫	৬	৭	৮
Half broken-	hearted to	sever for	years.

এ কবিতারও তাই। কিন্তু কানে শোনবামাত্রই বোঝা যায় এরা ভিন্ন জাতের ছন্দ।]

এই জাত নির্ণয় করতে হলে চালের দিকে ততটা নয় কিন্তু চলনের দিকেই দৃষ্টি দিতে হবে। দিলে দেখা যাবে, ছন্দকে মোটের উপর তিন জাতে ভাগ করা যায়। সমচলনের ছন্দ, অসমচলনের ছন্দ এবং বিষমচলনের ছন্দ। দুই মাত্রার চলনকে বলি সমমাত্রার চলন,

তিন মাত্রার চলনকে বলি অসমমাত্রার চলন এবং দুই-তিনের মিলিত মাত্রার চলনকে বলি বিষমমাত্রার ছন্দ।

ফিরে ফিরে আঁখি নীরে পিছু পানে চায়।
পায়ে পায়ে বাঁধা পড়ে চলা হল দায়।

এ হল দুই মাত্রার চলন। দুইয়ের গুণফল [*] চার বা আটকেও আমরা এক জাতিরই গণ্য করি।

নয়নধারায় পথ সে হারায়, চায় সে পিছন পানে,
চলিতে চলিতে চরণ চলে না, ব্যথার বিষম টানে।

এ হল তিন মাত্রার চলন। আর

যতই চলে চোখের জলে নয়ন ভরে ওঠে,
চরণ বাধে, পরান কাঁদে, পিছনে মন ছোটে।

এ হল দুই-তিনের যোগে বিষমমাত্রার ছন্দ।

তাহলেই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে চলনের ভেদেই ছন্দের প্রকৃতি-ভেদ। [আমরা যে-দুটি ইংরেজি কবিতা উপরে উদ্ধৃত করেছি তার মধ্যে একটার চলন সমমাত্রার অর্থাৎ দুই মাত্রার, অন্যটার চলন অসমমাত্রার অর্থাৎ তিন মাত্রার; তাল দিয়ে গুনে দেখলেই সেটা ধরা পড়বে। ইংরেজিতে বিষমমাত্রার ছন্দ আমার চোখে পড়েনি।]

বৈষ্ণব পদাবলীতে বাংলা সাহিত্যে ছন্দের প্রথম ঢেউ ওঠে। কিন্তু দেখা যায় তার লীলাবৈচিত্র্য সংস্কৃত ছন্দের দীর্ঘহ্রস্ব মাত্রা অবলম্বন করেই প্রধানত প্রকাশ পেয়েছে। প্রাকৃত বাংলায় যত কবিতা আছে তার ছন্দসংখ্যা বেশি নয়। সমমাত্রার ছন্দের দৃষ্টান্ত—

কেন তোরে আনমন দেখি।
কাহে নখে ক্ষিতিতল লেখি।

এ ছাড়া পয়ার এবং ত্রিপদী আছে, সেও সমমাত্রার ছন্দ। অসমমাত্রার অর্থাৎ তিনের ছন্দ চার রকমের পাওয়া যায়।

মলিন বদন ভেল,
ধীরে ধীরে চলি গেল।
আওল রাইর পাশ।
কি কহিব জ্ঞান- দাস॥

জাগিয়া জাগিয়া হইল খীন।
অসিত চাঁদের উদয় দিন॥

সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘপানে
না চলে নয়ন- তারা।
বিরতি আহারে রাঙা বাস পরে
যেমত যোগিনী পারা॥

বেলি অবসান কালে
কবে গিয়াছিলা জলে।
তাহারে দেখিয়া ইষত হাসিয়া ধরিলি সখীর গলে॥

বিষমমাত্রার দৃষ্টান্ত কেবল একটা চোখে পড়েছে, সেও কেবল গানের আরম্ভে—শেষ পর্যন্ত টেকেনি।

চিকনকালা গলায় মালা
বাজন নূপুর পায়।
চূড়ার ফুলে ভ্রমর বুলে
তেরছ নয়ানে চায়॥

বাংলায় সমমাত্রার ছন্দের মধ্যে পয়ার এবং ত্রিপদীই সবচেয়ে প্রচলিত। এই দুটি ছন্দের বিশেষত্ব হচ্ছে এই যে, এদের চলন খুব লম্বা। এদের প্রত্যেক পদক্ষেপে আট মাত্রা। এই আট মাত্রার মোট ওজন রেখে পাঠক এর মাত্রাগুলিকে অনেকটা ইচ্ছামতো চালাচালি করতে পারেন।

পাষাণ মিলায়ে যায় গায়ের বাতাসে

এর মধ্যে যে কতটা ফাঁক আছে তা যুক্তাক্ষর বসালেই টের পাওয়া যায়।

পাষাণ মূছিয়া যায় গায়ের বাতাসে

ভারি হল না।

পাষাণ মূছিয়া যায় অঙ্গের বাতাসে

এতেও বিশেষ ভিড় বাড়ল না।

পাষাণ মূছিয়া যায় অঙ্গের উচ্ছ্বাসে

এও বেশ সহ্য হয়।

সংগীত তরঙ্গি উঠে অঙ্গের উচ্ছ্বাসে

এতেও অত্যন্ত ঠেসাঠেসি হল না।

সংগীততরঙ্গরঙ্গ অঙ্গের উচ্ছ্বাস

অনুপ্রাসের ভিড় হল বটে কিন্তু এখনো অন্ধকূপহত্যা হবার মতো হয়নি। কিন্তু এর বেশি আর সাহস হয় না। তবু যদি আরো প্যাসেঞ্জার নেওয়া যায় তাহলে যে একেবারে পয়ারের নৌকাডুবি হবে তা নয়, তবে কিনা হাঁপ ধরবে। যথা—

দুর্দান্তপাণ্ডিত্যপূর্ণ দুঃসাধ্য সিদ্ধান্ত।

কিন্তু দুই মাত্রার ছন্দ মাত্রেরই যে এই রকম অসাধারণ শোষণশক্তি তা বলতে পারিনে। যেখানে পদক্ষেপ ঘন ঘন সেখানে ঠিক উলটো। যথা—

২ ২	২ ২	২ ২	২
ধরণীর	আঁখিনীর	মোচনের	ছলে,
২ ২	১ ২	২ ২	২
দেবতার	অবতার	বসুধার	তলে।

এও পয়ার কিন্তু যেহেতু এর পদক্ষেপ আটে নয়, দুইয়ে, সেইজন্যে এর উপরে বোঝা সয় না। যে দ্রুত চলে তাকে হালকা হতে হয়। যদি লেখা যায়

ধরিত্রীর চক্ষুনীর মুঞ্চনের ছলে,
কংসারির শঙ্খরব সংসারের তলে।

তাহলে ও একটা স্বতন্ত্র ছন্দ হয়ে যায়। সংস্কৃতেও দেখ, সমমাত্রার ছন্দ যেখানে দুয়ের লয়ে চলে সেখানে দৌড় বেশি। যেমন—

২ ২ ২ ২ ২ ২ ২ ২
হরিরিহ বিহরতি সরসব- সন্তে।

[ইংরেজিতেও তাই—

১ ২ ১ ২ ১ ২ ১ ২
Ah dis- | tinctly | I re- | member |

১ ২ ১ ২ ১ ২ ১ ২
It was | in the | bleak De- | cember |

বাংলা পয়ারের মতো এদের গম্ভীর মন্থর চলন নয়। কিন্তু ঐ ইংরেজিতে দুইয়ের চলনের বদলে চারের চলন যেখানে আসে সেখানে কেবল যে মন্থরতা তা নয়, ছন্দের স্বাধীনতা বাড়ে। যেমন—

১ ২ ৩ ৪ ১ ২ ৩ ৪ ১ ২
(O) Goddess, hear these | tuneless numbers, | wrung |

১ ২ ৩ ৪ ১ ২ ৩ ৪ ১ ২
(By) sweet enforcement | and remembrance | dear. |

এইখানে বলা আবশ্যক wrung এবং dear শব্দকে দুই মাত্রা বলে গণ্য করেছি, তার কারণ উচ্চারিত syllableএর এক মাত্রার সঙ্গে বিরামের এক মাত্রা যোগ না করলে ছন্দ সম্পূর্ণ হয় না।]

অসম অর্থাৎ তিন মাত্রার চলনও দ্রুত।

পাষাণ মিলায় গায়ের বাতাসে

এর লয়টা দুরন্ত। পড়লেই বোঝা যায় এর প্রত্যেক তিন মাত্রা পরবর্তী তিন মাত্রাকে চাচ্ছে, কিছুতে তর সচ্ছে না। তিনের মাত্রাটা টলটলে, গড়িয়ে যাবার দিকে তার ঝোঁক। এইজন্যে তিনকে গুণ করে

ছয় বা বারো করলেও তার চাপল্য ঘোচে না। দুই মাত্রার চলন ক্ষিপ্র, তিন মাত্রার চঞ্চল, চার মাত্রার মন্থর, আট মাত্রার গম্ভীর। তিন মাত্রার ছন্দে যে পয়ারের মতো ফাঁক নেই তা যুক্তাক্ষর জুড়তে গেলেই ধরা পড়বে। যথা—

গিরির গুহায় ঝরিছে নিঝর

এই পদটিকে যদি লেখা যায়

পর্বতকন্দরে ঝরিছে নির্ঝর

তাহলে ছন্দের পক্ষে সাংঘাতিক হয়। অথচ পয়ারে

গিরিগুহাতল বেয়ে ঝরিছে নিঝর

এবং

পর্বতকন্দরতলে ঝরিছে নির্ঝর

ছন্দের পক্ষে দুই সমান।

বিষমমাত্রার ছন্দের স্বভাব হচ্ছে তার প্রত্যেক পদে এক অংশে গতি, আর এক অংশে বাধা। এই গতি এবং বাধার সম্মিলনে তার নৃত্য।

অহহ কল য়ামি বল- য়াদিমণি- ভূষণং
হরিবিরহ- দহনবহ- নেন বহু- দূষণং।

তিন মাত্রার 'অহহ' যে ছাঁদে চলবার জন্যে বেগ সঞ্চয় করলে, দুই মাত্রার 'কল' তাকে হঠাৎ টেনে থামিয়ে দিলে, আবার পরক্ষণেই তিন যেই নিজমূর্তি ধরলে অমনি আবার দুই এসে তার লাগামে টান দিলে। এই বাধা যদি সত্যকার বাধা হত, তাহলে ছন্দই হত না; এ কেবল বাধার ছল, এতে গতিকে আরো উসকিয়ে দেয় এবং বিচিত্র করে তোলে। এইজন্যে অন্য ছন্দের চেয়ে বিষমমাত্রার ছন্দে গতিকে আরো যেন বেশি অনুভব করা যায়।

যাই হোক আমার বক্তব্য এই, ছন্দের পরিচয়ের মূলে দুটি প্রশ্ন আছে। এক হচ্ছে তার প্রত্যেক পদক্ষেপে ক'টি করে মাত্রা আছে। দুই হচ্ছে, সে মাত্রা সম, অসম, না বিষম অথবা সম-বিষমের যোগ। আমরা যখন মোটা করে বলে থাকি যে, এটা চোদ্দ মাত্রার ছন্দ, বা ওটা দশ মাত্রার তখন আসল কথাটাই বলা হয় না। তার কারণ পূর্বেই বলেছি চাল অর্থাৎ প্রদক্ষিণের মাত্রায় ছন্দকে চেনা যায় না, চলন অর্থাৎ পদক্ষেপের মাত্রায় তার পরিচয়। চোদ্দ মাত্রায় শুধু যে পয়ার হয় না, আরো অনেক ছন্দ হয় তার দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক।

বসন্ত পাঠায় দূত রহিয়া রহিয়া,
যে কাল গিয়েছে তারি নিশ্বাস বহিয়া।

এই তো পয়ার, এর প্রত্যেক প্রদক্ষিণে দুটি পদক্ষেপ। প্রথম পদক্ষেপে আটটি উচ্চারিত মাত্রা, দ্বিতীয় পদক্ষেপে ছয়টি উচ্চারিত মাত্রা এবং দুটি অনুচ্চারিত অর্থাৎ যতির মাত্রা। অর্থাৎ প্রত্যেক প্রদক্ষিণে মোটের উপর উচ্চারিত মাত্রা চোদ্দ। আমরা পয়ারের পরিচয় দেওয়ার কালে প্রত্যেক প্রদক্ষিণের উচ্চারিত মাত্রার সমষ্টির হিসাব দিয়ে থাকি। তার প্রধান কারণ, কিছুকাল পূর্বে পয়ার ছাড়া চোদ্দ মাত্রাসমষ্টির ছন্দ আমাদের ব্যবহারে লাগত না। নিম্নলিখিত চোদ্দ মাত্রার ছন্দেও ঠিক পয়ারের মতোই প্রত্যেক প্রদক্ষিণে দুটি করে পদক্ষেপ।

ফাগুন এল দ্বারে কেহ যে ঘরে নাই,
পরান ডাকে কারে ভাবিয়া নাহি পাই।

অথচ এটা মোটেই পয়ার নয়। তফাত হল কিসে যাচাই করে দেখলে দেখা যাবে যে, এর প্রতিপদক্ষেপে আটের বদলে সাত উচ্চারিত মাত্রা। আর অনুচ্চারিত মাত্রা প্রতিপদক্ষেপের শেষে একটি করে দেওয়া যেতে পারে। যেমন—

ফাগুন এল দ্বারে-এ কেহ যে ঘরে না-আ-ই।

কিংবা কেবল শেষ ছেদে একটি দেওয়া যেতে পারে। যেমন—

ফাগুন এল দ্বারে কেহ যে ঘরে না-আ-ই।

কিংবা যতি একেবারেই না দেওয়া যেতে পারে।

পুনশ্চ এই ছন্দেরই মাত্রাসমষ্টি সমান রেখে এরই পদক্ষেপমাত্রার পরিবর্তন করে যদি পড়া যায় তাহলে শ্লোকটি চোখে দেখতে একই রকম থাকবে কিন্তু কানে শুনতে অন্য রকম হবে। এইখানে বলে রাখি, ছন্দের প্রত্যেক ভাগে একটা করে তালি দিলে পড়বার সুবিধা হবে এবং এই তালি অনুসারে ভিন্ন ছন্দের ভিন্ন লয় ধরা পড়বে। প্রথমে সাত মাত্রাকে তিন এবং চারে স্বতন্ত্র ভাগ করে পড়া যাক। যেমন—

তালি তালি তালি তালি
ফাগুন এল দ্বারে কেহ যে ঘরে নাই,
পরান ডাকে কারে ভাবিয়া নাহি পাই।

তারপরে পাঁচ-দুই ভাগ করা যাক। যেমন—

তালি তালি তালি তালি
ফাগুন এল দ্বারে কেহ যে ঘরে নাই,
পরান ডাকে কারে ভাবিয়া নাহি পাই।

এই চোদ্দ মাত্রাসমষ্টির ছন্দ আরো কত রকম হতে পারে তার কতকগুলি নমুনা দেওয়া যাক। দুই-পাঁচ দুই-পাঁচ ভাগের ছন্দ, যথা—

। । । ।
সে যে আপন মনে শুধু দিবস গণে[১]
তার চোখের বারি কাঁপে আঁখির কোণে।

চার-তিন চার-তিন ভাগ—

। । । ।
নয়নের সলিলে যে কথাটি বলিলে
রবে তাহা স্মরণে জীবনে ও মরণে।

১ এই প্রত্যেক দণ্ডচিহ্নের অনুসরণ করে তাল দেওয়া আবশ্যক।

কিংবা এক-ছয় এক-ছয় ভাগ—

যে	কথা নাহি শোনে	সে	থাক্ নিজমনে,
কে	বৃথা নিবেদনে	রে	ফিরে তার সনে।

সাত-চার-তিনের ভাগ—

চাহিছ বারে বারে	আপনারে	ঢাকিতে,
মন না মানে মানা	মেলে ডানা	আঁখিতে।

এই কবিতাটাকেই অন্য লয়ে পড়া যায়—

চাহিছ	বারে বারে	আপনারে	ঢাকিতে,
মন না	মানে মানা	মেলে ডানা	আঁখিতে।

তিন-তিন-তিন-তিন-দুইয়ের ভাগ—

ব্যাকুল	বকুল	ঝরিল	পড়িল	ঘাসে,
বাতাস	উদাস	আমের	বোলের	বাসে।

একেই ছয়-আটের ভাগে পড়া যায়—

ব্যাকুল বকুল	ঝরিল পড়িল ঘাসে,
বাতাস উদাস	আমের বোলের বাসে।

পাঁচ-চার-পাঁচের ভাগ—

নীরবে গেলে	ম্লানমুখে	আঁচল টানি,
কাঁদিছে দুখে	মোর বুকে	না-বলা বাণী।

এই শ্লোককেই তিন-ছয়-পাঁচ ভাগ করা যায়—

নীরবে	গেলে ম্লানমুখে	আঁচল টানি,
কাঁদিছে	দুখে মোর বুকে	না-বলা বাণী।

এর থেকে এই বোঝা যাচ্ছে, প্রদক্ষিণের সমষ্টিমাত্রা চোদ্দ হলেও সেই সমষ্টির অংশের হিসাব কে কী ভাবে নিকাশ করছে তারই উপর ছন্দের প্রভেদ ধরা পড়ে। কেবল ছন্দরসায়নে নয়, বস্তুরসায়নেও

এইরকম উপাদানের মাত্রাভাগ নিয়েই বস্তুর প্রকৃতিভেদ ঘটে, রাসায়নিকেরা বোধ করি এই কথা বলেন।

পয়ার ছন্দের বিশেষত্ব হচ্ছে এই যে, তাকে প্রায় গাঁঠে গাঁঠে ভাগ করা চলে, এবং প্রত্যেক ভাগেই মূল ছন্দের একটা আংশিক রূপ দেখা যায়। যথা—

ওহে পান্থ, চল পথে, পথে বন্ধু আছে
একা বসে ম্লানমুখে, সে যে সঙ্গ যাচে।

'ওহে পান্থ', এইখানে একটা থামবার স্টেশন মেলে। তার পরে যথাক্রমে, 'ওহে পান্থ চল', 'ওহে পান্থ চল পথে', 'ওহে পান্থ চল পথে পথে'। তার পরে 'বন্ধু আছে', এই ভগ্নাংশটার সঙ্গে পরের লাইন জোড়া যায়, যেমন— 'বন্ধু আছে একা', 'বন্ধু আছে একা বসে', 'বন্ধু আছে একা বসে সে যে'। কিন্তু তিনের ছন্দকে তার ভাগে ভাগে পাওয়া যায় না, এইজন্যে তিনের ছন্দে ইচ্ছামতো থামা চলে না। যেমন— 'নিশি দিল ডুব অরুণসাগরে'। 'নিশি দিল', এখানে থামা যায়, কিন্তু তাহলে তিনের ছন্দ ভেঙে যায়; 'নিশি দিল ডুব' পর্যন্ত এসে ছয় মাত্রা পুরিয়ে দিয়ে তবেই তিনের ছন্দ হাঁফ ছাড়তে পারে। কিন্তু আবার, 'নিশি দিল ডুব অরুণ' এখানেও থামা যায় না; কেননা তিন এমন একটি মাত্রা যা আর একটা তিনকে পেলে তবে দাঁড়াতে পারে, নইলে টলে পড়তে চায়; এইজন্য 'অরুণসাগর'এর মাঝখানে থামতে গেলে রসনা কূল পায় না। তিনের ছন্দে গতির প্রাবল্যই বেশি, স্থিতি কম। সুতরাং তিনের ছন্দ চাঞ্চল্যপ্রকাশের পক্ষে ভালো কিন্তু তাতে গাম্ভীর্য এবং প্রসার অল্প। তিনের মাত্রার ছন্দে অমিত্রাক্ষর রচনা করতে গেলে বিপদে পড়তে হয়, সে যেন চাকা নিয়ে লাঠিখেলার চেষ্টা। পয়ার আট পায়ে চলে বলে তাকে যে কত রকমে চালানো যায় 'মেঘনাদবধ'কাব্যে তার প্রমাণ আছে। তার অবতারণাটি পরখ করে

দেখা যাক। এর প্রত্যেক ভাগে কবি ইচ্ছামতো ছোটো বড়ো নানা ওজনের নানা সুর বাজিয়েছেন; কোনো জায়গাতেই পয়ারকে তার প্রচলিত আড্ডায় এসে থামতে দেননি। প্রথম আরম্ভেই বীরবাহুর বীর-মর্যাদা সুগম্ভীর হয়ে বাজল—'সম্মুখসমরে পড়ি বীরচূড়ামণি বীরবাহু'; তার পরে তার অকালমৃত্যুর সংবাদটি যেন ভাঙা রণপতাকার মতো ভাঙা ছন্দে ভেঙে পড়ল—'চলি যবে গেলা যমপুরে অকালে'; তার পরে ছন্দ নত হয়ে নমস্কার করলে—'কহ হে দেবি অমৃতভাষিণি'; তার পরে আসল কথাটা, যেটা সবচেয়ে বড়ো কথা, সমস্ত কাব্যের ঘোর পরিণামের যেটা সূচনা, সেটা যেন আসন্ন ঝটিকার সুদীর্ঘ মেঘগর্জনের মতো এক দিগন্ত থেকে আরেক দিগন্তে উদ্‌ঘোষিত হল— 'কোন্‌ বীরবরে বরি সেনাপতিপদে পাঠাইলা রণে পুনঃ রক্ষঃকুলনিধি রাঘবারি'।

বাংলা ভাষায় অধিকাংশ শব্দই দুই মাত্রার এবং তিন মাত্রার, এবং ত্রৈমাত্রিক শব্দের উপর বিভক্তিযোগে চার মাত্রার। পয়ারের পদ-বিভাগটি এমন যে, দুই, তিন এবং চার মাত্রার শব্দ তাতে সহজেই জায়গা পায়।

চৈত্রের সেতারে বাজে বসন্তবাহার,
বাতাসে বাতাসে ওঠে তরঙ্গ তাহার।

এ পয়ারে তিন অক্ষরের ভিড়। আবার

চকমকি-ঠোকাঠুকি-আগুনের প্রায়,
চোখোচোখি ঘটিতেই হাসি ঠিকরায়।

এই পয়ারে চারের প্রাধান্য।

তারাগুলি সারারাতি কানে কানে কয়,
সেই কথা ফুলে ফুলে ফুটে বনময়।

এইখানে দুই মাত্রার আয়োজন।

প্রেমের অমরাবতী প্রেয়সীর প্রাণে,
কে সেথা দেবাধিপতি সে কথা কে জানে।

এই পয়ারে এক থেকে পাঁচ পর্যন্ত সকল রকম মাত্রারই সমাবেশ। এর থেকে জানা যায় পয়ারের আতিথেয়তা খুব বেশি, আর সেই-জন্যেই বাংলা কাব্যসাহিত্যে প্রথম থেকেই পয়ারের এত অধিক চলন।

পয়ারের চেয়ে লম্বা দৌড়ের সমমাত্রার ছন্দ আজকাল বাংলাকাব্যে চলছে। 'স্বপ্নপ্রয়াণে' এর প্রথম প্রবর্তন দেখা গেছে। 'স্বপ্নপ্রয়াণ' থেকেই তার নমুনা তুলে দেখাই।

গম্ভীর পাতাল, যেথা কালরাত্রি করালবদনা
বিস্তারে একাধিপত্য। শ্বসয়ে অযুত ফণিফণা
দিবানিশি ফাটি রোষে; ঘোর নীল বিবর্ণ অনল
শিখাসংঘ আলোড়িয়া দাপাদাপি করে দেশময়
তমোহস্ত এড়াইতে—প্রাণ যথা কালের কবল।

উচ্চারিত এবং অনুচ্চারিত মাত্রা নিয়ে পয়ার যেমন আট পদমাত্রায় সমান দুই ভাগে বিভক্ত এ তা নয়। এর একভাগে উচ্চারিত মাত্রা আট, অন্যভাগে উচ্চারিত মাত্রা দশ। এই রকম অসমান ভাগে ছন্দের গাম্ভীর্য বাড়ে। ছন্দে পদে পদে ঠিক সমান ওজন দাবি করা কানের যেন একটা বাঁধা মৌতাতের মতো দাঁড়ায়, সেইটি ভেঙে দিলে ছন্দের গৌরব আরো বাড়ে। [ইংরেজি কাব্যে এর অনেক দৃষ্টান্ত দেখতে পাই।

১ ২ ৩ ৪ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬
(O) Wild West Wind, thou | breath of Autumn's being |

এর প্রথম ভাগে চার মাত্রা, দ্বিতীয় ভাগে যতিসমেত ছয় মাত্রা। মিল্টনের

Hail holy light, offspring of Heaven's first-born

এও এই ছন্দে।] সংস্কৃত মন্দাক্রান্তার অসমান ভাগের গাম্ভীর্য সবাই জানেন।

কশ্চিৎকান্তা- বিরহগুরুণা স্বাধিকার- প্রমত্তঃ

এর প্রথম ভাগে আট, দ্বিতীয় ভাগে সাত, তৃতীয় ভাগে সাত, এবং চতুর্থ ভাগে চার[১] মাত্রা। এমনতরো ভাগে কানের কোনো সংকীর্ণ অভ্যাস হবার জো নেই।

সংস্কৃতের সঙ্গে সাধু বাংলা সাহিত্যের ছন্দের যে-একটি বিশেষ প্রভেদ আছে সেইটির কথা এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক। সংস্কৃত উচ্চারণের বিশেষত্ব হচ্ছে তার ধ্বনির দীর্ঘহ্রস্বতা। সেইজন্য সংস্কৃত ছন্দ কেবলমাত্র পদক্ষেপের মাত্রা গণনা করেই নিশ্চিন্ত থাকে না, নির্দিষ্ট নিয়মে দীর্ঘহ্রস্ব মাত্রাকে সাজানো তার ছন্দের অঙ্গ। আমি একটি বাংলা বই থেকে এর দৃষ্টান্ত তুলছি। বইটির নাম 'ছন্দঃকুসুম'। আজ চুয়ান্ন বছর পূর্বের এটি রচনা[২]। লেখক ভুবনমোহন রায়চৌধুরী রাধাকৃষ্ণের লীলাচ্ছলে বাংলা ভাষায় সংস্কৃত ছন্দের দৃষ্টান্ত দিয়ে ছন্দ শিক্ষা দেবার চেষ্টা করেছেন। কৃষ্ণবিরহিণী রাধা কালো রংটারই দূষণীয়তা প্রমাণ করবার জন্যে যখন কালো কোকিল কালো ভ্রমর কালো পাথর কালো লোহার নিন্দা করলেন তখন অপর পক্ষের উকিল লোহার দোষ ক্ষালন করতে প্রবৃত্ত হলেন।

॥।।   ॥।।   ॥।।   ॥।।   ॥।।   ॥।।   ॥।।   ॥।।

দেখহ   সুন্দর   লৌহর-   থে চড়ি   লৌহপ-   থে কত   লোক চ-   লে . .,

ষষ্ঠ মু-   হূর্তক   মধ্য ক-   রে গতি   যোজন   পঞ্চ দ-   শের প-   থে . . ।

লৌহবি-   নির্মিত   তার ত-   রে বহু   দূর অ-   বস্থিত   লোক স-   বে . .,

দূর অ-   বস্থিত   বন্ধুস-   নে সুখ-   চিত্ত প-   রস্পর   বাক্য ক-   হে . . ॥[৩]

এই কবিতাটির যুক্তি ও আধ্যাত্মিক রসমাধুর্যের বিচারভার আধুনিককালের বস্তুতান্ত্রিক উকিল রসিকদের উপর অর্পণ করা গেল। তা ছাড়া লোকশিক্ষায় এর প্রয়োজনীয়তার তর্ক তোলবার অধিকারীও

১ চার নয়, পাঁচ। গ্রন্থপরিচয় দ্রষ্টব্য।

২ বাংলা ১২৭০ (ইং ১৮৬৪) ফাল্গুন মাসে প্রকাশিত।

৩ মদিরা ছন্দ। ছন্দঃকুসুম, পৃ ৭৭।

আমি নই। আমি ছন্দের দিক দিয়ে বলছি এর প্রত্যেক পদভাগে একটি দীর্ঘ ও দুইটি হ্রস্ব মাত্রা, সেই দীর্ঘহ্রস্বের ওঠাপড়ার পর্যায়ই হচ্ছে এই ছন্দের প্রকৃতি। বাংলায় স্বরের দীর্ঘহ্রস্বতা নাই কিংবা নাই বললেই হয়, এবং যুক্তব্যঞ্জনকে সাধু বাংলা কোনো গৌরব দেয় না, অযুক্তের সঙ্গে একই বাটখারায় তার ওজন চলে। অতএব মাত্রাসংখ্যা মিলিয়ে ঐ লোহার স্তব যদি বাংলা ছন্দে লেখা যায় তাহলে তার দশা হয় এই।

দেখ দেখ মনোহর লোহার গা- ড়িতে চড়ি
লোহাপথে কত শত মানুষ চ- লিছে,
দেখিতে দে- খিতে তারা যোজন যো- জন পথ
অনায়াসে তরে যায় টিকিট কি- নিয়া।
যেসব মা- নুষ আছে অনেক দূ- রের দেশে,
লোহা দিয়ে গড়া তার রয়েছে ব- লিয়া,
সুদূর বঁ- ধুর সাথে কত যে ম- নের সুখে
কথা চালা- চালি করে নিমেষে নি- মেষে।

বাংলায় আর সবই রইল—মাত্রাও রইল, আর সম্ভবত আধ্যাত্মিকতারও হানি হয়নি, কেননা ভক্তির টিকিট থাকলে লোহার গাড়ি যে কঠিন লোহার পথও তরিয়ে দেয় এবং বঁধুর সঙ্গে যতই দূরত্ব থাক স্বয়ং লোহার তারে তাদের কথা চালাচালি হতে পারে এ ভাবটা বাংলাতেও প্রকাশ পাচ্ছে—কিন্তু মূল ছন্দের প্রকৃতিটা বাংলায় রক্ষা পায়নি। এ কেমন, যেমন ঢেউখেলানো দেশের জমির পরিমাণ সমতল দেশে জরিপের দ্বারা মিলিয়ে নেওয়া। তাতে জমি পাওয়া গেল কিন্তু ঢেউ পাওয়া গেল না। অথচ ঢেউটা ছন্দের একটা প্রধান জিনিস। সমতল বাংলা আপন কাব্যের ভাষাকে সমতল করে দিয়েছে। এ হচ্ছে কাজকে সহজ করবার একটা কৃত্রিম বাঁধা নিয়ম। আমরা যখন বলি থার্ডক্লাসের ছেলে, তখন মনে ধরে নিই যেন সব ছেলেই সমান মাত্রার। কিন্তু আসলে থার্ডক্লাসের আদর্শকে যদি একটা সরল রেখা বলে ধরে

নিই তবে কোনো ছেলে সেই রেখার উপরে চড়ে কেউবা তার নিচে নামে। ভালো শিক্ষাপ্রণালী তাকেই বলে যাতে প্রত্যেক ছেলেকে তার নিজের স্বতন্ত্র বুদ্ধি ও শক্তির মাত্রা অনুসারে ব্যবহার করা যায়, থার্ডক্লাসের একটা কাল্পনিক মাত্রা ক্লাসের সকল ছেলের উপরে সমানভাবে আরোপ না করা যায়। কিন্তু কাজ সহজ করবার জন্য বহু অসমানকে এক সমান কাঠগড়ায় বন্দী করবার নিয়ম আছে। সাধু বাংলার ছন্দে তারই প্রমাণ পাই। হলন্তই[১] হোক হসন্তই হোক আর যুক্তবর্ণ ই হোক এই ছন্দে সকলেরই সমান মাত্রা।

অথচ প্রাকৃত-বাংলার প্রকৃতি সমতল নয়। সংস্কৃতের নিয়মে না হোক নিজের নিয়মে তার একটা ঢেউখেলা আছে। তার কথার সকল অংশ সমান ওজনের নয়। বস্তুত পদেপদেই তার শব্দ বন্ধুর হয়ে ওঠে। তার কারণ, প্রাকৃত-বাংলায় হসন্তের প্রাদুর্ভাব খুব বেশি। এই হসন্তের দ্বারা ব্যঞ্জনবর্ণের মধ্যে সংঘাত জন্মাতে থাকে, সেই সংঘাতে ধ্বনি গুরু হয়ে ওঠে। প্রাকৃত-বাংলার এই গুরুধ্বনির প্রতি যদি সদ্‌ব্যবহার করা যায় তাহলে ছন্দের সম্পদ্ বেড়ে যায়। প্রাকৃত-বাংলার দৃষ্টান্ত—

বৃষ্টি পড়ে টাপুর্ টুপুর্ নদেয়্ এল বান্।
শিব ঠাকুরের্ বিয়ে হবে তিন্ কন্যে দান্।
এক্ কন্যে রাঁধেন্ বাড়েন্ এক্ কন্যে খান্।
এক্ কন্যে না পেয়ে বাপের্ বাড়ি যান্॥

এই ছড়াটিতে দুটি জিনিস দেখবার আছে। এক হচ্ছে বিসর্গের[২] ঘটকালিতে ব্যঞ্জনের সঙ্গে ব্যঞ্জনের সম্মিলন, আর এক হচ্ছে 'বৃষ্টি' এবং 'কন্যে' কথার যুক্তবর্ণকে যথোচিত মর্যাদা দেওয়া। এই ছড়া

১ 'স্বরান্ত' অর্থে ব্যবহৃত। গ্রন্থপরিচয় দ্রষ্টব্য।

২ বিসর্গের নয়, হসন্তের।

সাধু বাংলার ছন্দে বাঁধলে পালিসকরা আবলুস কাঠের মতো পিছল হয়ে ওঠে।

বারি ঝরে ঝর ঝর নদিয়ায় বান।
শিবুঠাকুরের বিয়ে তিন মেয়ে দান॥
এক মেয়ে রাঁধিছেন এক মেয়ে খান।
এক মেয়ে ক্ষুধাভরে পিতৃঘরে যান॥

এতে যুক্তবর্ণের সংযোগ হলেও ছন্দের উল্লাস তাতে বিশেষ বাড়ে না। যথা—

মন্দ মন্দ বৃষ্টি পড়ে নবদ্বীপে বান।
শিবুঠাকুরের বিয়া তিন কন্যা দান॥
এক কন্যা রান্ধিছেন এক কন্যা খান।
এক কন্যা ঊর্ধ্বশ্বাসে পিতৃগৃহে যান॥

এই সব যুক্তবর্ণের যোগে এ-ছন্দ বন্ধুর হয়ে উঠেছে বটে কিন্তু তরঙ্গিত হয়নি; কেননা যুক্তবর্ণ যথেচ্ছ ছড়ানো হয়েছে মাত্র, তাদের মর্যাদা অনুসারে জায়গা দেওয়া হয়নি। অর্থাৎ হাটের মধ্যে ছোটোয় বড়োয় যেমন গায়ে গায়ে ভিড় করে তেমনি, সভার মধ্যে যেমন তারা যথাযোগ্য আসন পায় তেমন নয়।

'ছন্দঃকুসুম' বইটির লেখক প্রাকৃত-বাংলার ছন্দ সম্বন্ধে অনুষ্টভ্ ছন্দে বিলাপ করে বলছেন—

পাঁচালী নাম বিখ্যাতা সাধারণ-মনোরমা।
পয়ার ত্রিপদী আদি প্রাকৃতে হয় চালনা॥
দ্বিপাদে শ্লোক সংপূর্ণ তুল্যসংখ্যার অক্ষরে।
পাঠে দুই পদে মাত্র শেষাক্ষর সদা মিলে॥
পঠনে সে সব ছন্দঃ রাখিতে তালগৌরব।
পঠিছে সর্বদা লোকে উচ্চারণ-বিপর্যয়ে॥
লঘুকে গুরু সম্ভাষে দীর্ঘবর্ণে কহে লঘু।
হ্রস্বে দীর্ঘে সমজ্ঞানে উচ্চারণ করে সবে॥[১]

কবির এই বিলাপের সঙ্গে আমিও যোগ দিচ্ছি। কেবল আমি এই বলতে চাই প্রাকৃত-বাংলার ছন্দে এমনতরো দুর্ঘটনা ঘটে না, এসব

১ ছন্দঃকুসুম, পৃ ।৵, ৩১২-১৫ শ্লোক।

ঘটে সংস্কৃত-বাংলার ছন্দে। প্রাকৃত-বাংলার যে স্বকীয় দীর্ঘহ্রস্বতা আছে তার ছন্দে তার বিপর্যয় দেখিনে কিন্তু সাধু ভাষায় দেখি।

এই প্রাকৃত-বাংলা মেয়েদের ছড়ায় বাউলের গানে রামপ্রসাদের পদে আপন স্বভাবে প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু সাধুসভায় তার সমাদর হয়নি বলে সে মুখ ফুটে নিজের সব কথা বলতে পারেনি এবং তার শক্তি যে কত তারও সম্পূর্ণ পরিচয় হল না। আজকের দিনের ডিমক্রেসির যুগেও সে ভয়ে ভয়ে দ্বিধা করে চলেছে; কোথায় যে তার পংক্তি এবং কোথায় নয় তা স্থির হয়নি। এই সংকোচে তার আত্মপরিচয়ের খর্বতা হচ্ছে। [একদিন বাঙালিকে বলা হত বাঙালি কেরানিগিরি করতে পারে, বিশুদ্ধ বিশেষত অবিশুদ্ধ ইংরেজি লিখতে ও বলতে তার বাহাদুরি আছে কিন্তু সে রাষ্ট্রশাসন কিংবা যুদ্ধ করতে পারে না। এমন অবিশ্বাস ও সন্দেহের কথা যতদিন বলা হবে, ততদিন আমাদের শক্তির প্রমাণ হবে না। প্রাকৃত-বাংলাকেও সেই রকম অবজ্ঞা ও অবিশ্বাসের উপর রাখা হয়েছে সেইজন্যে তার পূর্ণ পরিচয় হচ্ছে না]। আমরা একটা কথা ভুলে যাই প্রাকৃত-বাংলার লক্ষ্মীর পেটরায় সংস্কৃত, পারসি, ইংরেজি প্রভৃতি নানা ভাষা থেকেই শব্দসঞ্চয় হচ্ছে, সেইজন্যে শব্দের দৈন্য প্রাকৃত-বাংলার স্বভাবগত বলে মনে করা উচিত নয়। প্রয়োজন হলেই আমরা প্রাকৃতভাণ্ডারে সংস্কৃত শব্দের আমদানি করতে পারব। কাজেই যেখানে অর্থের বা ধ্বনির প্রয়োজনবশত সংস্কৃত শব্দই সংগত সেখানে প্রাকৃত-বাংলায় তার বাধা নেই। আবার পারসি কথাও তার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা একসারে বসিয়ে দিতে পারি। সাধুবাংলায় তার বিঘ্ন আছে, কেননা সেখানে জাতিরক্ষা করাকেই সাধুতারক্ষা করা বলে। প্রাকৃত ভাষার এই ঔদার্য গদ্যে পদ্যে আমাদের সাহিত্যের একটি পরম সম্পদ্ এই কথা মনে রাখতে হবে।

সবুজপত্র—১৩২৪ চৈত্র

ছন্দের হসন্ত হলন্ত[1]

১

... আমার নিজের বিশ্বাস যে, আমরা ছন্দ রচনা করি স্বতই কানের ওজন রেখে, বাজারে প্রচলিত কোনো বাইরের মানদণ্ডের দ্বারা মেপে মেপে এ কাজ করিনে, অন্তত সজ্ঞানে নয়। কিন্তু ছান্দসিক প্রবোধচন্দ্র সেন[2] এই বলে আমাদের দোষ দিয়েছেন যে— আমরা একটা কৃত্রিম মানদণ্ড দিয়ে পাঠকের কানকে ফাঁকি দিয়ে তার চোখ ভুলিয়ে এসেছি, আমরা ধ্বনি চুরি করে থাকি অক্ষরের আড়ালে।

ছন্দোবিৎ কী বলছেন ভালো করে বোঝবার চেষ্টা করা যাক। তাঁর প্রবন্ধে আমার লেখা থেকে কিছু লাইন তুলে চিহ্নিত করে দৃষ্টান্ত-স্বরূপে ব্যবহার করেছেন। যথা—

+ । + । ।
উদয়দিগন্তে ঐ শুভ্র শঙ্খ বাজে।
+ ।
মোর চিত্ত মাঝে,
+
চিরনূতনেরে দিল ডাক
। +
পঁচিশে বৈশাখ।

তিনি বলেন, "এখানে দণ্ডচিহ্নিত যুগ্মধ্বনিগুলিকে এক বলে ধরা হয়েছে, কারণ এগুলি শব্দের মধ্যে অবস্থিত; আর যোগচিহ্নিত যুগ্ম-ধ্বনিগুলিকে দুই বলে ধরা হয়েছে, যেহেতু এগুলি শব্দের অন্তে অবস্থিত।" অর্থাৎ 'উদয়'এর অয়্ হয়েছে দুই মাত্রা অথচ 'দিগন্ত'এর

১ ৪৯ পৃষ্ঠায় পাদটীকা ১ দ্রষ্টব্য।

২ বিচিত্রা—১৩৩৮ অগ্রহায়ণ : বাংলা অক্ষরবৃত্ত ছন্দের স্বরূপ।

অন্ হয়েছে একমাত্রা, এইজন্যে 'উদয়' শব্দকেও তিন মাত্রা এবং 'দিগন্ত' শব্দকেও তিন মাত্রা গণনা করা হয়েছে। 'যুগ্মধ্বনি' শব্দটার পরিবর্তে ইংরেজি সিলেব্‌ল্ শব্দ ব্যবহার করলে অনেকের পক্ষে সহজ হবে। আমি তাই করব।

বহুকালপূর্বে একদিন বাংলার শব্দতত্ত্ব আলোচনা করেছিলুম। সেই প্রসঙ্গে ধ্বনিতত্ত্বের কথাও মনে উঠেছিল। তখন দেখেছিলুম বাংলায় স্বরবর্ণ যদিও সংস্কৃত বানানের হ্রস্বদীর্ঘতা মানে না তবু এ সম্বন্ধে তার নিজের একটি স্বকীয় নিয়ম আছে। সে হচ্ছে বাংলায় হসন্ত শব্দের পূর্ববর্তী স্বর দীর্ঘ হয়। যেমন জল, চাঁদ। এ দুটি শব্দের উচ্চারণে জ-এর অ এবং চাঁ-এর আ আমরা দীর্ঘ করে টেনে পরবর্তী হসন্তের ক্ষতিপূরণ করে থাকি। জল এবং জলা, চাঁদ এবং চাঁদা শব্দের তুলনা করলে এ কথা ধরা পড়বে। এ সম্বন্ধে বাংলার বিখ্যাত ধ্বনিতত্ত্ববিৎ সুনীতিকুমারের বিধান নিলে নিশ্চয়ই তিনি আমার সমর্থন করবেন। বাংলায় ধ্বনির এই নিয়ম স্বাভাবিক বলেই আধুনিক বাঙালি কবি ও ততোধিক আধুনিক বাঙালি ছন্দোবিৎ জন্মাবার বহু পূর্বেই বাংলা ছন্দে প্রাক্‌হসন্ত স্বরকে দুই মাত্রার পদবি দেওয়া হয়েছে। আজ পর্যন্ত কোনো বাঙালির কানে ঠেকেনি; এই প্রথম দেখা গেল নিয়মের ধাঁধায় পড়ে বাঙালি পাঠক কানকে অবিশ্বাস করলেন। কবিতা লেখা শুরু করবার বহুপূর্বে সবে যখন দাঁত উঠেছে তখন পড়েছি "জল পড়ে, পাতা নড়ে।" এখানে 'জল' যে 'পাতা'র চেয়ে মাত্রা-কৌলীন্যে কোনো অংশে কম এমন সংশয় কোনো বাঙালি শিশু বা তার পিতামাতার কানে বা মনেও উদয় হয়নি। এইজন্যে ঐ দুটো কথা অনায়াসে এক পংক্তিতে বসে গেছে, আইনের ঠেলা খায়নি। ইংরেজি মতে 'জল' সর্বত্রই এক সিলেব্‌ল্, 'পাতা' তার ডবল ভারি। কিন্তু জল শব্দটা ইংরেজি নয়। 'কাশীরাম' নামের 'কাশী' এবং 'রাম' যে

একই ওজনের এ কথাটা কাশীরামের স্বজাতীয় সকলকেই মানতেই হয়েছে। 'উদয়দিগন্তে ঐ শুভ্র শঙ্খ বাজে' এই লাইনটা নিয়ে আজ পর্যন্ত প্রবোধচন্দ্র ছাড়া আর কোনো পাঠকের কিছুমাত্র খটকা লেগেছে বলে আমি জানিনে, কেননা তারা সবাই কান পেতে পড়েছে নিয়ম পেতে নয়। যদি কর্তব্যবোধে নিতান্তই খটকা লাগা উচিত হয়, তাহলে সমস্ত বাংলাকাব্যের পনেরো আনা লাইনের এখনি প্রুফ-সংশোধন করতে বসতে হবে।

লেখক আমার একটা মস্ত ফাঁকি ধরেছেন। তিনি বলেন, আমি ইচ্ছামতো কোথাও 'ঐ' লিখি কোথাও লিখি 'ওই', এই উপায়ে পাঠকের চোখ ভুলিয়ে অক্ষরের বাটখারার চাতুরীতে একই উচ্চারণকে জায়গা বুঝে দুই রকমের মূল্য দিয়েছি।

তাহলে গোড়াকার ইতিহাসটা বলি। তখনকার দিনে বাংলা কবিতায় এক-একটি অক্ষর এক সিলেব্‌ল্ বলেই চলত। অথচ সেদিন কোনো কোনো ছন্দে যুগ্মধ্বনিকে দ্বৈমাত্রিক বলে গণ্য করার দরকার আছে বলে অনুভব করেছিলুম।

আকাশের ওই আলোর কাঁপন
নয়নেতে এই লাগে,
সেই মিলনের তড়িৎ-তাপন
নিখিলের রূপে জাগে।

আজকের দিনে এমন কথা অতি অর্বাচীনকেও বলা অনাবশ্যক যে, ঐ ত্রৈমাত্রিক ভূমিকার ছন্দকে নিচের মতো রূপান্তরিত করা অপরাধ—

ঐ যে তপনের রশ্মির কম্পন
এই মস্তিকেতে লাগে,
সেই সম্মিলনে বিদ্যুৎ-ঝম্পন
বিশ্বমূর্তি হয়ে জাগে।

অথচ সেদিন 'বৃত্রসংহারে' এইজাতীয় ছন্দে হেমচন্দ্র ঐন্দ্রিলার রূপবর্ণনায় অসংকোচে লিখতে পেরেছিলেন

বদনমণ্ডলে ভাসিছে ব্রীড়া।

বেশ মনে আছে সেদিন স্থানবিশেষে 'ঐ' শব্দের বানান নিয়ে আমাকে ভাবতে হয়েছিল। প্রবোধচন্দ্র নিশ্চয় বলবেন, "ভেবে যা হয় একটা স্থির করে ফেলাই ভালো ছিল। কোথাও বা 'ঐ', কোথাও বা 'ওই' বানান কেন।" তার উত্তর এই, বাংলার স্বরের হ্রস্বদীর্ঘতা সংস্কৃতের মতো বাঁধা নিয়ম মানে না, ওর মধ্যে অতি সহজেই বিকল্প চলে। "ও—ই দেখ, খোকা ফাউনটেন পেন মুখে পুরেছে", এখানে দীর্ঘ ওকারে কেউ দোষ ধরবে না। আবার যদি বলি "ঐ দেখ, ফাউনটেন পেনটা খেয়ে ফেললে বুঝি", তখন হ্রস্ব ঐকার নিয়ে বচসা করবার লোক মিলবে না। বাংলা উচ্চারণে স্বরের ধ্বনিকে টান দিয়ে অতি সহজেই বাড়ানো-কমানো যায় বলেই ছন্দে তার গৌরব বা লাঘব নিয়ে আজ পর্যন্ত দলাদলি হয়নি।

এ সব কথা দৃষ্টান্ত না দিলে স্পষ্ট হয় না, তাই দৃষ্টান্ত তৈরি করতে হল।

মনে পড়ে দুইজনে জুঁই তুলে বাল্যে
নিরালায় বনছায় গেঁথেছিনু মাল্যে।
দোঁহার তরুণ প্রাণ বেঁধে দিল গন্ধে
আলোয় আঁধারে মেশা নিভৃত আনন্দে॥

এখানে 'দুই' 'জুঁই' আপন আপন উকারকে দীর্ঘ করে দুই সিলেব্‌ল্‌এর টিকিট পেয়েছে, কান তাদের সাধুতায় সন্দেহ করলে না, দ্বার ছেড়ে দিলে। উলটো দৃষ্টান্ত দেখাই।

এই যে এল সেই আমারি স্বপ্নে-দেখা রূপ,
কই দেউলে দেউটি দিলি, কই জ্বালালি ধূপ।
যায় যদি রে যাক না ফিরে চাইনে তারে রাখি,
সব গেলেও হায়রে তবু স্বপ্ন রবে বাকি॥

এখানে 'এই' 'সেই' 'কই' 'যায়' 'হায়' প্রভৃতি শব্দ এক সিলেব্‌ল্‌এর বেশি মান দাবি করলে না। বাঙালি পাঠক সেটাকে অন্যায় না মনে করে সহজ ভাবেই নিলে।

কাঁধে মই, বলে, "কই ভুঁইচাপা গাছ।"
দইভাঁড়ে ছিপ ছাড়ে, খোঁজে কইমাছ।
ঘুঁটেছাই মেখে লাউ রাঁধে ঝাউপাতা,
কী খেতাব দেব তায় ঘুরে যায় মাথা।

এখানে 'সই' 'কই' 'ভুঁই' 'দই' 'ছাই' 'লাউ' প্রভৃতি সকলেরই সমান দৈর্ঘ্য, যেন গ্র্যানেডিয়ারের সৈন্যদল। যে-পাঠক এটা পড়ে দুঃখ পাননি সেই পাঠককেই অনুরোধ করি, তিনি পড়ে দেখুন—

দুইজনে জুঁই তুলতে যখন
গেলেম বনের ধারে,
সন্ধ্যা-আলোর মেঘের ঝালর
ঢাকল অন্ধকারে।

কুঞ্জে গোপন গন্ধ বাজায়
নিরুদ্দেশের বাঁশি,
দোঁহার নয়ন খুঁজে বেড়ায়
দোঁহার মুখের হাসি।

এখানে যুগ্মধ্বনিগুলো এক সিলেব্‌ল্‌এর চাকার গাড়িতে অনায়াসে ধেয়ে চলেছে। চণ্ডীদাসের গানে রাধিকা বলেছেন "কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো"। বাঁশিধ্বনির এই তো ঠিক পথ, নিয়মের ভিতর দিয়ে প্রবেশ করলে মরমে পৌঁছত না। কবিরাও সেই কান লক্ষ্য করে চলেন, নিয়ম যদি চৌমাথার পাহারাওয়ালার মতো সিগ্‌ন্যাল তোলে তবু তাঁদের রুখতে পারে না।

আমার দুঃখ এই, তথাচ আইনবিৎ বলছেন যে, লিপিপদ্ধতির দোষে 'অক্ষর গুনে ছন্দরচনার অন্ধ অভ্যাস' আমাদের পেয়ে বসেছে।

আমার বক্তব্য এই যে, ছন্দরচনার অভ্যাসটাই অন্ধ অভ্যাস। অন্ধের কান খুব সজাগ, ধ্বনির সংকেতে সে চলতে পারে, কবিরও সেই দশা। তা যদি না হত তাহলেই পায়ে পায়ে কবিকে চোখে চশমা এঁটে অক্ষর গনে গনে চলতে হত।

'বৎসর' 'উৎসব' প্রভৃতি খণ্ড ৎ-ওয়ালা কথাগুলোকে আমরা ছন্দের মাপে বাড়াই কমাই, এ রকম চাতুরী সম্ভব হয় যেহেতু খণ্ড ৎ-কে কখনো আমরা চোখে দেখার সাক্ষ্যে এক অক্ষর ধরি আবার কখনো কানে শোনার দোহাই দিয়ে তাকে আধ অক্ষর বলে চালাই, প্রবন্ধলেখক এই অপবাদ দিয়েছেন। অভিযোগকারীর বোঝা উচিত এটা একেবারেই অসম্ভব, কেননা ছন্দের কাজ চোখভোলানো নয়, কানকে খুশি করা, সেই কানের জিনিসে ইঞ্চিগজের মাপ চলেই না। 'বৎসর' প্রভৃতি শব্দ গেঞ্জিজামার মতো ; মধুপুরের স্বাস্থ্যকর হাওয়ায় দেহ এক-আধ ইঞ্চি বাড়লেও চলে, আবার শহরে এসে এক-আধ ইঞ্চি কমলেও সহজে খাপ খেয়ে যায়। কান যদি সম্মতি না দিত তাহলে কোনো কবির সাধ্য ছিল না ছন্দ নিয়ে যা খুশি তাই করতে পারে।

বৎসরে বৎসরে হাঁকে কালের গোমায়ু,
যায় আয়ু, যায় আয়ু, যায় যায় আয়ু।

এখানে 'বৎসর' তিনমাত্রা। কিন্তু সেতারে মিড় লাগাবার মতো অল্প একটু টানলে বেসুর লাগে না। যথা—

সখা সনে উৎসবে বৎসর যায়
শেষে মরি বিরহের ক্ষুৎপিপাসায়।
ফাগুনের দিনশেষে মউমাছি ও যে
মধুহীন বনে বৃথা মাধবীরে খোঁজে॥

টান কমিয়ে দেওয়া যাক।—

উৎসবের রাত্রিশেষে মৃৎপ্রদীপ হায়,
তারকার মৈত্রী ছেড়ে মৃত্তিকারে চায়।

দেখা যাচ্ছে এটুকু কমিবেশিতে মামলা চলে না, বাংলা ভাষার স্বভাবের মধ্যেই যথেষ্ট প্রশ্রয় আছে। যদি লেখা যেত

সখাসনে মহোৎসবে বৎসর যায়

তাহলে নিয়ম বাঁচত, কারণ পূর্ববর্তী ওকারের সঙ্গে খণ্ড ৎ মিলে একমাত্রা; কিন্তু কর্ণধার বলছে ঐখানটায় তরণী যেন একটু কাত হয়ে পড়ল। আমি এক জায়গায় লিখেছি 'উদয়-দিক্‌প্রান্ত-তলে'। ওটাকে বদলে 'উদয়ের দিক্‌প্রান্ত-তলে' লিখলে কানে খারাপ শোনাত না একথা প্রবন্ধলেখক বলেছেন, সালিসির জন্যে কবিদের উপর বরাত দিলুম।

অপরপক্ষে দেখা যাক চোখ ভুলিয়ে ছন্দের দাবিতে ফাঁকি চালানো যায় কিনা।

এখনই আসিলাম দ্বারে
অমনই ফিরে চলিলাম,
চোখও দেখেনি কভু তারে
কানই শুনিল তার নাম।

'তোমারি', 'যখনি' শব্দগুলির ইকারকে বাংলা বানানে অনেক সময় বিচ্ছিন্ন করে লেখা হয়, সেই সুযোগ অবলম্বন করে কোনো অলস কবি ওগুলোকে চারমাত্রার কোঠায় বসিয়ে ছন্দ ভরাট করেছেন কি না জানিনে, যদি করে থাকেন বাঙালি পাঠক তাঁকে শিরোপা দেবে না। ওদের উকিল তখন 'বৎসর' 'উৎসব' 'দিক্‌প্রান্ত' প্রভৃতি শব্দগুলির নজির দেখিয়ে তর্ক করবে। তার একমাত্র উত্তর এই যে, কান যেটাকে মেনে নিয়েছে কিংবা মেনে নেয়নি চোখের সাক্ষ্য নিয়ে কিংবা বাঁধানিয়মের দোহাই দিয়ে সেখানে তর্ক তোলা অগ্রাহ্য। যে-কোনো কবি উপরের ছড়াটাকে অনায়াসে বদল করে লিখতে পারে—

এখনি আসিনু তার দ্বারে
অমনি ফিরিয়া চলিলাম,
চোখেও দেখিনি কভু তারে
কানেই শুনেছি তার নাম।

'বৎসর' 'উৎসব' প্রভৃতি শব্দ যদি তিনমাত্রার কোঠা পেরোতে গেলেই স্বভাবতই খুঁড়িয়ে পড়ত তাহলে তার স্বাভাবিক ওজন বাঁচিয়ে ছন্দ চালানো এতই দুঃসাধ্য হত না যে, ধ্বনিকে এড়িয়ে অক্ষরগণনার আশ্রয়ে শেষে মানবাঁচানো আবশ্যক হত। ওটা চলে বলেই চালানো হয়েছে, দায়ে পড়ে না। কেবল অক্ষর সাজিয়ে অচল রীতিকে ছন্দে চালানো যদি সম্ভব হত তাহলে খোকাবাবুকে কেবল লম্বা টুপি পরিয়ে দাদামশায় বলে চালানো অসাধ্য হত না।···

বিচিত্রা—১৩৩৮ পৌষ

২

দিলীপকুমার আশ্বিনের 'উত্তরা'য়[১] ছন্দ সম্বন্ধে আমার দুই একটি চিঠির খণ্ড ছাপিয়েছেন। সর্বশেষে যে নোটটুকু দিয়েছেন তার থেকে বোঝা গেল আমি যে কথা বলতে চেয়েছি এখনো সেটা তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়নি।

তিনি আমারই লেখার নজির তুলে দেখিয়েছেন যে, নিম্নলিখিত কবিতায় আমি 'একেকটি' শব্দটাকে চারমাত্রার ওজন দিয়েছি।

ইচ্ছা করে অবিরত আপনার মনোমত
গল্প লিখি একেকটি করে।

১ উত্তরা—১৩৩৮ আশ্বিন : পত্রধারা।

এদিকে নীরেনবাবুর[১] রচনায়[২] "একটি কথা এতবার হয় কলুষিত" পদটিতে 'একটি' শব্দটাকে দুই মাত্রায় গণ্য করতে আপত্তি করিনি বলে তিনি দ্বিধা বোধ করছেন। তর্ক না করে দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক।

একটি কথার লাগি তিনটি রজনী জাগি,
একটুও নাহি মেলে সাড়া।
সখীরা যখন জোটে মুখে তব বন্যা ছোটে,
গোলমালে তোলপাড় পাড়া।

'একটি' 'তিনটি' 'একটু' শব্দগুলি হসন্তমধ্য, 'গোলমাল' 'তোলপাড়' ও সেই জাতের। অথচ হসন্তে ধ্বনিলাঘবতার অভিযোগে ওদের মাত্রা জরিমানা দিতে হয়নি। তিনমাত্রা ও চারমাত্রার গৌরবেই রয়ে গেল। কেউ কেউ বলেন কেবলমাত্র অক্ষরগণনার দোহাই দিয়েই এরা মান বাঁচিয়েছে, অর্থাৎ যদি যুক্ত অক্ষরের ছাঁদে লেখা যেত তাহলেই ছন্দে ধ্বনির কমতি ধরা পড়ত। আমার বক্তব্য এই যে, চোখ দিয়ে ছন্দ পড়া আর বাইসিক্‌ল্-এর চাকা দিয়ে হামাগুড়ি দেওয়া একই কথা, ওটা হবার জো নেই। বিরুদ্ধ দৃষ্টান্ত দিলে কথাটা বোঝা যাবে।

টোট্‌কা এই মুষ্টিযোগ লট্‌কানের ছাল,
সিট্‌কে মুখ খাবি, জ্বর আট্‌কে যাবে কাল।

বলে রাখা ভালো এটা ভিষক্-ডাক্তারের প্রেস্‌ক্রিপশন নয়, সাহিত্য-ডাক্তারের বানানো ছড়া, ছন্দ সম্বন্ধে মতসংশয় নিবারণের উদ্দেশে; এর থেকে অন্য কোনো রোগের প্রতিকার কেউ যেন আশা না করেন। আরো একটা

এক্‌টি কথা শুনিবারে তিন্‌টে রাত্রি মাটি,
এর পরে ঝগড়া হবে, শেষে দাঁত্‌কপাটি॥

১ নীরেন্দ্রনাথ রায়।

২ পরিচয়—১৩৩৮ কার্তিক : অনুবাদ।

অথবা

একটি কথা শোনো, মনে খট্‌কা নাহি রেখে,
টাট্‌কা মাছ জুট্‌ল না তো, শুঁট্‌কি দেখো চেখে।

শেষের তিনটি ছড়ায় অক্ষর গুনতি করতে গেলে দৃশ্যত পয়ারের সীমা ছাড়িয়ে যায়, কিন্তু তাই বলেই যে পয়ার ছন্দের নির্দিষ্ট ধ্বনি বেড়ে গেল তা নয়। আপাতত মনে হয় এটা যথেচ্ছাচার। কিন্তু হিসাব করে দেখলেই দেখা যাবে ছন্দের নীতি নষ্ট করা হয়নি। কেননা, তার জো নেই। এ তো রাজত্ব করা নয় কবিত্ব করা, এখানে লক্ষ্য হল মনোরঞ্জন; খামকা একটা জবরদস্তির আইন জারি করে তারপরে পাহারাওয়ালা লাগিয়ে দেওয়া, ব্যাপারটা এত সহজ নয়। ধ্বনির রাজ্যে গোঁয়ারতমি করে কেউ জিতে যাবে এমন সাধ্য আছে কার। চব্বিশ ঘণ্টা কান রয়েছে সতর্ক।

আমি এই কথাটি বোঝাতে চেষ্টা করছি যে, আক্ষরিক ছন্দ বলে কোনো অদ্ভুত পদার্থ বাংলায় কিংবা অন্য কোনো ভাষাতেই নেই। অক্ষর ধ্বনির চিহ্নমাত্র। যেমন 'জল' শব্দটাকে দিয়ে 'জল' পদার্থটার প্রতিবাদ চলে না, অক্ষরকে ধ্বনির প্রতিপক্ষ দাঁড় করানো তেমনি বিড়ম্বনা।

প্রশ্ন উঠবে, তাই যদি হয় তাহলে খোঁড়া হসন্তবর্ণকে কখনো আধ-মাত্রা কখনো পুরোমাত্রার পদবিতে বসানো হয় কেন। উত্তরে আমার বক্তব্য এই যে, স্বয়ং ভাষা যদি নিজেই আসন পেতে দেয় তবে তার উপরে অন্য কোনো আইন চলে না। ভাষাও বর্ণভেদে পংক্তির ব্যবস্থা নিজের ধ্বনির নিয়ম বাঁচিয়ে তবে করতে পারে। বাংলা ভাষায় স্বর-বর্ণের ধ্বনিমাত্রা বিকল্পে দীর্ঘ ও হ্রস্ব হয়ে থাকে, ধনুকের ছিলের মতো, টানলে বাড়ে, টান ছেড়ে দিলে কমে। সেটাকে গুণ বলেই গণ্য করি। তাতে ধ্বনিরসের বৈচিত্র্য হয়। আমরা দ্রুত লয়ে বলতে পারি 'এইরে',

আবার তাকে টানলে ডবল করে বলতে পারি 'এ-ইয়ে'। তার কারণ আমাদের স্বরবর্ণগুলো জীবধর্মী, ব্যবহারের প্রয়োজনে একটা সীমার মধ্যে তাদের সংকোচন-প্রসারণ চলে। চারটে পাথরের মূর্তি ধরাবার মতো জায়গায় পাঁচটা ধরাতে গেলে মুশকিল বাধে; কিন্তু চারজন প্যাসেঞ্জার বসবার বেঞ্চিতে পাঁচজন মানুষ বসালে দুর্ঘটনার আশঙ্কা নেই যদি তারা পরস্পর রাজি থাকে। বাংলা ভাষার স্বরবর্ণগুলিও পাথুরে নয়, নিজের স্থিতিস্থাপকতার গুণে তারা প্রতিবেশীর জন্যে একটু-আধটু জায়গার ব্যবস্থা করতে সহজেই রাজি থাকে। এইজন্যেই অক্ষরের সংখ্যা গণনা করে ছন্দের ধ্বনিমাত্রা গণনা বাংলায় চলে না। এটা বাঙালির আত্মীয়সভার মতন। সেখানে যতগুলো চৌকি তার চেয়ে মানুষ বেশি থাকা কিছুই অসম্ভব নয়, অথবা পাশে ফাঁক পেলে দুইজনের জায়গা একজনে হাত পা মেলে আরামে দখল করাও এই জনতার অভ্যস্ত। বাংলার প্রাকৃতছন্দ ধরে তার প্রমাণ দেওয়া যাক।

বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদেয় এল বান,
শিবঠাকুরের বিয়ে হবে তিন কন্যে দান।

এটা তিন মাত্রার ছন্দ। অর্থাৎ চার পোয়ায় সেরওয়ালা এর ওজন নয়, তিন পোয়ায় এর সের। এর প্রত্যেক পা-ফেলার লয় হচ্ছে তিনের।

বৃষ্‌টি। পড়ে-। টাপুর। টুপুর। নদেয়। এল-। বা-ন।
শিবঠা। কুরের। বিয়ে-। হবে-। তিন্‌ক। ন্‌নে-। দা-ন।

দেখা যাচ্ছে, তিন গণনায় যেখানে যেখানে ফাঁক, পার্শ্ববর্তী স্বরবর্ণগুলি সহজেই ধ্বনি প্রসারিত করে সেই পোড়ো জায়গা দখল করে নিয়েছে। এত সহজে যে, হাজার হাজার ছেলেমেয়ে এই ছড়া আউড়েছে, তবু ছন্দের কোনো গর্তে তাদের কারো কণ্ঠ স্খলিত হয়নি। ফাঁকগুলো যদি

ঠেসে ভরাতে কেউ ইচ্ছা করেন—দোহাই দিচ্ছি না করেন যেন—তবে এই রকম দাঁড়াবে।

বৃষ্টি পড়ছে টাপুর টুপুর নদেয় আসছে বন্যা,
শিবঠাকুরের বিয়ের বাসরে দান হবে তিন কন্যা।

রামপ্রসাদের একটি গান আছে।—

মা আমায় ঘুরাবি কত
চোখবাঁধা বলদের মতো।

এটাও তিনমাত্রা লয়ের ছন্দ।

মা-আ। মায় ঘু। রাবি-। কত-।

ফাঁক ভরাট করতে হলে হবে এই চেহারা।

হে মাতা আমারে ঘুরাবি কতই
চক্ষুবদ্ধ বৃষের মতোই।

যাঁরা অক্ষর গণনা করে নিয়ম বাঁধেন তাঁদের জানিয়ে রাখা ভালো যে, স্বরবর্ণে টান দিয়ে মিড় দেবার জন্যেই প্রাকৃত-বাংলা ছন্দে কবিরা বিনা দ্বিধায় ফাঁক রেখে দেন; সেই ফাঁকগুলো ছন্দেরই অঙ্গ, সে সব জায়গায় ধ্বনির রেশ কিছু কাজ করবার অবকাশ পায়।

হারিয়ে ফেলা বাঁশি আমার পালিয়েছিল বুঝি
লুকোচুরির ছলে।

এর মধ্যে প্রায় প্রত্যেক যতিতে ফাঁক আছে।

হারিয়ে ফেলা-[১]। বাঁশি আমা-র[২]। পালিয়েছিল[৩]। বুঝি—[৪]।
লুকোচুরি-র[৫]। ছলে-[৬]।

কিছু বৈচিত্র্যও দেখছি। প্রথম দুটি বিভাগে সমান্তরাল ফাঁক। কিন্তু তিনের ভাগে ফাঁক বাদ গিয়ে একেবারে চতুর্থ ভাগের শেষে দীর্ঘ ফাঁক পড়েছে। পাঠক 'হারিয়ে ফেলা'র পরেও ফাঁক না দিয়ে একেবারে

দ্বিতীয় ভাগের শেষে যদি সেটা পূরণ করে দেন তবে ভালোই শুনতে হবে। কিন্তু যদি বেফাঁক টাসবুনানির বিশেষ ফরমাশ থাকে তাহলে সেটাও চেষ্টা করলে মন্দ হবে না।

স্বপ্ন আমার বন্ধনহীন সন্ধ্যাতারার সঙ্গী
মরণযাত্রীদলে,
স্বর্ণবরন কুজ্ঝটিকায় অস্তশিখর লঙ্ঘি'
লুকায় মৌনতলে॥

এই কথাটা লক্ষ্য করবার বিষয় যে, হসন্তবর্ণের হ্রস্ব বা দীর্ঘ যে মাত্রাই থাক পাঠ করতে বাঙালি পাঠকের একটুও বাধে না, ছন্দের ঝোঁক আপনিই অবিলম্বে তাকে ঠিকমতো চালনা করে।

পাৎলা করিয়া কাট কাৎলা মাছেরে,
উৎসুক নাৎনি যে চাহিয়া আছেরে।

এই ছড়াটা পড়তে গেলে বাঙালি নিঃসংশয়ে স্বতই খণ্ড ৎ-এর পূর্ববর্তী স্বরবর্ণকে দীর্ঘ করে পড়বে। আবার যেমনি নিম্নের ছড়াটি সামনে ধর

পাৎলা করি কাট প্রিয়ে কাৎলা মাছটিরে
টাট্‌কা তেলে ফেলে দাও সরষে আর জিরে,
ভেট্‌কি যদি জোটে তাহে মাখ লঙ্কাবাঁটা,
যত্ন করে বেছে ফেল টুকরো যত কাঁটা।

অমনি প্রাকৃহসন্ত স্বরগুলিকে ঠেসে দিতে এক মুহূর্তও দেরি হবে না। এই যে বাংলা স্বরবর্ণের সজীবতা, একে কোনো কড়া নিয়মের চাপে আড়ষ্ট করে তাকে সর্বত্র সমানভাবে ব্যবহারযোগ্য করা উচিত—এ মত চালালে বাংলাভাষাকে ফাঁকি দেওয়া হবে। শুকনো আমসত্ত্বের মধ্যেই সাম্য, কিন্তু সরস আমের মধ্যে বৈচিত্র্য, ভোজে কোন্‌টার দাম বেশি তা নিয়ে তর্ক অনাবশ্যক।

বাংলা-প্রাকৃত ভাষার কাব্যে স্বরধ্বনির যে প্রাণবান্ স্বচ্ছন্দতা আছে সংস্কৃত-বাংলা ভাষা, যাকে আমরা সাধুভাষা বলি, তার মধ্যে পড়ে সে কেন জেনানা মেয়ের মতো দেয়ালে আটকা পড়ে গেল। তার কারণ সংস্কৃত-বাংলা কৃত্রিম ভাষা, ওখানে বাইরের নিয়মের প্রাধান্য, তার আপন নিয়ম অনেক জায়গায় কুণ্ঠিত। সভাস্থলে একটি আসনে একটি মানুষের স্থান নির্দিষ্ট, কারো বা দেহ ক্ষীণ, আসনে ফাঁক থেকে যায়, কারো বা স্থূল দেহ, আসনে ঠেসে বসতে হয়; কিন্তু গোনাগনতি চৌকি, সীমা নির্দিষ্ট। যদি ফরাশে বসতে হত তাহলে কলেবরের তারতম্য ধরে পরস্পরের আসনের সীমানায় কমিবেশি স্বাভাবিক নিয়মেই ঘটত। কিন্তু সভ্যতার মর্যাদার দিকে দৃষ্টি রেখে স্বভাবের নিয়মকে বাঁধানিয়মে পাকা করে দিতে হয়। তাতে কিছু পীড়ন ঘটলেও গাম্ভীর্যের পক্ষে তার একটা সার্থকতা আছে। সেইজন্যেই সভার রীতি ও ঘরের রীতিতে কিছু ভেদ থাকেই। শকুন্তলার বাকল দেখে দুষ্মন্ত বলেছিলেন, কিমিব হি মধুরাণাং মণ্ডনং নাকৃতীনাম্; কিন্তু যখন তাঁকে রাজান্তঃপুরে নিয়েছিলেন তখন তাঁকে নিশ্চয়ই বাকল পরাননি। তখন শকুন্তলার স্বাভাবিক শোভাকে অলংকৃত করেছিলেন, সৌন্দর্যবৃদ্ধির জন্যে নয়, মর্যাদারক্ষার জন্যে। রাজরানীর সৌন্দর্য ব্যক্তি-বিশেষে বিচিত্র, কিন্তু তাঁর মর্যাদার আদর্শ সকল রাজরানীর মধ্যে এক। ওটা প্রকৃতির হাতে তৈরি নয়, রাজসমাজের দ্বারা নির্দিষ্ট। অর্থাৎ ওটা প্রাকৃত নয়, সংস্কৃত। তাই দুষ্মন্ত স্বীকার করেছিলেন বটে বনলতার দ্বারা উদ্যানলতা পরাভূত, তবু উদ্যানকে বনের আদর্শে রমণীয় করে তুলতে নিশ্চয় তাঁর সাহস হয়নি। তাই আমি নিজে আকন্দফুল ভালোবাসি, কিন্তু আমার সাধুসমাজের মালি ঐ গাছের অঙ্কুর দেখবামাত্র উপড়ে ফেলে। সে যদি কবি হত, সাধুভাষায় ছাড়া কবিতা লিখত না। সাধুভাষার ছন্দের বাঁধারীতি যে-জাতীয় ছন্দে চলে এবং শোভা পায়

সে হচ্ছে পয়ারজাতীয় ছন্দ। এখানে ফাঁক-ফাঁক নির্দিষ্ট আসনের উপর নানা ওজনেরই ধ্বনিকে চড়ানো নিরাপদ্। এখানে ঠিক চোদ্দটা অক্ষরকে বাহন করে যুগ্ম-অযুগ্ম নানারকমের ধ্বনিই একত্র সভা জমাতে পারে।

কাব্যলীলা একদিন যখন শুরু করেছিলেম তখন বাংলাসাহিত্যে সাধুভাষারই ছিল একাধিপত্য। অর্থাৎ তখন ছিল কাটা-কাটা পিঁড়িতে ভাগকরা ছন্দ। এই আইনের অধীনে যতক্ষণ পয়ারের এলাকায় থাকি ততক্ষণ আসনপীড়া ঘটে না। কিন্তু তিনমাত্রামূলক ছন্দের দিকে আমার কলমের একটা স্বাভাবিক ঝোঁক ছিল। ঐ ছন্দে প্রত্যেক অক্ষরে স্বতন্ত্র-আরূঢ় সকল ওজনের ধ্বনিকেই সমানদরের একক বলে ধরে নিতে বারংবার কানে বাজত। সেইজন্যে যুক্ত-অক্ষর অর্থাৎ যুগ্মধ্বনি বর্জন করবার একটা দুর্বল অভ্যাস আমাকে ক্রমেই পেয়ে বসছিল। ঠোকর খাবার ভয়ে পদগুলোকে একেবারে সমতল করে যাচ্ছিলুম। সব জায়গায় পেরে উঠিনি, কিন্তু মোটের উপর চেষ্টা ছিল। 'ছবি ও গান'এ 'রাহুর প্রেম' কবিতা পড়লে দেখা যাবে, যুক্ত-অক্ষর ঝেঁটিয়ে দেবার প্রয়াস আছে তবু তারা পাথরের টুকরোর মতো রাস্তার মাঝে মাঝে উঁচু হয়ে রইল। তাই যখন লিখেছিলুম

কঠিন বাঁধনে চরণ বেড়িয়া
চিরকাল তোরে রব আঁকড়িয়া
লৌহশৃঙ্খলের ডোর।

মনে খটকা লেগেছিল, কান প্রসন্ন হয়নি। কিন্তু তখন কলম ছিল অপটু এবং অলস মন ছিল অসতর্ক। কেননা পাঠকদের তরফ থেকে বিপদের আশঙ্কা ছিল না। তখন ছন্দের সদর রাস্তাও গ্রাম্য রাস্তার মতো এবড়ো-খেবড়ো থাকত, অভ্যাসের গতিকে কেউ সেটাকে নিন্দনীয় বলে মনেও করেনি।

অক্ষরের দাসত্বে বন্দী বলে প্রবোধচন্দ্র বাঙালি কবিদেরকে যে দোষ দিয়েছেন[১] সেটা এই সময়কার পক্ষে কিছু অংশে খাটে। অর্থাৎ অক্ষরের মাপ সমান রেখে ধ্বনির মাপে ইতরবিশেষ করা তখনকার শৈথিল্যের দিনে চলত, এখন চলে না। তখন পয়ারের রীতি সকল ছন্দেরই সাধারণ রীতি বলে সাহিত্যসমাজে চলে গিয়েছিল। তার প্রধান কারণ পয়ার-জাতীয় ছন্দই তখন প্রধান, অন্যজাতীয় অর্থাৎ ত্রৈমাত্রিক ছন্দের ব্যবহার তখন অতি অল্পই। তাই এই মাইনরিটির স্বতন্ত্র দাবি সেদিন বিধিবদ্ধ হয়নি।

তারপরে 'মানসী' লেখার সময় এল। তখন ছন্দের কান আর ধৈর্য রাখতে পারছে না। একথা তখন নিশ্চিত বুঝেছি যে, ছন্দের প্রধান সম্পদ্ যুগ্মধ্বনি, অথচ এটাও জানছি যে পয়ারসম্প্রদায়ের বাইরে নির্বিচারে যুগ্মধ্বনির পরিবেশন চলে না।

রয়েছি পড়িয়া শৃঙ্খলে বাঁধা

এ লাইন-বেচারাকে পয়ারের বাঁধাপ্রথাটা শৃঙ্খল হয়েই বেঁধেছে, তিনমাত্রার স্কন্ধকে চারমাত্রার বোঝা বইতে হচ্ছে।[২] সেই 'মানসী' লেখবার বয়সে আমি যুগ্মধ্বনিকে দুইমাত্রার মূল্য দিয়ে ছন্দরচনায় প্রবৃত্ত হয়েছি। প্রথম প্রথম পয়ারেও সেই নিয়ম প্রয়োগ করেছিলুম।[৩] অনতিকাল পরেই দেখা গেল তার প্রয়োজন নেই।[৪] পয়ারে যুগ্মধ্বনির উপযুক্ত ফাঁক যথেষ্ট আছে। এই প্রবন্ধে আমি ত্রিপদী প্রভৃতি পয়ারজাতীয় সমস্ত দ্বৈমাত্রিক ছন্দকেই 'পয়ার' নাম দিচ্ছি।

১ ৫২ পৃষ্ঠায় পাদটীকা ২ দ্রষ্টব্য।

২ 'শৃঙ্খলে' শব্দে চার মাত্রা না ধরে তিন মাত্রা ধরা হয়েছে। পরবর্তী 'গদ্যছন্দ' প্রবন্ধের প্রথম উদ্ধৃতি দ্রষ্টব্য।

৩ 'মানসী'র প্রথম সংস্করণের ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

৪ গ্রন্থপরিচয় দ্রষ্টব্য।

পয়ারে ধ্বনিবিন্যাসের এই যে স্বচ্ছন্দতা, দুই মাত্রার লয় তার একমাত্র কারণ নয়। পয়ারের পদগুলিতে তার ধ্বনিভাগের বৈচিত্র্য একটা মস্ত কথা। সাধারণ ভাগ হচ্ছে ৩+৩+২+৩+৩। যথা—

নিখিল আকাশভরা আলোর মহিমা
তৃণের শিশির মাঝে লভিল প্রতিমা।

অন্য রকম। যথা—

তপনের পানে চেয়ে সাগরের ঢেউ
বলে ওই পুতলিরে এনে দে-না কেউ।

অথবা

রাখি যাহা তার বোঝা কাঁধে চেপে রহে,
দিই যাহা তার ভার চরাচর বহে।

অথবা

সারা দিবসের হায় যত কিছু আশা
রজনীর কারাগারে হারাবে কি ভাষা।

অমিত্রাক্ষর ছন্দে পয়ারের প্রবর্তন হয়েছে এই কারণেই। সে কোনো কোনো আদিম জীবের মতো বহুগ্রন্থিল, তাকে নষ্ট না করেও যেখানে-সেখানে ছিন্ন করা যায়।[১] এই ছেদের বৈচিত্র্য থাকাতেই প্রয়োজন হলে সে পদ্য হলেও গদ্যের অবন্ধ গতি অনেকটা অনুকরণ করতে পারে। সে গ্রামের মেয়ের মতো; যদিও থাকে অন্তঃপুরে, তবুও হাটে-ঘাটে তার চলাফেরায় বাধা নেই।

উপরের দৃষ্টান্তগুলিতে ধ্বনির বোঝা হালকা। যুগ্মবর্ণের ভার চাপানো যাক।

সুরাঙ্গনা নন্দনের নিকুঞ্জপ্রাঙ্গণে
মন্দারমঞ্জরি তোলে চঞ্চলকঙ্কণে।
বেণীবন্ধ তরঙ্গিত কোন্ ছন্দ নিয়া,
স্বর্গবীণা গুঞ্জরিছে তাই সন্ধানিয়া।

১ দৃষ্টান্ত ৪৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

আধুনিক বাংলা ছন্দে সবচেয়ে দীর্ঘ পয়ার আঠার অক্ষরে গাঁথা। তার প্রথম যতি পদের মাঝখানে আট অক্ষরের পরে, শেষ যতি দশ অক্ষরের পরে পদের শেষে। এতেও নানাপ্রকারের ভাগ চলে। তাই অমিত্রাক্ষরের লাইনডিঙানো চালে এর ধ্বনিশ্রেণীকে নানারকমে কুচকাওয়াজ করানো যায়।

হিমাদ্রির ধ্যানে যাহা | স্তব্ধ হয়ে ছিল রাত্রিদিন
সপ্তর্ষির দৃষ্টিতলে | বাক্যহীন স্তব্ধতায় লীন,
সেই নির্ঝরিণী-ধারা | রবিকরস্পর্শে উচ্ছ্বসিতা
দিগ্‌দিগন্তে প্রচারিছে | অন্তহীন আনন্দের গীতা।

বাংলায় এই আরেকটি গুরুভারবহ ছন্দ। এরা সবাই মহাকাব্য বা আখ্যান বা চিন্তাগর্ভ বড়ো বড়ো কথার বাহন। ছোটো পয়ার আর এই বড়ো পয়ার, বাংলা কাব্যে এরা যেন ইন্দ্রের উচ্চৈঃশ্রবা আর ঐরাবত। অন্তত এই বড়ো পয়ারকে গীতিকাব্যের কাজে খাটাতে গেলে বেমানান হয়। এর নিজের গড়নের মধ্যেই একটা সমারোহ আছে, সেইজন্যে এর প্রয়োজন সমারোহসূচক ব্যাপারে।

ছোটো পয়ারকে চেঁচে ছুলে হালকা কাজে লাগানো যায়, যেমন বাঁশের কঞ্চিকে ছিপ করা চলে। পয়ারের দেহসংস্থানেই গুরুর সঙ্গে লঘুর যোগ আছে। তার প্রথম অংশে আট, দ্বিতীয় অংশে ছয়; অর্থাৎ হালের দিকে সে চওড়া কিন্তু দাঁড়ের দিকে সরু; তাকে নিয়ে মাল-বওয়ানোও যায়, বাচ-খেলানোও চলে। বড়ো পয়ারের দেহসংস্থান এর উলটো; তার প্রথমভাগে আট, শেষভাগে দশ; তার গৌরবটা ক্রমেই প্রশস্ত হয়ে উঠেছে। ছোটো পয়ারের ছিবলেমির একটা পরিচয় দেওয়া যাক।

খুব তার বোলচাল, সাজ ফিটফাট,
তকরার হলে আর নাই মিটমাট।
চশমায় চমকায় আড়ে চায় চোখ,
কোনো ঠাঁই ঠেকে নাই কোনো বড়ো লোক।

এর ভাগগুলোকে কাটা-কাটা ছোটো-ছোটো করে হ্রস্বস্বরে হসন্তবর্ণে ঘনঘন ঝোঁক দিয়ে এর চটুলতা বাড়িয়ে দেওয়া গেছে। এখানে এটা পাতলা কিরিচের মতো। একেই আবার যুগ্মধ্বনির যোগে মজবুত করে খাড়া করে তোলা যায়।

বাক্য তার অনর্গল মল্লসজ্জাশালী,
তর্কযুদ্ধে উগ্র তেজ, শেষ যুক্তি গালি।
ভ্রূকুটিপ্রচ্ছন্ন চক্ষু কটাক্ষিয়া চায়,
কুত্রাপিও মহত্ত্বের চিহ্ন নাহি পায়।

যেখানে-সেখানে নানাপ্রকার অসমান ভার নিয়েও পয়ারের পদস্খলন হয় না, এই তত্ত্বটির মধ্যে অসামান্যতা আছে। অন্য কোনো ভাষার কোনো ছন্দে এ-রকম স্বচ্ছন্দতা এতটা পরিমাণে আছে বলে আমি তো জানিনে।

এর কৌশলটা কোন্‌খানে যখন ভেবে দেখা যায়, তখন দেখি পয়ারে প্রত্যেক পদের মাঝখানে ও শেষে যে দুটো হাঁফ ছাড়বার যতি আছে সেইখানেই তার ভারসামঞ্জস্য হয়ে থাকে।

নিঃস্বতা-সংকোচে দিন | অবসন্ন হলে
নিভৃতে নিঃশব্দ সন্ধ্যা | নেয় তারে কোলে।

গণনা করে দেখলে ধরা পড়ে এই পয়ারের দুই লাইনে ধ্বনিভারের সাম্য নেই। তবু যে টলমল করতে করতে ছন্দটা কাত হয়ে পড়ে না, তার কারণ ডাইনে-বাঁয়ে যতির লগির ঠেকা দিয়ে দিয়ে তাকে চালিয়ে নেওয়া হয়। চতুষ্পদ জন্তু যেমন তার ভারী দেহটাকে দুইজোড়া পায়ের

দ্বারা দুই দিকে ঠেকাতে ঠেকাতে চলে সেই রকম। পয়ারের প্রকৃতরূপ চোদ্দটা অক্ষরে নয়, সেটা প্রথম অংশের আট অক্ষর ও দ্বিতীয় অংশের ছয় অক্ষরের পরবর্তী দুই যতিতে। অজগর সমস্ত দেহটা নিয়ে চলে। তার দেহে মুণ্ড এবং ধড়ের মধ্যে ভাগ নেই। ঘোড়ার দেহে সেই ভাগ আছে। তার মুণ্ডটার পরে যেখানে গলা সেখানে একটা যতি, ধড়ের শেষভাগে যেখানে ক্ষীণকটি সেখানেও আর একটা। এই বিভক্তভাবের দেহকে সামলিয়ে নিয়ে সে চার পা ফেলে চলে। পয়ারেরও সেইরকম বিশেষভাবে বিভক্ত দেহ এবং চার পা ফেলতে ফেলতে চলা। চতুষ্পদ জন্তুর দুই পায়ের সমান বিন্যাস। যদি এমন হত যে, কোনো জানোয়ারের পা দুটো বাঁয়ের চেয়ে ডাইনে এক ফুট বেশি লম্বা তাহলে তার চলনে স্থিতির চেয়ে অস্থিতিই বেশি হত; সুতরাং তার পিঠে সওয়ার চাপালে কোনো পক্ষেই আরাম থাকত না। ছন্দে তার একটা দৃষ্টান্ত দিই।

তরণী বেয়ে শেষে | এসেছি ভাঙা ঘাটে,
স্থলে না মেলে ঠাঁই | জলে না দিন কাটে।

এ ছড়ায় প্রত্যেক লাইনে চোদ্দ অক্ষর এবং মাঝে আর শেষে দুই যতিও আছে। তবু ওকে পয়ার বলবার জো নেই। ওর পা-ফেলার ভাগ অসমান।

তরণী। বেয়ে শেষে ॥ এসেছি। ভাঙা ঘাটে ॥

এক পায়ে তিন মাত্রা আর এক পায়ে চার। সাত মাত্রার পরে একটা করে যতি আছে, কিন্তু বিজোড় অঙ্কের অসাম্য ঐ যতিতে পুরো বিরাম পায় না। সেইজন্যে সমস্ত পদটার মধ্যে নিয়তই একটা অস্থিরতা থাকে, যে পর্যন্ত না পদের শেষে এসে একটা সম্পূর্ণ স্থিতি ঘটে। এই অস্থিরতাই এরকম ছন্দের স্বভাব, অর্থাৎ পয়ারের ঠিক বিপরীত। এই অস্থিরতার সৌন্দর্যকে ব্যবহার করবার জন্যেই এই রকম ছন্দের রচনা।

এর পিঠের উপর যেমন-তেমন করে যুগ্মধ্বনির সওয়ার চাপালে অস্বস্তি ঘটে। যদি লেখা যায়

সায়াহ্ন-অন্ধকারে এসেছি ভগ্ন ঘাটে

তাহলে ছন্দটার কোমর ভেঙে যাবে। তবুও যদি যুগ্মবর্ণ দেওয়াই মত হয় তাহলে তার জন্যে বিশেষভাবে জায়গা করে দিতে হবে। পয়ারের মতো উদারভাবে যেমন খুশি ভার চাপিয়ে দিলেই হল না।

অন্ধরাতে যবে | বন্ধ হল দ্বার,
ঝঞ্ঝাবাতে ওঠে | উচ্চ হাহাকার।

মনে রাখা দরকার এই শ্লোক অবিকৃত রেখেও এর ভাগের যদি পরিবর্তন করে পড়া যায়, দুই ভাগের বদলে প্রত্যেক লাইনে যদি তিন ভাগ বসানো যায়, তাহলে এটা আরেক ছন্দ হয়ে যাবে। একে নিম্নলিখিত রকম ভাগ করে পড়া যাক।

অন্ধরাতে | যবে বন্ধ | হল দ্বার,
ঝঞ্ঝাবাতে | ওঠে উচ্চ | হাহাকার।

পশুপক্ষীদের চলন সমান মাত্রার দুই বা চার পায়ের উপর। এই পা-কে কেবল যে চলতে হয় তা নয়, দেহভার বইতে হয়। পদক্ষেপের সঙ্গেসঙ্গেই বিরাম আছে বলে বোঝা সামলিয়ে চলা সম্ভব। আজ পর্যন্ত জীবলোকে জুড়িওয়ালা পায়ের পরিবর্তে চাকার উদ্ভব কোথাও হল না। কেননা চাকা না থেমে গড়িয়ে চলে, চলার সঙ্গে থামার সামঞ্জস্য তার মধ্যে নেই। দুইমূলক সমমাত্রায় দুই পায়ের চাল, তিনমূলক অসমমাত্রায় চাকার চাল। দুইপা-ওয়ালা জীব উঁচুনিচু পথের বাধা ডিঙিয়ে চলে যায়। পয়ারের সেই শক্তি। চাকা বাধায় ঠেকলে ধাক্কা খায়, ত্রৈমাত্রিক ছন্দের সেই দশা। তার পথে যুগ্মস্বর[১] যাতে বাধা হয়ে না দাঁড়ায় সেই চেষ্টা করতে হবে।

১ যুগ্মধ্বনি। পরবর্তী 'যুগ্মস্বর' ও 'যুগ্মবর্ণ' লক্ষিতব্য।

অধীর বাতাস এল সকালে.
বনেরে বৃথাই শুধু বকালে।
দিনশেষে দেখি চেয়ে
ঝরা ফুলে মাটি ছেয়ে
লতারে কাঙাল করে ঠকালে।

এ ছন্দ পয়ারজাতীয়, টেনিস-খেলোয়াড়ের আধা-পায়জামার মতো বহরটা নিচের দিকে ছাঁটা। এ ছন্দে তাই যুগ্মস্বর যেমন খুশি চলে।

নবারুণ-চন্দনের তিলকে
দিক্‌ললাট এঁকে আজি দিল কে।
বরণের পাত্র হাতে
উষা এল সুপ্রভাতে,
জয়শঙ্খ বেজে ওঠে ত্রিলোকে॥

কিন্তু

শরতে শিশির বাতাস লেগে
জল ভরে আসে উদাসী মেঘে।
বরষন তবু হয় না কেন,
ব্যথা নিয়ে চেয়ে রয়েছে যেন॥

এখানে তিনমাত্রার ছন্দ গড়িয়ে চলেছে। চাকার চাল, পা-ফেলার চাল নয়; তাই যুগ্মবর্ণের স্বেচ্ছাচারিতা এর সইবে না।

চাষের সময়ে যদিও করিনি হেলা,
ভুলিয়া ছিলাম ফসল-কাটার বেলা।

পয়ারের মতোই চোদ্দটা অক্ষরে পদ, কিন্তু জাত আলাদা। তিনমাত্রার চাকায় চলেছে। পদাতিকের সঙ্গে চক্রীর মেলে না।

শ্যামল ঘন | বকুলবন | ছায়ে ছায়ে
যেন কী সুর | বাজে মধুর | পায়ে পায়ে।

এখানেও চোদ্দ অক্ষর। কিন্তু এর চালে পয়ারের মতো সমমাত্রার পদচারণের শান্তি নেই বলে বিষমমাত্রার ভাগগুলি যতির মধ্যেও গতির ঝোঁক রেখে দেয়। খোঁড়া মানুষের চলার মতো, যতক্ষণ না লক্ষ্য স্থানে গিয়ে বসে পড়ে থেমেও ভালো করে থামতে পারে না।

বাংলা চলতি ভাষায় মূল সংস্কৃত শব্দের অনেকগুলি স্বরবর্ণই কোনোটা আধখানা কোনোটা পুরোপুরি ক্ষয়ে যাওয়াতে ব্যঞ্জনগুলো তাল পাকিয়ে অত্যন্ত পরস্পরের গায়ে-পড়া হয়ে গেছে। স্বরের ধ্বনিই ব্যঞ্জনের ধ্বনিকে অবকাশ দেয়, তার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে; সেগুলো সরে গেলেই ব্যঞ্জনধ্বনি পিণ্ডীভূত হয়ে পড়ে। চলিত এবং চল্‌তি, ঘৃণা এবং ঘেন্না, বসতি এবং বস্‌তি, শব্দগুলো তুলনা করে দেখলেই বোঝা যাবে। সংস্কৃত ভাষায় স্বরধ্বনির দাক্ষিণ্য, আর প্রাকৃত-বাংলায় তার কার্পণ্য, এইটেই হল দুটো ভাষার ধ্বনিগত মূল পার্থক্য। স্বরবর্ণবহুল ধ্বনিসংগীত এবং স্বরবর্ণবিরল ধ্বনিসংগীতে প্রভূত প্রভেদ। এই দুইয়েরই বিশেষ মূল্য আছে। বাঙালি কবি তাঁদের কাব্যে যথাস্থানে দুটোরই সুযোগ নিতে চান। তাঁরা ধ্বনিরসিক বলেই কোনোটাকেই বাদ দিতে ইচ্ছা করেন না।

প্রাকৃত-বাংলার ধ্বনির বিশেষত্ববশত দেখতে পাই তার ছন্দ তিন-মাত্রার দিকেই বেশি ঝুঁকেছে। অর্থাৎ তার তালটা স্বভাবতই একতালা-জাতীয়, কাওয়ালিজাতীয় নয়। সংস্কৃত ভাষায় এই 'তাল' শব্দটা দুই সিলেব্‌ল্‌এর; বাংলায় ল আপন অন্তিম অকার খসিয়ে ফেলেছে, তার জায়গায় টি বা টা যোগ করে শব্দটাকে পুষ্ট করবার দিকে তার ঝোঁক। টি টা-এর ব্যবধান যদি না থাকে তবে ঐ নিঃস্বর ধ্বনিটি প্রতিবেশী যে-কোনো ব্যঞ্জন বা স্বরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পূর্ণতা পেতে চায়।

রূপসাগরের তলে ডুব দিনু আমি

এটা সংস্কৃত-বাংলার ছাঁদে লেখা। এখানে শব্দগুলো পরস্পর গা-ঘেঁষা

নয়। বাংলা-প্রাকৃতের অনিবার্য নিয়মে এই পদের যে শব্দগুলি হসন্ত, তারা আপনারই স্বরধ্বনিকে প্রসারিত করে ফাঁক ভরতি করে নিয়েছে। 'রূপ' এবং 'ডুব' আপন উকারধ্বনিকে টেনে বাড়িয়ে দিলে। 'সাগরের' শব্দ আপন একারকে পরবর্তী হসন্ত র-এর পঙ্গুতা চাপা দিতে লাগিয়েছে। এই উপায়ে ঐ পদটার প্রত্যেক শব্দ নিজের মধ্যেই নিজের মর্যাদা বাঁচিয়ে চলেছে। অর্থাৎ এ-ছন্দে ডিমক্রেসির প্রভাব নেই। এই রকমের ছন্দে দুইমাত্রার ধ্বনি আপন পদক্ষেপের প্রত্যেক পর্যায়ে যে অবকাশ পায় তা নিয়ে তার গৌরব। বস্তুত এই অবকাশের সুযোগ গ্রহণ করে তার ধ্বনিসমারোহ বাড়িয়ে তুললে এ ছন্দের সার্থকতা। যথা—

চৈতন্য নিমগ্ন হল রূপসিন্ধুতলে।

প্রাকৃত-বাংলা দেখা যাক।

রূপসাগরে ডুব দিয়েছি অরূপ রতন আশা করি

এখানে 'রূপ' আপন হসন্ত প-এর ঝোঁকে 'সাগরে'র সা-টাকে টেনে আপন করে নিয়েছে, মাঝে ব্যবধান থাকতে দেয়নি। 'রূপ-সা' তাই আপনিই তিনমাত্রা হয়ে গেল। 'সাগরে'র বাকি টুকরো রইল 'গরে'। সে আপন ওজন বাঁচাবার জন্যে রে-টাকে দিলে লম্বা করে, তিনমাত্রা পুরল। 'ডুব' আপনার হসন্তর টানে 'দিয়েছি'র দি-টাকে করলে আত্মসাৎ। এমনি করে আগাগোড়া তিনমাত্রা জমে উঠল। হসন্ত-প্রধান ভাষা সহজেই তিনমাত্রার দানা পাকায়, এটা দেখেছি। এমন কি, যেখানে হসন্তের ভিড় নেই সেখানেও তার ঐ একই চাল। এটা যেন তার অভ্যস্ত হয়ে মজ্জাগত হয়ে গেছে। যেমন—

অচে- । তনে- । ছিলেম। ভালো-।
আমায় । চেতন । করলি। কেনে-।

প্রাকৃত-বাংলার এই তিনমাত্রার ভঙ্গি চণ্ডীদাস জ্ঞানদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিরা সাধুভাষাতেও গ্রহণ করেছেন। যেমন—

হাসিয়া হাসিয়া মুখ নিরখিয়া
মধুর কথাটি কয়।
ছায়ার সহিতে ছায়া মিশাইতে
পথের নিকটে রয়॥

কিন্তু প্রাকৃত-বাংলার ক্রিয়াপদ নিয়ে একটু ভাববার বিষয় আছে।

মত্তরোষে বীরভদ্র ছুট্‌ল উর্ধ্বশ্বাসে,
ঘূর্ণিবেগে উড়্‌ল ধুলো রক্ত সন্ধ্যাকাশে।

কিংবা

ছুট্‌ল কেন মহেন্দ্রের আনন্দের ঘোর,
টুট্‌ল কেন উর্বশীর মঞ্জীরের ডোর।
বৈকালে বৈশাখী এল আকাশলুণ্ঠনে,
শুক্লরাতি ঢাক্‌ল মুখ মেঘাবগুণ্ঠনে॥

এদের সম্বন্ধে কী বলা যাবে। প্রধানত ক্রিয়াপদেরই বিশেষ রূপটাতে প্রাকৃত-বাংলার চেহারা ধরা পড়ে। উপরের ছড়াগুলিতে 'উড়্‌ল' 'ছুট্‌ল' 'টুট্‌ল' 'ঢাক্‌ল' প্রভৃতি প্রয়োগ নিয়ে তর্কটা ছন্দের তর্ক নয়, ভাষারীতির। এই রকম ক্রিয়াপদ যদি ব্যবহার করি তবে ধরে নিতে হবে ঐ ছড়াগুলি প্রাকৃত-বাংলাতেই লেখা হচ্ছে। আমি যে প্রবন্ধ লিখছি এও প্রাকৃত-বাংলার ঠাটে। যদি আমাকে কারো সঙ্গে মুখে মুখে আলোচনা করতে হত তাহলে এই লেখার সঙ্গে আমার মুখের কথার কোনো তফাত থাকত না। মাঝে মাঝে অভ্যাসদোষে হয়তো ইংরেজি শব্দ মুখ দিয়ে বেরিয়ে যেত, কিন্তু কখনোই 'করিয়াছিল' 'গিয়াছে' ধরনের ক্রিয়াপদ ভুলেও ব্যবহার করতে পারতুম না। আবার প্রাকৃত-বাংলার ক্রিয়াপদ সংস্কৃত-বাংলায়

ব্যবহার করাও চলে না। প্রবোধচন্দ্র 'বিচিত্রা'য়[১] লিখেছেন যে, বাঙালি কবিরা সাহস করে কবিতায় 'করিব' 'চলিব' প্রভৃতি প্রয়োগ না করে কেন 'করব' 'চলব' প্রয়োগ না করেন। যদি প্রশ্নটার অর্থ এই হয় যে, অযথা-স্থানে কেন করিনে তবে তার উত্তর দেওয়া অনাবশ্যক। যদি বলেন যথাস্থানেও কেন করিনে তবে তার উত্তরে বলব, যথাস্থানে করে থাকি।

যে তর্ক নিয়ে লেখা শুরু করেছিলেম সেটাতে ফিরে আসা যাক। বাংলায় হসন্তমধ্য শব্দগুলোয় কয় মাত্রা গণনা করা হবে তাই নিয়ে সংশয় উঠেছে।

[সংস্কৃত ভাষায় শব্দের মাঝখানে হসন্তবর্ণ যুক্তবর্ণের রূপ ধরে সাধুভাষায় অনায়াসেই আপন স্থান পেয়েছে। একমাত্র খণ্ড-ৎ অক্ষরমহলে আপন অনুবর্তী জুড়ির সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে। প্রাকৃত-বাংলায় শব্দমধ্যবর্তী হসন্তবর্ণ আপন বিচ্ছিন্ন অক্ষররূপ রক্ষা করে রয়ে গেছে। তার অধিকাংশই ক্রিয়াপদ।]

যেগুলি ক্রিয়াপদ নয় সে সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এ-প্রবন্ধের গোড়াতেই আলোচনা করেছি। বলেছি নিয়মের বিকল্প চলে; কেননা বাঙালির কান সাধারণ ব্যবহারে সেই বিকল্প মঞ্জুর করেছে। এ-ক্ষেত্রে হিসাবে একটা মাত্রার কমিবেশি নিয়ে তর্ক ওঠে না।

চিমনি ভেঙে গেছে দেখে গিন্নি রেগে খুন,
ঝি বলে আমার দোষ নেই ঠাকরুন।

অন্তত 'চিমনি'কে দুই মাত্রা করায় কবির দোষ হয়নি। আবার

চিমনি ফেটেছে দেখে গৃহিণী সরোষ,
ঝি বলে ঠাকরুন মোর নাই কোনো দোষ।

এ রকম বিপর্যয়ও চলে। একই ছড়ায় 'চিমনি'কে একমাত্রা গ্রেসমার্কা দেওয়া হয়েছে, অথচ 'ঠাকরুন'কে খর্ব করে তিনমাত্রায় নামানো গেল। অপরাধ ঘটেছে বলে মনে করিনি।

১ ১৩৩৮ অগ্রহায়ণ, পৃ ৫৭৪-৭৫।

কুস্তির আখড়ায় ভিস্তিকে ধরে
জল ছিটাইয়া দাও, ধুলা যাক মরে।

অপর পক্ষে

রাস্তা দিয়ে কুস্তিগির চলে ঘেঁষাঘেঁষি,
একটা নয় দুটো নয় একশোর বেশি।

প্রয়োজনমতো এটাও চলে, ওটাও চলে। নিখতির মাপে বিচার করতে গেলে বিশুদ্ধ ওজনের পয়ার হচ্ছে

পালোয়ানে পালোয়ানে চলে ঘেঁষাঘেষি।

তাতে প্রত্যেক অক্ষর নিখুঁত একমাত্রা, সবসুদ্ধ চোদ্দটা। 'রাস্তা' 'কুস্তি' প্রভৃতি শব্দে ওজন বেড়ে যায়, তবুও বহুসহিষ্ণু পয়ারকে কাবু করতে পারে না।

প্রাকৃত-বাংলার ক্রিয়াপদ নিয়ে কথা হচ্ছিল। ক্রিয়াপদেই তার আপন চেহারা। ঐটুকু ছাড়া তার আর কোনো উপসর্গ নেই বললেই চলে। বাংলা-সংস্কৃত ভাষার মতো সে শুচিবায়ুগ্রস্ত নয়। ভোজে বসে গেছে ব্রাহ্মণ, তাকে পরিবেশনকর্তা জিজ্ঞাসা করলে, নিরামিষ না আমিষ। সে বললে, দ্বৌ কর্তব্যৌ। তেমনি শব্দবাছাই নিয়ে যদি প্রাকৃত-বাংলাকে প্রশ্ন করা যায়, 'কী চাই, প্রাকৃত শব্দ না সংস্কৃত শব্দ' সে বলবে, দ্বৌ কর্তব্যৌ। তার জাতবিচার নেই বললেই হয়। পছন্দ হবামাত্র ইংরেজি পারসি সব শব্দই সে আত্মসাৎ করে। আবার অমরকোষবিহারী বড়ো বড়ো বহরওয়ালা সংস্কৃত শব্দকে ওদেরি ভিড়ের মধ্যে মিলিয়ে নেয়। সংস্কৃত ভাষার প্রতি সম্ভ্রমবশত তার মুখে বাধবে না—

রূপযৌবন উপঢৌকন
দেবেন কন্যা তাহারে,
তাই পরেছেন চীনাংশুকের
পট্টবসন বাহারে।

নন-কো-অপরেশনের দিনেও ইংরেজি শব্দ চালিয়ে দিতে পিকেটিঙের ভয় নেই। যথা—

আইডিয়াল নিয়ে থাকে, নাহি চড়ে হাঁড়ি,
প্র্যাকটিক্যাল লোকে বলে, এ যে বাড়াবাড়ি।
শিবনেত্র হল বুঝি, এইবার মোলো,
অকসিজেন নাকে দিয়ে চাঙ্গা করে তোলো।

কিন্তু সংস্কৃত-বাংলায় বাছবিচার খুব কড়া। আধুনিকদের হাতে পড়ে ম্লেচ্ছপনা কিছুকিছু সয়ে গেছে; কিন্তু সেটুকু বড়োজোর বাইরের রোয়াকে, ভিতরমহলে রীতরক্ষা সম্বন্ধে কষাকষি।

কর্ণে দিলা ঝুমকাফুল, নাসিকায় নথ,
অঙ্গসজ্জা-সমাধানে ভূরি মেহন্নত।

এটাকে প্রহসন বলে পাঠক হয়তো মাপ করতে পারেন, কিন্তু প্রাকৃত-বাংলায় এই রকম ভিন্নপর্যায়ের শব্দগুলো যখন কাছাকাছি বসানো যায় তাদের আওয়াজের মধ্যে অত্যন্ত বেশি বেমিল হয় না। আমার এই গদ্যপ্রবন্ধ পড়ে দেখলে পাঠকেরা সেটা লক্ষ্য করতে পারবেন। কিন্তু এটাও দেখে থাকবেন এটার মধ্যে 'করিব' 'করিয়াছে' 'করিয়াছিল' প্রভৃতি ক্রিয়ারূপ কলমের কোনো ভুলে ঢুকে পড়বার কোনো সম্ভাবনা নেই। সেইজন্যে আমরা বাংলায় সংস্কৃতে ও প্রাকৃতে দুই ভিন্ন নিয়মেই চলি, তার অন্যথা করা অসম্ভব। তাই বাংলাকাব্যে এই দুই ভাষার ধারায় ছন্দের রীতি যদি দুই ভিন্ন পথ নিয়ে থাকে তবে সেই আপত্তিতে শুদ্ধির গোময়লেপনে সমস্ত একাকার করবার পক্ষপাতী আমি নই। আমি বলি, দ্বৌ কর্তব্যৌ। কারণ ছন্দের এই দ্বিবিধরসেই আমার রসনার লোভ।

পরিচয়—১৩৩৮ মাঘ

৩

…তব চিত্তগগনের দূর দিক্‌সীমা
বেদনার রাঙা মেঘে পেয়েছে মহিমা।

এখানে 'দিক্' শব্দের ক্ হসন্ত হওয়া সত্ত্বেও তাকে একমাত্রার পদবি দেওয়া গেল। নিশ্চিত জানি পাঠক সেই পদবির সম্মান স্বতই রক্ষা করে চলবেন।

মনের আকাশে তার দিক্‌সীমানা বেয়ে
বিবাগী স্বপনপাখি চলিয়াছে ধেয়ে।

অথবা

দিগ্‌বলয়ে নবশশিলেখা
টুক্‌রো যেন মানিকের রেখা।

এতেও কানের সম্মতি আছে।

দিক্‌প্রান্তে ওই চাঁদ বুঝি
দিক্-ভ্রান্ত মরে পথ খুঁজি।

আপত্তির বিশেষ কারণ নেই।

দিক্‌প্রান্তের ধূমকেতু উন্মত্তের প্রলাপের মতো
নক্ষত্রের আঙিনায় টলিয়া পড়িল অসংগত।

এও চলে। একের নজিরে অন্যের প্রামাণ্য ঘোচে না।

কিন্তু যাঁরা এ নিয়ে আলোচনা করছেন তাঁরা একটা কথা বোধ হয় সম্পূর্ণ মনে রাখছেন না যে, সব দৃষ্টান্তগুলিই পয়ারজাতীয় ছন্দের। আর এ-কথা বলাই বাহুল্য যে, এই ছন্দ যুক্তধ্বনি ও অযুক্তধ্বনি উভয়কেই বিনা পক্ষপাতে একমাত্রারূপে ব্যবহার করবার সনাতন অধিকার পেয়েছে। আবার যুক্তধ্বনিকে দুইভাগে বিশ্লিষ্ট করে তাকে দুইমাত্রায় ব্যবহার করার স্বাধীনতা সে যে দাবি করতে পারে না তাও নয়।

যাকে আমি অসম বা বিষমমাত্রার ছন্দ বলি যুক্তধ্বনির বাছবিচার তাদেরই এলাকায়।

হৃৎ-ঘটে সুধারস ভরি

কিংবা

হৃৎ-ঘটে অমৃতরস ভরি
তৃষা মোর হরিলে সুন্দরী।

এ ছন্দে দুইই চলবে। কিন্তু

অমৃতনির্ঝরে হৃৎপাত্রটি ভরি
কারে সমর্পণ করিলে সুন্দরী।

অগ্রাহ্য, অন্তত আধুনিক কালের কানে। অসমমাত্রার ছন্দে এরকম যুক্তধ্বনির বন্ধুরতা আবার একদিন ফিরে আসতেও পারে, কিন্তু আজ এটার চল নেই।

এই উপলক্ষ্যে একটা কথা বলে রাখি, সেটা আইনের কথা নয়, কানের অভিরুচির কথা।

হৃৎপটে আঁকা ছবিখানি

ব্যবহার করা আমার পক্ষে সহজ, কিন্তু

হৃৎপত্রে আঁকা ছবিখানি

অল্প একটু বাধে। তার কারণ খণ্ড ৎ-কে পূর্ণ ত-এর জাতে তুলতে হলে তার পূর্ববর্তী স্বরবর্ণকে দীর্ঘ করতে হয়; এই চুরিটুকুতে পীড়াবোধ হয় না যদি পরবর্তী স্বরটা হ্রস্ব থাকে। কিন্তু পরবর্তী স্বরটাও যদি দীর্ঘ হয় তাহলে শব্দটার পায়াভারি হয়ে পড়ে।

হৃৎপত্রে এঁকেছি ছবিখানি

আমি সহজে মঞ্জুর করি, কারণ এখানে 'হৃৎ' শব্দের স্বরটি ছোটো ও 'পত্র' শব্দের স্বরটি বড়ো। রসনা 'হৃৎ' শব্দ দ্রুত পেরিয়ে 'পত্র' শব্দে পুরো ঝোঁক দিতে পারে। এই কারণেই 'দিক্‌সীমা' শব্দকে চারমাত্রার

আসন দিতে কুণ্ঠিত হইনে, কিন্তু 'দিক্‌প্রান্ত' শব্দের বেলা ঈষৎ-একটু দ্বিধা হয়। শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, দরিদ্রান্ ভর কৌন্তেয়; 'দিক্‌সীমা' কথাটি দরিদ্র, 'দিক্‌প্রান্ত' কথাটি পরিপুষ্ট।

এ অসীম গগনের তীরে
মৃৎকণা জানি ধরণীরে।

'মৃৎকণা' না বলে যদি 'মৃৎপিণ্ড' বলা যায় তবে তাকে চালিয়ে দেওয়া যায়, কিন্তু একটু যেন ঠেলতে হয় তবেই চলে।

মৃৎ-ভবনে এ কী সুধা
রাখিয়াছ হে বসুধা।

কানে বাধে না। কিন্তু

মৃৎ-ভাণ্ডেতে এ কী সুধা
ভরিয়াছ হে বসুধা।

কিছু পীড়া দেয় না যে তা বলতে পারিনে। কিন্তু অক্ষর গনতি করে যদি বল ওটা ইন্‌ভীডিয়স্ ডিস্‌টিঙ্ক্‌শন, তাহলে চুপ করে যাব। কারণ কান-বেচারা প্রিমিটিভ্ ইন্দ্রিয়, তর্কবিদ্যায় অপটু।...

পরিচয়—১৩৩৯ কার্তিক

সংস্কৃত-বাংলা ও প্রাকৃত-বাংলার ছন্দ

সংস্কৃত-বাংলা এবং প্রাকৃত-বাংলার গতিভঙ্গিতে একটা লয়ের তফাত আছে। তার প্রকৃত কারণ প্রাকৃত-বাংলার দেহতত্ত্বটা হসন্তের ছাঁচে, সংস্কৃত-বাংলার হলন্তের[১]। অর্থাৎ উভয়ের ধ্বনিস্বভাবটা পরস্পরের উলটো। প্রাকৃত-বাংলা স্বরবর্ণের মধ্যস্থতা থেকে মুক্ত হয়ে পদে পদে তার ব্যঞ্জনধ্বনিগুলোকে আঁট করে তোলে। সুতরাং তার ছন্দের বুনানি সমতল নয়, তা তরঙ্গিত। সোজা লাইনের সুতো ধরে বিশেষ কোনো প্রাকৃত-বাংলার ছন্দকে মাপলে হয়তো বিশেষ কোনো সংস্কৃত-বাংলার ছন্দের সঙ্গে সে বহরে সমান হতে পারে, কিন্তু সুতোর মাপকে কি আদর্শ বলে ধরা যায়।

মনে করা যাক রাজমিস্ত্রি দেয়াল বানাচ্ছে, ওলনদণ্ড ঝুলিয়ে দেখা গেল সেটা হল বার ফিট। কিন্তু মোটের উপর দেয়াল খাড়া দাঁড়িয়ে থাকলেও সেটার উপরিতল যদি ঢেউখেলানো হয়, তবে কারুবিচারে সেই তরঙ্গিত ভঙ্গিটাই বিশেষ আখ্যা পেয়ে থাকে। দৃষ্টান্তের সাহায্য নেওয়া যাক।

> 'বউ কথা কও, বউ কথা কও'
> যতই গায় সে পাখি,
> নিজের কথাই কুঞ্জবনের
> সব কথা দেয় ঢাকি।

খাড়া সুতোর মাপে দাঁড়ায় এই

১ ২ ১ ২ ১ ২ ১ ২
বউ ক | থা কও | বউ ক | থা কও

১ ২ ১ ২ ১ ২
য তই | গায় সে | পা খি,

১ ৫২ পৃষ্ঠায় পাদটীকা ১ দ্রষ্টব্য।

১ ২   ১ ২   ১ ২   ১ ২
নি জের | ক থাই | কুন্ জ | ব নের

১ ২   ১ ২   ১ ২
সব ক | থা দেয় | ঢা কি।

সেই সুতোর মাপে এর সংস্কৃত সংস্করণকে মাপা যাক

১ ২   ১ ২   ১ ২   ১ ২
ক থা | ক হ | ক থা | ক হ

১ ২   ১ ২   ১ ২
পা খি | য ত | ডা কে,

১ ২   ১ ২   ১ ২   ১ ২
নি জ | ক থা | কা ন | নে র

১ ২   ১ ২   ১ ২
স ব | ক থা | ঢা কে

সুতোর মাপে সমান। কিন্তু কান কি সেই মাপে আঙুল গুনে ছন্দের পরিচয় নেয়। ছন্দ যে ভঙ্গি নিয়ে, বস্তুর পরিমাপ নিয়ে নয়।

তোমার সঙ্গে আমার মিলন
বাধল কাছেই এসে।
তাকিয়ে ছিলেম আসন মেলে,
অনেক দূর যে পেরিয়ে এলে,
আঙিনাতে বাড়িয়ে চরণ
ফিরলে কঠিন হেসে।
তীরের হাওয়ায় তরী উধাও
পারের নিরুদ্দেশে॥

এরই সংস্কৃত রূপান্তর দেওয়া যাক।

তোমা সনে মোর প্রেম
বাধে কাছে এসে।

চেয়েছিনু আঁখি মেলে,
বহুদূর হতে এলে,
আঙিনাতে পা বাড়িয়ে
ফিরে গেলে হেসে।
তীর-বায়ে তরী গেল
ওপারের দেশে॥

মাপে মিলল, কিন্তু লয়ে মিলেছে কি? সমুদ্র যখন স্থির থাকে আর সমুদ্র যখন ঢেউ খেলিয়ে ওঠে তখন তার দৈর্ঘ্যপ্রস্থ সমান থাকে, কিন্তু তার ভঙ্গির বৈচিত্র্য ঘটে। এই ভঙ্গি নিয়েই ছন্দ। বিধাতা সেই ভঙ্গির দিকে তাকিয়েই মৃদঙ্গ বাজান, বোল বদলিয়ে দেন, তাই মনের মধ্যে ভিন্ন রকমের আঘাত লাগে।

আমি অন্যত্র[১] বলেছি, প্রাকৃত-বাংলার ছন্দে যতিবিভাগ সকল সময় ঠিক কাটাকাটা সমান ভাগে নয়। পাঠক এক জায়গায় মাত্রা হরণ করে আরেক জায়গায় ওজন রেখে তা পূরণ করে দিলে নালিশ চলে না। এইজন্যে একই কবিতা পাঠক আপন রুচি-অনুসারে কিছুপরিমাণে ভিন্ন-রকম করে পড়তে পারেন।

রূপসাগরে ডুব দিয়েছি
অরূপ রতন আশা করি।
ঘাটে ঘাটে ফিরব না আর
ভাসিয়ে আমার জীর্ণ তরী॥

এই কবিতাটি আমি পড়ি 'রূপ' এবং 'ডুব' এবং 'অরূপ' শব্দের ধ্বনিকে দীর্ঘ করে। অর্থাৎ ঐ উকারগুলোর ওজন হয় দুইমাত্রার কিছু বেশি। তখন তারই পূরণস্বরূপে 'ডুব দিয়েছি'র পরে যতিকে থামতে দেওয়া যায় না। অপরপক্ষে 'ঘাটে ঘাটে' শব্দে মাত্রাহ্রাসের ত্রুটি পূরণ করবার

১ পৃ ৭৩-৭৪ দ্রষ্টব্য।

বরাত দেওয়া যায় 'ফিরব না' শব্দের উপর। নইলে লিখতে হত 'সাতঘাটে আর ফিরব না ভাই'।

সংস্কৃত-বাংলা ও প্রাকৃত বাংলার ছন্দে লয়ের যে ভেদ কানে লাগে তার কারণ সংস্কৃত-বাংলায় অনেক স্থলেই যে-শব্দের মাপ দুইয়ের তার ওজনও দুইয়ের। যেমন—

১	২	১	২
তো	মা	স	নে

কিন্তু প্রাকৃত-বাংলায় প্রায়ই সে স্থলে মাপ দুইয়ের হলেও ওজন তিনের। যেমন—

১	২	১	২
তো	মার	সঙ্	গে।

এতে করে তিনঘেঁষা ছন্দের প্রকৃতি বদলে যায়। 'রূপসাগরে' গানটির পরিবর্তে লেখা যেতে পারত

> রূপরসে ডুব দিনু অরূপের আশা করি।
> ঘাটে ঘাটে ফিরব না বেয়ে মোর ভাঙা তরী॥

যদি কেউ বলেন দুটোর একই ছন্দ তাহলে এইটুকু বলে চুপ করব যে, আমার সঙ্গে মতে মিলল না। কেননা আমি ছন্দ গুনিনে, আমি ছন্দ শুনি।

পরিচয়—১৩৩৯ শ্রাবণ

ছন্দের মাত্রা

১

বহুকাল পূর্বে একটি গান রচনা করেছিলেম। 'সবুজপত্রে' সেটি উদ্ধৃত হয়েছিল।[১]

আঁধার রজনী পোহাল,
জগৎ পুরিল পুলকে,
বিমল প্রভাত-কিরণে
মিলিল দ্যুলোক ভূলোকে।

তাছাড়া এই ছন্দে পরবর্তী কালে দুই-একটি শ্লোক লিখেছিলুম। যথা—

গোড়াতেই ঢাক বাজনা,
কাজ করা তার কাজ না।

আরেকটি—

শকতিহীনের দাপনি
আপনারে মারে আপনি।

বলা বাহুল্য এগুলি নয় মাত্রার চালে লেখা।

'সবুজপত্রে'র প্রবন্ধে তার পরে দেখিয়েছিলুম ধ্বনিসংখ্যার কতরকম হেরফের করে এই ছন্দের বৈচিত্র্য ঘটতে পারে, অর্থাৎ তার চলন কত ভঙ্গির হয়। তাতে যে-দৃষ্টান্ত রচনা করেছিলেম তার পুনরুক্তি না করে নতুন বাণী প্রয়োগ করা যাক।

এইখানে বলে রাখা ভালো এই প্রবন্ধে ব্যবহৃত উদাহরণগুলিতে প্রত্যেক ভাগে তাল দিলে ছন্দের পার্থক্য ধরা সহজ হয়।

১ ২৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। গানটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১২৯২ সালে 'রবিচ্ছায়া' গ্রন্থে।

২ ২৩-২৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

উপরের ছন্দে ৩+৩+৩-এর লয়। নিচের ছন্দে ৩+২+৪-এর লয়।

আসন | দিলে | অনাহুতে
ভাষণ | দিলে | বীণাতানে,
বুঝি গো | তুমি | মেঘদূতে
পাঠায়ে | ছিলে | মোর পানে।
বাদল রাতি এল যবে
বসিয়াছিনু একা-একা,
গভীর গুরু-গুরু রবে
কী ছবি মনে দিল দেখা।
পথের কথা পুবে হাওয়া
কহিল মোরে থেকে থেকে ;
উদাস হয়ে চলে-যাওয়া,
খ্যাপামি সেই রোধিবে কে।
আমার তুমি অচেনা যে,
সে কথা নাহি মানে হিয়া,
তোমারে কবে মনোমাঝে
জেনেছি আমি না জানিয়া।
ফুলের ডালি কোলে দিনু,
বসিয়াছিলে একাকিনী,
তখনি ডেকে বলেছিনু,
তোমার চিনি, ওগো চিনি।

তার পরে ৪+৩+২ :

বলেছিনু | বসিতে | কাছে,
দেবে কিছু | ছিল না | আশা,
দেব বলে | যেজন | যাচে
বুঝিলে না | তাহারো | ভাষা।

শুকতারা চাঁদের সাথী
বলে, "প্রভু, বেসেছি ভালো,
নিয়ে যেয়ো আমার বাতি
যেথা যাবে তোমার আলো।"
ফুল বলে, "দখিন হাওয়া,
বাঁধিব না বাহুর ডোরে,
ক্ষণতরে তোমারে পাওয়া
চিরতরে দেওয়া যে মোরে॥"

তার পরে ৩+৬ :

বিজুলি | কোথা হতে এলে,
তোমারে | কে রাখিবে বেঁধে।
মেঘের | বুক চিরি গেলে
অভাগা | মরে কেঁদে কেঁদে।
আগুনে গাঁথা মণিহারে
ক্ষণেক সাজায়েছ যারে,
প্রভাতে মরে হাহাকারে
বিফল রজনীর খেদে।

দেখা যাক ৪+৫ :

মোর বনে | ওগো গরবী,
এলে যদি | পথ ভুলিয়া,
তবে মোর | রাঙা করবী
নিজ হাতে | নিয়ো তুলিয়া।

আরেকটা :

জলে ভরা | নয়নপাতে
বাজিতেছে | মেঘরাগিণী,
কী লাগিয়া | বিজনরাতে
উড়ে হিয়া, | হে বিবাগিনী।

ম্লানমুখে | মিলাল হাসি
গলে দোলে | নবমালিকা ।
ধরাতলে | কী ভুলে আসি
সুর ভোলে | সুরবালিকা ॥

তার পরে ৪+৪+১। বলে রাখা ভালো এই ছন্দটি পড়বার সময় সবশেষ ধ্বনিটিকে বিচ্ছিন্ন করতে হবে।

বারে বারে | যায় চলি- | য়া,
ভাসায় ন- | য়ননীরে | সে,
বিরহের | ছলে ছলি- | য়া
মিলনের | লাগি ফিরে | সে।
যায় নয়নের আড়া-লে,
আসে হৃদয়ের মাঝে গো।
বাঁশিটিরে পায়ে মাড়া-লে
বুকে তার সুর বাজে গো।
ফুলমালা গেল শুকা-য়ে,
দীপ নিবে গেল বাতা-সে,
মোর ব্যথাখানি লুকা-য়ে
মনে তার রহে গাঁথা সে।
যাবার বেলায় দুয়া-রে
তালা ভেঙে নেয় ছিনি-য়ে,
ফিরিবার পথ উহা-রে
ভাঙা দ্বার দেয় চিনি-য়ে ॥

৩+২+৪-এর লয় পূর্বে দেখানো হয়েছে। ৫+৪-এর লয় এখানে দেওয়া গেল।

আলো এল যে | দ্বারে তব
ওগো মাধবী | বনছায়া।
দোঁহে মিলিয়া | নবনব
তৃণে বিছায়ে | গাঁথ মায়া ॥

চাঁপা, তোমার আঙিনাতে
ফেরে বাতাস কাছে কাছে ;
আজি ফাগুনে একসাথে
দোলা লাগিয়ো নাচে নাচে ।
বধূ, তোমার দেহলিতে
বর আসিছে দেখিছ কি ।
আজি তাহার বাঁশরিতে
হিয়া মিলায়ে দিয়ো সখি ॥

৬+৩-এর ঠাটেও নয় মাত্রাকে সাজানো চলে । যেমন—

সেতারের তারে | ধানশী
মিড়ে মিড়ে উঠে | বাজিয়া ।
গোধূলির রাগে | মানসী
সুরে যেন এল | সাজিয়া ॥

আরেকটা :

তৃতীয়ার চাঁদ | বাঁকা সে,
আপনারে দেখে | ফাঁকা সে ।
তারাদের পানে | তাকিয়ে
কার নাম যায় | ডাকিয়ে
সাথী নাহি পায় | আকাশে ।

এতক্ষণ এই যে নয় মাত্রার ছন্দটাকে নিয়ে নয়-ছয় করছিলুম সেটা বাহাদুরি করবার জন্যে নয়, প্রমাণ করবার জন্যে যে এতে বিশেষ বাহাদুরি নেই । ইংরেজি ছন্দে একসেন্‌টের প্রভাব ; সংস্কৃত ছন্দে দীর্ঘ-হ্রস্বের সুনির্দিষ্ট ভাগ । বাংলায় তা নেই, এইজন্যে লয়ের দাবিরক্ষা ছাড়া বাংলা ছন্দে মাত্রা বাড়িয়ে-কমিয়ে চলার আর কোনো বাধা নেই । 'জল পড়ে পাতা নড়ে' থেকে আরম্ভ করে পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ মাত্রা পর্যন্ত বাংলা ছন্দে আমরা দেখি । এই সুযোগে কেউ বলতে পারেন

এগার মাত্রার ছন্দ বানিয়ে নতুন কীর্তি স্থাপন করব। আমি বলি তা কর কিন্তু পুলকিত হোয়ো না, কেননা কাজটা নিতান্তই সহজ। দশ মাত্রার পরে আর একটা মাত্রা যোগ করা একেবারেই দুঃসাধ্য ব্যাপার নয়। যেমন—

চামেলির ঘনছায়া-বিতানে
বনবীণা বেজে ওঠে কী তানে।
স্বপনে মগন সেথা মালিনী
কুসুমমালায় গাঁথা শিথানে॥

অন্যরকমের মাত্রাভাগ করতে চাও সেও কঠিন নয়। যেমন—

মিলন-সুলগনে | কেন বল্
নয়ন করে তোর | ছল্‌ছল্।
বিদায়দিনে যবে | ফাটে বুক,
সেদিনো দেখেছি তো | হাসিমুখ।

তারপরে তের মাত্রার প্রস্তাবটা শুনতে লাগে খাপছাড়া এবং নতুন, কিন্তু পয়ার থেকে একমাত্রা হরণ করতে দুঃসাহসের দরকার হয় না। সে কাজ অনেকবার করেছি, তা নিয়ে নালিশ ওঠেনি। যথা—

গগনে গরজে মেঘ ঘন বরষা।

এক মাত্রা যোগ করে পয়ারের জাতিবৃদ্ধি করাও খুবই সহজ। যথা—

হে বীর, জীবন দিয়ে মরণেরে জিনিলে,
নিজেরে নিঃস্ব করি বিশ্বেরে কিনিলে।

ষোল মাত্রার ছন্দ দুর্লভ নয়। অতএব দেখা যাক সতর মাত্রা :

নদীতীরে দুই | কূলে কূলে |
কাশবন দুলি- | ছে।
পূর্ণিমা তারি | ফুলে ফুলে |
আপনারে ভুলি- | ছে।

আঠার মাত্রার ছন্দ সুপরিচিত। তার পরে উনিশ :

ঘন মেঘভার গগনতলে,
বনে বনে ছায়া তারি,
একাকিনী বসি নয়নজলে
কোন্ বিরহিনী নারী ॥

তারপরে কুড়ি মাত্রার ছন্দ সুপ্রচলিত। একুশ মাত্রা। যথা—

বিচলিত কেন মাধবীশাখা,
মঞ্জরি কাঁপে থরথর।
কোন্ কথা তার পাতায় ঢাকা
চুপি চুপি করে মরমর ॥

তারপরে,—আর কাজ নেই। বোধ হয় যথেষ্ট প্রমাণ করতে পেরেছি যে, বাংলায় নতুন ছন্দ তৈরি করতে অসাধারণ নৈপুণ্যের দরকার করে না।

সংস্কৃত ভাষায় নূতন ছন্দ বানানো সহজ নয়, পুরানো ছন্দ রক্ষা করাও কঠিন। যথানিয়মে দীর্ঘহ্রস্ব স্বরের পর্যায় বেঁধে তার সংগীত। বাংলায় সেই দীর্ঘধ্বনিগুলিকে দুইমাত্রায় বিশ্লিষ্ট করে একটা ছন্দ দাঁড় করানো যেতে পারে, কিন্তু তার মধ্যে মূলের মর্যাদা থাকবে না। মন্দাক্রান্তার[১] বাংলা রূপান্তর দেখলেই তা বোঝা যাবে।

যক্ষ সে কোনো জনা আছিল আনমনা, সেবার অপরাধে প্রভুশাপে
হয়েছে বিলয়গত মহিমা ছিল যত, বরষকাল যাপে দুখতাপে।
নির্জন রামগিরি-শিখরে মরে ফিরি একাকী দূরবাসী প্রিয়াহারা
যেথায় শীতল ছায় ঝরনা বহি যায় সীতার স্নানপূত জলধারা।
মাস পরে কাটে মাস, প্রবাসে করে বাস প্রেয়সী-বিচ্ছেদে বিমলিন;
কনকবলয়-খসা বাহুর ক্ষীণদশা, বিরহদুখে হল বলহীন।
একদা আষাঢ় মাসে প্রথম দিন আসে, যক্ষ নিরখিল গিরিপর
ঘনঘোর মেঘ এসে লেগেছে সানুদেশে, দন্ত হানে যেন করিবর ॥

পরিচয়—১৩৩৯ কার্তিক

১ ৪৬-৪৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

২

উপরের প্রবন্ধে লিখেছি 'আঁধার রজনী পোহাল' গানটি নয়মাত্রার ছন্দে রচিত। ছন্দতত্ত্বে প্রবীণ অমূল্যবাবু ওর নয়-মাত্রিকতার দাবি একেবারে নামঞ্জুর করে দিলেন।[১] আর কারো হাত থেকে এ রায় এলে তাকে আপিল করবার যোগ্য বলেও গণ্য করতুম না, এ-ক্ষেত্রে ধাঁধা লাগিয়ে দিলে। রাস্তার লোক এসে যদি আমাকে বলে তোমার হাতে পাঁচটা আঙুল নেই তাহলে মনে উদ্‌বেগের কোনো কারণ ঘটে না। কিন্তু শারীরতত্ত্ববিদ্ এসে যদি এই সংবাদটা জানিয়ে যান তাহলে দশবার করে নিজের আঙুল গুনে দেখি, মনে ভয় হয় অঙ্ক বুঝি ভুলে গেছি। অবশেষে নিতান্ত হতাশ হয়ে স্থির করি, যে-কটাকে এতদিন আঙুল বলে নিশ্চিন্ত ছিলুম বৈজ্ঞানিক মতে তার সব-কটা আঙুলই নয়; হয়তো শাস্ত্রবিচারে জানা যাবে যে, আমার আঙুল আছে মাত্র তিনটি, বাকি দুটো বুড়ো আঙুল আর কড়ে আঙুল, তারা হরিজনশ্রেণীয়।

বর্তমান তর্কে আমার মনে সেইরকম উদ্‌বেগ জন্মেছে। 'আঁধার রজনী পোহাল' চরণের মাত্রাসংখ্যা যেদিক্ থেকে যেমন করে গনে দেখি নয়মাত্রায় গিয়ে ঠেকে। অমূল্যবাবু বললেন এটা তো নয়মাত্রার ছন্দ নয়ই, বাংলাভাষায় আজো নয়মাত্রার উদ্ভব হয়নি, হয়তো নিরবধিকালে কোনো এক সময়ে হতেও পারে। তিনি বলেন বাংলা ছন্দ দশমাত্রাকে মেনেছে, নয়মাত্রাকে মানেনি। এ-কথায় আরো আমার ধাঁধা লাগল।

অমূল্যবাবু পরীক্ষা করে বলছেন এ ছন্দে জোড়ের চিহ্ন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, 'আঁধার রজনী' পর্যন্ত এক পর্ব, এইখানে একটা ফাঁক, তারপরে

১ অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়—নয় মাত্রার ছন্দ: পরিচয়, ১৩৪০ কার্তিক।

'পোহাল' শব্দে তিনমাত্রার একটা পঙ্গু পর্বাঙ্গ, তার পরে পুরো যতি। অর্থাৎ এ-ছন্দে ছয়মাত্রারই প্রাধান্য। এর ধড়টা ছয়মাত্রার, ল্যাজটা তিনমাত্রার। চোখ দিয়ে এক পংক্তিতে নয়মাত্রা দেখা যাচ্ছে বটে, কিন্তু অমূল্যবাবুর মতে কান দিয়ে দেখলে ওর দুটো অসমান ভাগ বেরিয়ে পড়ে।

এর থেকে বোঝা যাচ্ছে আমার অঙ্কবিদ্যায় আমি যে-সংখ্যাকে 'নয়' বলি অমূল্যবাবুর অঙ্কশাস্ত্রেও তাকেই 'নয়' বলে বটে, কিন্তু ছন্দের মাত্রানির্ণয় সম্বন্ধে তাঁর পদ্ধতির সঙ্গে আমার পদ্ধতির মূলেই প্রভেদ আছে। কথাটা পরিষ্কার করে নেওয়া ভালো।

পৃথিবী চলছে, তার একটা ছন্দ আছে। অর্থাৎ তার গতিকে মাত্রাসংখ্যায় ভাগ করা যায়। এই ছন্দের পূর্ণায়তনকে নির্ণয় করব কোন্ লক্ষণ মতে। পৃথিবী নিয়মিতকালে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। আমাদের পঞ্জিকা-অনুসারে পয়লা বৈশাখ থেকে আরম্ভ করে চৈত্রসংক্রান্তিতে তার আবর্তনের এক পর্যায় শেষ হয়, তার পরে আবার সেই পরিমিতকালে পয়লা বৈশাখ থেকে পুনর্বার তার আবর্তন শুরু হয়। এই পুনরাবর্তনের দিকে লক্ষ্য করে আমরা বলতে পারি পৃথিবীর সূর্যপ্রদক্ষিণের মাত্রাসংখ্যা ৩৬৫ দিন।

> মহাভারতের কথা অমৃতসমান
> কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান্।

এই ছন্দের মাত্রাপথে পুনরাবর্তন আরম্ভ হয়েছে কোথায় সে তো জানা কথা। সেই অনুসারে সর্বজনে বলে থাকে এর মাত্রাসংখ্যা চোদ্দ। বলা বাহুল্য এই চোদ্দমাত্রা একটা অখণ্ড নিরেট পদার্থ নয়। এর মধ্যে জোড় দেখা যায়, সেই জোড় আটমাত্রার অবসানে, অর্থাৎ 'মহাভারতের কথা' একটুখানি দাঁড়িয়েছে যেখানে এসে। পয়ারে এই দাঁড়াবার আড্ডা

দু-জায়গায়, প্রথম আট ধ্বনিমাত্রার পরে ও শেষার্ধের ছয় ধ্বনিমাত্রা ও দুই যতিমাত্রার শেষে। পৃথিবীর প্রদক্ষিণ-ছন্দের মধ্যেও দুইভাগ আছে, উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন। যতিসমেত ষোলমাত্রা পয়ারেও তেমনি আছে উত্তরভাগ ও দক্ষিণভাগ, কিন্তু সেই দুটিভাগ সমগ্রেরই অন্তর্গত।

মহাভারতের বাণী
অমৃতসমান মানি,
কাশীরাম দাস ভনে
শোনে তাহা সর্বজনে।

যদিও পয়ারের সঙ্গে এর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ তবু একে অন্য ছন্দ বলব, কারণ এর পুনরাবর্তন আটমাত্রায়, ষোলমাত্রায় নয়।

আঁধার রজনী পোহাল,
জগৎ পুরিল পুলকে।

এই ছন্দের আবর্তন ছয়মাত্রার পর্যায়ে ঘটে না, তার কক্ষপথ সম্পূর্ণ হয়েছে নয়মাত্রায়। নয়মাত্রায় তার প্রদক্ষিণ নিজেকে বারে বারে বহুগুণিত করছে। এই নয়মাত্রায় মাঝে মাঝে সমভাগে জোড়ের বিচ্ছেদ আছে। সেই জোড় ছয় মাত্রায় না, তিন মাত্রায়।

এই ছন্দের লক্ষণ কী। প্রশ্নের উত্তর এই যে, এর পূর্ণভাগ নয়মাত্রা নিয়ে, আংশিক ভাগ তিন, এবং সেই প্রত্যেক ভাগের মাত্রাসংখ্যা তিন। কোনো পাঠক যদি ছয়মাত্রার পরে এসে হাঁফ ছাড়েন, তাঁকে বাধা দেবার কোনো দণ্ডবিধি নেই ; সুতরাং সেটা তিনি নিজের স্বচ্ছন্দেই করবেন, আমার ছন্দে করবেন না। আমার ছন্দের লক্ষণ এই— প্রত্যেক পদে তিন কলা[১], প্রত্যেক কলায় তিনমাত্রা, অতএব সমগ্র পদের মাত্রাসমষ্টি নয়। অমূল্যবাবু এটিকে নিয়ে যে ছন্দ

১ 'উপপর্ব' অর্থে ব্যবহৃত। সংস্কৃত ও প্রাকৃত ছন্দশাস্ত্রমতে 'কলা' শব্দের মানে 'মাত্রা', অর্থাৎ 'কলা' ও 'মাত্রা' একই অর্থে ব্যবহৃত হয়।

জানিয়েছেন তার প্রত্যেক পদে দুই কলা। প্রথম কলার মাত্রাসংখ্যা ছয়, দ্বিতীয় কলার তিন, অতএব সমগ্র পদের মাত্রাসমষ্টি নয়। দুটি ছন্দেরই মোট আয়তন একই হবে, কানে শোনাবে ভিন্নরকম।

ছান্দসিক যাই বলুন এখানে ছন্দরচয়িতা হিসাবে আমার আবেদন আছে। ছন্দের তত্ত্ব সম্বন্ধে আমি যা বলি সেটা আমার অশিক্ষিত বলা, সুতরাং তাতে দোষ স্পর্শ করতে পারে; কিন্তু ছন্দের রস সম্বন্ধে আমি যদি কিছু আলোচনা করি, সংকোচ করব না, কেননা ছন্দসৃষ্টিতে অশিক্ষিতপটুত্বের মূল্য উপেক্ষা করবার নয়। 'আঁধার রজনী পোহাল' রচনাকালে আমার কান যে আনন্দ পেয়েছিল সেটা অন্যছন্দোজনিত আনন্দ থেকে বিশেষভাবে স্বতন্ত্র। কারণটা বলি।

অন্যত্র বলেছি দুই মাত্রায় স্থৈর্য আছে, কিন্তু বেজোড় বলেই তিনমাত্রা অস্থির।[১] ত্রৈমাত্রিক ছন্দে সেই অস্থিরতার বেগটাকে বিশেষভাবে ব্যবহার করা হয়।

বিংশতি কোটি মানবের বাস
এ ভারতভূমি যবনের দাস
রয়েছে পড়িয়া শৃঙ্খলে বাঁধা।

এ-ছন্দে শব্দগুলি পরস্পরকে অস্থিরভাবে ঠেলা দিচ্ছে। একে জোড়মাত্রার ছন্দে রূপান্তরিত করা যাক।

যেথায় বিংশতি কোটি মানবের বাস
সেই তো ভারতবর্ষ যবনের দাস
শৃঙ্খলেতে বাঁধা পড়ে আছে।

এর চালটা শান্ত। [কবিতায় ত্রৈমাত্রিক ছন্দে সাধারণত অশান্ত বেজোড় মাত্রার দৌড়কে পরিণামে জোড়মাত্রার সীমায় লাগাম টেনে সংযত করা হয়। প্রায়ই সংগীতের একতালাজাতীয় তালের নিয়মে

১ ৩৯-৪০, ৪৩-৪৪, ৭১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

বারমাত্রায় তার চরমগতি, সেই তীর্থে এসে তবে সে খাড়া হয়ে থাকে। ঐ 'বার' সংখ্যাটা যেন বরের ঘরের পিসি কনের ঘরের মাসি, দুইয়ের সঙ্গেও তার যেমন কুটুম্বিতা তিনের সঙ্গেও তেমনি। তাই তিনমাত্রার ঝোঁকটা বারমাত্রায় এসে ঠাণ্ডা হবার সুযোগ পায়। 'বিংশতি কোটি মানবের বাস' পদটি বারমাত্রায় স্থির হয়েছে।]

আলোচ্য নয়মাত্রার ছন্দে 'তিন' সংখ্যার অস্থিরতা শেষপর্যন্তই রয়ে গেছে। সেটা উচিত নয়, ছয়মাত্রার পরে থামবার একটুখানি অবকাশ দেওয়া ভালো, এমন তর্ক তোলা যেতে পারে। কিন্তু ছন্দের সিদ্ধান্ত তর্কে হয় না, ওটার মীমাংসা কানে। সৌভাগ্যক্রমে এ-সভায় সুযোগ পেয়েছি কানের দরবারে আরজি পেশ করবার। নয়মাত্রার চঞ্চল ভঙ্গিতে কান সায় দিচ্ছে না, এ-কথা যদি সুধীজন বলেন তাহলে অগত্যা চুপ করে যাব, কিন্তু তবুও নিজের কানের স্বীকৃতিকে অশ্রদ্ধা করতে পারব না।

'আঁধার রজনী পোহাল' কবিতাটি গানরূপে রচিত। সংগীতাচার্য ভীমরাও শাস্ত্রী[১] মৃদঙ্গের বোলে একে যে তালের রূপ দিয়েছিলেন তাতে দুটি আঘাত এবং একটি ফাঁক। যথা—

১ ২ •
আঁধার | রজনী | পোহাল।

এ কথা সকলেরই জানা আছে যে, ফাঁকটা তালের শেষ ঝোঁক, তারপরে পুনরাবর্তন। এই গানের স্বাভাবিক ঝোঁক প্রত্যেক তিনমাত্রায় এবং এর তালের অর্থাৎ ছন্দের সম্পূর্ণতা তিনমাত্রাঘটিত তিন ভাগে। অমূল্যবাবু বা শৈলেন্দ্রবাবু[২] যদি অন্য কোনো রকমের ভাগ ইচ্ছা করেন

১ বিশ্বভারতীর ভূতপূর্ব সংগীতশিক্ষক।

২ শৈলেন্দ্রকুমার মল্লিক। তাঁর 'ছন্দরূপ' প্রবন্ধ (বিচিত্রা, ১৩৩৯ শ্রাবণ) দ্রষ্টব্য।

তবে রচয়িতার ইচ্ছার সঙ্গে তার ঐক্য হবে না, এর বেশি আমার আর কিছু বলবার নাই।

উত্তর দিগন্ত ব্যাপি দেবতাত্মা হিমাদ্রি বিরাজে,
দুই প্রান্তে দুই সিন্ধু, মানদণ্ড যেন তারি মাঝে।

এই ছন্দকে আঠারমাত্রা যখন বলি তখন সমগ্র পদের মাত্রাসংখ্যা গণনা করেই বলে থাকি। আট মাত্রার পরে এর একটা সুস্পষ্ট বিরাম আছে বলেই এর আঠার মাত্রার সীমানার বিরুদ্ধে নালিশ চলে না।

আমাদের হাতে তিন পর্ব আছে। মণিবন্ধ পর্যন্ত এক, এটি ছোটো পর্ব, কনুই পর্যন্ত দুই, কনুই থেকে কাঁধ পর্যন্ত তিন; যাকে আমরা সমগ্র বাহু বলি সে এই তিনি পর্ব মিলিয়ে। আমাদের দেহে এক বাহু অন্য বাহুর অবিকল পুনরাবৃত্তি। প্রত্যেক ছন্দেরই এমনিতরো একটি সম্পূর্ণ রূপকল্প অর্থাৎ প্যাটার্ন্ আছে। ছন্দোবদ্ধ কাব্যে সেই প্যাটার্ন্‌কেই পুনঃপুনিত করে। সেই প্যাটার্নের সম্পূর্ণ সীমার মধ্যেই তার নানা পর্ব পর্বাঙ্গ প্রভৃতি যা-কিছু। সেই সমগ্র প্যাটার্নের মাত্রাই সেই ছন্দের মাত্রা। 'আঁধার রজনী পোহাল' গানটিকে এইজন্যেই নয়মাত্রার বলেছি। যেহেতু প্রত্যেক নয়মাত্রাকে নিয়েই তার পুনঃপুনঃ আবর্তন।

কোন্ ছত্র কী রকম ভাগ করে পড়তে হবে, এ নিয়ে মতান্তর হওয়া অসম্ভব নয়। পুরাতন ছন্দগুলির নাম অনুসারে সংজ্ঞা আছে। নতুন ছন্দের নামকরণ হয়নি। এইজন্যে তার আবৃত্তির কোনো নিশ্চিত নির্দেশ নেই। কবির কল্পনা এবং পাঠকের রুচিতে যদি অনৈক্য হয় তবে কোনো আইন নেই যা নিয়ে নালিশ চলতে পারে। বর্তমান প্রসঙ্গে আমার বক্তব্য এই যে, আমি যখন স্পষ্টতই আমার কোনো কাব্যের ছন্দকে নয়মাত্রার বলছি তখন সেটা অনুসরণ করাই বিহিত। হতে পারে তাতে কানের তৃপ্তি হবে না। না যদি হয় তবে সে দায় কবির।

কবিকে নিন্দা করবার অধিকার সকলেরই আছে, তার রচনাকে সংশোধন করবার অধিকার কারো নেই।

এই উপলক্ষ্যে একটা গল্প মনে পড়ছে। গল্পটা বানানো নয়। পার্লামেন্টে দর্শকদের বসবার আসনে দুটি শ্রেণীভাগ আছে। সম্মুখভাগের আসনে বসেন যাঁরা খ্যাতনামা, পশ্চাতের ভাগে বসেন অপর-সাধারণ। দুই বিভাগের মাঝখানে কেবল একটিমাত্র দড়ি বাঁধা। একজন ভারতীয় দর্শক সেই সামনের দিক্ নির্দেশ করে প্রহরীকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "Can I go over there?" প্রহরী উত্তর করেছিল, "Yes, sir, you *can*, but you *mayn't*।" ছন্দেও যতিবিভাগ সম্বন্ধে কোনো কোনো ক্ষেত্রে canএর নিষেধ বলবান্ নয়, কিন্তু তবু mayর নিষেধ স্বীকার্য। একটা দৃষ্টান্ত দেখা যাক। পাঠকমহলে স্বনামখ্যাত পয়ার ছন্দের একটা পাকা পরিচয় আছে, এইজন্যে তার পদে কোথায় আধা যতি কোথায় পুরো যতি তা নিয়ে বচসার আশঙ্কা নেই। নিম্নলিখিত কবিতার চেহারা অবিকল পয়ারের। সেই চোখের দলিলের জোরে তার সঙ্গে পয়ারের চালে ব্যবহার অবৈধ হয় না।

মাথা তুলে তুমি যবে চল তব রথে
তাকাও না কোথা আমি ফিরি পথে পথে,
    অবসাদজাল মোরে ঘেরে পায় পায়।
মনে পড়ে এই হাতে নিয়েছিলে সেবা,
তবু হায় আজ মোরে চিনিবে সে কেবা,
    তোমারি চাকার ধুলা মোরে ঢেকে যায়॥

কিন্তু যদি পয়ার নাম বদলিয়ে এর নাম দেওয়া যায় 'ষড়ঙ্গী' এবং এর যথোচিত সংজ্ঞা নির্দেশ করি তাহলে বিনা প্রতিবাদে নিম্নলিখিত ভাগেই একে পড়া উচিত হবে।

মাথা তুলে তুমি
    যবে চল তব
        রথে

তাকাও না কোথা
আমি ফিরি পথে
পথে,
অবসাদজাল
ঘেরে মোরে পায়
পায়।
মনে পড়ে এই
হাতে নিয়েছিলে
সেবা,
তবু হায় আজ
মোরে চিনিবে সে
কেবা,
তোমারি চাকার
ধুলা মোরে ঢেকে
যায়॥

এর প্রত্যেক পদে চোদ্দ মাত্রা, তিন কলা, সেই কলার মাত্রাসংখ্যা যথাক্রমে ছয় ছয় দুই।

অমূল্যবাবুর মতে বাংলায় নয়মাত্রার ছন্দ নেই, আছে দশমাত্রার, কিন্তু দশমাত্রার উর্ধ্বে আর ছন্দ চলে না। আমি অনেক চিন্তা করেও তাঁর এই মতের তাৎপর্য বুঝতে পারিনি। একাদিক্রমে মাত্রাগণনা গণিতশাস্ত্রের সবচেয়ে সহজ কাজ, তাতেও যদি তিনি বাধা দেন তাহলে বুঝতে হবে তাঁর মতে গণনার বাইরে আরো কিছু গণ্য করবার আছে। হয়তো মোট মাত্রার ভাগগুলো নিয়ে তর্ক। ভাগ সকল ছন্দেই আছে। দশমাত্রার ছন্দ। যথা—

প্রাণে মোর আছে তার বাণী,
তার বেশি তারে নাহি জানি।

এর সহজ ভাগ এই—

প্রাণে মোর
আছে তার
বাণী।

একে অন্যরকমেও ভাগ করা চলে। যথা—

প্রাণে মোর আছে
তার বাণী।

অথবা 'প্রাণে' শব্দটাকে একটু আড় করে রেখে—

প্রাণে মোর আছে তার
বাণী।

এই তিনটেই দশমাত্রার ছন্দের ভিন্ন ভিন্ন রূপ। তাহলেই দেখা যাচ্ছে ছন্দকে চিনতে হলে প্রথম দেখা চাই তার পদের মোট মাত্রা, তারপরে তার কলাসংখ্যা, তারপরে প্রত্যেক কলার মাত্রা।

১ ২ ৩ ৪
সকল বেলা | কাটিয়া গেল | বিকাল নাহি | যায়

এই ছন্দের প্রত্যেক পদে সতর মাত্রা। এর চার কলা। অন্ত্য কলাটিতে দুই ও অন্য তিনটি কলায় পাঁচ পাঁচ মাত্রা। এই সতর মাত্রা বজায় রেখে অন্যজাতীয় ছন্দ রচনা চলে কলাবৈচিত্র্যের দ্বারা। যথা—

১ ২ ৩
মন চায় | চলে আসে | কাছে,
৪ ৫
তবুও পা | চলে না।
বলিবার | কত কথা | আছে,
তবু কথা | বলে না॥

এ-ছন্দে পদের মাত্রা সতর, কলার সংখ্যা পাঁচ, তার মাত্রাসংখ্যা যথাক্রমে ৪।৪।২।৪।৩। আঠারমাত্রার দীর্ঘপয়ারে প্রথম আট মাত্রার পরে যেমন স্পষ্ট যতি আছে, এই ছন্দের প্রথম দশ মাত্রার পরে তেমনি।

নয়নে । নিঠুর । চাহনি ।
হৃদয়ে । করুণা । ঢাকা ।
গভীর । প্রেমের । কাহিনী ।
গোপন । করিয়া । রাখা ॥

এরও পদের মাত্রা সতর, কলার সংখ্যা ছয়, শেষ কলাটি ছাড়া প্রত্যেক কলার মাত্রা তিন।

১ ২ ৩ ৪
অন্তর তার । কী বলিতে চায় । চঞ্চল চর- । ণে
কণ্ঠের হার । নয়ন ডুবায় । চম্পক বর- । নে।

এরও সমগ্র পদের মাত্রা সতর। এর চারটি কলা। প্রথম তিনটি কলায় মাত্রাসংখ্যা ছয়, চতুর্থ কলায় এক। সতরমাত্রার ছন্দকে কলাবৈচিত্র্যের দ্বারা আরো নবনব রূপ দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু সাক্ষী আর বাড়াবার দরকার নেই।

শেষের যে দৃষ্টান্ত দেওয়া গেছে তাতে মাত্রাসংখ্যাগণনা উপলক্ষ্যে 'চরণে' শব্দকে ভাগ করে দিয়ে একমাত্রার 'ণে' ধ্বনিকে স্বতন্ত্র কলায় বসিয়েছি। ওটা যে স্বতন্ত্রকলাভুক্ত তার প্রমাণ এই ছন্দের তাল দেবার সময় ঐ 'ণে' ধ্বনিটির উপর তাল পড়ে।

ইতিপূর্বে অন্যত্র একটি নয়মাত্রার ছন্দের দৃষ্টান্ত দেবার সময় নিম্নলিখিত শ্লোকটি ব্যবহার করেছি।[১] তাল দেবার রীতি বদল করে একে দুরকম করে পড়া যায়, দুটোই পৃথক্ ছন্দ।

বারে বারে যায় । চলিয়া
ভাসায় গো আঁখি- । নীরে সে।
বিরহের ছলে । ছলিয়া
মিলনের লাগি । ফিরে সে ॥

১ ৯০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

এটা নয়মাত্রার শ্রেণীর ছন্দ ; এর দুই কলা এবং কলাগুলি ত্রৈমাত্রিক। এর পদকে তিন কলায় ভাগ করে কলাগুলিকে দুই মাত্রার ছাঁদ দিলে এই একই ছড়া সম্পূর্ণ নূতন ছন্দে গিয়ে পৌঁছাবে। যথা—

১ ২ ৩

বারে বারে | যায় চলি- | য়া
ভাসায় গো | আঁখিনীরে | সে।
বিরহের | ছলে ছলি- | য়া
মিলনের | লাগি ফিরে | সে॥
সারাদিন | দহে তিয়া- | ষা,
বারেক না | দেখি উহা- | রে।
অসময়ে | লয়ে কী আ- | শা
অকারণে | আসে দুয়া- | রে॥

অমূল্যবাবু বলেন এর প্রথম দুই কলায় চার চার আট এবং শেষের কলায় একমাত্রার ছন্দ কৃত্রিম শুনতে হয়। বোধ হয় অখণ্ড শব্দকে খণ্ডিত করা হচ্ছে বলে তাঁর কাছে এটা কৃত্রিম ঠেকছে। কিন্তু ছন্দের ঝোঁকে অখণ্ড শব্দকে দুভাগ করার দৃষ্টান্ত অনেক আছে। এরকম তর্কে বিশুদ্ধ হাঁ এবং না-এর দ্বন্দ্ব, কোনো পক্ষে কোনো যুক্তিপ্রয়োগের ফাঁক নেই। আমি বলছি কৃত্রিম শোনায় না, তিনি বলছেন শোনায়। আমি এখনো বলি, এই রকম কলাভাগে এই ছন্দে একটি নূতন নৃত্যভঙ্গি জেগে ওঠে, তার একটা রস আছে।

দশের বেশি মাত্রাভার বাংলা ছন্দ বহন করতে অক্ষম একথা মানতে পারব না। নিম্নে বারমাত্রার একটি শ্লোক দেওয়া গেল।

মেঘ ডাকে গম্ভীর গরজনে
ছায়া নামে তমালের বনে বনে
ঝিল্লি ঝনকে নীপ-বীথিকায়।

সরোবর উচ্ছল কূলে কূলে,
তটে তারি বেণুশাখা দুলে দুলে
মেতে ওঠে বর্ষণ-গীতিকায়॥

শ্রোতারা নিশ্চয় বুঝতে পারছেন আবৃত্তিকালে পদান্তের পূর্বে কোনো যতিই দিইনি, অর্থাৎ বারমাত্রা একটি ঘনিষ্ঠ গুচ্ছের মতোই হয়েছে। এই পদগুলিকে বারমাত্রার পদ বলবার কোনো বাধা আছে বলে আমি কল্পনা করতে পারিনে। উল্লিখিত শ্লোকের ছন্দে বারমাত্রা, প্রত্যেক পদে তিন কলা, প্রত্যেক কলায় চার মাত্রা। বারমাত্রার পদকে চার কলায় বিভক্ত করে ত্রৈমাত্রিক করলে আরেক ছন্দ দেখা দেবে। যথা—

শ্রাবণ-গগন, ঘোর ঘনঘটা,
তাপসী যামিনী এলায়েছে জটা,
দামিনী ঝলকে রহিয়া রহিয়া।

এ ছন্দ বাংলাভাষায় সুপরিচিত।

তমালবনে ঝরিছে বারিধারা,
তড়িৎ ছুটে আঁধারে দিশাহারা।
ছিঁড়িয়া ফেলে কিরণ-কিঙ্কিনী
আত্মঘাতী যেন সে পাগলিনী॥

পঞ্চমাত্রাঘটিত এই বারমাত্রাকেও কেন যে বারমাত্রা বলে স্বীকার করব না, আমি বুঝতেই পারিনে।

কেবল নয়মাত্রার পদ বলার দ্বারা ছন্দের একটা সাধারণ পরিচয় দেওয়া হয়, সে পরিচয় বিশেষভাবে সম্পূর্ণ হয় না। আমার সাধারণ পরিচয় আমি ভারতীয়, বিশেষ পরিচয় আমি বাঙালি, আরও বিশেষ পরিচয় আমি বিশেষ পরিবারের বিশেষ নামধারী মানুষ। নয়মাত্রার পদবিশিষ্ট ছন্দ সাধারণভাবে অনেক হতে পারে।

[মোর বনে ওগো | গরবী
এলে যদি পথ | ভুলিয়া,
তবে মোর রাঙা | করবী
নিজ হাতে নিয়ো | তুলিয়া।

এর এই নয়মাত্রার পদকে যদি দুইভাগ করা যায় তবুও সমগ্র পদের দিকে তাকিয়ে একে নয়মাত্রার ছন্দই বলব। যথা—

মোর বনে | ওগো গরবী
এলে যদি | পথ ভুলিয়া।

এই উভয় ভাগের ছন্দকেই নয়মাত্রার ছন্দ বলছি, তার কারণ উভয়তই নয়মাত্রার পদে ছন্দের রূপকল্পটি সমাপ্ত, তার পরে পুনরাবর্তন। এই সব-কটি ছন্দেরই সাধারণ পরিচয়, এরা নয়মাত্রার ছন্দ।] আরও বিশেষ পরিচয় দাবি করলে এর কলাসংখ্যা এবং সেই কলার মাত্রাসংখ্যার হিসাব দিতে হয়।

কোনো কোনো ছন্দে কলাবিভাগ করতে ভুল হবার আশঙ্কা আছে। যেমন— গগনে গরজে মেঘ ঘন বরষা। পয়ারের চোদ্দ মাত্রা থেকে এক মাত্রা হরণ করে এই তের মাত্রার ছন্দ গঠিত। অর্থাৎ 'গগনে গরজে মেঘ ঘন বরিষন' এবং এই ছন্দটি বস্তুত এক, এমন মনে হতে পারে। আমি তা স্বীকার করিনে, তার সাক্ষী শুধু কান নয় তালও বটে। এই দুটি ছন্দে তালের ঘা পড়েছে কী রকম তা দেখা উচিত।

১ ২
গগনে গরজে মেঘ | ঘন বরিষন।

সাধারণ পয়ারের নিয়মে এতে দুটি আঘাত।

১ ২ ৩
গগনে গরজে মেঘ | ঘন বর- | ষা।

এতে তিনটি আঘাত। পদটি তিন অসমান ভাগে বিভক্ত। পদের শেষ-বর্ণে স্বতন্ত্র ঝোঁক দিলে তবেই এর ভঙ্গিটাকে রক্ষা করা হয়। 'বরষা'

শব্দের শেষ আকার যদি হরণ করা যায় তাহলে ঝোঁক দেবার জায়গা পাওয়া যায় না, তাহলে অক্ষরসংখ্যা সমান হলেও ছন্দ কাত হয়ে পড়ে।

'আঁধার রজনী পোহালো' পদের অন্তবর্ণে দীর্ঘস্বর আছে, কিন্তু নয়মাত্রার ছন্দের পক্ষে সেটা অনিবার্য নয়। তারি একটি প্রমাণ নিচে দেওয়া গেল।

জ্বেলেছে পথের আলোক
সূর্যরথের চালক,
অরুণরক্ত গগন।
বক্ষে নাচিছে রুধির
কে রবে শান্ত সুধীর
কে রবে তন্দ্রামগন।
বাতাসে উঠিছে হিলোল
সাগর-উর্মি বিলোল,
এল মহেন্দ্রলগন,
কে রবে তন্দ্রামগন॥

এই তর্কক্ষেত্রে আর-একটি আমার কৈফিয়ত দেবার আছে। অমূল্য-বাবুর নালিশ এই যে, ছন্দের দৃষ্টান্তে কোনো কোনো স্থলে দুই পংক্তিকে মিলিয়ে আমি কবিতার এক পদ বলে চালিয়েছি। আমার বক্তব্য এই, লেখার পংক্তি এবং ছন্দের পদ এক নয়। আমাদের হাঁটুর কাছে একটা জোড় আছে বলে আমরা প্রয়োজনমতো পা মুড়ে বসতে পারি, তৎসত্ত্বেও গণনায় ওটাকে এক পা বলেই স্বীকার করি এবং অনুভব করে থাকি। নইলে চতুষ্পদের কোঠায় পড়তে হয়। ছন্দেও ঠিক তাই।

সকল বেলা কাটিয়া গেল
বিকাল নাহি যায়।

অমূল্যবাবু একে দুই চরণ বলেন, আমি বলিনে। এই দুটি ভাগকে নিয়েই ছন্দের সম্পূর্ণতা। যদি এমন হত

সকল বেলা কাটিয়া গেল,
বকুলতলে আসন মেল।

তাহলে নিঃসংশয়ে একে দুই চরণ বলতুম।

পুনর্বার বলি যে, যে-বিরামস্থলে পৌঁছিয়ে পদ্যছন্দ অনুরূপ ভাগে পুনরাবর্তন করে সেইপর্যন্ত এসে তবেই কোন্‌টা কোন্‌ ছন্দ এবং তার মাত্রার পরিমাণ কত তার নির্ণয় সম্ভব, মাঝখানে কোনো একটা জোড়ের মুখে গণনা শেষ করা অসংগত। সংস্কৃত বা প্রাকৃত ছন্দশাস্ত্রে এই নিয়মেরই অনুসরণ করা হয়। দৃষ্টান্ত—

পৈঙ্গল-ছন্দঃসূত্রাণি

ভংজিঅ মলঅচোলবই ণিবলিঅ
গংজিঅ গুজ্জরা।
মালবরাঅ মলঅগিরি লুক্কিঅ
পরিহরি কুংজরা।
খুরাসাণ খুহিঅ রণমহ মুহিঅ
লংঘিঅ সাঅরা।
হম্মীর চলিঅ হারব পলিঅ
রিউগণহ কাঅরা।[১]

গ্রন্থকার বলছেন 'বিংশত্যক্ষরাণি' এবং 'পঞ্চবিংশতিমাত্রাঃ প্রতিপাদং দেয়াঃ'। এর পদে পদে কুড়িটি অক্ষর ও পঁচিশটা মাত্রা, ছন্দের এই পরিচয়।

১ প্রাকৃতপৈঙ্গলম্, ১।১৫১। এই প্রাকৃত ছন্দটির নাম 'গগনাঙ্গ' (প্রাকৃতপৈঙ্গলম্ ১।১৪৯-৫০), মতান্তরে 'গগনাঙ্গনা'।

পঢ়ম দহ দিজ্জিআ
পুণবি তহ কিজ্জিঅ।
পুণবি দহ সত্ত তহ বিরই জাআ।
এম পরি বিবিহ দল
মত্ত সততীস পল
এহু কহ ঝুল্লণা ণাঅরাআ ॥[১]

ভাষ্যকারের ব্যাখ্যা এই, "প্রথমং দশমাত্রা দীয়ন্তে। অর্থাৎ তত্র বিরতিঃ ক্রিয়তে। পুনরপি তথা কর্তব্যা। পুনরপি সপ্তদশমাত্রাসু বিরতির্জাতা চ। অনয়ৈব রীত্যা দলদ্বয়েপি মাত্রাঃ সপ্তত্রিংশৎ পতন্তি।" এমনি করে দলগুলিকে[২] মিলিয়ে যে ছন্দের সাঁইত্রিশ মাত্রা "তামিমাং নাগরাজঃ পিঙ্গলো ঝুল্লণামিতি কথয়তি"। আমি যাকে ছন্দোবিশেষের রূপকল্প বা প্যাটার্‌ন্[৩] বলছি 'ঝুল্লণা' ছন্দে সেইটে সাঁইত্রিশ মাত্রায় সম্পূর্ণ, তারপরে তার অনুরূপ পুনরাবৃত্তি। অমূল্যবাবু হয়তো এর কলাগুলির প্রতি লক্ষ্য রেখে একে পাঁচ বা দশমাত্রার ছন্দ বলবেন, কিন্তু পাঁচ বা দশমাত্রায় এর পদের সম্পূর্ণতা নয়।

যার ভাগগুলি অসমান এমন ছন্দ দেখা যাক।

কুংতঅরু ধণুদ্ধরু
হঅবর গঅবরু
ছক্কলু বিবি পা-
ইক্ক দলে।[৪]

১ প্রাকৃতপৈঙ্গলম্ ১।১৫৬। এ-ছন্দের সঙ্গে জয়দেবের 'বদসি যদি কিঞ্চিদপি' ইত্যাদি বিখ্যাত রচনাটির ছন্দোগত সাদৃশ্য লক্ষণীয়।

২ 'দল' মানে ছন্দের বৃহত্তম বিভাগ বা 'চরণ'। ঝুল্লণা ছন্দে দুই দল, প্রতিদলে সাঁইত্রিশ মাত্রা।

৩ 'প্রাকৃতপৈঙ্গলম্'এর ভাষ্যকার এই রূপকল্প বা প্যাটার্‌ন্ অর্থে 'পরিপাটি' শব্দ ব্যবহার করেছেন। ঝুল্লণা ছন্দের প্রতিদলে সাঁইত্রিশ মাত্রা স্থাপনের পরিপাটি হচ্ছে ১০।১০।১০।৭।

৪ প্রাকৃতপৈঙ্গলম্ ১।১৭৯। প্রাকৃত-ছন্দশাস্ত্রমতে এ-ছন্দের নাম 'দণ্ডকল'।

এই ছন্দ সম্বন্ধে বলা হয়েছে 'দ্বাত্রিংশন্মাত্রাঃ পাদে সুপ্রসিদ্ধাঃ'। এই ছন্দকে বাংলায় ভাঙতে গেলে এইরকম দাঁড়ায়।

কৃষ্ণপক্ষে জ্যোৎস্নারাতে
চলিয়াছে সখীসাথে
মল্লিকা-কলিকার
মাল্য হাতে।[১]

চার পংক্তিতে এই ছন্দের পূর্ণরূপ এবং সেই পূর্ণরূপের মাত্রাসংখ্যা বত্রিশ। ছন্দে মাত্রাগণনার এই ধারা আমি অনুসরণ করা কর্তব্য মনে করি। মনে নেই আমার কোনো পূর্বতম প্রবন্ধে অন্য মত[২] প্রকাশ করেছি কি না, যদি করে থাকি তবে ক্ষমা প্রার্থনা করি।

সবশেষে পুনরায় বলি, ছন্দের স্বরূপনির্ণয় করতে হলে সমগ্রের মাত্রাসংখ্যা, তার কলাসংখ্যা ও কলাগুলির মাত্রাসংখ্যা জানা আবশ্যক। শুধু তাই নয়, যেখানে ছন্দের রূপকল্প একাধিক পদের দ্বারা সম্পূর্ণ হয় সেখানে পদসংখ্যাও বিচার্য। যথা—

বর্ষণশান্ত
পাণ্ডুর মেঘ যবে ক্লান্ত
বন ছাড়ি মনে এল নীপরেণুগন্ধ,
ভরি দিল কবিতার ছন্দ।

এখানে চারটি পদ এবং প্রত্যেক পদ নানা অসমান মাত্রায় রচিত, সমস্তটাকে নিয়ে ছন্দের রূপকল্প। বিশেষজাতীয় ছন্দে এইরূপ পদ ও মাত্রা গণনাতেও আমি পিঙ্গলাচার্যের[৩] অনুবর্তী।

উদয়ন—১৩৪১ জ্যৈষ্ঠ

১ সংস্কৃত ও প্রাকৃত ছন্দশাস্ত্রমতে পদের অন্তস্থিত লঘুধ্বনি অনেক সময় গুরু অর্থাৎ দ্বিমাত্রক বলে গণ্য হয়। সেই হিসাবে এখানে 'হাতে' শব্দের 'তে' ধ্বনিটিকে দ্বিমাত্রক বলে গণ্য করতে হবে।

২ ৪১-৪৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

৩ বিখ্যাত ছন্দশাস্ত্রকার। এঁর নামে দুইখানি বই প্রচলিত আছে, একটি সংস্কৃত ও একটি প্রাকৃত। প্রথমটি (ছন্দঃসূত্রম্) খ্রীস্টের পূর্ববর্তী কালে এবং দ্বিতীয়টি (প্রাকৃতপৈঙ্গলম্) খ্রীস্টীয় চতুর্দশ শতকে রচিত বলে পণ্ডিতেরা অনুমান করেন।

ছন্দের প্রকৃতি

আমাদের দেহ বহন করে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ভার, আর তাকে চালন করে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গতিবেগ ; এই দুই বিপরীত পদার্থ যখন পরস্পর মিলনে লীলায়িত হয় তখন জাগে নাচ। দেহের ভারটাকে দেহের গতি নানা ভঙ্গিতে বিচিত্র করে, জীবিকার প্রয়োজনে নয়, সৃষ্টির অভিপ্রায়ে ; দেহটাকে দেয় চলমান শিল্পরূপ। তাকে বলি নৃত্য।

রূপসৃষ্টির প্রবাহই তো বিশ্ব। সেই রূপটা জাগে ছন্দে, আধুনিক পরমাণুতত্ত্বে সে কথা সুস্পষ্ট। সাধারণ বিদ্যুৎপ্রবাহ আলো দেয়, তাপ দেয়, তার থেকে রূপ দেখা দেয় না। কিন্তু বিদ্যুৎকণা যখন বিশেষ সংখ্যায় ও গতিতে আমাদের চৈতন্যের দ্বারে ঘা মারে তখনি আমাদের কাছে প্রকাশ পায় রূপ, কোনোটা দেখা দেয় সোনা হয়ে, কোনোটা হয় সীসে। বিশেষসংখ্যক মাত্রা ও বিশেষবেগের গতি এই দুই নিয়েই ছন্দ, সেই ছন্দের মায়ামন্ত্র না পেলে রূপ থাকে অব্যক্ত। বিশ্বসৃষ্টির এই ছন্দোরহস্য মানুষের শিল্পসৃষ্টিতে। তাই ঐতরেয় ব্রাহ্মণ বলছেন, শিল্পানি শংসন্তি দেবশিল্পানি। মানুষের সব শিল্পই দেবশিল্পের স্তবগান করছে। এতেষাং বৈ শিল্পানামনুকৃতীহ শিল্পম্ অধিগম্যতে। মানবলোকের সব শিল্পই এই দেবশিল্পের অনুকৃতি, অর্থাৎ বিশ্বশিল্পের রহস্যকেই অনুসরণ করে মানবশিল্প। সেই মূলরহস্য ছন্দে, সেই রহস্য আলোক-তরঙ্গে, শব্দতরঙ্গে, রক্তরঙ্গে, স্নায়ুতন্তুর বৈদ্যুততরঙ্গে।

মানুষ তার প্রথম ছন্দের সৃষ্টিকে জাগিয়েছে আপন দেহে। কেননা তার দেহ ছন্দরচনার উপযোগী। ভূতলের টান থেকে মুক্ত করে দেহকে সে তুলেছে ঊর্ধ্বদিকে। চলমান মানুষের পদেপদেই ভারসাম্যের অপ্রতিষ্ঠতা, unstable equilibrium। এতেই তার বিপদ্, এতেই তার সম্পদ্। চলার চেয়ে পড়াই তার পক্ষে সহজ। ছাগলের ছানা

চলা নিয়েই জন্মেছে, মানুষের শিশু চলাকে আপনি সৃষ্টি করেছে ছন্দে। সামনে-পিছনে ডাইনে-বাঁয়ে পায়েপায়ে দেহভারকে মাত্রাবিভক্ত করে ওজন বাঁচিয়ে তবেই তার চলা সম্ভব হয়। সেটা সহজ নয়, মানবশিশুর চলার ছন্দসাধনা দেখলেই তা বোঝা যায়। যে-পর্যন্ত আপন ছন্দকে সে আপনি উদ্ভাবন না করে সে-পর্যন্ত তার হামাগুড়ি। অর্থাৎ ভারাকর্ষণের কাছে তার অবনতি, সে-পর্যন্ত সে নৃত্যহীন।

চতুষ্পদ জন্তুর নিত্যই হামাগুড়ি। তার চলা মাটির কাছে হার মেনে চলা। লাফ দিয়ে যদিবা সে উপরে ওঠে, পরক্ষণেই মাটির দরবারে ফিরে এসেই তার মাথা হেঁট। বিদ্রোহী মানুষ মাটির একান্ত শাসন থেকে দেহভারকে মুক্ত করে নিয়ে তাতেই চালায় প্রয়োজনের কাজ এবং অপ্রয়োজনের লীলা। ভূমির টানের বিরুদ্ধে ছন্দের সাহায্যে তার এই জয়লব্ধ শক্তি।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণ বলছেন, আত্মসংস্কৃতির্বাব শিল্পানি। শিল্পই হচ্ছে আত্মসংস্কৃতি। সম্যক্‌ রূপদানই সংস্কৃতি, তাকেই বলে শিল্প। আত্মাকে সুসংযত করে মানুষ যখন আত্মার সংস্কার করে, অর্থাৎ তাকে দেয় সম্যক্‌ রূপ, সেও তো শিল্প। মানুষের শিল্পের উপাদান কেবল তো কাঠপাথর নয়, মানুষ নিজে। বর্বর অবস্থা থেকে মানুষ নিজেকে সংস্কৃত করেছে। এই সংস্কৃতি তার স্বরচিত বিশেষ ছন্দোময় শিল্প। এই শিল্প নানা দেশে, নানা কালে, নানা সভ্যতায়, নানা আকারে প্রকাশিত, কেননা বিচিত্র তার ছন্দ। ছন্দোময়ং বা এতৈর্যজমান আত্মানং সংস্কুরুতে। শিল্পযজ্ঞের যজমান আত্মাকে সংস্কৃত করেন, তাকে করেন ছন্দোময়।

যেমন মানুষের আত্মার তেমনি মানুষের সমাজেরও প্রয়োজন ছন্দোময় সংস্কৃতি। সমাজও শিল্প। সমাজে আছে নানা মত, নানা ধর্ম, নানা শ্রেণী। সমাজের অন্তরে সৃষ্টিতত্ত্ব যদি সক্রিয় থাকে,

তাহলে সে এমন ছন্দ উদ্ভাবন করে যাতে তার অংশ-প্রত্যংশের মধ্যে কোথাও ওজনের অত্যন্ত বেশি অসাম্য না হয়। অনেক সমাজ পঙ্গু হয়ে আছে ছন্দের এই ত্রুটিতে, অনেক সমাজ মরেছে ছন্দের এই অপরাধে। সমাজে যখন হঠাৎ কোনো একটা সংরাগ অতিপ্রবল হয়ে ওঠে তখন মাতাল সমাজ পা ঠিক রাখতে পারে না, ছন্দ থেকে হয় ভ্রষ্ট। কিংবা যখন এমন সকল মতের, বিশ্বাসের, ব্যবহারের বোঝা অচল হয়ে কাঁধে চেপে থাকে, যাকে ছন্দ বাঁচিয়ে সম্মুখে বহন করে চলা সমাজের পক্ষে অসম্ভব হয়, তখন সেই সমাজের পরাভব ঘটে। যেহেতু জগতের ধর্মই চলা, সংসারের ধর্ম স্বভাবতই সরতে থাকা, সেইজন্যেই তার বাহন ছন্দ। যে গতি ছন্দ রাখে না, তাকেই বলে দুর্গতি।

মানুষের ছন্দোময় দেহ কেবল প্রাণের আন্দোলনকে নয় তার ভাবের আন্দোলনকেও যেমন সাড়া দেয়, এমন আর কোনো জীবে দেখিনে। অন্য জন্তুর দেহেও ভাবের ভাষা আছে কিন্তু মানুষের দেহভঙ্গির মতো সে ভাষা চিন্ময়তা লাভ করেনি, তাই তার তেমন শক্তি নেই, ব্যঞ্জনা নেই।

কিন্তু এই যথেষ্ট নয়। মানুষ সৃষ্টিকর্তা। সৃষ্টি করতে গেলে ব্যক্তিগত তথ্যকে দাঁড় করাতে হয় বিশ্বগত সত্যে। সুখদুঃখ রাগ-বিরাগের অভিজ্ঞতাকে আপন ব্যক্তিগত ঐকান্তিকতা থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে সেটাকে রূপসৃষ্টির উপাদান করতে চায় মানুষ। 'আমি ভালোবাসি', এই কথাটিকে ব্যক্তিগত ভাষায় প্রকাশ করা যেতে পারে ব্যক্তিগত সংবাদ বহন করবার কাজে। আবার 'আমি ভালোবাসি', এই কথাটিকে 'আমি' থেকে স্বতন্ত্র করে সৃষ্টির কাজে লাগানো যেতে পারে যে-সৃষ্টি সর্বজনের, সর্বকালের। যেমন সাজাহানের বিরহশোক দিয়ে সৃষ্ট হয়েছে তাজমহল, সাজাহানের সৃষ্টি অপরূপ ছন্দে অতিক্রম করেছে ব্যক্তিগত সাজাহানকে।

নৃত্যকলার প্রথম ভূমিকা দেহচাঞ্চল্যের অর্থহীন সুষমায়। তাতে কেবলমাত্র ছন্দের আনন্দ। গানেরও আদিম অবস্থায় একঘেয়ে তালে একঘেয়ে সুরের পুনরাবৃত্তি ; সে কেবল তালের নেশা-জমানো, চেতনাকে ছন্দের দোল-দেওয়া। তার সঙ্গে ক্রমে ভাবের দোলা মেশে। কিন্তু এই ভাবব্যক্তি যখন আপনাকে ভোলে, অর্থাৎ ভাবের প্রকাশটাই যখন লক্ষ্য না হয়, তাকে উপলক্ষ্য করে রূপসৃষ্টিই হয় চরম, তখন নাচটা হয় সর্বজনের ভোগ্য ; সেই নাচটা ক্ষণকালের পরে বিস্মৃত হলেও যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ তার রূপে চিরকালের স্বাক্ষর লাগে।

নাচতে দেখেছি সারসকে। সেই নাচকে কেবল আঙ্গিক বলা যায় না, অর্থাৎ টেক্‌নিকেই তার পরিশেষ নয়। আঙ্গিকে মন নেই, আছে নৈপুণ্য। সারসের নাচের মধ্যে দেখেছি ভাব এবং তার চেয়েও আরো কিছু বেশি। সারস যখনি মুগ্ধ করতে চেয়েছে আপন দোসরকে, তখনি তার মন সৃষ্টি করতে চেয়েছে নৃত্যভঙ্গির সংস্কৃতি, বিচিত্র ছন্দের পদ্ধতি। সারসের মন আপন দেহে এই নৃত্যশিল্প রচনা করতে পেরেছে, তার কারণ তার দেহভারটা অনেক মুক্ত।

কুকুরের মনে আবেগের প্রবলতা যথেষ্ট, কিন্তু তার দেহটা বন্ধক দেওয়া মাটির কাছে। মুক্ত আছে কেবল তার ল্যাজ। ভাবাবেগের চাঞ্চল্যে কুক্কুরীয় ছন্দে ঐ ল্যাজটাতেই চঞ্চল হয় তার নৃত্য, দেহ আঁকুবাঁকু করে বন্দীর মতো।

মানুষের সমগ্র মুক্তদেহ নাচে, নাচে মানুষের মুক্তকণ্ঠের ভাষা। তাদের মধ্যে ছন্দের সৃষ্টিরহস্য যথেষ্ট জায়গা পায়। সাপ অপদস্থ জীব, মানুষের মতো পদস্থ নয়। সমস্ত দেহ সে মাটিকে সমর্পণ করে বসেছে। সে কখনো নিজে নাচে না। সাপুড়ে তাকে নাচায়। বাহিরের উত্তেজনায় ক্ষণকালের জন্য দেহের এক অংশকে সে মুক্ত করে নেয়, তাকে দোলায় ছন্দে। এই ছন্দ সে পায় অন্যের কাছ থেকে, এ তার

আপন ইচ্ছার ছন্দ নয়। ছন্দ মানেই ইচ্ছা।[১] মানুষের ভাবনা রূপ-গ্রহণের ইচ্ছা করেছে নানা শিল্পে, নানা ছন্দে। কত বিলুপ্ত সভ্যতার ভগ্নাবশেষে বিস্মৃত যুগের ইচ্ছার বাণী আজও ধ্বনিত হচ্ছে তার কত চিত্রে, জলপাত্রে, কত মূর্তিতে। মানুষের আনন্দময় ইচ্ছা সেই ছন্দোলীলার নটরাজ, ভাষায় ভাষায় তার সাহিত্যে সেই ইচ্ছা নব নব নৃত্যে আন্দোলিত।

মানুষের সহজ চলায় অব্যক্ত থাকে নৃত্য, ছন্দ যেমন প্রচ্ছন্ন থাকে গদ্যভাষায়। কোনো মানুষের চলাকে বলি সুন্দর, কোনোটাকে বলি তার উলটো। তফাতটা কিসে। সে কেবল একটা সমস্যাসমাধান নিয়ে। দেহের ভার সামলিয়ে দেহের চলা একটা সমস্যা। ভারটাই যদি অত্যন্ত প্রত্যক্ষ হয়, তাহলেই অসাধিত সমস্যা প্রমাণ করে অপটুতা। যে চলায় সমস্যার সমুৎকৃষ্ট মীমাংসা সেই চলাই সুন্দর।

পালে-চলা নৌকো সুন্দর, তাতে নৌকোর ভারটার সঙ্গে নৌকোর গতির সম্পূর্ণ মিলন ; সেই পরিণয়ে শ্রী উঠেছে ফুটে, অতিপ্রয়াসের অবমান হয়েছে অন্তর্হিত। এই মিলনেই ছন্দ। দাঁড়ি দাঁড় টানে, সে লগি ঠেলে, কঠিন কাজের ভারটাকে সে কমিয়ে আনে কেবল ছন্দ রেখে। তখন কাজের ভঙ্গি হয় সুন্দর। বিশ্ব চলেছে প্রকাণ্ড ভার নিয়ে বিপুল দেশে নিরবধি কালে সুপরিমিতির ছন্দে। এই সুপরিমিতির প্রেরণায় শিশিরের ফোঁটা থেকে সূর্যমণ্ডল পর্যন্ত সুগোল ছন্দে গড়া। এইজন্যেই ফুলের পাপড়ি সুবঙ্কিম, গাছের পাতা সুঠাম, জলের ঢেউ সুডোল।

১ সংস্কৃত ছন্দঃ শব্দ বাংলায় হয়েছে ছন্দ। সংস্কৃতে বিসর্গহীন ছন্দ শব্দও আছে। ছন্দঃ এবং ছন্দ শব্দের অর্থ এক নয়। ছন্দঃ মানে পদ্যবন্ধ অর্থাৎ পদ্যের ধ্বনিবিন্যাস-প্রণালী। আর ছন্দ মানে ইচ্ছা (যথা— স্বচ্ছন্দ, ছন্দানুবর্তন)। মূলে হয়তো দুই শব্দের এক অর্থই ছিল। বিধুশেখর শাস্ত্রীর 'ছন্দঃ' প্রবন্ধ (বিশ্বভারতীপত্রিকা, ১৩৫০ মাঘ, পৃ ২৯৯-৩০১) দ্রষ্টব্য।

জাপানের ফুলদানিতে ফুল সাজাবার একটি কলাবিদ্যা আছে। যেমন-তেমন আকারে পুঞ্জীকৃত পুষ্পিত শাখায় বস্তুভারটাই প্রত্যক্ষ; তাকে ছন্দ দিয়ে যেই শিল্প করা যায় তখন সেই ভারটা হয় অগোচর, হালকা হয়ে গিয়ে অন্তরে প্রবেশ করে সহজে।

প্রাচীন জাপানের একজন বিখ্যাত বীর এই ফুলসাজানো দেখতে ভালোবাসতেন। তিনি বলতেন এই সজ্জাপ্রকরণ থেকে তাঁর মনে আসত আপন যুদ্ধব্যবসায়ের প্রেরণা। যুদ্ধও ছন্দে-বাঁধা শিল্প, ছন্দের সমুৎকর্ষ থেকেই তার শক্তি। এই কারণেই লাঠি খেলাও নৃত্য।

জাপানে দেখেছি চা-উৎসব। তাতে চা-তৈরি, চা-পরিবেষণের প্রত্যেক অংশই সযত্ন-সুন্দর। তার তৎপর্য এই যে, কর্মের সৌষ্ঠব এবং কর্মের নৈপুণ্য একসঙ্গে গাঁথা। গৃহিণীপনা যদি সত্য হয় তাকে সুন্দর হতেই হবে, অকৌশল ধরা পড়ে কুশ্রীতায়, কর্মের ও লোক-ব্যবহারের ছন্দোভঙ্গে। ভাঙা ছন্দের ছিদ্র দিয়েই লক্ষ্মী বিদায় নেন।

এতক্ষণ ছন্দকে দেখা গেল নৃত্যে। কেননা ছন্দের প্রথম উল্লাস মানুষের বাক্যহীন দেহেই। তারপরে দেহের ইশারা মেলে ভাষার ইশারায়। এবার ভাষার ক্ষেত্রে দেখা যাক ছন্দকে।

সেই একই কথা, ভার আর গতি, সেই দুইয়ের যোগে ওজন বাঁচিয়ে চলা। জন্তুর আওয়াজের পরিধি কতটুকুই বা; তাতে জোর থাকতে পারে কিন্তু ভার সামান্য। কুকুর যতই ডাকুক, শেয়াল যতই চেঁচাক, ধ্বনির ওজন বাঁচিয়ে চলবার সমস্যা তাদের নেই। কোনো কোনো ক্ষেত্রে কিছু আভাস পাওয়া যায়। গাধার 'পরে অবিচার করতে চাইনে। সে শুধু পরের ময়লা কাপড় বহন করে তা নয়, এ-পর্যন্ত কণ্ঠস্বর সম্বন্ধে আপন প্রভূত অখ্যাতি বহন করে এসেছে। কিন্তু যখনি সে নিজের ডাককে দীর্ঘায়িত করে, তখনি পর্যায়ে পর্যায়ে তাকে ধ্বনির ওজন ভাগ

করতে হয়। নিজের ব্যবসায়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে এই ব্যাপারকে ছন্দ বলতে কুণ্ঠিত হচ্ছি; কিন্তু আর কী বলব জানিনে।

মানুষকে বহন করতে হয় ভাষার সুদীর্ঘতা। প্রলম্বিত ভাষার ওজন তাকে রাখতেই হয়। মানুষের সেই বাক্যের সঙ্গে তার গানের সুর যখন মিশল, তখন গীতিকলা হল দীর্ঘায়ত। নানাবিধ তাল নিযুক্ত হয়েছে তার ভার বইতে। কিন্তু তাল অর্থাৎ ছন্দকে কেবল ভারবাহক বললে চলবে না। সে তো ধ্বনিভারের ঝাঁকামুটে নয়। ভারগুলিকে নানা আয়তনে বিভক্ত করে যেই সে তাকে গতি দেয়, অমনি রূপ নিয়ে সংগীত আমাদের চৈতন্যকে আঘাত করে। ভাষা অবলম্বন করে যখন আমরা খবর দিতে চাই তখন বিবরণের সত্যতা রক্ষা করাই আমাদের একমাত্র দায়িত্ব; কিন্তু যখন রূপ দিতে চাই তখন সত্যতার চেয়ে বেশি আবশ্যক হয় ছন্দের।

'একদা এক বাঘের গলায় হাড় ফুটিয়াছিল', এটা নিছক খবর। গল্প হিসাবে বা ঘটনা হিসাবে সত্য হলে এর আর কোনোই জবাবদিহি নেই। কিন্তু গলায় হাড়বেঁধা জন্তুটার ল্যাজ যদি প্রত্যক্ষভাবে চৈতন্যের মধ্যে আছড়িয়ে নিতে চাই তবে ভাষায় লাগাতে হবে ছন্দের মন্ত্র।

বিদ্যুৎ-লাঙ্গুল করি ঘন তর্জন
বজ্রবিদ্ধ মেঘ করে বারি বর্জন।
তদ্রূপ যাতনায় অস্থির শার্দুল
অস্থিবিদ্ধগলে করে ঘোর গর্জন॥

কাব্যসাহিত্য কেবল রসসাহিত্য নয়, তা রূপসাহিত্য। সাধারণত ভাষায় শব্দগুলি অর্থবহন করে, কিন্তু ছন্দে তারা রূপগ্রহণ করে।

ছন্দ সম্বন্ধে এই গেল আমার সাধারণ বক্তব্য। বিশ্বের ভাষায় মানুষের ভাষায় রূপ দেওয়া তার কাজ। এখন বাংলা কাব্যছন্দ সম্বন্ধে বিশেষভাবে কিছু বলবার চেষ্টা করা যাক।

২

[সবচেয়ে সহজ ও প্রাথমিক ছন্দ হচ্ছে দুই ধ্বনিমাত্রার দুই পদপাতন। ছাত্র-অবস্থায় তার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়, 'জল পড়ে পাতা নড়ে'। আমার ঘরের কাছে মেহেদি গাছের বেড়া। খবর নিতে গেলেম তার ছন্দটা কী। দেখি ডাঁটার ডাইনে একটি পাতা বাঁয়ে একটি পাতা, তার পরেই একটি যতি। এই তো সমান ভাগে দুই মাত্রার ছন্দ। দ্বিপদীর চাল।[১] অন্যগাছে অন্যমাত্রার ছন্দ। যেমন শিমুল গাছ ছাতিম গাছ। এক সময়ে বনচ্ছায়ায় যখন গাছের অলংকারশাস্ত্র অধ্যয়ন করেছি তখন তাদের ছন্দের খবর কিছু আদায় করতে পেরেছিলেম।]

দুই মাত্রা বা দুই মাত্রার গুণক নিয়ে যেসব ছন্দ তারা পদাতিক; বোঝা সামলিয়ে ধীরপদক্ষেপে তাদের চাল। এই জাতের ছন্দকে পয়ারশ্রেণীয় বলব। সাধারণ পয়ারে প্রত্যেক পংক্তিতে দুটি করে ভাগ, ধ্বনির মাত্রা ও যতির মাত্রা মিলিয়ে প্রত্যেক ভাগে আটটি করে মাত্রা, সুতরাং সমগ্র পয়ারের ধ্বনিমাত্রাসংখ্যা চোদ্দ এবং তার সঙ্গে মিলেছে যতিমাত্রাসংখ্যা দুই, অতএব সর্বসমেত ষোল মাত্রা।

বচন নাহি তো মুখে | তবু মুখখানি • •
হৃদয়ের কানে বলে | নয়নের বাণী • •।

আট মাত্রার উপর ঝোঁক না রেখে প্রত্যেক দুই মাত্রার উপর ঝোঁক যদি রাখি তবে সেই দুলকি চালে পয়ারের পদমর্যাদার লাঘব হয়।

কেন | তার | মুখ | ভার | বুক | ধুক | ধুক | • •,
চোখ | লাল | লাজে | গাল | রাঙা | টুক | টুক | • •।

১ মানে দুইমাত্রার বা সমমাত্রার চাল। 'দ্বিপদী' শব্দটি এখানে পারিভাষিক অর্থে গ্রহণীয় নয়। পারিভাষিক অর্থে 'দ্বিপদী' মানে 'পয়ার'।

অথবা প্রত্যেক চার মাত্রায় ঝোঁক দিয়ে পয়ার পড়া যেতে পারে। যেমন—

সুনিবিড় | শ্যামলতা | উঠিয়াছে | জেগে • •
ধরণীর | বনতলে | গগনের | মেঘে • • |

ছন্দের দুটি জিনিস দেখবার আছে— এক হচ্ছে তার সমগ্র অবয়ব, আর তার সংঘটন। পয়ারের অবয়বের মাত্রাসমষ্টি ষোল সংখ্যায়। এই ষোল মাত্রা সংঘটিত হয়েছে দুই মাত্রার অংশযোজনায়। ধ্বনিরূপ-সৃষ্টিতে 'দুই' সংখ্যার একটি বিশেষ প্রভাব আছে, 'তিন' সংখ্যা থেকে তা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। দৃষ্টান্ত দেখাই।

শ্রাবণ-ধারে সঘনে
কাঁদিয়া মরে যামিনী,
ছোটে তিমির-গগনে
পথহারানো দামিনী।

এই ছন্দটির সমগ্র অবয়ব ষোল মাত্রায়। সেই ষোল মাত্রাটি সংঘটিত হচ্ছে তিন-দুই তিন মাত্রার যোগে, এইজন্যেই পয়ারের মতো এর চাল-চলন নয়। যে আট মাত্রা দুইয়ের অংশ নিয়ে সে চলে সোজা সোজা পা ফেলে, কিন্তু যে আট মাত্রা তিন-দুই-তিনের ভাগে সে চলছে হেলতে দুলতে মরালগমনে।

চেয়ে থাকে মুখপানে,
সে চাওয়া নীরব গানে
মনে এসে বাজে,
যেন ধীর ধ্রুবতারা
কহে কথা ভাবাহারা
জনহীন সাঁঝে।

যতিমাত্রাসমেত চব্বিশ মাত্রায় এই ত্রিপদীর অবয়ব। এই চব্বিশ মাত্রা দুই মাত্রাখণ্ডের সমষ্টি, এইজন্যেই একে পয়ারশ্রেণীতে গণ্য করব।

রিমি ঝিমি বরিষে শ্রাবণধারা
ঝিল্লি ঝনকিছে ঝিনি ঝিনি ;
দুরু দুরু হৃদয়ে বিরামহারা
তাকায়ে পথপানে বিরহিণী ।

এ-ছন্দেরও অবয়ব চব্বিশ মাত্রায়। কিন্তু এর গড়ন স্বতন্ত্র; এর অংশগুলি দুই-তিনের মিশ্রিত মাত্রা।

পয়ার ছন্দের বিশেষ গুণ এই যে, তার বুনোনি ঠাসবুনোনি নয়, তাকে বাড়ানো-কমানো[1] যায়। সুর করে টেনে টেনে পড়বার সময় কেউ যদি যতির যোগে পয়ারের প্রথম ভাগে দশ ও শেষ ভাগে আট মাত্রা পড়ে তবু পয়ারের প্রকৃতি বজায় থাকে। যেমন—

মহাভারতের কথা • • | অমৃত-সমান • • ।
কাশীরাম দাস ভণে • • | শুনে পুণ্যবান্ • • ॥

অথবা

মহা • • ভারতের কথা • • | অমৃত • • সমা • • ন ।
কাশীরা • • ম দাস ভণে • • | শুনে • • পুণ্যবা • • ন্ ॥

পয়ার ছন্দ স্থিতিস্থাপক বলেই এটা সম্ভব, আর সেই গুণেই বাংলা কাব্য-সাহিত্যকে সে এমন করে অধিকার করেছে।

[যাকে 'মহাপয়ার' নাম দেওয়া যায় সেটা পয়ারশ্রেণীর সবচেয়ে প্রশস্ত ছন্দ। সেই ছন্দ আমার পূজনীয় অগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথের সৃষ্টি। আঠার মাত্রায় এর অবয়ব, এর প্রত্যেক পংক্তির প্রথম ভাগে আট মাত্রা, দ্বিতীয় ভাগে দশ মাত্রা। তাঁরি কাব্য থেকে দৃষ্টান্ত দেখাই।

গম্ভীর পাতাল যথা কালরাত্রি করালবদনা
বিস্তারে একাধিপত্য, শ্বসয়ে অযুত ফণিফণা

১ ৫৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

দিবানিশি কাটি রোষে। ঘোর নীল বিবর্ণ অনল
শিখাসংঘ আলোড়িয়া দাপাদাপি করে দেশময়
তমোহস্ত এড়াইতে, প্রাণ যথা কালের কবল।[১]

স্থিতিস্থাপকতা ছাড়া পয়ারজাতীয় ছন্দের আর দুটি মহদ্‌গুণ আছে। এক তার ভারবহনশক্তি,[২] আর তার গাম্ভীর্য। যাকে ধ্বনিমাত্রা বলি তার আছে সরু-মোটা ভেদ। 'চন্দনচর্চিত' শব্দটা অক্ষরগণনায় আট মাত্রা, অন্তত সংস্কৃত ছন্দে তার এই ওজনই পাকা। দুর্বল বাহনের পিঠে চড়ালেই ওজনের কমি-বেশি পড়ে ধরা।]

তিন-তিন মাত্রায় যার গ্রন্থিযোজনা এমন একটি ছন্দের দৃষ্টান্ত দেখাই।

আঁখির পাতায় নিবিড় কাজল
গলিছে নয়ন-সলিলে।

অক্ষরসংখ্যা সমান রেখে এই দুটো পদে যুক্তবর্ণ যদি চড়াই তাহলে সেটা কেমন হয়, যেমন এক-এক সময়ে দেখা যায় জোয়ান পুরুষ ক্ষীণ স্ত্রীর ঘাড়ে বোঝা চাপিয়ে পথে চলে নির্মমভাবে। প্রমাণ দিই।

চক্ষুর পল্লবে নিবিড় কজ্জল
গলিছে অশ্রুর নির্ঝরে।

কিন্তু এই বোঝা পয়ারজাতীয় পালোয়ানের স্কন্ধে চাপালে দুর্ঘটনার আশঙ্কা থাকবে না। প্রথমে বিনা-বোঝার চালটা দেখানো যাক।

শ্রাবণের কালো ছায়া নেমে আসে তমালের বনে
যেন দিক্‌-ললনার গলিত কাজল-বরিষনে।

এইটিকে গুরুভার করে দিই।

বর্ষার তমিস্রচ্ছায়া ব্যাপ্ত হল অরণ্যের তলে
যেন অশ্রুসিক্তচক্ষু দিগ্‌বধূর গলিত কজ্জলে।

এতটা ভারবৃদ্ধি যে সম্ভব হয় তার কারণ পয়ার স্থিতিস্থাপক।

১ ৪৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।
২ অন্যত্র (৩৮ পৃ) বলেছেন 'শোষণশক্তি'।

[একদিন এই তত্ত্বটি বিশেষ করে আমার গোচর হয়েছিল, তার ইতিহাসটা বলি।

সংস্কৃত ভাষায় প্রত্যেক শব্দেই দীর্ঘহ্রস্বধ্বনির অসাম্য, ইংরেজি ভাষায় ধ্বনির অসমানতা তার এক্‌সেন্‌ট্‌বিদ্ধ শব্দে। মসৃণপথে তারা গড়গড় করে গড়িয়ে যায় না, ধাক্কা দিতে দিতে মনের মধ্যে দাগ রেখে রেখে চলে। বাংলাভাষায় রেলপাতা পথে ঠেলাগাড়ির মতো শব্দগুলোকে এক ঝোঁকে আট-দশ মাত্রা অনায়াসে পিছলিয়ে নিয়ে যাওয়া চলে, মনের মধ্যে তারা জোরে দাগ কাটে না ; যথেষ্ট সময় পায় না নিজেকে বিশেষ করে জানান দেবার।[১] এই ত্রুটি লাঘব করবার জন্যে মাইকেল তাঁর অমিত্রাক্ষর ছন্দে যুক্তবর্ণের ধ্বনি পদে পদে ঝংকৃত করে পয়ারের একটানা চালের মধ্যে শক্তিসঞ্চার করেছিলেন। সাধারণ পয়ারে এই শক্তির সম্ভাবনা কতদূর পর্যন্ত পৌঁছয় সে তিনিই প্রথম দেখিয়েছেন। তৎসত্ত্বেও তাঁর অনবধানতা 'মেঘনাদবধ'কাব্যের আরম্ভেই প্রকাশ পেয়েছে।

> সম্মুখ-সমরে পড়ি বীরচূড়ামণি
> বীরবাহু চলি যবে গেলা যমপুরে
> অকালে, কহ হে দেবি অমৃতভাষিণি,
> কোন্ বীরবরে বরি সেনাপতিপদে
> পাঠাইলা রণে পুনঃ রক্ষঃকুলনিধি
> রাঘবারি।

এতগুলি পংক্তির আরম্ভে ও শেষে দুটিমাত্র যুক্তবর্ণের ধাক্কা। এর সঙ্গে 'প্যারাডাইস্ লস্ট্'এর সূচনা মিলিয়ে দেখলে প্রভেদ স্পষ্ট হবে।

একদিন তৎকালপ্রচলিত বাংলা ছন্দের ক্ষীণতা-প্রতিকারের উপায় আমাকে ভাবতে হয়েছিল। সংস্কৃতের অনুকরণে বাংলা স্বরবর্ণে হ্রস্ব-দীর্ঘতার প্রচলন করতে গেলে এই কৃত্রিমতা বেশিক্ষণ সয় না। তার

১ দ্রষ্টব্য পৃ ১-২, ৮-৯।

অসংগতি অধিকাংশ স্থলে ব্যঙ্গকাব্যেরই প্রয়োজন মেটাতে পারে। যথা—

বিলাতে পালাতে ছটফট করে নব্য গউড়ে
অরণ্যে যে-জন্যে গৃহগবিহগপ্রাণ দউড়ে।
স্বদেশে কাঁদে সে, গুরুজনবশে কিছু হয় না,
বিনা হ্যাট্‌টা কোট্‌টা ধুতি-পিরহনে মান রয় না।[১]

'মানসী' লেখবার সময় আমার মনে প্রথম সংকল্প এল যে, যুক্ত-ধ্বনিকে দুই মাত্রার গৌরব দিয়ে ছন্দকে ধ্বনিবন্ধুর করব।[২] সকলেই জানেন বাংলা ছন্দে যুক্তবর্ণ তখন ঐকমাত্রিক শ্রেণীতে গণ্য ছিল। সেই জন্যেই 'বদনমণ্ডলে ভাসিছে ব্রীড়া' এমনতরো লাইনের সৃষ্টিতেও কবির সংকোচ ছিল না।[৩]

প্রথমত সেদিন যুক্তবর্ণকে পয়ারেও দিলেম দুই মাত্রার আসন।[২] লিখলেম

নিম্নে যমুনা বহে স্বচ্ছশীতল,
ঊর্ধ্বে পাষাণতট শ্যাম শিলাতল।

অনতিকাল পরেই বোঝা গেল পয়ারের উপর এ-আইন চালাবার কোনোই প্রয়োজন নেই। বিনা বাধায় লেখা যেতে পারে

উন্মত্ত যমুনা বহে, আবর্তিত জল
দুর্গম শৈলের তটে উদ্দাম উচ্ছল।

যদি লেখা যায়

হিমালয় নামে গিরি নগ-অধিরাজ

তাহলে হিমালয়ের মতো অত বড়ো পদার্থেরও উপর মন চলে যায়

১ শিখরিণী ছন্দ। অকারান্ত ধ্বনিকে অকারান্তরূপে এবং দীর্ঘস্বরান্ত ধ্বনিকে দীর্ঘরূপে উচ্চারণ করা আবশ্যক। দৃষ্টান্তটি দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি রচনা (ভারতী, ১২৮৬ আশ্বিন, পৃ ২৬৪) থেকে গৃহীত।

২ ৬৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। ৩ ৫৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

ঘুমিয়ে-পড়া গাড়োয়ানকে নিয়ে রাতের বেলার গোরুর গাড়ির মতো।
কিন্তু ঐ পয়ারেই লেখা চলে

বিখ্যাত হিমাদ্রি নামে শৈল-অধিরাজ।

এ-লাইনে হিমালয়ের মানরক্ষা হতে পারে।]

যেমন দুইমাত্রামূলক পয়ার তেমনি তিনমাত্রামূলক ছন্দও বাংলাদেশে অনেককাল থেকে প্রচলিত। পয়ারের ব্যবহার প্রধানত আখ্যানে, রামায়ণ-মহাভারত-মঙ্গলকাব্য প্রভৃতিতে। তিনমাত্রামূলক ছন্দ গীতি-কাব্যে, যেমন বৈষ্ণব পদাবলীতে।[১]

পূর্বেই বলেছি পয়ারের চাল পদাতিকের চাল, পা ফেলে ফেলে চলে।

অভিসার-যাত্রাপথে হৃদয়ের ভার
পদে পদে দেয় বক্ষে ব্যথার ঝংকার।

এই পা ফেলে চলার মাঝে মাঝে যতি পাওয়া যায় যথেষ্ট, ইচ্ছা করলে তাকে বাড়ানো-কমানো চলে। কিন্তু তিনমাত্রার তালটা যেন গোল গড়নের, গড়িয়ে চলে।[২] পরস্পরকে ঠেলে নিয়ে দৌড় দেয়।

চলিতে চলিতে চরণে উছলে
চলিবার ব্যাকুলতা,
নূপুরে নূপুরে বাজে বনতলে
মনের অধীর কথা।

এইজন্যে মাত্রা যদি কোথাও তিনের মাপের একটু বেশি হয় এ-ছন্দ তাকে প্রসন্নমনে জায়গা দিতে পারে না। দায়ে পড়ে এই অত্যাচার কখনো করিনি এমন কথা বলতে পারব না।

প্রভু বুদ্ধ লাগি আমি ভিক্ষা মাগি,
ওগো পুরবাসী, কে রয়েছ জাগি,
অনাথপিণ্ডদ কহিলা অম্বুদ-
নিনাদে।

১ দ্রষ্টব্য ৩৬-৩৭ পৃষ্ঠা। ২ দ্রষ্টব্য ১৩-১৪, ৭২-৭৩ পৃষ্ঠা।

এ-কথা বোঝা শক্ত নয় যে, 'অনাথপিণ্ডদ' নামটার খাতিরে নিয়ম বন্ধ করেছিলেম। গার্ড এসে গাড়ির কামরায় বরাদ্দর বেশি মানুষকে ঠেসে ঢুকিয়ে দিয়েছে, ঘুষ খেয়ে থাকবে কিংবা আগন্তুক ভারি দরের।

সেকালে অক্ষরগনতিকরা তিনমাত্রামূলক ছন্দে যুক্তধ্বনি বর্জন করে চলতুম। কিন্তু তাতে রচনায় অতিলালিত্যের দুর্বলতা এসে পৌছত।[১] সেটা যখন আমার কাছে বিরক্তিকর হল তখন যুক্তধ্বনির শরণ নিলুম। ছন্দটা একদিন ছিল যেন নবনী দিয়ে গড়া।

বরষার রাতে জলের আঘাতে
পড়িতেছে যূথী ঝরিয়া,
পরিমলে তারি সজল পবন
করুণায় উঠে ভরিয়া।

এই দুর্বলতার মধ্যে যুক্তবর্ণ এসে দেখা দিল।

নববর্ষার বারিসংঘাতে
পড়ে মল্লিকা ঝরিয়া,
সিক্তপবন সুগন্ধে তারি
কারুণ্যে উঠে ভরিয়া।

ধ্বনির দুইমাত্রা এবং তিনমাত্রা বাংলা ছন্দের আদিম এবং রূঢ়িক উপাদান। তারপরে এই দুই এবং তিনের যোগে যৌগিকমাত্রার ছন্দের উৎপত্তি। তিন+দুই, তিন+চার, তিন+দুই+চার প্রভৃতি নানা-প্রকার যোগ চলেছে আধুনিক বাংলা ছন্দে। তিন+দুই-মাত্রামূলক ছন্দের দৃষ্টান্ত।

আঁধার রাতি জ্বেলেছে বাতি
অযুতকোটি তারা,
আপন কারা-ভবনে পাছে
আপনি হয় হারা।

১ দ্রষ্টব্য ৬৬ পৃষ্ঠা।

দেখা যাচ্ছে এখানে পদশেষের অংশটিকে খর্ব করা হয়েছে। যদি লেখা যেত

আঁধার রাতি জ্বেলেছে বাতি
আকাশ ভরি অযুত তারা

তাহলে ছন্দের কাছে দেনা বাকি থাকত না। কিন্তু পূর্বোক্ত প্রথম শ্লোকটির পদশেষে পাঁচমাত্রার থেকে তিনমাত্রাকে জবাব দেওয়া হয়েছে। তাহলে বুঝতে হবে সেই তিনমাত্রা দেহত্যাগ করে ঐখানেই বসে আছে যতিকে ভর করে।

কিন্তু এই কৈফিয়তটা সম্পূর্ণ হল বলে মনে হয় না, আরো কথা আছে। প্রকৃতির কাজের অলংকরণতত্ত্বটা আলোচ্য। দুই পা দুই হাত নিয়ে দেহটা দাঁড়াল, দুই কাঁধে দুটো মুণ্ড বসালেই সম্মিতি অর্থাৎ symmetry ঘটত। তা না করে দুই কাঁধের মাঝখানে একটি মুণ্ড বসিয়ে সমাপ্তিটা সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। কৃষ্ণচূড়ার গাছে ডাঁটার দুধারে দুটি করে পত্রগুচ্ছ চলতে চলতে প্রান্তে এসে থামল একটিমাত্র গুচ্ছে। অলংকরণের ধারা যেখানে পূর্ণ হয়েছে সেখানে একটিমাত্র তর্জনী, ছোটো একটি ইশারা।

সকল ভাষারই যতি আছে, কিন্তু যতিকে বাটখারাস্বরূপ করে ছন্দের ওজন পূরণ বাংলা ছন্দ ছাড়া আর কোনো ছন্দে আছে কি না জানিনে। সংস্কৃত ছন্দে এই রীতি বিরল, তবু একেবারে পাওয়া যায় না তা নয়।

বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচিকৌমুদী
হরতি দরতিমিরমতি ঘোরম্ • •।[১]

যতিকে কেবল বিরতির স্থান না দিয়ে তাকে পূর্তির কাজে লাগাবার অভ্যাস আরম্ভ হয়েছে আমাদের ছড়ার ছন্দ থেকে। ছড়া আবৃত্তি করবার সময় আপনি যতির জোগান দেয় আমাদের কান।

১ দ্রষ্টব্য ১৫-১৬ পৃষ্ঠা।

কাক কালো বটে, পিক সেও কালো,
কালো সে ফিঙের বেশ,
তাহার অধিক কালো যে কন্যা
তোমার চিকন কেশ।

এমন করে ছন্দটাকে পুরোপুরি ভরিয়ে দিলে কানের কাছে ঋণী হতে হত না। কিন্তু এতে ছড়ার জাত যেত। ছড়ার রীতি এই যে, সে কিছু ধ্বনি জোগায় নিজে, কিছু আদায় করে কণ্ঠের কাছ থেকে; এ দুয়ের মিলনে সে হয় পূর্ণ।[১] প্রকৃতি আমের মধুরতায় জল মিশিয়েছেন, তাকে আমসত্ত্ব করে তোলেননি; সেজন্যে রসজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রই কৃতজ্ঞ। তেমনি যথেষ্ট যতি মিশোল করা হয়েছে ছড়ার ছন্দে, শিশুকাল থেকে বাঙালি তাতে আনন্দ পায়। সে সহজেই আউড়েছে

কাক কালো, কোকিল কালো,
কালো ফিঙের বেশ,
তাহার অধিক কালো কন্যে
তোমার চিকন কেশ।[২]

কিংবা

টুমুস টুমুস বাদ্যি বাজে,
লোকে বলে কী,
শামুকরাজা বিয়ে করে
ঝিনুকরাজার ঝি।

১ 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর' ইত্যাদি ছড়াটির ছন্দ-বিশ্লেষণ (পৃ ৬২-৬৩) দ্রষ্টব্য।

২ সমগ্র ছড়াটি 'লোকসাহিত্য' গ্রন্থের 'ছেলেভুলানো ছড়া'-নামক মূলপ্রবন্ধে সংকলিত হয়েছে। ছড়াটির আরম্ভ 'জাদু, এতো বড়ো রঙ্গ'। উক্ত প্রবন্ধে 'চিকন কেশ'-এর স্থলে আছে 'মাথার কেশ'।

৩

প্রত্যেক ভাষার একটি স্বকীয় ধ্বনি-উদ্ভাবনা আছে। তার থেকে তার স্বরূপ চেনা যায়। ইংরেজিতে বেশির ভাগ শব্দে স্বরবর্ণের মধ্যস্থতা নেই বলে সে যেন হয়েছে সরোদ যন্ত্রের মতো, আঙুলের আঘাতে তার ঐকমাত্রিক ধ্বনিগুলি উচ্চকিত, ইটালিয়নে ছড়ির লম্বা টানে বেহালার টানা সুর।

বাংলাভাষারও নিজের একটা বিশেষ ধ্বনিস্বরূপ আছে। তার ধ্বনির এই চেহারা হসন্তবর্ণের যোগে। যে-বাংলা আমাদের মায়ের কণ্ঠগত, জ্যেষ্ঠতাতের লেখনীগত নয়, ইংরেজির মতো তারও সুর ব্যঞ্জন-বর্ণের সংঘাতে। আজ সাধুভাষার ছন্দে জোর দেবার অভিপ্রায়ে অভিধান ঘেঁটে যুক্তবর্ণের আয়োজনে লেগেছি, অথচ প্রাকৃত-বাংলায় হসন্তের প্রাধান্য আছে বলেই যুক্তবর্ণের জোর তার মধ্যে আপনি এসে পড়ে।[১] এই ভাষায় একটি শ্লোক রচনা করা যাক একটিও যুক্তবর্ণ না দিয়ে।

দুর সাগরের পারের পবন
আসবে যখন কাছের কূলে,
রঙিন আগুন জ্বালবে ফাগুন
মাতবে অশোক সোনার ফুলে।

হসন্তের ধাক্কায় যুক্তবর্ণের ঢেউ আপনি উঠছে।

চীনদেশের সাংঘাই নগরে একটি আরামবাগ আছে। অনেককাল সেখানে চীনের লোকেরই প্রবেশ-নিষেধ ছিল। তেমনি বাংলাদেশের সাহিত্য-আরামবাগ থেকে বাংলাভাষার স্বকীয় ধ্বনিরূপটি পণ্ডিত-পাহারাওয়ালার ধাক্কা খেয়ে অনেক কাল বাইরে বাইরে ফিরেছিল।

১ দ্রষ্টব্য পৃ ৬-৭, ৪৯-৫০, ৮৩।

ভাষার শব্দে অর্থ আছে, স্বর আছে। অর্থ জিনিসটা সকল ভাষাতেই এক, স্বরটা প্রত্যেক ভাষাতেই স্বতন্ত্র। 'জল' শব্দে যা বোঝায় 'water' শব্দেও তাই বুঝি, কিন্তু ওদের সুর আলাদা। ভাষা এই সুর নিয়ে শিল্প রচনা করে, ধ্বনির শিল্প। সেই রূপসৃষ্টির যে ধ্বনিতত্ত্ব বাংলা-ভাষার আপন সম্বল পণ্ডিতরা তাকে অবজ্ঞা করতে পারেন। কেননা তাঁরা অর্থের মহাজন, কিন্তু যাঁরা রূপরসিক তাঁদের মূলধন ধ্বনি। প্রাকৃত-বাংলার দুয়োরানীকে যারা সুয়োরানীর অপ্রতিহতপ্রভাবে সাহিত্যের গোয়ালঘরে বাসা না দিয়ে হৃদয়ে স্থান দিয়েছে সেই 'অশিক্ষিত'-লাঞ্ছনাধারীর দল যথার্থ বাংলাভাষার সম্পদ্ নিয়ে আনন্দ করতে বাধা পায় না। তাদের প্রাণের গভীর কথা তাদের প্রাণের সহজ ভাষায় উদ্ধৃত করে দিই।

আছে যার মনের মানুষ আপন মনে
সে কি আর জপে মালা।
নির্জনে সে বসে বসে দেখছে খেলা।
কাছে রয়, ডাকে তারে
উচ্চস্বরে
কোন্ পাগেলা,
ওরে যে যা বোঝে তাই সে বুঝে
থাকে ভোলা।
যেথা যার ব্যথা নেহাত
সেইখানে হাত
ডলামলা,
তেমনি জেনো মনের মানুষ মনে তোলা।
যে জনা দেখে সে রূপ
করিয়া চুপ,
রয় নিরালা।

ওরে লালন[১]-ভেড়ের লোকদেখানো
মুখে হরি হরি বোলা।[২]

আর-একটি

এমন মানব-জনম আর কি হবে।
যা কর মন ত্বরায় কর
এই ভবে।
অনন্তরূপ ছিষ্টি করেন সাঁই,
শুনি মানবের তুলনা কিছুই নাই।
দেবদেবতাগণ
করে আরাধন
জন্ম নিতে মানবে। ...
এই মানুষে হবে মাধুর্যভজন
তাইতে মানুষ-রূপ গঠিল নিরঞ্জন।
এবার ঠকলে আর
না দেখি কিনার
লালন কয় কাতরভাবে।[২]

এই ছন্দের ভঙ্গি একঘেয়ে নয়। ছোটো-বড়ো নানাভাগে বাঁকে বাঁকে চলেছে। সাধুপ্রসাধনে মেজে-ঘষে এর শোভা বাড়ানো চলে, আশা করি এমন কথা বলবার সাহস হবে না কারো।

এই খাঁটি বাংলায় সকল রকম ছন্দেই সকল কাব্যই লেখা সম্ভব এই আমার বিশ্বাস। ব্যঙ্গকবিতায় এ-ভাষার জোর কত ঈশ্বর গুপ্তের

১ লালনচন্দ্র দাস বা রায়। পরে ইনি লালন শাহ ফকির নামে পরিচিত হন। দ্রষ্টব্য: প্রবাসী ১৩৩২ শ্রাবণ পৃ ৪৯৭, ললিত চট্টোপাধ্যায় ও চারু বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পাদিত 'বঙ্গবীণা' পৃ ৪৯৩, মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন-প্রণীত 'হারামণি' ভূমিকা পৃ ১৮০।

২ এই গান-দুটি রবীন্দ্রনাথকর্তৃক সংগৃহীত ও প্রকাশিত: প্রবাসী ১৩২২ আশ্বিন ও পৌষ। এই পাঠ ও প্রবাসীর পাঠে কিছু পার্থক্য আছে। গ্রন্থপরিচয় দ্রষ্টব্য।

কবিতা থেকে তার নমুনা দিই। কুইন ভিক্টোরিয়াকে সম্বোধন করে কবি বলছেন

তুমি মা কল্পতরু,
আমরা সব পোষা গোরু
শিখিনি শিঙ-বাঁকানো,
কেবল খাব খোলবিচিলি ঘাস।
যেন রাঙা আমলা তুলে মামলা
গামলা ভাঙে না,
আমরা ভুষি পেলেই খুশি হব
ঘুষি খেলে বাঁচব না।[১]

কেবল এর হাসিটা নয়, এর ছন্দের বিচিত্র ভঙ্গিটা লক্ষ্য করে দেখবার বিষয়।

অথচ এই প্রাকৃত-বাংলাতেই 'মেঘনাদবধ' কাব্য লিখলে যে বাঙালিকে লজ্জা দেওয়া হত সে কথা স্বীকার করব না। কাব্যটা এমন ভাবে আরম্ভ করা যেত

যুদ্ধ তখন সাঙ্গ হল বীরবাহু বীর যবে
বিপুল বীর্য দেখিয়ে হঠাৎ গেলেন মৃত্যুপুরে
যৌবনকাল পার না হতেই। কও মা সরস্বতী,
অমৃতময় বাক্য তোমার, সেনাধ্যক্ষপদে
কোন্ বীরকে বরণ করে পাঠিয়ে দিলেন রণে
রঘুকুলের পরম শত্রু, রক্ষকুলের নিধি।

এতে গাম্ভীর্যের ত্রুটি ঘটেছে একথা মানব না। এই যে-বাংলা বাঙালির দিনরাত্রির ভাষা এর একটি মস্ত গুণ এ-ভাষা প্রাণবান্। এইজন্যে

১ 'নীলকর' নামক কবিতা থেকে উদ্ধৃত।

সংস্কৃত বল, পারসি বল, ইংরেজি বল সব শব্দকেই প্রাণের প্রয়োজনে আত্মসাৎ করতে পারে।[১] খাঁটি হিন্দি ভাষারও সেই গুণ। যারা হেডপণ্ডিত মশায়ের কাছে পড়েনি তাদের একটা লেখা তুলে দিই।

চক্ষু আঁধার দিলের ধোঁকায়
কেশের আড়ে পাহাড় লুকায়,
কী রঙ্গ সাঁই দেখছে সদাই
বসে নিগম ঠাঁই।
এখানে না দেখলেম তারে
চিনব তবে কেমন করে,
ভাগ্যেতে আখেরে তারে
চিনতে যদি পাই।[২]

প্রাকৃত-বাংলাকে গুরুচণ্ডালি দোষ স্পর্শই করে না। সাধু ছাঁদের ভাষাতেই শব্দের মিশোল সয় না।

চলতি বাংলাভাষার প্রসঙ্গটা দীর্ঘ হয়ে পড়ল। তার কারণ এ-ভাষাকে যাঁরা প্রতিদিন ঘরে দেন স্থান, তাঁদের অনেকে সাহিত্যে একে অবজ্ঞা করেন। সেটাতে সাহিত্যকে তার প্রাণরসের মূল আধার থেকে সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে জেনে আমার আপত্তিকে বড়ো করেই জানালুম। ছন্দের তত্ত্ববিচারে ভাষার অন্তর্নিহিত ধ্বনিপ্রকৃতির বিচার অত্যাবশ্যক, সেই কথাটা এই উপলক্ষ্যে বোঝাবার চেষ্টা করেছি।

৪

বাংলা ছন্দের তিনটি শাখা। একটি আছে পুঁথিগত কৃত্রিম ভাষাকে অবলম্বন করে, সেই ভাষায় বাংলার স্বাভাবিক ধ্বনিরূপকে স্বীকার করেনি।[৩] আর-একটি সচল বাংলার ভাষাকে নিয়ে, এই ভাষা বাংলার হসন্ত-শব্দের ধ্বনিকে আপন বলে গ্রহণ করেছে।[৪] আর-একটি শাখার উদ্গম হয়েছে সংস্কৃত ছন্দকে বাংলায় ভেঙে নিয়ে।[৫]

১ দ্রষ্টব্য ৫১ পৃষ্ঠা। ২ লালন-রচিত : প্রবাসী ১৩২২ আশ্বিন।
৩ সাধুছন্দ বা সংস্কৃত-বাংলার ছন্দ। ৪ ছড়ার ছন্দ বা প্রাকৃত-বাংলার ছন্দ।
৫ রবীন্দ্রনাথ অন্য কোথাও এ-শাখাটিকে স্বতন্ত্র নামে উল্লেখ করেননি। অসম ও বিষম মাত্রার ছন্দগুলি এর অন্তর্গত। এই শাখার প্রচলিত নাম 'মাত্রাবৃত্ত'। পরবর্তী অংশে আলোচিত শিখরিণী প্রভৃতি সংস্কৃত-ভাঙা ছন্দগুলিও এই শ্রেণীভুক্ত।

শিখরিণী মালিনী মন্দাক্রান্তা শার্দূলবিক্রীড়িত প্রভৃতি বড়ো বড়ো গম্ভীরচালের ছন্দ গুরুলঘুস্বরের যথানির্দিষ্ট বিন্যাসে অসমান মাত্রাভাগের ছন্দ। বাংলায় আমরা বিষমমাত্রামূলক ছন্দ কিছু কিছু চালিয়েছি, কিন্তু বিষমমাত্রার ঘনঘন পুনরাবৃত্তির দ্বারা তারো একটা সম্মিতি রক্ষা হয়।

শিমুল রাঙা রঙে
চোখেরে দিল ভরে।
নাকটা হেসে বলে,
হায় রে যাই মরে।
নাকের মতে, গুণ
কেবলি আছে ঘ্রাণে,
রূপ যে রঙ খোঁজে
নাকটা তা কি জানে।

এখানে বিষমমাত্রার পদগুলি জোড়ে-জোড়ে এসে চলনের অসমানতা ঘুচিয়ে দিয়েছে। কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় বিষমমাত্রার বিস্তার আরো অনেক বড়ো। এই সংস্কৃত ছন্দের দীর্ঘহ্রস্ব স্বরকে সমান করে নিয়ে কেবলমাত্র মাত্রা মিলিয়ে ছন্দ রচনা বাংলায় দেখেছি, সে বহুকাল পূর্বে 'স্বপ্নপ্রয়াণে'।

লজ্জা বলিল, "হবে
কি লো তবে,
কতদিন পরান রবে
অমন করি।
হইয়ে জলহীন
যথা মীন
রহিবি ওলো কতদিন
মরমে মরি"।[১]

এর প্রত্যেক ভাগে মাত্রাসংখ্যা স্বতন্ত্র।

১ স্বপ্নপ্রয়াণ, দ্বিতীয় সর্গ, ১২৫। শিখরিণী ছন্দ। 'লজ্জা' শব্দে দুই মাত্রা গণনীয়। পৃ ১৩৫ পাদটীকা ১ দ্রষ্টব্য।

সংস্কৃত ছন্দে বিবিধ মাত্রার এই গতিবৈচিত্র্য যা সম্মিতি উপেক্ষা করেও ভঙ্গিলীলা বাঁচিয়ে চলে বাংলায় তার অনুকৃতি এখনো যথেষ্ট প্রচলিত হয়নি। নূতন ছন্দ বাংলায় সৃষ্টি করবার শখ যাঁদের প্রবল, এই পথে তাঁরা অনেক নূতনত্বের সন্ধান পাবেন। তবু বলে রাখি তাতে তাঁরা সংস্কৃত ছন্দের মোট আয়তনটা পাবেন, তার ধ্বনিতরঙ্গ পাবেন না। মন্দাক্রান্তার মাত্রাগোনা একটা বাংলা ছন্দের নমুনা দেওয়া যাক।

সারা প্রভাতের বাণী
বিকালে গেঁথে আনি'
ভাবিনু হারখানি
দিব গলে।
ভয়ে ভয়ে অবশেষে
তোমার কাছে এসে
কথা যে যায় ভেসে
আঁখিজলে।
দিন যবে হয় গত
না-বলা কথা যত
খেলার ভেলা-মতো
হেলাভরে
লীলা তার করে সারা
যে-পথে ঠাঁই-হারা
রাতের যত তারা
যায় সরে॥[১]

শিখরিণীকেও এই ভাবে বাংলায় রূপান্তরিত করা যেতে পারে।

কেবলি অহরহ মনে মনে
নীরবে তোমা সনে
যা-খুশি কহি কত ;

১ আরেকটি নমুনা ৯৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

শিখরিণীকেও এইভাবে বাংলায় রূপান্তরিত
করা যেতে পারে।

কেবলি অহরহ মনে মনে
নীরবে তোমা সনে
যা-খুসি কহি কত;
বিরহব্যথা মম নিতি নিতি
তোমারি মূরতিতে
গড়িছে অবিরত।
এ দূরে ধায় যবে তোমাপানে
তাকে কি কোনোখানে
কাঁপে কি মন তব?
জানো কি দিবানিশি ঐ দূরে
তোমারে ডাকে সুরে
বেদনা অভিনব?

ছন্দ সম্বন্ধে আরো কিছু বলা বাকি রইল আর কোনো
সময়ে পরে বলবার ইচ্ছা আছে। উপসংহারে
আজ কেবল এই কথাটি বলতে চাই যে, কেউ কেউ

'ছন্দের প্রকৃতি' প্রবন্ধের এক পৃষ্ঠা

বিরহব্যথা মম নিজে নিজে
তোমারি মুরতি যে
গড়িছে অবিরত।
এ-পূজা ধায় যবে তোমা পানে
বাজে কি কোনোখানে,
কাঁপে কি মন তব।
জান কি দিবানিশি বহুদূরে
গোপনে বাজে সুরে
বেদনা অভিনব।[১]

ছন্দ সম্বন্ধে আরো কিছু বলা বাকি রইল, আর কোনো সময়ে পরে বলবার ইচ্ছা আছে।[২] উপসংহারে আজ কেবল এই কথাটি বলতে চাই যে, ছন্দের একটা দিক্ আছে যেটাকে বলা যেতে পারে কৌশল। কিন্তু তার চেয়ে আছে বড়ো জিনিস যেটাকে বলি সৌষ্ঠব। বাহাদুরি তার মধ্যে নেই, সমগ্র কাব্যসৃষ্টির কাছে ছন্দের আত্মবিস্মৃত আত্ম-নিবেদনে তার উদ্ভব। কাব্য পড়তে গিয়ে যদি অনুভব করি যে ছন্দ পড়ছি, তাহলে সেই প্রগল্‌ভ ছন্দকে ধিক্‌কার দেব। মস্তিষ্ক হৃৎপিণ্ড পাকস্থলী অতি আশ্চর্য যন্ত্র, সৃষ্টিকর্তা তাদের স্বাতন্ত্র্য ঢাকা দিয়েছেন। দেহ তাদেরকে ব্যবহার করে, প্রকাশ করে না। করে প্রকাশ যখন রোগে ধরে; তখন যকৃৎটা হয় প্রবল, তার কাছে মাথা হেঁট করে লাবণ্য। শরীরে স্বাস্থ্যের মতোই কবি ছন্দকে ভুলে থাকে, ছন্দ যখন তার যথার্থ আপন হয়।

উদয়ন—১৩৪১ বৈশাখ

১ এটির সঙ্গে 'স্বপ্নপ্রয়াণ'এর 'লজ্জা বলিল' ইত্যাদি দৃষ্টান্তটির (পৃ ১৩৩) মাত্রাবিভাগগত পার্থক্য লক্ষিতব্য। সংস্কৃত-ছন্দশাস্ত্রমতে শিখরিণীর প্রতিপংক্তির দুই ভাগ; প্রথম ভাগে এগার এবং দ্বিতীয় ভাগে চোদ্দ মাত্রা (পূর্ণ বিবরণ 'সংজ্ঞাপরিচয়' অংশে দ্রষ্টব্য)। দ্বিজেন্দ্রনাথ প্রথম ভাগের এগার মাত্রাকে ভেঙে সাত ও চার মাত্রার দুই পর্ব এবং দ্বিতীয় ভাগে চোদ্দ মাত্রাকে ভেঙে নয় ও পাঁচ মাত্রার দুই পর্ব রচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ প্রথমে এগার মাত্রা একত্র স্থাপন করে দ্বিতীয় ভাগটিকে সাত মাত্রার দুটি পর্বে বিভক্ত করেছেন। এ-বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা "বাংলা-কবিতায় সংস্কৃত ছন্দ" প্রবন্ধে (ভারতবর্ষ ১৩৪১ অগ্রহায়ণ পৃ ৮৫৭-৫৮) দ্রষ্টব্য।

২ পরবর্তী প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

চলতিভাষার ছন্দ

মানুষের উদ্ভাবনী-প্রতিভার একটা কীর্তি হল চাকা-বানানো। চাকার সঙ্গে একটা নতুন চলৎশক্তি এল তার সংসারে। বস্তুর বোঝা সহজে নড়ে না, তাকে পরস্পরের মধ্যে চালাচালি করতে দুঃখ পেতে হয়। চাকা সেই জড়ত্বের মধ্যে প্রাণ এনে দিলে। আদানপ্রদানের কাজ চলল বেগে। ভাষার দেশে সেই চাকা এসেছে ছন্দের রূপে। সহজ হল মোটবাঁধা কথাগুলিকে চালিয়ে দেওয়া। মুখে-মুখে চলল ভাষার দেনাপাওনা।

কবিতার বিশেষত্ব হচ্ছে তার গতিশীলতা। সে শেষ হয়েও শেষ হয় না। গদ্যে যখন বলি "একদিন শ্রাবণের রাত্রে বৃষ্টি পড়েছিল," তখন এই বলার মধ্যে এই খবরটা ফুরিয়ে যায়। কিন্তু কবি যখন বললেন

> রজনী শাঙনঘন ঘন দেয়া-গরজন
> রিমিঝিমি শবদে বরিষে

তখন কথা থেমে গেলেও বলা থামে না।[১] এ-বৃষ্টি যেন নিত্যকালের বৃষ্টি, পঞ্জিকা-আশ্রিত কোনো দিনক্ষণের মধ্যে বদ্ধ হয়ে এ-বৃষ্টি শুদ্ধ হয়ে যায়নি। এই খবরটির উপর ছন্দ যে-দোলা সৃষ্টি করে দেয় সে-দোলা ঐ খবরটিকে প্রবহমান করে রাখে।

অণুপরমাণু থেকে আরম্ভ করে নক্ষত্রলোক পর্যন্ত সর্বত্রই নিরন্তর গতিবেগের মধ্যে ছন্দ রয়েছে। বস্তুত এই ছন্দই রূপ। উপাদানকে ছন্দের মধ্যে তরঙ্গিত করলেই সৃষ্টি রূপ ধারণ করে। ছন্দের বৈচিত্র্যই রূপের বৈচিত্র্য। বাতাস যখন ছন্দে কাঁপে তখনি সে সুর হয়ে ওঠে।

[১] দ্রষ্টব্য ৬৩ পৃষ্ঠা।

ভাবকে কথাকে ছন্দের মধ্যে জাগিয়ে তুললেই তা কবিতা হয়। সেই ছন্দ থেকে ছাড়িয়ে নিলেই সে হয় সংবাদ; সেই সংবাদে প্রাণ নেই, নিত্যতা নেই।

মেঘদূতের কথা ভেবে দেখ। মনিব একজন চাকরকে বাড়ি থেকে বের করে দিলে, গদ্যে এই খবরের মতো এমন খবর তো সর্বদা শুনছি। কেবল তফাত এই যে, রামগিরি-অলকার বদলে হয়তো আমরা আধুনিক রামপুরহাট-হাটখোলার নাম পাচ্ছি। কিন্তু মেঘদূত কেন লোকে বছর বছর ধরে পড়ছে। কারণ মেঘদূতের মন্দাক্রান্তা ছন্দের মধ্যে বিশ্বের গতি নৃত্য করছে। তাই এই কাব্য চিরকালের সজীব বস্তু। গতিচাঞ্চল্যের ভিতরকার কথা হচ্ছে 'আমি আছি' এই সত্যটির বিচিত্র অনুভূতি। 'আমি আছি' এই অনুভূতিটা তো বদ্ধ নয়, এ যে সহস্ররূপে চলায়-ফেরায় আপনাকে জানা। যতদিন পর্যন্ত আমার সত্তা স্পন্দিত, নন্দিত হচ্ছে, ততদিন 'আমি-আছি'র বেগের সঙ্গে সৃষ্টির সকল বস্তু বলছে "তুমি যেমন আছ, আমিও তেমনি আছি"। 'আমি আছি' এই সত্যটি কেবলি প্রকাশিত হচ্ছে 'আমি-চলছি'র দ্বারা। চলাটি যখন বাধাহীন হয়, চারদিকের সঙ্গে যখন সুসংগত হয়, সুন্দর হয়, তখনি আনন্দ। ছন্দোময় চলমানতার মধ্যেই সত্যের আনন্দরূপ। আর্টে কাব্যে গানে প্রকাশের সেই আনন্দমূর্তি ছন্দের দ্বারা ব্যক্ত হয়।

একদা ছিল না ছাপাখানা; অক্ষরের ব্যবহার হয় ছিল না, নয় ছিল অল্প। অথচ মানুষ যেসব কথা সকলকে জানাবার যোগ্য মনে করেছে দলের প্রতি শ্রদ্ধায়, তাকে বেঁধে রাখতে চেয়েছে এবং চালিয়ে দিতে চেয়েছে পরস্পরের কাছে।

একশ্রেণীর কথা ছিল যেগুলো সামাজিক উপদেশ। আর ছিল চাষবাসের পরামর্শ, শুভ-অশুভের লক্ষণ, লগ্নের ভালোমন্দ ফল। এইসমস্ত পরীক্ষিত এবং কল্পিত কথাগুলোকে সংক্ষেপ করে বলতে হয়েছে,

ছন্দে বাঁধতে হয়েছে, স্থায়িত্ব দেবার জন্যে। দেবতার স্তুতি, পৌরাণিক আখ্যান বহন করেছে ছন্দ। ছন্দ তাদের রক্ষা করেছে যেন পেটিকার মধ্যে। সাহিত্যের প্রথম পর্বে ছন্দ মানুষের শুধু খেয়ালের নয় প্রয়োজনের একটা বড়ো সৃষ্টি, আধুনিককালে যেমন সৃষ্টি তার ছাপাখানা। ছন্দ তার সংস্কৃতির ধাত্রী, ছন্দ তার স্মৃতির ভাণ্ডারী।

চলতিভাষার স্বভাব রক্ষা করে বাংলা ছন্দে কবিতা যা লেখা হয়েছে সে আমাদের লোকগাথায়, বাউলের গানে, ছেলে ভোলাবার ও ঘুম-পাড়াবার ছড়ায়, ব্রতকথায়। সাধুভাষী সাহিত্যমহলের বাইরে তাদের বসতি। তারা যে সমস্তই প্রাচীন তা নয়। লক্ষণ দেখে স্পষ্ট বোঝা যায় তাদের অনেক আছে যারা আমাদের সমান-বয়সেরই আধুনিক, এমন কি ছন্দে মিলে ভাবে আমাদেরই শাকরেদি সন্দেহ করি। একটা দৃষ্টান্ত দেখাই।

অচিন ডাকে নদীর বাঁকে
ডাক যে শোনা যায়।
অকূল পাড়ি থামতে নারি,
সদাই ধায়া ধায়।
ধারার টানে তরী চলে,
ডাকের চোটে মন যে টলে,
টানাটানি ঘুচাও জগার[১]
হল বিষম দায়॥

এর মিল, এর মাজাঘষা ছাঁদ ও শব্দবিন্যাস আধুনিক। তবুও যেটা লক্ষ্য করবার বিষয় সে হচ্ছে এর চলতি ভাষা। চলতিভাষার কবিতা বাংলা শব্দের স্বাভাবিক হসন্তরূপ মেনে নিয়েছে। হসন্ত শব্দ স্বরবর্ণের বাধা না পাওয়াতে পরস্পর জুড়ে যায়, তাতে যুক্তবর্ণের ধ্বনি কানে

১ জগা কৈবর্ত। দ্রষ্টব্য রবীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত 'বাংলাকাব্য-পরিচয়' পৃ ৬৮।

লাগে। চলতিভাষার ছন্দ সেই যুক্তবর্ণের ছন্দ। উপরের ঐ কবিতাকে সাধুভাষার ছন্দে ঢালাই করলে তার চেহারা হয় নিম্নলিখিত মতো।

অচিনের ডাকে নদীটির বাঁকে
ডাক যেন শোনা যায়।
কলহীন পাড়ি থামিতে না পারি,
নিশিদিন ধারা ধায়।
সে ধারার টানে তরীখানি চলে;
সেই ডাক শুনে মন মোর টলে,
এই টানাটানি ঘুচাও জগার,
হয়েছে বিষম দায়।

যদি উচ্চারণ মেনে বানান করা যেত তাহলে বাউলের গানের চেহারা হত

অচিণ্‌ডাকে নদীর্‌বাঁকে ডাক্‌যে শোনা যায়।

সাধুভাষার কবিতায় বাংলাশব্দের হসন্তরীতি যে মানা হয়নি তা নয়, কিন্তু তাদের পরস্পরকে ঠোকাঠুকি ঘেঁষাঘেঁষি করতে দেওয়া হয় না। বাউলের গানে আছে 'ডাকের চোটে মন যে টলে'। এখানে 'ডাকের' আর 'চোটে, 'মন' আর 'যে' এদের মধ্যে উচ্চারণের কোনো ফাঁক থাকে না। কিন্তু সাধুভাষার গানে 'মন' আর 'মোর' হসন্ত শব্দ হলেও হসন্ত শব্দের স্বভাব রক্ষা করে না, সন্ধির নিয়মে পরস্পর এঁটে যায় না।

বাংলাভাষার সবচেয়ে পুরোনো ছন্দ পয়ারের ছাঁদের, অর্থাৎ 'দুই' সংখ্যার ওজনে। যেমন—

খনা ডেকে বলে যান
রোদে ধান ছায়ায় পান।
দিনে রোদ রাতে জল
তাতে বাড়ে ধানের বল।

এমনি করে হতে হতে ছন্দের মধ্যে এসে পড়ে তিনের মাত্রা। যেমন—

আনহি বসত আনহি চাষ,
বলে ডাক তাহার বিনাশ।

কিংবা

আষাঢ়ে কাড়ান নামকে,
শ্রাবণে কাড়ান ধানকে,
ভাদরে কাড়ান শিষকে,
আশ্বিনে কাড়ান কিসকে।

এর অর্থ বোঝাবার দায়িত্ব নিতে পারব না।

দুইমাত্রার ছড়ার ছন্দ পরিণতরূপ নিয়েছে পয়ারে। বাঙালি বহুকাল ধরে এই ছন্দে গেয়ে এসেছে রামায়ণ মহাভারত একটানা সুরে। এই ছন্দে প্রবাহিত প্রাদেশিক পুরাণকাহিনী রঙিয়েছে বাঙালির হৃদয়কে। দারিদ্র্য ছিল তার জীবনযাত্রায়, তার ভাগ্যদেবতা ছিল অত্যাচার-পরায়ণ, সে এমন নৌকোয় ভাসছিল যার হাল ছিল না তার নিজের হাতে; যখন তার আকাশ থাকত শান্ত তখন গ্রামের এঘাটে-ওঘাটে চলত তার আনাগোনা সামান্য কারবার নিয়ে; কখনো বা দিনের পর দিন দুর্যোগ লেগেই থাকত, ভাগ্যের অনিশ্চয়তায় হঠাৎ কে কোথায় পৌঁছয় তার ঠিক ছিল না, হঠাৎ নৌকোসুদ্ধ হত ভরাডুবি। এরা ছড়া বাঁধেনি নিজের কোনো স্মরণীয় ইতিহাস নিয়ে। এরা গান বাঁধেনি ব্যক্তিগত জীবনের সুখ-দুঃখ-বেদনায়। এরা নিঃসন্দেহই ভালোবেসেছে, কিন্তু নিজের জবানিতে প্রকাশ করেনি তারি হাসিকান্না। দেবতার চরিতবৃত্তান্তে এরা ঢেলেছে এদের অন্তরের আবেগ; হরপার্বতীর লীলায় এরা নিজের গৃহস্থালির রূপ ফুটিয়েছে, রাধাকৃষ্ণের প্রেমের গানে এরা সেই প্রেমের কল্পনাকে মনের মধ্যে ঢেউ লাগিয়েছে যে-প্রেম সমাজবন্ধনে বন্দী নয়, যে-প্রেম শ্রেয়োবুদ্ধিবিচারের বাইরে। একমাত্র কাহিনী ছিল

রামায়ণ-মহাভারতকে অবলম্বন করে, যা মানবচরিত্রের নতোন্নতকে নিয়ে হিমালয়ের মতো ছিল দিক্ থেকে দিগন্তরে প্রসারিত। কিন্তু সে হিমালয় বাংলাদেশের উত্তরতম সীমার দূর গিরিমালার মতোই; তার অভ্রভেদী মহত্ত্বের কঠিনমূর্তি সমতল বাংলার রসাতিশয্যের সঙ্গে মেলে না। তা বিশেষভাবে বাংলার নয়, সনাতন ভারতের। অন্নদামঙ্গলের সঙ্গে কবিকঙ্কণের সঙ্গে রামায়ণ-মহাভারতের তুলনা করলে উভয়ের পার্থক্য বোঝা যাবে। অন্নদামঙ্গল-চণ্ডীমঙ্গল বাংলার, তাতে মনুষ্যত্বের বীর্য প্রকাশ পায়নি, প্রকাশ পেয়েছে অকিঞ্চিৎকর প্রাত্যহিকতার অনুজ্জ্বল জীবনযাত্রা।

এই কাব্যের পণ্য ভেসেছিল পয়ার ছন্দে। ভাঙাচোরা ছিল এর পদবিন্যাস। গানের সুর দিয়ে এর অসমানতা মিলিয়ে দেওয়া হত, দরকার হত না অক্ষর সাজাবার কাজে সতর্ক হবার। পুরোনো কাব্যের পুঁথি দেখলেই তা টের পাওয়া যায়। অত্যন্ত উঁচুনিচু তার পথ। ভারতচন্দ্রই প্রথম ছন্দকে সৌষম্যের নিয়মে বেঁধেছিলেন। তিনি ছিলেন সংস্কৃত ও পারসিক ভাষায় পণ্ডিত। ভাষাবিন্যাসে ছন্দে প্রাদেশিকতার শৈথিল্য তিনি মানতে পারেননি।

পয়ার ছন্দের একেশ্বরত্ব ছাড়িয়ে গিয়ে বিচিত্র হয়েছে ছন্দ বৈষ্ণব-পদাবলীতে।[১] তার একটা কারণ এগুলি একটানা গল্প নয়। এই পদগুলিতে বিচিত্র হৃদয়াবেগের সংঘাত লেগেছে। দোলায়িত হয়েছে সেই আবেগ তিনমাত্রার ছন্দে। দ্বৈমাত্রিক এবং ত্রৈমাত্রিক ছন্দে বাংলা কাব্যের আরম্ভ। এখনো পর্যন্ত ঐ দুই জাতের মাত্রাকে নানাপ্রকারে সাজিয়ে বাংলায় ছন্দের লীলা চলছে। আর আছে দুই—এবং তিনের জোড়-বিজোড় সংখ্যা মিলিয়ে পাঁচ কিংবা নয়ের অসমমাত্রার ছন্দ।

১ দ্রষ্টব্য ৩৬ পৃষ্ঠা।

মোট কথা বলা যায় দুই এবং তিন সংখ্যাই বাংলার সকল ছন্দের মূলে। তার রূপের বৈচিত্র্য ঘটে যতিবিভাগের বৈচিত্র্যে এবং নানা ওজনের পংক্তিবিন্যাসে। এইরকম বিভিন্ন বিভাগের যতি ও পংক্তি নিয়ে বাংলায় ছন্দ কেবলি বেড়ে চলেছে।

একসময়ে শ্রেণীবদ্ধ মাত্রা গুনে ছন্দ-নির্ণয় হত। বালকবয়সে একদিন সেই চোদ্দ অক্ষর মিলিয়ে ছেলেমানুষি পয়ার রচনা করে নিজের কৃতিত্বে বিস্মিত হয়েছিলুম।[১] তারপরে দেখা গেল কেবল অক্ষর গণনা করে যে-ছন্দ তৈরি হয় তার শিল্পকলা আদিম-জাতের। পদের নানা ভাগ আর মাত্রার নানা সংখ্যা দিয়ে ছন্দের বিচিত্র অলংকৃতি। অনেক সময়ে ছন্দের নৈপুণ্য কাব্যের মর্যাদা ছাড়িয়ে যায়।

চলতিভাষার কাব্য, যাকে বলে ছড়া, তাতে বাংলার হসন্তসংঘাতের স্বাভাবিক ধ্বনিকে স্বীকার করেছে। সেটা পয়ার হলেও অক্ষরগোনা পয়ার হবে না, সে হবে মাত্রাগোনা পয়ার। কিন্তু কথাটা ঠিল হল না, বস্তুত সাধুভাষার পয়ারও মাত্রাগোনা। সাহিত্যিক কবুলতিপত্রে সাধুভাষায় অক্ষর এবং মাত্রা এক পরিমাণের বলে গণ্য হয়েছে। এইমাত্র রফা হয়েছে যে, সাধুভাষার পদ্য উচ্চারণকালে হসন্তের টানে শব্দগুলি গায়ে গায়ে লেগে যাবে না, অর্থাৎ বাংলার স্বাভাবিক ধ্বনির নিয়ম এড়িয়ে চলতে হবে।

সতত হে নদ তুমি পড় মোর মনে। …
জুড়াই এ কান আমি ভ্রান্তির ছলনে॥[২]

চলতি বাংলায় ‘নদ’ আর ‘তুমি’, ‘মোর’ আর ‘মনে’ হসন্তের বাঁধনে বাঁধা। এই পয়ারে ঐ শব্দগুলিকে হসন্ত বলে যে মানা হয়নি তা নয়,

১ দ্রষ্টব্য : জীবনস্মৃতি, কবিতা-রচনারম্ভ।

২ মধুসূদন : চতুর্দশপদী কবিতাবলী, কপোতাক্ষ নদ।

কিন্তু ওর বাঁধন আলগা করে দেওয়া হয়েছে। 'কান' আর 'আমি', 'ভ্রান্তির' আর 'ছলনে' হসন্তের রীতিতে হওয়া উচিত ছিল যুক্তশব্দ, কিন্তু সাধুছন্দের নিয়মে ওদের জোড় বাঁধতে বাধা দেওয়া হয়েছে। একটা খাঁটি ছড়ার নমুনা দেখা যাক।

এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা মধ্যিখানে চর,
তারি মধ্যে বসে আছেন শিবু সদাগর।[১]

এটা পয়ার, কিন্তু চোদ্দ অক্ষরের সীমানা পেরিয়ে গেছে। তবু উচ্চারণ মিলিয়ে বানান করলে চোদ্দ অক্ষরের বেশি হবে না।

এপার্গঙ্গা ওপার্গঙ্গা মধ্যিখানে চর,
তারি মধ্যে বসে আছেন্শিবু সদাগর।

ছড়ায় প্রায় দেখা যায় মাত্রার ঘনতা কোথাও কম কোথাও বেশি, আবৃত্তিকারের উপর ছন্দ মিলিয়ে নেবার বরাত দেওয়া আছে। ছন্দের নিজের মধ্যে যে ঝোঁক আছে তার তাড়ায় কণ্ঠ আপনি প্রয়োজনমতো স্বর বাড়ায় কমায়।

শিবু ঠাকুরের বিয়ে হবে তিন কন্মে দান

এখানে 'বিয়ে হবে' শব্দে মাত্রা ঢিলে হয়ে গেছে। যদি থাকত

শিবু ঠাকুরের বিয়ের সভায় তিন কন্মে দান

তাহলে মাত্রা পুরো হত। কিন্তু বাংলাদেশে ছেলে বুড়ো এমন কেউ নেই যে আপনিই 'বিয়ে- হবে-' স্বরে টান না দেয়।

বক ধলো, বস্ত্র ধলো, ধলো রাজহংস,
তাহার অধিক ধলো কন্মে তোমার হাতের শঙ্খ।[১]

দুটো লাইনের মাত্রার কমি-বেশি স্পষ্ট; কিন্তু ভয়ের কারণ নেই, স্বতই আবৃত্তির টানে দুটো লাইনের ওজন মিলে যায়। ছন্দে চলতিভাষা আইনজারি না করেও আইন মানিয়ে নিতে পারে।

বাংলাভাষা-পরিচয়—১৩৪৫ কার্তিক

১ দ্রষ্টব্য: লোকসাহিত্য, ছেলেভুলানো ছড়া।

গদ্য-ছন্দ

কথা যখন খাড়া দাঁড়িয়ে থাকে তখন সে কেবলমাত্র আপন অর্থটুকু নিবেদন করে। যখন তাকে ছন্দের আঘাতে নাড়া দেওয়া যায় তখন তার কাছ থেকে অর্থের বেশি আরো কিছু বেরিয়ে পড়ে। সেটা জানার জিনিস নয়, বেদনার জিনিস। সেটাতে পদার্থের পরিচয় নয়, রসের সম্ভোগ।[১]

আবেগকে প্রকাশ করতে গেলে কথার মধ্যে আবেগের ধর্ম সঞ্চার করতে হয়। আবেগের ধর্ম হচ্ছে বেগ; সে চলে, চালায়। কথা যখন সেই বেগ গ্রহণ করে তখন স্পন্দিত হৃদয়ভাবের সঙ্গে তার সাধর্ম্য ঘটে।

চলতিভাষায় আমরা বলি কথাকে ছন্দে বাঁধা। বাঁধা বটে, কিন্তু সে বাঁধন বাইরে, রূপের দিকে; ভাবের দিকে মুক্তি। যেমন সেতারে তার বাঁধা, তার থেকে সুর পায় ছাড়া। ছন্দ সেই সেতারের বাঁধা তার, সুরের বেগে কথাকে অন্তরে দেয় মুক্তি।

উপনিষদে আছে আত্মার লক্ষ্য ব্রহ্ম, ওংকারের ধ্বনিবেগ তাকে ধনুর মতো লক্ষ্যে পৌঁছিয়ে দেয়। এতে বলা হচ্ছে বাক্যের দ্বারা যুক্তির দ্বারা ব্রহ্ম জানবার বিষয় নন, তিনি আত্মার সঙ্গে একাত্ম হবার বিষয়। এই উপলব্ধিতে ধ্বনিই সহায়তা করে, শব্দার্থ করে না।

জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয় উভয়ের মধ্যে মোকাবিলা হয় মাত্র; অর্থাৎ সান্নিধ্য হয়, সাযুজ্য হয় না। কিন্তু এমন-সকল বিষয় আছে যাকে জানার দ্বারা পাওয়া যায় না, যাকে আত্মস্থ করতে হয়। আম বস্তুটাকে সামনে রেখে জানা চলে, কিন্তু তার রসটাকে আত্মগত করতে না পারলে বুদ্ধিমূলক কোনো প্রণালীতে তাকে জানবার উপায় নেই। রসসাহিত্য মুখ্যত

১ এই পংক্তি কয়টি অনেকাংশে 'ছন্দের অর্থ' প্রবন্ধের গোড়ার কথাগুলির অনুরূপ। প্রথম বাক্যটি সম্বন্ধে একথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য।

জ্ঞানের জিনিস নয়, তা মর্মের অধিগম্য। তাই সেখানে কেবল অর্থ যথেষ্ট নয়, সেখানে ধ্বনির প্রয়োজন; কেননা ধ্বনি বেগবান্। ছন্দের বন্ধনে এই ধ্বনিবেগ পায় বিশিষ্টতা, পায় প্রবলতা।

নিত্যব্যবহারের ভাষাকে ব্যাকরণের নিয়মজাল দিয়ে বাঁধতে হয়। রসপ্রকাশের ভাষাকে বাঁধতে হয় ধ্বনিসংগতের নিয়মে। সমাজেই বল ভাষাতেই বল সাধারণ ব্যবহারবিধির প্রয়োজন বাইরের দিকে, কিন্তু তাতেই সম্পূর্ণতা নেই। আর-একটা বিধি আছে যেটা আত্মিকতার বিধি। সমাজের দিক্ থেকে একটা দৃষ্টান্ত দেখানো যাক।

জাপানে গিয়ে দেখা গেল জাপানি সমাজস্থিতি। সেই স্থিতি ব্যবস্থাবন্ধনে। সেখানে চোরকে ঠেকায় পুলিস, জুয়াচোরকে দেয় সাজা, পরস্পরের দেনাপাওনা পরস্পরকে আইনের তাড়ায় মিটিয়ে দিতে হয়। এই যেমন স্থিতির দিক্ তেমনি গতির দিক্ আছে; সে চরিত্রে, যা চলে যা চালায়। এই গতি হচ্ছে অন্তর থেকে উদ্গত সৃষ্টির গতি, এই গতিপ্রবাহে জাপানি মনুষ্যত্বের আদর্শ নিয়ত রূপ গ্রহণ করে। জাপানি সেখানে ব্যক্তি, সর্বদাই তার ব্যঞ্জনা চলছে। সেখানে জাপানির নিত্যউদ্ভাবিত সচল সত্তার পরিচয় পাওয়া গেল। দেখতে পেলেম, স্বভাবতই জাপানি রূপকার। কেবল যে শিল্পে সে আপন সৌষম্যবোধ প্রকাশ করছে তা নয়, প্রকাশ করছে আপন ব্যবহারে। প্রতি-দিনের আচরণকেও সে শিল্পসামগ্রী করে তুলেছে, সৌজন্যে তার শৈথিল্য নেই। আতিথেয়তায় তার দাক্ষিণ্য আছে, হৃদ্যতা আছে, বিশেষভাবে আছে সুষমা। জাপানের বৌদ্ধমন্দিরে গেলেম। মন্দিরসজ্জায় উপাসকদের আচরণে অনিন্দ্যনির্মল শোভনতা, বহুনৈপুণ্যে নির্মিত মন্দিরের ঘণ্টার গম্ভীর মধুর ধ্বনি মনকে আনন্দে আন্দোলিত করে। কোথাও সেখানে এমন কিছুই নেই যা মানুষের কোনো ইন্দ্রিয়কে কদর্যতা বা অপারিপাট্যে অবমানিত করতে পারে। এই সঙ্গে

দেখা যায় পৌরুষের অভিমানে জাপানির প্রাণপণ নির্ভীকতা। চারুতা ও বীর্যের সম্মিলনে এই যে তার আত্মপ্রকাশ, এ তো ফৌজদারি দণ্ডবিধির সৃষ্টি নয়। অথচ জাপানির ব্যক্তিস্বরূপ বন্ধনের সৃষ্টি, তার পরিপূর্ণতা সীমার দ্বারাতেই। নিয়ত প্রকাশমান চলমান এই তার প্রকৃতিকে শক্তিদান রূপদান করে যে আন্তরিক বন্ধন, যে সজীব সীমা তাকেই বলি ছন্দ। আইনের শাসনে সমাজস্থিতি, অন্তরের ছন্দে আত্মপ্রকাশ।

বিংশতিকোটি মানবের বাস
এ ভারতভূমি যবনের দাস
রয়েছে পড়িয়া শৃঙ্খলে বাঁধা।
আর্যাবর্তজয়ী মানব যাহারা
সেই বংশোদ্ভব জাতি কি ইহারা,
জন কত শুধু প্রহরী-পাহারা
দেখিয়া নয়নে লেগেছে ধাঁধা।[১]

দেখা যাচ্ছে ছন্দের বন্ধনে শব্দগুলোকে শৈথিল্য থেকে বাঁচিয়ে রেখেছে, এলিয়ে পড়ছে না, তারা একটা বিশেষ রূপ নিয়ে চলেছে। বাঁধন ভেঙে দেওয়া যাক।

ভারতভূমিতে বিংশতিকোটি মানব বাস করিয়া থাকে, তথাপি এই দেশ দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া আছে। যাহারা একদা আর্যাবর্ত জয় করিয়াছিল ইহারা কি সেই বংশ হইতে উদ্ভূত। কয়েকজনমাত্র প্রহরীর পরিক্রমণ দেখিয়াই ইহাদের চক্ষুতে কি দৃষ্টিবিভ্রম ঘটিয়াছে।

কথাগুলোর কোনো লোকসান হয়নি, বরঞ্চ হিসাব করে দেখলে কয়েক পারসেন্ট্ মুনফাই দেখা যায়। কিন্তু কেবল ব্যাকরণের বাঁধনে

১ হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়: কবিতাবলী, ভারতসংগীত। দ্রষ্টব্য ৯৭ পৃষ্ঠা। 'বিংশতি' শব্দে চার মাত্রা গণনীয়, এখানে তৎকাল-প্রচলিত অক্ষরগণনার রীতি লঙ্ঘিত হয়েছে: দ্রষ্টব্য ৬৭ পৃষ্ঠা। তুলনীয় 'বংশোদ্ভব' শব্দ।

বিংশতি কোটি মানবের বাস
এ ভারতভূমি যবনের দাস
রয়েছে পড়িয়া শৃঙ্খলে বাঁধা।

গদ্যছন্দ' প্রবন্ধের এক পৃষ্ঠা

কথাগুলোকে অন্তরের দিকে সংঘবদ্ধ করেনি, তারি অভাবে সে শক্তি হারিয়েছে। উদাস মনের রুদ্ধ দ্বার ভাঙবার উদ্দেশে সবাই মিলে এক হয়ে ঘা দিতে পারছে না।

ছন্দর সঙ্গে অছন্দর তফাত এই যে, কথা একটাতে চলে, আরেকটাতে শুধু বলে কিন্তু চলে না। যে চলে সে কখনো খেলে, কখনো নাচে, কখনো লড়াই করে, হাসে কাঁদে; যে স্থির বসে থাকে সে আপিস চালায়, তর্ক করে, বিচার করে, হিসাব দেখে, দল পাকায়। ব্যবসায়ীর শুষ্ক প্রবীণতা ছন্দোহীন বাক্যে, অব্যবসায়ীর সরস চঞ্চল প্রাণের বেগ ছন্দোময় ছবিতে কাব্যে গানে।

এই ছবি-গান-কাব্যকে আমরা গড়ে-তোলা জিনিস বলে অনুভব করিনে; মনে লাগে যেন তারা হয়ে-ওঠা পদার্থ। তাদের মধ্যে উপাদানের বাহ্য সংঘটনটা অত্যন্ত বেশি ধরা দেয় না; দেখা যায় উদ্ভাবনার একটা অখণ্ড প্রকাশ, যে-প্রকাশ একান্তভাবে আমাদের বোধের সঙ্গে মেলে। বিশ্বসৃষ্টিতে স্পন্দিত আকাশ, কম্পিত বাতাস, চঞ্চল হৃদয়াবেগ স্নায়ুতন্তুতে ছন্দোবিভক্তিত হয়ে আলোতে গানেতে বেদনায় আমাদের চৈতন্যে কেবলি এঁকে দিচ্ছে আলিম্পন। ছবি-গান-কাব্যও আপন ছন্দঃস্পন্দনের চলদ্‌বেগে আমাদের চৈতন্যকে গতিমান্‌ আকৃতিমান্‌ করে তুলছে নানাপ্রকার চাঞ্চল্যে। অন্তরে যেটা এসে প্রবেশ করছে সেটা মিলে যাচ্ছে আমাদের চৈতন্যে, সে আর স্বতন্ত্র থাকছে না।

ঘোড়ার ছবি দেখি প্রাণিতত্ত্বের বইএ। সেখানে ঘোড়ার আকৃতির সঙ্গে তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সমস্ত হিসাব ঠিকঠাক মেলে। তাতে খবর পাই, সে খবর বাইরের খবর; তাতে জ্ঞানলাভ করি, ভিতরটা খুশি হয়ে ওঠে না। এই খবরটা স্থাবর পদার্থ। রূপকার ঘোড়ার যে ছবি আঁকে তার চরম উদ্দেশ্য খবর নয় খুশি, এই খুশিটা বিচলিত চৈতন্যের

বিশেষ উদ্‌বোধন। ভালো ছবির মধ্যে বরাবরের মতো একটা সচলতার বেগ রয়েই গেল, তাকে বলা চলে পর্‌পেচুয়ল মুভ্‌মেন্ট্‌। প্রাণিতত্ত্বের বইএ ঘোড়ার ছবিটা চারদিকেই সঠিক করে বাঁধা, খাঁটি খবরের যাথার্থ্যে পিলপে-গাড়ি করা তার সীমানা। রূপকারের রেখায় রেখায় তার তুলি মৃদঙ্গের বোল বাজিয়েছে, দিয়েছে সুষমার নাচের দোলা। সেই ঘোড়ার ছবিতে চতুষ্পদজাতীয় জীবের খাঁটি খবর না মিলতেও পারে, মিলবে ছন্দ যার নাড়া খেয়ে সচকিত চৈতন্য সাড়া দিয়ে বলে ওঠে 'হাঁ এইতো বটে'। আপনারই মধ্যে সেই সৃষ্টিকে সে স্বীকার করে, সেই থেকে চিরকালের মতো সেই ধ্বনিময় রূপ আমাদের বিশ্বপরিচয়ের অন্তর্গত হয়ে থাকে। আকাশ কালো মেঘে স্নিগ্ধ, বনভূমি তমালগাছে শ্যামবর্ণ, ব্যাপারটা এর বেশি কিছুই নয় ; খবরটা একবারের বেশি দুবার বললে ধমক দিয়ে থামিয়ে দিই। কবি বরাবরকার মতো বলতে থাকলেন

মেঘৈর্মেদুরমম্বরং বনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈঃ।[১]

কবির মনের মেঘলা দিনের সংবেগ চড়ে বসল ছন্দ-পক্ষিরাজের পিঠে, চলল চিরকালের মনোহরণ করতে।

গদ্যে প্রধানত অর্থবান্‌ শব্দকে ব্যূহবদ্ধ করে কাজে লাগাই, পদ্যে প্রধানত ধ্বনিমান্‌ শব্দকে ব্যূহবদ্ধ করে সাজিয়ে তোলা হয়। ব্যূহ শব্দটা এখানে অসার্থক নয়। ভিড় জমে রাস্তায়, তার মধ্যে সাজাই-বাছাই নেই, কেবল এলোমেলো চলাফেরা। সৈন্যের ব্যূহ সংহত সংযত, সাজাই-বাছাইএর দ্বারা সবগুলি মানুষের যে সম্মিলন ঘটে তার থেকে একটা প্রবল শক্তি উদ্ভাবিত হয়। এই শক্তি স্বতন্ত্রভাবে যথেচ্ছভাবে প্রত্যেক সৈনিকের মধ্যে নেই। মানুষকে উপাদান করে নিয়ে ছন্দোবিন্যাসের

১ জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' কাব্যের প্রথম শ্লোকের প্রথম পদ। শার্দূলবিক্রীড়িত ছন্দ।

দ্বারা সেনাপতি এই শক্তিরূপের সৃষ্টি করে। এ যেন বহু-ইন্ধনের হোমহুতাশন থেকে যাজ্ঞসেনীর আবির্ভাব। ছন্দঃসজ্জিত শব্দব্যূহে ভাষায় তেমনি একটি শক্তিরূপের সৃষ্টি।

চিত্রসৃষ্টিতেও এ-কথা খাটে। তার মধ্যে রেখার ও রঙের একটা সামঞ্জস্যবদ্ধ সাজাই-বাছাই আছে। সে প্রতিরূপ নয়, সে স্বরূপ। তার উদ্দেশ্য রিপোর্ট করা নয়, তার উদ্দেশ্য চৈতন্যকে কবুল করিয়ে নেওয়া 'এইতো স্বয়ং দেখলুম'। গুণীর হাতে রেখা ও রঙের ছন্দোবন্ধন হলেই ছবির নাড়ির মধ্যে প্রাণের স্পন্দন চলতে থাকে, আমাদের চিৎস্পন্দন তার লয়টাকে স্বীকার করে, ঘটতে থাকে গতির সঙ্গে গতির সহযোগিতা বাতাসের হিল্লোলের সঙ্গে সমুদ্রের তরঙ্গের মতো।

ভারতবর্ষে বেদমন্ত্রে ছন্দ প্রথম দেখা দিল, মন্ত্রে প্রবেশ করল প্রাণের বেগ, সে প্রবাহিত হতে পারল নিশ্বাসে-প্রশ্বাসে, আবর্তিত হতে থাকল মননধারায়। মন্ত্রের ক্রিয়া কেবল জ্ঞানে নয়, তা প্রাণে মনে, স্মৃতির মধ্যে তা চিরকাল স্পন্দিত হয়ে বিরাজ করে। ছন্দের এই গুণ।

ছন্দকে কেবল আমরা ভাষায় বা রেখায় স্বীকার করলে সব কথা বলা হয় না। শব্দের সঙ্গে-সঙ্গে ছন্দ আছে ভাবের বিন্যাসে, সে কানে শোনবার নয়, মনে অনুভব করবার। ভাবকে এমন করে সাজানো যায় যাতে সে কেবলমাত্র অর্থবোধ ঘটায় না, প্রাণ পেয়ে ওঠে আমাদের অন্তরে। বাছাই করে সুবিন্যস্ত সুবিভক্ত করে ভাবের শিল্প রচনা করা যায়। বর্জন গ্রহণ সজ্জীকরণের বিশেষ প্রণালীতে ভাবের প্রকাশে সঞ্চারিত হয় চলৎশক্তি। যেহেতু সাহিত্যে ভাবের বাহন ভাষা, সেই কারণে সাহিত্যে যে-ছন্দ আমাদের কাছে প্রত্যক্ষ সে-ছন্দ ভাষার সঙ্গে জড়িত। তাই অনেক সময়ে এ-কথাটা ভুলে যাই যে, ভাবের ছন্দই তাকে অতিক্রম করে আমাদের মনকে বিচলিত করে। সেই ছন্দ ভাবের সংযমে, তার বিন্যাসনৈপুণ্যে।

জ্ঞানের বিষয়কে প্রাঞ্জল ও যথার্থ করে ব্যক্ত করতে হলেও প্রকাশের উপাদানকে আঁট করে তাকে ঠিকমতো শ্রেণীবদ্ধ করা চাই। সে তাকে প্রাণের বেগ দেবার জন্যে নয়, তাকে প্রকৃষ্ট অর্থ দেবার জন্যেই। শংকরের বেদান্তভাষ্য তার একটি নিদর্শন। তার প্রত্যেক শব্দই সার্থক, তার কোনো অংশেই বাহুল্য নেই, তাই তত্ত্বব্যাখ্যা সম্বন্ধে তা এমন সুস্পষ্ট। কিন্তু এই শব্দযোজনার সংযমটি যৌক্তিকতার সংযম, আর্থিক যাথাতথ্যের সংযম, শব্দগুলি লজিক-সংগত পংক্তিবন্ধনে সুপ্রতিষ্ঠিত। কিন্তু শংকরাচার্যের নামে যে সৌন্দর্যলহরী[১] কাব্য প্রচলিত তার ভাবের প্রকাশ লজিকের পক্ষ থেকে অসংযত, অথচ প্রাণবান্ গতিমান্ রূপসৃষ্টির পক্ষ থেকে তার কলাকৌশল দেখতে পাই।

বহন্তী সিন্দূরং প্রবলকবরীভারতিমির-
দ্বিষাং বৃন্দৈর্বন্দীকৃতমিব নবীনার্ককিরণম্।
তনোতু ক্ষেমং নস্তব বদনসৌন্দর্যলহরী-
পরীবাহস্রোতঃসরণিরিব সীমন্তসরণিঃ ॥[২]

ঐ সিঁথির রেখা আমাদের কল্যাণ দিক যে-রেখাটি তোমার মুখসৌন্দর্যধারার স্রোতঃ-পথের মতো। আর যে-সিঁদুর আঁকা রয়েছে তোমার ঐ সিঁথিতে, সে যেন নবীন সূর্যের আলো, তাকে ঘনকবরীভারের অন্ধকার শত্রু হয়ে বন্দী করে রেখেছে।

সৌন্দর্যলহরীতে[৩] যে নারীরূপের কথা পাই সে সাধারণ নারী নয়, সে বিশ্বসৌন্দর্যের প্রতিমা। নিয়ত বয়ে চলেছে তার সৌন্দর্যের প্রবাহ, পিছনে তার ঘনকবরীপুঞ্জে রাত্রি, সম্মুখে তার সীমন্তরেখার সিন্দূররাগে

১ বঙ্গশ্রী ও প্রথম সংস্করণের পাঠে আছে 'আনন্দলহরী', পাণ্ডুলিপিতেও তাই।

২ সৌন্দর্যলহরী, ৪৪সংখ্যক শ্লোক (শংকরাচার্যের গ্রন্থাবলীর বাণীবিলাস স্মৃতিসংস্করণে এই শ্লোকটির প্রথমার্ধ দ্বিতীয়ার্ধের পরে আছে; সপ্তদশ খণ্ড পৃ ১৩৬)। শিখরিণী ছন্দ। দ্রষ্টব্য: পৃ ১২৩ পাদটীকা ১, পৃ ১৩৫ পাদটীকা ১।

৩ বঙ্গশ্রী ও প্রথম সংস্করণের পাঠে আছে 'আনন্দলহরী', কিন্তু পাণ্ডুলিপিতে 'সৌন্দর্যলহরী'।

তরুণসূর্যকিরণ, এই অল্পকথায় ভাবের যে স্তবকগুলি সংবদ্ধ তাতে কবি-হৃদয়ের আনন্দ দিয়ে আঁকা একটি ছবি দেখতে পাচ্ছি, সেই ছবিটি বিশ্ব-প্রকৃতির নারীরূপ।

যে-ছন্দ দিয়ে এই ছবি আঁকা এ শুধু ভাষার ছন্দ নয়, এ ভাবের ছন্দ। এতে ভাবের গুটিকয়েক উপকরণ উপমার গুচ্ছে সাজানো, তাই দিয়েই ওর জাদু। ওর নিত্যসচল কটাক্ষে অনেক না-বলা কথার ইশারা রয়ে গেল।

একদিন ছিল যখন ছাপার অক্ষরের সাম্রাজ্যপত্তন হয়নি।[১] যেমন কলকারখানার আবির্ভাবে পণ্যবস্তুর ভূরি-উৎপাদন সম্ভবপর হল তেমনি লিখিত ও মুদ্রিত অক্ষরের প্রসাদে সাহিত্যে শব্দসংকোচের প্রয়োজন চলে গেছে। আজ সরস্বতীর আসনই বল, আর তাঁর ভাণ্ডারই বল, প্রকাণ্ড আয়তনের। সাবেক সাহিত্যের দুই বাহন, তার উচ্চৈঃশ্রবা আর তার ঐরাবত, তার শ্রুতি ও স্মৃতি; তারা নিয়েছে ছুটি। তাদের জায়গায় যে যান এখন চলল, তার নাম দেওয়া যেতে পারে লিখিতি। সে রেলগাড়ির মতো, তাতে কোনোটা যাত্রীর কামরা কোনোটা মালের। কোনোটাতে বস্তুর পিণ্ড, সংবাদপুঞ্জ, কোনোটাতে সজীব যাত্রী অর্থাৎ রসসাহিত্য। তার অনেক চাকা, অনেক কক্ষ; একসঙ্গে মস্ত মস্ত চালান। স্থানের এই অসংকোচে গদ্যের ভূরিভোজ।

সাহিত্যে অক্ষরের অতিথিশালায় বাক্যের এত বড়ো সদাব্রতের আয়োজন যখন ছিল না তখন ছন্দের সাহায্য ছিল অপরিহার্য। তাতে বাধা পেত শব্দের অতিব্যয়িতা, আর ছন্দ আপন সাংগীতিক গতিবেগের স্মৃতিকে রাখত সচল করে। সেদিন পদ্যছন্দের সতিন ছিল না ভাষায়, সেদিন বাণীর ছন্দের সঙ্গে ভাবের ছন্দের অদ্বয়-বিবাহ অর্থাৎ মনোগেমি ছিল প্রচলিত। এখন বই-পড়াটা অনেকস্থলেই নিঃশব্দ পড়া, কানের

১ দ্রষ্টব্য ১৩৭ পৃষ্ঠা।

একান্ত শাসন তাই উপেক্ষিত হতে পারে। এই সুযোগেই আজকাল কাব্যশ্রেণীয় রচনা অনেকস্থলে পদ্যছন্দের বিশেষ অধিকার এড়িয়ে ভাবচ্ছন্দের মুক্তি দাবি করছে।

গদ্যসাহিত্যের আরম্ভ থেকেই তার মধ্যে মধ্যে প্রবেশ করেছে ছন্দের অন্তঃশীলা ধারা। রস যেখানেই চঞ্চল হয়েছে, রস যেখানেই চেয়েছে রূপ নিতে, সেখানেই শব্দগুচ্ছ স্বতই সজ্জিত হয়ে উঠেছে। ভাবরস-প্রধান গদ্য আবৃত্তির মধ্যে সুর লাগে অথচ তাকে রাগিণী বলা চলে না, তাতে তালমানসুরের আভাসমাত্র আছে। তেমনি গদ্যরচনায় যেখানে রসের আবির্ভাব সেখানে ছন্দ অতিনির্দিষ্ট রূপ নেয় না, কেবল তার মধ্যে থেকে যায় ছন্দের গতিলীলা।

করবি গাছের প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায় তার ডালে-ডালে জুড়ি-জুড়ি সমানভাগে পত্রবিন্যাস। কিন্তু বটগাছে প্রশাখাগত সুনিয়মিত পত্রপর্যায় চোখে পড়ে না। তাতে দেখি বহু শাখা-প্রশাখায় পত্রপুঞ্জের বড়ো-বড়ো স্তবক। এই অনতিসমান রাশীকৃত ভাগগুলি বনস্পতির মধ্যে একটি সামঞ্জস্য পেয়েছে, তাকে দিয়েছে একটি বৃহৎ চরিত্ররূপ।[১] অথচ পাথরের যে পিণ্ডীকৃত স্থাবর বিভাগগুলি দেখা যায় পাহাড়ে, এ সেরকম নয়। এর মধ্যে দেখতে পাই প্রাণশক্তি অবলীলাক্রমে আপন নানায়তন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ওজন প্রতিনিয়ত বিশেষ মহিমার সঙ্গে বাঁচিয়ে চলেছে, তার মধ্যে দেখি যেন মহাদেবের তাণ্ডব, বলদেবের নৃত্য, সে অপ্সরীর নাচ নয়। একেই তুলনা করা যায় সেই আধুনিক কাব্যরীতির সঙ্গে, গদ্যের সঙ্গে যার বাহ্যরূপ মেলে আর পদ্যের সঙ্গে আন্তররূপ।

সঞ্জীবচন্দ্র তাঁর 'পালামৌ' গ্রন্থে কোল নারীদের নাচের বর্ণনা করেছেন। নৃতত্ত্বে যেমন করে বিবরণ লেখা হয় এ তা নয়, লেখক ইচ্ছা করেছেন নাচের রূপটা রসটা পাঠকদের সামনে ধরতে। তাই এ-লেখায়

১ দ্রষ্টব্য ১১৮ ও ১২৬ পৃষ্ঠা

ছন্দের ভঙ্গি এসে পৌঁছেছে অথচ কোনো বিশেষ ছন্দের কাঠামো নেই। এর গদ্য সমমাত্রায় বিভক্ত নয়, কিন্তু শিল্পপ্রচেষ্টা আছে এর গতির মধ্যে।

গদ্যসাহিত্যে এই যে বিচিত্রমাত্রার ছন্দ মাঝে-মাঝে উচ্ছ্বসিত হয়, সংস্কৃত বিশেষত প্রাকৃত আর্যা প্রভৃতি ছন্দে তার তুলনা মেলে। সে-সকল ছন্দে সমান পদক্ষেপের নৃত্য নেই, বিচিত্র-পরিমাণ ধ্বনিপুঞ্জ কানকে আঘাত করতে থাকে। যজুর্বেদের গদ্যমন্ত্রের ছন্দকে ছন্দ বলেই গণ্য করা হয়েছে। তার থেকে দেখা যায় প্রাচীনকালেও ছন্দের মূলতত্ত্বটি গদ্যে পদ্যে উভয়ত্রই স্বীকৃত। অর্থাৎ যে পদবিভাগ বাণীকে কেবল অর্থ দেবার জন্যে নয়, তাকে গতি দেবার জন্যে, তা সমমাত্রায় না হলেও তাতে ছন্দের স্বভাব থেকে যায়।

পদ্যছন্দের প্রধান লক্ষণ পংক্তিসীমানায় বিভক্ত তার কাঠামো। নির্দিষ্টসংখ্যক ধ্বনিগুচ্ছে এক-একটি পংক্তি সম্পূর্ণ। সেই পংক্তিশেষে একটি করে বড়ো যতি। বলা বাহুল্য গদ্যে এই নিয়মের শাসন নেই। গদ্যে বাক্য যেখানে আপন অর্থ সম্পূর্ণ করে সেইখানেই তার দাঁড়াবার জায়গা। পদ্যছন্দ যেখানে আপন ধ্বনিসংগতিকে অপেক্ষাকৃত বড়ো রকমের সমাপ্তি দেয়, অর্থনির্বিচারে সেইখানে পংক্তি শেষ করে। পদ্য সবপ্রথমে এই নিয়ম লঙ্ঘন করলে অমিত্রাক্ষর ছন্দে, পংক্তির বাইরে পদচারণা শুরু করলে। আধুনিক পদ্যে এই স্বৈরাচার দেখা দিল পয়ারকে আশ্রয় করে।[১]

বলা বাহুল্য এক মাত্রা চলে না। বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ। যেই দুইয়ের সমাগম অমনি হল চলা শুরু। থাম আছে এক পায়ে

১ পদ্যে পংক্তিসীমালঙ্ঘনের রীতি কেন পয়ারেই দেখা দিল তা ব্যাখ্যাত হয়েছে ৪৪-৪৫ ও ৬৮-৬৯ পৃষ্ঠায়। বস্তুত এই প্রবন্ধটি যখন 'বঙ্গশ্রী'তে প্রকাশিত হয় তখন ৪৪-৪৫ পৃষ্ঠার 'পয়ার ছন্দের বিশেষত্ব ... রক্ষঃকুলনিধি রাঘবারি' এই অংশটুকুকে ঈষৎ-পরিবর্তিতরূপে 'আশ্রয় করে'র পরে সন্নিবেশ করা হয়েছিল। গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় এই অংশটা বর্জিত হয়।

দাঁড়িয়ে থেমে। জন্তুর পা, পাখির পাখা, মাছের পাখনা 'দুই' সংখ্যার যোগে চলে। সেই নিয়মিত গতির উপরে যদি আর-একটা একের অতিরিক্ত ভার চাপানো যায় তবে সেই গতিতে ভারসাম্যের অপ্রতিষ্ঠতা প্রকাশ পায়। এই অনিয়মের ঠেলায় নিয়মিত গতির বেগ বিচিত্র হয়ে ওঠে। মানুষের দেহটা তার দৃষ্টান্ত।[১] আদিমকালের চারপেয়ে মানুষ আধুনিক কালে দুই পায়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল। তার কোমর থেকে পদতল পর্যন্ত দুই পায়ের সাহায্যে মজবুত, কোমর থেকে মাথা পর্যন্ত টলমলে। এই দুই ভাগের অসামঞ্জস্যকে সামলাবার জন্যে মানুষের গতিতে মাথা হাত কোমর পা বিচিত্র হিল্লোলে হিল্লোলিত। পাখিও দুই পায়ে চলে কিন্তু তার দেহ স্বভাবতই দুই পায়ের ছন্দে নিয়মিত, টলবার ভয় নেই তার। দুইমাত্রায় অর্থাৎ জোড়মাত্রায় যে-পদ বাঁধা হয় তার মধ্যে দাঁড়ানোও আছে চলাও আছে, বেজোড়মাত্রায় চলার ঝোঁকটাই প্রধান। এইজন্যে অমিত্রাক্ষরে যেখানে-সেখানে থেমে যাবার যে নিয়ম আছে সেটা পালন করা বিষমমাত্রার ছন্দের পক্ষে দুঃসাধ্য। এইজন্যে বেজোড়মাত্রায় পদ্যধর্মই একান্ত প্রবল। চেষ্টা করে দেখা যাক বেজোড়মাত্রার দরজাটা খুলে দিয়ে। প্রথম পরীক্ষা হোক তিনমাত্রার মহলে।[২]

বিরহী গগন ধরণীর কাছে
পাঠাল লিপিকা। দিকের প্রান্তে
নামে তাই মেঘ, বহিয়া সজল
বেদনা, বহিয়া তড়িৎ-চকিত
ব্যাকুল আকৃতি। উৎসুক ধরা
ধৈর্য হারায়, পারে না লুকাতে
বুকের কাঁপন পল্লবদলে।

১ দ্রষ্টব্য ১১১ পৃষ্ঠা।

২ তিনমাত্রার ছন্দে যে ইচ্ছামতো যেখানে-সেখানে থামা চলে না, একথা ৪৪ পৃষ্ঠাতেও দৃষ্টান্তযো[illegible]নো হয়েছে।

বকুলকুঞ্জে রচে সে প্রাণের
মুগ্ধ প্রলাপ; উল্লাস ভাসে
চামেলিগন্ধে পূর্বগগনে।

পয়ার ছন্দের মতো এর গতি সিধে নয়। এই তিনমাত্রার এবং জোড়-বিজোড় মাত্রার ছন্দে পদক্ষেপ মাঘনৈষধের নায়িকাদের মতো মরালগমনে, ডাইনে-বাঁয়ে ঝোঁকে-ঝোঁকে হেলতে দুলতে।[১]

এবার যে-ছন্দের নমুনা দেব সেটা তিন-দুই মাত্রার, গানের ভাষায় ঝাঁপতাল-জাতীয়।

চিত্ত আজি দুঃখদোলে
আন্দোলিত। দূরের সুর
বক্ষে লাগে। অঙ্গনের
সম্মুখেতে পান্থ মম
ক্লান্তপদে গিয়েছে চলি
দিগন্তরে। বিরহবেণু
ধ্বনিছে তাই মন্দবায়ে।
ছন্দে তারি কুন্দফুল
ঝরিছে কত, চঞ্চলিয়া
কাঁপিছে কাশগুচ্ছশিখা।

এ-ছন্দ পাঁচ মাত্রার মাঝখানে ভাগ করে থামতে পারে না; এর যতিস্থাপনায় বৈচিত্র্যের যথেষ্ট স্বাধীনতা নেই।

এবার দেখানো যাক তিন-চার মাত্রার ছন্দ।

মালতী সারাবেলা ঝরিছে রহি রহি
কেন যে বুঝি না তো। হায় রে উদাসিনী,
পথের ধূলিরে কি করিলি অকারণে
মরণসহচরী। অরুণ-গগনের
ছিলি তো সোহাগিনী। শ্রাবণ-বরিষনে
মুখর বনভূমি তোমারি গন্ধের
গর্ব প্রচারিছে সিক্ত সমীরণে

১ দ্রষ্টব্য ৭১ ও ১১৯ পৃষ্ঠা।

দিশে-দিশান্তরে। কী অনাদরে তবে
গোপনে বিকশিয়া বাদল রজনীতে
প্রভাত-আলোকেরে কহিলি 'নহে, নহে'।

উপরের দৃষ্টান্তগুলি থেকে দেখা যায় অসম ও বিষম মাত্রার ছন্দে পংক্তিলঙ্ঘন[১] চলে বটে, কিন্তু তার এক-একটি ধ্বনিগুচ্ছ সমানমাপের, তাতে ছোটো-বড়ো ভাগের বৈচিত্র্য নেই। এইজন্যেই একমাত্র পয়ারছন্দই অমিত্রাক্ষর রীতিতে কতকটা গদ্যজাতীয় স্বাধীনতা পেয়েছে।

এইবার আমার শ্রোতাদের মনে করিয়ে দেবার সময় এল যে, এইসব পংক্তিলঙ্ঘক ছন্দের কথাটা উঠেছে প্রসঙ্গক্রমে। মূলকথাটা এই যে, কবিতায় ক্রমে-ক্রমে ভাষাগত ছন্দের আঁটা-আঁটির সমান্তরে ভাবগত ছন্দ উদ্ভাবিত হচ্ছে। পূর্বেই বলেছি তার প্রধান কারণ কবিতা এখন কেবল-মাত্র শ্রাব্য নয়, তা প্রধানত পাঠ্য। যে সুনিবিড় সুনিয়মিত ছন্দ আমাদের স্মৃতির সহায়তা করে তার অত্যাবশ্যকতা এখন আর নেই। একদিন খনার বচনে চাষবাসের পরামর্শ লেখা হয়েছিল ছন্দে।[২] আজকালকার বাংলায় যে 'কৃষ্টি' শব্দের উদ্ভব হয়েছে খনার এইসমস্ত কৃষির ছড়ায় তাকে নিশ্চিত এগিয়ে দিয়েছিল।[৩] কিন্তু এইধরনের কৃষ্টি প্রচারের ভার আজকাল গদ্য নিয়েছে। ছাপার অক্ষর তার বাহন, এইজন্যে ছন্দের পুঁটুলিতে ঐ বচনগুলো মাথায় করে বয়ে বেড়াবার দরকার হয় না। একদিন পুরুষও আপিসে যেত পালকিতে, মেয়েও সেই উপায়েই যেত শ্বশুরবাড়িতে। এখন রেলগাড়ির প্রভাবে উভয়ে একত্রে একই রথে জায়গা পায়। আজকাল গদ্যের অপরিহার্য প্রভাবের দিনে ক্ষণে-ক্ষণে দেখা যাবে কাব্যও আপন গতিবিধির জন্যে বাঁধাছন্দের ময়ূরপংখিটাকে অত্যাবশ্যক বলে গণ্য করবে না। পূর্বেই বলেছি অমিত্রাক্ষর ছন্দে

১ তুলনীয় 'লাইনডিঙানো চাল' পৃ ৬৯।
২ দ্রষ্টব্য ১৩৭-৩৮ ও ১৩৯-৪০ পৃষ্ঠা।
৩ দ্রষ্টব্য : সাহিত্যের পথে, সাহিত্যতত্ত্ব।

সবপ্রথমে পালকির দরজা গেছে খুলে, তার ঘটাটোপ হয়েছে বর্জিত। তবুও পয়ার যখন পংক্তির বেড়া ডিঙিয়ে চলতে শুরু করেছিল তখনো সাবেকি চালের পরিশেষরূপে গণ্ডির চিহ্ন পূর্বনির্দিষ্ট স্থানে রয়ে গেছে। ঠিক যেন পুরোনো বাড়ির অন্দরমহল; তার দেয়ালগুলো সরানো হয়নি, কিন্তু আধুনিককালের মেয়েরা তাকে অস্বীকার করে অনায়াসে সদরে যাতায়াত করছে। অবশেষে হাল-আমলের তৈরি ইমারতে সেই দেয়ালগুলো ভাঙা শুরু হয়েছে। চোদ্দ অক্ষরের গণ্ডিভাঙা পয়ার একদিন 'মানসী'র এক কবিতায় লিখেছিলুম, তার নাম নিষ্ফল-প্রয়াস[১]। অবশেষে আরো অনেক বছর পরে বেড়াভাঙা পয়ার দেখা দিতে লাগল 'বলাকা'য় 'পলাতকা'য়। এতে করে কাব্যছন্দ গদ্যের কতকটা কাছে এল বটে, তবু মেয়ে-কম্পার্টমেন্ট্ রয়ে গেল, পুরাতন ছন্দোরীতির বাঁধন খুলল না। এমন কি সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষায় আর্যা প্রভৃতি ছন্দে ধ্বনিবিভাগ যতটা স্বাধীনতা পেয়েছে আধুনিক বাংলায় ততটা সাহসও প্রকাশ পায়নি। একটি প্রাকৃত ছন্দের শ্লোক উদ্ধৃত করি।

বরিস জল ভমই ঘণ গঅণ
সিঅল পবণ মণহরণ
কণঅ-পিঅরি ণচই বিজুরি ফুল্লিআ ণীবা।
পত্থর-বিত্থর-হিঅলা
পিঅলা ণিঅলং ণ আবেই ॥[২]

১ নিষ্ফল-প্রয়াস নয়, নিষ্ফল-কামনা।

২ প্রাকৃতপৈঙ্গলম্ ১।১৬৬। এই ছন্দটির নাম মালা। মালা ছন্দের প্রথম পদে পঁয়তাল্লিশ মাত্রা। এর পরিপাটি হচ্ছে এরকম: প্রথমে ছত্রিশটি লঘুধ্বনি, তারপর গুরু-লঘু-গুরু ক্রমে তিন ধ্বনি ও সর্বশেষে দুটি গুরুধ্বনি। দ্বিতীয় পদের দুই ভাগ, প্রথম ভাগে বার ও দ্বিতীয় ভাগে পনর মাত্রা। 'আবেই' শব্দের 'ই' ধ্বনিটি দ্বিমাত্রক বলে গণনীয়: পৃ ১১০ পাদটীকা ১ দ্রষ্টব্য। 'ণিঅলং' শব্দটি বোধ করি অনবধানতাবশতই বঙ্গশ্রী ও প্রথম সংস্করণের ধৃত পাঠে বাদ পড়ে গিয়েছিল। এই সংস্করণে শব্দটিকে যথাস্থানে স্থাপন করা গেল।

মাত্রা মিলিয়ে এই ছন্দ বাংলায় লেখা যাক।

বৃষ্টিধারা শ্রাবণে ঝরে গগনে,
শীতল পবন বহে সঘনে,
কনক-বিজুরি নাচে রে, অশনি গর্জন করে।
নিষ্ঠুর-অন্তর মম প্রিয়তম নাই ঘরে॥[১]

বাঙালি পাঠকের কান একে রীতিমতো ছন্দ বলে মানতে বাধা পাবে তাতে সন্দেহ নেই, কারণ এর পদবিভাগ প্রায় গদ্যের মতোই অসমান। যাই হোক, এর মধ্যে একটা ছন্দের কাঠামো আছে; সেটুকুও যদি ভেঙে দেওয়া যায় তাহলে কাব্যকেই কি ভেঙে দেওয়া হল। দেখা যাক।

অবিরল ঝরছে শ্রাবণের ধারা,
বনে বনে সজল হাওয়া বয়ে চলেছে,
সোনার বরন ঝলক দিয়ে নেচে উঠছে বিদ্যুৎ,
বজ্র উঠছে গর্জন করে।
নিষ্ঠুর আমার প্রিয়তম ঘরে এল না।

একে বলতে হবে কাব্য, বুদ্ধির সঙ্গে এর বোঝাপড়া নয়, একে অনুভব করতে হয় রসবোধে। সেইজন্যেই যতই সামান্য হোক, এর মধ্যে বাক্য-সংস্থানের একটা শিল্পকলা শব্দব্যবহারের একটা 'তেরছ চাহনি' রাখতে হয়েছে। সুবিহিত গৃহিণীপনার মধ্যে লোকে দেখতে পায় লক্ষ্মীশ্রী, বহু উপকরণে বহু অলংকারে তার প্রকাশ নয়। ভাষার কক্ষেও অনতিভূষিত গৃহস্থালি গদ্য হলেও তাকে সম্পূর্ণ গদ্য বলা চলবে না, যেমন চলবে না আপিসঘরের অসজ্জাকে অন্তঃপুরের সরল শোভনতার সঙ্গে তুলনা করা। আপিসঘরে ছন্দটা প্রত্যক্ষই বর্জিত, অন্যত্র ছন্দটা নিগূঢ় মর্মগত, বাহ্য ভাষায় নয়, অন্তরের ভাবে।

১ এই তরজমাটিতে মালা ছন্দের ধ্বনি ও মাত্রাবিন্যাস স্থলে-স্থলে লঙ্ঘিত হয়েছে। 'বৃষ্টি' শব্দে লঘুত্বের বিধান রক্ষিত হয়নি এবং দীর্ঘস্বরগুলিকে সর্বত্রই লঘু বলে ধরা হয়েছে। তাছাড়া 'পিঅলং' শব্দটিকে গণনা করা হয়নি বলে দ্বিতীয় পদে আরও চার মাত্রা কম পড়েছে। টীকাকারদের মতে 'ফুল্লিআ ণীবা' কথার অর্থ 'পুষ্পিতা নীপাঃ'। উপরের তরজমায় এই অর্থ গৃহীত হয়নি।

আধুনিক পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে গদ্যে কাব্য রচনা করেছেন ওয়াল্ট্ হুইট্‌ম্যান। সাধারণ গদ্যের সঙ্গে তার প্রভেদ নেই, তবু ভাবের দিক্ থেকে তাকে কাব্য না বলে থাকবার জো নেই। এইখানে একটা তরজমা করে দিই।

লুইসিয়ানাতে দেখলুম একটি তাজা ওক গাছ বেড়ে উঠছে ;
একলা সে দাঁড়িয়ে, তার ডালগুলো থেকে শ্যাওলা পড়ছে ঝুলে।
কোনো দোসর নেই তার, ঘন সবুজ পাতায় কথা কইছে তার খুশিটি।
তার কড়া খাড়া তেজালো চেহারা মনে করিয়ে দিলে আমারই নিজেকে।
আশ্চর্য লাগল, কেমন করে এ-গাছ ব্যক্ত করছে খুশিতে ভরা
আপন পাতাগুলিকে
যখন না আছে ওর বন্ধু, না আছে দোসর।
আমি বেশ জানি আমি তো পারতুম না।
গুটিকতক পাতাওয়ালা একটি ডাল তার ভেঙে নিলেম,
তাতে জড়িয়ে দিলেম শ্যাওলা।
নিয়ে এসে চোখের সামনে রেখে দিলেম আমার ঘরে ;
প্রিয় বন্ধুদের কথা স্মরণ করাবার জন্যে যে তা নয়।
(সম্প্রতি ঐ বন্ধুদের ছাড়া আর কোনো কথা আমার মনে ছিল না।)
ও রইল একটি অদ্ভুত চিহ্নের মতো,
পুরুষের ভালোবাসা যে কী তাই মনে করাবে।
তা যাই হোক, যদিও সেই তাজা ওক গাছ
লুইসিয়ানার বিস্তীর্ণ মাঠে একলা ঝল্‌মল্ করছে,
বিনা বন্ধু বিনা দোসরে খুশিতে ভরা পাতাগুলি প্রকাশ করছে
চিরজীবন ধরে,
তবু আমার মনে হয় আমি তো পারতুম না।[১]

১ Leaves of Grass কাব্যের '*I saw in Louisiana a live-oak growing*'-শীর্ষক কবিতা।

এক দিকে দাঁড়িয়ে আছে কঠিন বলিষ্ঠ সতেজ ওক গাছ, একলা আপন আত্মসম্পূর্ণ নিঃসঙ্গতায় আনন্দময়, আর-এক দিকে একজন মানুষ, সেও কঠিন বলিষ্ঠ সতেজ, কিন্তু তার আনন্দ অপেক্ষা করছে প্রিয়সঙ্গের জন্যে— এটি কেবলমাত্র সংবাদরূপে গদ্যে বলবার বিষয় নয়। এর মধ্যে কবির আপন মনোভাবের একটি ইশারা আছে। একলা গাছের সঙ্গে তুলনায় একলা বিরহী-হৃদয়ের উৎকণ্ঠা আভাসে জানানো হল। এই প্রচ্ছন্ন আবেগের ব্যঞ্জনা, এই তো কাব্য ; এর মধ্যে ভাববিন্যাসের শিল্প আছে, তাকেই বলব ভাবের ছন্দ।

চীন-কবিতার তরজমা থেকে একটি দৃষ্টান্ত দেখাই।

স্বপ্ন দেখলুম যেন চড়েছি কোনো উঁচু ডাঙায় ;
সেখানে চোখে পড়ল গভীর এক ইঁদারা।
চলতে চলতে কণ্ঠ আমার শুকিয়েছে,
ইচ্ছে হল জল খাই।
ব্যগ্র দৃষ্টি নামতে চায় ঠাণ্ডা সেই কুয়োর তলার দিকে।
ঘুরলেম চারদিকে, দেখলেম ভিতরে তাকিয়ে,
জলে পড়ল আমার ছায়া।
দেখি এক মাটির ঘড়া কালো সেই গহ্বরে ;
দড়ি নাই যে তাকে টেনে তুলি।
ঘড়াটা পাছে তলিয়ে যায়
এই ভেবে প্রাণ কেন এমন ব্যাকুল হল।
পাগলের মতো ছুটলেম সহায় খুঁজতে।
গ্রামে গ্রামে ঘুরি, লোক নেই একজনো,
কুকুরগুলো ছুটে আসে টুঁটি কামড়ে ধরতে।
কাঁদতে কাঁদতে ফিরে এলেম কুয়োর ধারে।
জল পড়ে দুই চোখ বেয়ে, দৃষ্টি হল অন্ধপ্রায়।
শেষকালে জাগলেম নিজেরই কান্নার শব্দে।

ঘর নিস্তব্ধ, স্তব্ধ সব বাড়ির লোক ;
বাতির শিখা নিবো-নিবো, তার থেকে সবুজ ধোঁয়া উঠছে,
তার আলো পড়ছে আমার চোখের জলে।
ঘণ্টা বাজল, রাতদুপুরের ঘণ্টা,
বিছানায় উঠে বসলুম, ভাবতে লাগলুম অনেক কথা।

মনে পড়ল, যে-ডাঙাটা দেখছি সে চাং-আনের কবরস্থান ;
তিনশো বিঘে পোড়ো জমি,
ভারি মাটি তার, উঁচু-উঁচু সব ঢিবি ;
নিচে গভীর গর্তে মৃতদেহ শোওয়ানো।
শুনেছি মৃত মানুষ কখনো-কখনো দেখা দেয় সমাধির বাইরে।
আজ আমার প্রিয় এসেছিল ইঁদারায় ডুবে-যাওয়া সেই ঘড়া,
তাই দুচোখ বেয়ে জল পড়ে আমার কাপড় গেল ভিজে।[১]

এতে পদ্যছন্দ নেই, এতে জমানো ভাবের ছন্দ। শব্দবিন্যাসে সুপ্রত্যক্ষ অলংকরণ নেই, তবুও আছে শিল্প।

উপসংহারে শেষকথা এই যে, কাব্যের অধিকার প্রশস্ত হতে চলেছে। গদ্যের সীমানার মধ্যে সে আপন বাসা বাঁধছে ভাবের ছন্দ দিয়ে। একদা কাব্যের পালা শুরু করেছি পদ্যে, তখন সে মহলে গদ্যের ডাক পড়েনি। আজ পালা সাঙ্গ করবার বেলায় দেখি কখন অসাক্ষাতে গদ্যে-পদ্যে রফানিষ্পত্তি চলছে। যাবার আগে তাদের রাজিনামায় আমিও একটা সই দিয়েছি। এককালের খাতিরে অন্যকালকে অস্বীকার করা যায় না।

বঙ্গশ্রী— ১৩৪১ বৈশাখ

১ য়ুয়ান চেন-নামক চৈনিক কবির (খ্রী ৭৭৯-৮৩১) একটি কবিতার আর্থার ওয়ালে-কৃত *The Pitcher*-শীর্ষক ইংরেজি তরজমা থেকে অনূদিত। Ernest Benn-এর The Augustan Book of English Poetry গ্রন্থমালা দ্বিতীয় পর্যায়ের সপ্তম পুস্তক : *Poems from the Chinese* : পৃ ২৫-২৬ দ্রষ্টব্য।

কাব্য ও ছন্দ

গদ্যকাব্য নিয়ে সন্দিগ্ধ পাঠকের মনে তর্ক চলছে। এতে আশ্চর্যের বিষয় নেই। ছন্দের মধ্যে যে বেগ আছে সেই বেগের অভিঘাতে রসগর্ভ বাক্য সহজে হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করে, মনকে দুলিয়ে তোলে, এ-কথা স্বীকার করতে হবে। শুধু তাই নয়। যে-সংসারের ব্যবহারে গদ্য নানা বিভাগে নানা কাজে খেটে মরছে কাব্যের জগৎ তার থেকে পৃথক্। পদ্যের ভাষাবিশিষ্টতা এই কথাটাকে স্পষ্ট করে; স্পষ্ট হলেই মনটা তাকে স্বক্ষেত্রে অভ্যর্থনা করবার জন্যে প্রস্তুত হতে পারে। গেরুয়াবেশে সন্ন্যাসী জানান দেয় সে গৃহীর থেকে পৃথক্, ভক্তের মন সেই মুহূর্তেই তার পায়ের কাছে এগিয়ে আসে; নইলে সন্ন্যাসীর ভক্তির ব্যবসায়ে ক্ষতি হবার কথা। কিন্তু বলা বাহুল্য সন্ন্যাসধর্মের মুখ্য তত্ত্বটা তার গেরুয়া কাপড়ে নয়, সেটা আছে তার সাধনার সত্যতায়। এই কথাটা যে বোঝে, গেরুয়া কাপড়ের অভাবেই তার মন আরো বেশি করে আকৃষ্ট হয়। সে বলে আমার বোধশক্তির দ্বারাই সত্যকে চিনব, সেই গেরুয়া কাপড়ের দ্বারা নয় যে-কাপড় বহু অসত্যকে চাপা দিয়ে রাখে।

ছন্দটাই যে ঐকান্তিকভাবে কাব্য তা নয়। কাব্যের মূলকথাটা আছে রসে, ছন্দটা এই রসের পরিচয় দেয় তার আনুষঙ্গিক হয়ে। সহায়তা করে দুই দিক্ থেকে। এক হচ্ছে স্বভাবতই তার দোলা দেবার শক্তি আছে, আর এক হচ্ছে পাঠকের চিরাভ্যস্ত সংস্কার। এই সংস্কারের কথাটা ভাববার বিষয়।

একদা নিয়মিত অংশে বিভক্ত ছন্দই সাধু কাব্যভাষায় একমাত্র পাংক্তেয় বলে গণ্য ছিল। সেই সময়ে আমাদের কানের অভ্যাসও ছিল তার অনুকূলে। তখন ছন্দে মিল রাখাও ছিল অপরিহার্য। এমন

সময়ে মধুসূদন বাংলা সাহিত্যে আমাদের সংস্কারের প্রতিকূলে আনলেন অমিত্রাক্ষর ছন্দ। তাতে রইল না মিল। তাতে লাইনের বেড়াগুলি সমানভাগে সাজানো বটে, কিন্তু ছন্দের পদক্ষেপ চলে ক্রমাগতই বেড়া ডিঙিয়ে।[১] অর্থাৎ এর ভঙ্গি পদ্যের মতো, কিন্তু ব্যবহার গদ্যের চালে।

সংস্কারের অনিত্যতার আর-একটা প্রমাণ দিই। একসময়ে কুলবধূর সংজ্ঞা ছিল সে অন্তঃপুরচারিণী। প্রথম যে-কুলস্ত্রীরা অন্তঃপুর থেকে অসংকোচে বেরিয়ে এলেন তাঁরা সাধারণের সংস্কারকে আঘাত করাতে তাঁদেরকে সন্দেহের চোখে দেখা ও অপ্রকাশ্যে বা প্রকাশ্যে অপমানিত করা, প্রহসনের নায়িকারূপে তাঁদেরকে অট্টহাস্যের বিষয় করা প্রচলিত হয়ে এসেছিল। সেদিন যে-মেয়েরা সাহস করে বিশ্ববিদ্যালয়ে পুরুষছাত্রদের সঙ্গে একত্রে পাঠ নিতেন তাঁদের সম্বন্ধে কাপুরুষ আচরণের কথা জানা আছে। ক্রমশই সংজ্ঞার পরিবর্তন হয়ে আসছে। কুলস্ত্রীরা আজ অসংশয়িতভাবে কুলস্ত্রীই আছেন যদিও অন্তঃপুরের অবরোধ থেকে তাঁরা মুক্ত।

তেমনি অমিত্রাক্ষর ছন্দের মিলবর্জিত অসমানতাকে কেউ কাব্য-রীতির বিরোধী বলে আজ মনে করেন না। অথচ পূর্বতন বিধানকে এই ছন্দ বহুদূরে লঙ্ঘন করে গেছে। কাজটা সহজ হয়েছিল, কেননা তখনকার ইংরেজিশেখা পাঠকেরা মিল্‌টন-শেক্‌স্‌পীয়রের ছন্দকে শ্রদ্ধা করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

অমিত্রাক্ষর ছন্দকে জাতে তুলে নেবার প্রসঙ্গে সাহিত্যিক সনাতনীরা এই কথা বলবেন যে, যদিও এই ছন্দ চোদ্দ অক্ষরের গণ্ডিটা পেরিয়ে চলে তবু সে পয়ারের লয়টাকে অমান্য করে না। অর্থাৎ লয়কে রক্ষা করার দ্বারা এই ছন্দ কাব্যের ধর্ম রক্ষা করেছে, অমিত্রাক্ষর সম্বন্ধে

১ তুলনীয় 'পংক্তিলঙ্ঘন' পৃ ১৫৬।

এইটুকু বিশ্বাস লোকে আঁকড়ে রয়েছে। তারা বলতে চায় পয়ারের সঙ্গে এই নাড়ির সম্বন্ধটুকু না থাকলে কাব্য কাব্যই হতে পারে না। কী হতে পারে এবং হতে পারে না তা হওয়ার উপরেই নির্ভর করে, লোকের অভ্যাসের উপর করে না, এ-কথাটা অমিত্রাক্ষর ছন্দই পূর্বেই প্রমাণ করেছে। আজ গদ্যকাব্যের উপরে প্রমাণের ভার পড়েছে যে গদ্যেও কাব্যের সঞ্চরণ অসাধ্য নয়।

অশ্বারোহী সৈন্যও সৈন্য আবার পদাতিক সৈন্যও সৈন্য। কোন্‌খানে তাদের মূলগত মিল। যেখানে লড়াই করে জেতাই তাদের উভয়েরই সাধনার লক্ষ্য। কাব্যের লক্ষ্য হৃদয় জয় করা, পদ্যের ঘোড়ায় চড়েই হোক আর গদ্যে পা চালিয়েই হোক। সেই উদ্দেশ্যসিদ্ধির সক্ষমতার দ্বারাই তাকে বিচার করতে হবে। হার হলেই হার, তা সে ঘোড়ায় চড়েই হোক আর পায়ে হেঁটেই হোক। ছন্দে-লেখা রচনা কাব্য হয়নি তার হাজার প্রমাণ আছে, গদ্যরচনাও কাব্য নাম ধরলেও কাব্য হবে না তার ভূরি ভূরি প্রমাণ জুটতে থাকবে।

ছন্দের একটা সুবিধা এই যে ছন্দের স্বতই একটা মাধুর্য আছে, আর কিছু না হয় তো সেটাই একটা লাভ। সস্তা সন্দেশে ছানার অংশ নগণ্য হতে পারে, কিন্তু অন্তত চিনিটা পাওয়া যায়। কিন্তু সহজে সন্তুষ্ট নয় এমন একগুঁয়ে মানুষ আছে, যারা চিনি দিয়ে আপনাকে ভোলাতে লজ্জা পায়। মনভোলানো মালমসলা বাদ দিয়েও, কেবলমাত্র খাঁটি মাল দিয়েই তারা জিতবে এমনতরো তাদের জিদ। তারা এই কথাই বলতে চায় আসল কাব্য জিনিসটা একান্তভাবে ছন্দ-অছন্দ নিয়ে নয়, তার গৌরব তার আন্তরিক সার্থকতায়।

গদ্যই হোক পদ্যই হোক রসরচনামাত্রেই একটা স্বাভাবিক ছন্দ থাকে। পদ্যে সেটা সুপ্রত্যক্ষ, গদ্যে সেটা অন্তর্নিহিত। সেই নিগূঢ় ছন্দটিকে পীড়ন করলেই কাব্যকে আহত করা হয়। পদ্যছন্দবোধের

চর্চা বাঁধা-নিয়মের পথে চলতে পারে, কিন্তু গদ্যছন্দের পরিমাণবোধ মনের মধ্যে যদি সহজে না থাকে তবে অলংকারশাস্ত্রের সাহায্যে এর দুর্গমতা পার হওয়া যায় না। অথচ অনেকেই মনে রাখেন না যে, যেহেতু গদ্য সহজ, সেই কারণেই গদ্যছন্দ সহজ নয়। সহজের প্রলোভনেই মারাত্মক বিপদ্ ঘটে, আপনি এসে পড়ে অসতর্কতা। অসতর্কতাই অপমান করে কলালক্ষ্মীকে, আর কলালক্ষ্মী তার শোধ তোলেন অকৃতার্থতা দিয়ে। অসতর্ক লেখকদের হাতে গদ্যকাব্য অবজ্ঞা ও পরিহাসের উপাদান স্তূপাকার করে তুলবে এমন আশঙ্কার কারণ আছে। কিন্তু এই সহজ কথাটা বলতেই হবে, যেটা যথার্থ কাব্য সেটা পদ্য হলেও কাব্য গদ্য হলেও কাব্য।

সবশেষে এই একটি কথা বলবার আছে, কাব্য প্রাত্যহিক সংসারের অপরিমার্জিত বাস্তবতা থেকে যতদূরে ছিল এখন তা নেই। এখন সমস্তকেই সে আপন রসলোকে উত্তীর্ণ করতে চায়, এখন সে স্বর্গারোহণ করবার সময়েও সঙ্গের কুকুরটিকে ছাড়ে না। বাস্তব জগৎ ও রসের জগতের সমন্বয়সাধনে গদ্য কাজে লাগবে; কেননা গদ্য শুচিবায়ুগ্রস্ত নয়।

কবিতা—১৩৪৩ পৌষ

পরিশেষ

বাংলাভাষার স্বাভাবিক ছন্দ

প্রকাশক সিন্ধুদূত[১]-এর ছন্দ সম্বন্ধে বলিতেছেন, "সিন্ধুদূতের ছন্দঃ প্রচলিত ছন্দঃসকল হইতে একরূপ স্বতন্ত্র ও নূতন। এই নূতনত্বহেতু অনেকেরই প্রথম-প্রথম পড়িতে কিছু কষ্ট হইতে পারে।...বাঙ্গালা ছন্দের প্রাণগত ভাব কি ও তাহার স্বাভাবিক গতি কোন্‌দিকে এবং কি প্রণালীতেই বা ইচ্ছামতে উহার সুন্দর বৈচিত্র্যসাধন করা যায়, ইহার নিগূঢ়তত্ত্ব সিন্ধুদূতের ছন্দঃ আলোচনা করিলে উপলব্ধ হইতে পারে।"

আমাদের সমালোচ্য গ্রন্থের ছন্দ পড়িতে প্রথম-প্রথম কষ্ট বোধ হয় সত্য; কিন্তু ছন্দের নূতনত্ব তাহার কারণ নহে, ছত্রবিভাগের ব্যতিক্রমই তাহার একমাত্র কারণ। নিম্নে গ্রন্থ হইতে একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

এ কি এ, আগত সন্ধ্যা, এখনো রয়েছি বসে সাগরের তীরে?
দিবস হয়েছে গত, না জানি ভেবেছি কত,
প্রভাত হইতে বসে রয়েছি এখানে বাহ্য জগৎ পাশরে,
ক্ষুধাতৃষ্ণা নিদ্রাহার কিছু নাহি মোর; সব ত্যজেছে আমারে।

রীতিমতো ছত্রবিভাগ করিলে উপরিউদ্ধৃত শ্লোকটি নিম্নলিখিত আকারে প্রকাশ পায়।

এ কি এ, আগত সন্ধ্যা, এখনো রয়েছি বসে
সাগরের তীরে?
দিবস হয়েছে গত,
না জানি ভেবেছি কত,

১ 'ভুবনমোহিনী প্রতিভা'র (১৮৭৫-৭৭) কবি নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত 'সিন্ধুদূত' (১৮৮৩) এ'র তৃতীয় কাব্য।

প্রভাত হইতে বসে রয়েছি এখানে বাহ্য
জগৎ পাশরে,
ক্ষুধাতৃষ্ণা নিদ্রাহার কিছু নাই মোর ; সব
ত্যজেছে আমারে।

মাইকেল-রচিত নিম্নলিখিত কবিতাটি যাঁহাদের মনে আছে তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন সিন্ধুদূতের ছন্দ বাস্তবিক নূতন নহে।

আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু, হায়,
তাই ভাবি মনে ?
জীবনপ্রবাহ বহি কালসিন্ধু-পানে যায়,
ফিরাব কেমনে ?

একটি ছত্রের মধ্যে দুইটি ছত্র পুরিয়া দিলে পর প্রথমত চোখে দেখিতে খারাপ হয়, দ্বিতীয়ত কোন্‌খানে হাঁপ ছাড়িতে হইবে পাঠকরা হঠাৎ ঠাহর পান না। এখানে-ওখানে হাতড়াইতে হাতড়াইতে অবশেষে ঠিক জায়গাটা বাহির করিতে হয়। প্রকাশক যে বলিয়াছেন, বাংলা ছন্দের প্রাণগত ভাব কী ও তাহার স্বাভাবিক গতি কোন্‌দিকে তাহা সিন্ধুদূতের ছন্দ আলোচনা করিলে উপলব্ধ হইতে পারে, সে-বিষয়ে আমাদের মতভেদ আছে। ভাষার উচ্চারণ-অনুসারে ছন্দ নিয়মিত হইলে তাহাকেই স্বাভাবিক ছন্দ বলা যায়, কিন্তু বর্তমান কোনো কাব্যগ্রন্থে (এবং সিন্ধুদূতেও) তদনুসারে ছন্দ নিয়মিত হয় নাই।[১] আমাদের ভাষায় পদে পদে হসন্ত শব্দ দেখা যায়, কিন্তু আমরা ছন্দ পাঠ করিবার সময় তাহাদের হসন্ত উচ্চারণ লোপ করিয়া দিই। এইজন্য যেখানে চোদ্দটা অক্ষর বিন্যস্ত হইয়াছে, বাস্তবিক বাংলার উচ্চারণ অনুসারে পড়িতে গেলে তাহা হয়তো আট বা নয় অক্ষরে পরিণত হয়। রামপ্রসাদের নিম্নলিখিত ছন্দটি পাঠ করিয়া দেখ।

মন্ বেচারির্ কি দোষ্ আছে,
তারে যেমন্ নাচাও তেম্‌নি নাচে।

১ এই স্বাভাবিক ছন্দের সচেতন ও বহুল প্রয়োগ সর্বপ্রথমে দেখা দেয় 'ক্ষণিকা' কাব্যে (১৯০০)।

দ্বিতীয় ছত্রের 'তারে' নামক অতিরিক্ত শব্দটি[১] ছাড়িয়া দিলে দুই ছত্রে এগারটি করিয়া অক্ষর থাকে। কিন্তু উহাই আধুনিক ছন্দে পরিণত করিতে হইলে নিম্নলিখিতরূপ হয়।

মনের কি দোষ আছে,
যেমন নাচাও নাচে।[২]

ইহাতে দুই ছত্রে আটটি অক্ষর হয়; তাল ঠিক সমান রহিয়াছে অথচ অক্ষর কম পড়িতেছে। তাহার কারণ শেষোক্ত ছন্দে আমরা হসন্ত শব্দকে আমল দিই না। বাস্তবিক ধরিতে গেলে রামপ্রসাদের ছন্দেও আটটির অধিক অক্ষর নাই।

মনেৎচারি কিঁ দোষাছে,
যেমন্নাচা তেম্নি নাচে।[৩]

দ্বিতীয় ছত্র হইতে 'নাচাও' শব্দের 'ও' অক্ষর ছাড়িয়া দিয়াছি; তাহার কারণ এই ও-টি হসন্ত ও, পরবর্তী তে-র সহিত ইহা যুক্ত।[৪]

উপরে দেখাইলাম বাংলা ভাষার স্বাভাবিক ছন্দ কী।[৫] আর, যদি কখনো স্বাভাবিক দিকে বাংলা ছন্দের গতি হয় তবে ভবিষ্যতের ছন্দ রামপ্রসাদের ছন্দের অনুযায়ী হইবে।[৬]

ভারতী— ১২৯০ শ্রাবণ

১ এ-রকম 'অতিরিক্ত শব্দ'কে আধুনিক ছন্দ-পরিভাষায় বলা হয় 'অতিপর্ব'।

২ তুলনীয়: বারি ঝরে ঝরঝর··· পৃ ৫০, রূপরসে ডুব দিনু··· পৃ ৮৬।

৩ তুলনীয়: অচিণ্ডাকে নদীর্বাঁকে···পৃ ১৩৯, এপার্গঙ্গা ওপার্গঙ্গা··· পৃ ১৪৩।

৪ হসন্ত মানে ব্যঞ্জনান্ত। সুতরাং স্বরবর্ণ হসন্ত হতে পারে না। 'হসন্ত ও' বলার উদ্দেশ্য এই স্বরবর্ণটির স্বাতন্ত্র্য নেই, হসন্তবর্ণের মতো অন্য বর্ণের আশ্রিত। অই আই অও আও প্রভৃতি যুগ্মস্বর (diphthong) মাত্রেরই শেষাংশ স্বাতন্ত্র্যহীন। 'দাও' শব্দের 'ও' স্বাতন্ত্র্যহীন, কিন্তু 'দিও' শব্দের 'ও' তা নয়। স্বাতন্ত্র্যহীন আশ্রিত স্বরকে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত বলেছেন 'ভাংটা' স্বর (ছন্দ-সরস্বতী: ভারতী ১৩২৫ বৈশাখ পৃ ১১)।

৫ তুলনীয়: ভাষার নিজের অন্তরের 'স্বাভাবিক' সুর পৃ ৭, রামপ্রসাদের পদে 'আপন স্বভাবে' প্রকাশ পেয়েছে পৃ ৫১, বাংলাভাষার 'স্বকীয়' ধ্বনিরূপ পৃ ১২৮, বাংলার 'স্বাভাবিক' ধ্বনিরূপ পৃ ১৩২, বাংলা শব্দের 'স্বাভাবিক' হসন্তরূপ পৃ ১৩৮ ইত্যাদি। এ-বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা "রবীন্দ্রনাথ ও লৌকিক ছন্দ" প্রবন্ধে (বিশ্বভারতী-পত্রিকা ১৩৫১ শ্রাবণ-আশ্বিন) দ্রষ্টব্য।

৬ তুলনীয়: এই খাঁটি বাংলায় সকল রকম ছন্দেই সকল কাব্যই লেখা সম্ভব এই আমার বিশ্বাস পৃ ১৩০।

বাংলা শব্দ ও ছন্দ

বাংলা শব্দ উচ্চারণের মধ্যে কোথাও ঝোঁক[১] নাই, অথবা যদি থাকে সে এত সামান্য যে, তাহাকে নাই বলিলেও ক্ষতি হয় না। এইজন্যই আমাদের ছন্দে অক্ষর গনিয়া মাত্রা নিরূপিত হইয়াছে। কথার প্রত্যেক অক্ষরের মাত্রা সমান। কারণ কোনোস্থানে বিশেষ ঝোঁক না থাকাতে অক্ষরের বড়ো ছোটো প্রায় নাই। সংস্কৃত উচ্চারণে যে দীর্ঘহ্রস্বের নিয়ম আছে তাহাও বাংলায় লোপ পাইয়াছে। এই কারণে উচ্চারণ-হিসাবে বাংলাভাষা বঙ্গদেশের সমতল-প্রসারিত প্রান্তরভূমির মতো সর্বত্র সমান।[২] জিহ্বা কোথাও বাধা না পাইয়া ভাষার উপর দিয়া যেন একপ্রকার নিদ্রিত অবস্থায় চলিয়া যায়; কথাগুলি চিত্তকে পদে পদে প্রতিহত করিয়া অবিশ্রাম মনোযোগ জাগ্রত করিয়া রাখিতে পারে না।[৩] শব্দের সহিত শব্দের সংঘর্ষণে যে বিচিত্র সংগীত উৎপন্ন হয় তাহা সাধারণত বাংলা ভাষায় অসম্ভব; কেবল একতান কলধ্বনি ক্রমে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের চেতনা লোপ করিয়া দেয়।[৪] একটি শব্দের সম্পূর্ণ অর্থ হৃদয়ংগম হইবার পূর্বেই অবিলম্বে আর-একটি কথার উপরে স্খলিত হইয়া পড়িতে হয়। বৈষ্ণব কবির একটি গান আছে—

> মন্দপবন, কুঞ্জভবন,
> কুসুমগন্ধ-মাধুরী।

১ এই প্রসঙ্গের বিস্তৃত আলোচনা 'বাংলা ছন্দ'-নামক প্রথম প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য।

২ তুলনীয়: বাংলা দেশটি যেমন সমভূমি… পৃ ৩, সমতল বাংলা আপন কাব্যের ভাষাকে সমতল করে দিয়েছে পৃ ৪৮।

৩ তুলনীয়: মন চলে যায় ঘুমিয়ে-পড়া গাড়োয়ানকে নিয়ে রাতের বেলার গোরুর গাড়ির মতো পৃ ১২৩-২৪।

৪ এই উক্তি সাধু বা সংস্কৃত বাংলার সম্বন্ধে প্রযোজ্য, চলতি বা প্রাকৃত বাংলার সম্বন্ধে নয়। প্রাকৃত-বাংলার প্রকৃতি সমতল নয় এবং তাতে শব্দের সংঘাতজাত সংগীত-বৈচিত্র্যও আছে, একথা বহুস্থলেই বলা হয়েছে। দ্রষ্টব্য পৃ ৬-৮, ১৭-১৮, ৪৯-৫১ ইত্যাদি।

এই দুটি ছত্রে অক্ষরের গুরুলঘু নিরূপিত হওয়াতে এই সামান্য গুটিকয়েক কথায় মধুর ভাবে সমস্ত হৃদয় অধিকার করিয়া লয়। কিন্তু এই ভাব সমমাত্রক[১] ছন্দে নিবিষ্ট হইলে অনেকটা নিষ্ফল হইয়া পড়ে। যেমন—

মৃদুল পবন, কুসুমকানন,
ফুলপরিমল-মাধুরী।

ইংরেজিতে অনেক সময় আট-দশ লাইনের একটি ছোটো কবিতা লঘুবাণের মতো ক্ষিপ্রগতিতে হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া মর্মের মধ্যে বিদ্ধ হইয়া থাকে। বাংলায় ছোটো কবিতা আমাদের হৃদয়ের স্বাভাবিক জড়তায় আঘাত দিতে পারে না। বোধ করি কতকটা সেই কারণে আমাদের ভাষার এই খর্বতা আমরা অত্যুক্তি দ্বারা পূরণ করিয়া লইতে চেষ্টা করি।[২] একটা কথা বাহুল্য করিয়া না বলিলে আমাদের ভাষায় বড়োই ফাঁকা শুনায় এবং সে কথা কাহারো কানে পৌঁছায় না। সেইজন্য সংক্ষিপ্ত সংহত রচনা আমাদের দেশে প্রচলিত নাই বলিলেই হয়। কোনো লেখা অত্যুক্তি পুনরুক্তি বিস্তারিত ব্যাখ্যা এবং আড়ম্বরপূর্ণ না হইলে সাধারণত গ্রাহ্য হয় না।

বাংলা পড়িবার সময় অনেক পাঠক অধিকাংশ স্বরবর্ণকে দীর্ঘ করিয়া টানিয়া টানিয়া পড়েন।[৩] নচেৎ সমমাত্র হ্রস্বস্বরে হৃদয়ের সমস্ত আবেগ কুলাইয়া উঠে না। বাংলার বক্তারা অনেকেই দীর্ঘ উচ্চারণ প্রয়োগ করিয়া বক্তৃতা বৃহৎ ও গম্ভীর করিয়া তোলেন। ভালো ইংরেজ

১ অন্যত্র (পৃ ৩৫-৩৬) সম, অসম ও বিষম মাত্রার ছন্দের কথা বলা হয়েছে। সেখানে সমমাত্রার ছন্দ মানে জোড়মাত্রার ছন্দ। এখানে সে অর্থ নয়। এখানে সমমাত্রক ছন্দ মানে সমতল অর্থাৎ ধ্বনির হ্রস্বদীর্ঘতা বা উচ্চনীচতা-হীন ছন্দ। পরবর্তী "সমমাত্র হ্রস্বস্বর' লক্ষিতব্য। ৩ পৃষ্ঠাতেও এই অর্থে 'সমমাত্রিক ছন্দ' কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে।

২ দ্রষ্টব্য ২-৩ পৃষ্ঠা।

৩ তুলনীয় : কবিতা পড়িতে হইলে আমরা সুর করিয়া পড়ি পৃ ৪।

অভিনেতার অভিনয়ে দেখিতে পাওয়া যায় এক-একটি শব্দকে সবলে বেষ্টন করিয়া প্রচণ্ড হৃদয়াবেগ কিরূপ উদ্দামগতিতে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। কিন্তু বাংলা অভিনয়ে শিথিল কোমল কথাগুলি হৃদয়স্রোতের নিকট সহজেই মাথা নত করিয়া দেয়, তাহাকে ক্ষুব্ধ করিয়া তুলিতে পারে না। এইজন্য তাহাতে সর্বত্রই একপ্রকার দুর্বল সমায়ত সানুনাসিক ক্রন্দনস্বর ধ্বনিত হইতে থাকে। এইজন্য আমাদের অভিনেতারা যেখানে শ্রোতাদের হৃদয় বিচলিত করিতে চান সেখানে গলা চড়াইয়া অযথা-পরিমাণে চিৎকার করিতে থাকেন এবং তাহাতে প্রায়ই ফললাভ করেন।

মাইকেল তাঁহার মহাকাব্যে যে বড়ো বড়ো সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন— শব্দের স্থায়িত্ব, গাম্ভীর্য এবং পাঠকের সমগ্র মনোযোগ বদ্ধ করিবার চেষ্টাই তাহার কারণ বোধ হয়।[১] 'যাদঃপতিরোধঃ যথা চলোর্মি-আঘাতে' দুর্বোধ হইতে পারে, কিন্তু 'সাগরের তট যথা তরঙ্গের ঘায়' দুর্বল; 'উড়িল কলম্বকুল অম্বর-প্রদেশে' ইহার পরিবর্তে 'উড়িল যতেক তীর আকাশ ছাইয়া' ব্যবহার করিলে ছন্দের পরিপূর্ণ ধ্বনি নষ্ট হয়।[২]

বাংলা শব্দের মধ্যে এই ধ্বনির অভাববশত বাংলায় পদ্যের অপেক্ষা গীতের প্রচলনই অধিক।[৩] কারণ গীত সুরের সাহায্যে প্রত্যেক কথাটিকে মনের মধ্যে সম্পূর্ণ নিবিষ্ট করিয়া দেয়। কথায় যে অভাব আছে সুরে তাহা পূর্ণ হয়। এবং গানে এক কথা বার-বার ফিরিয়া গাহিলে ক্ষতি হয় না। যতক্ষণ চিত্ত না জাগিয়া উঠে ততক্ষণ সংগীত ছাড়ে না। এইজন্য প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে গান ছাড়া কবিতা নাই বলিলে হয়।

সংস্কৃতে ইহার বিপরীত দেখা যায়। বেদ ছাড়িয়া দিলে সংস্কৃত ভাষায় এত মহাকাব্য খণ্ডকাব্য সত্ত্বেও গান নাই। শকুন্তলা প্রভৃতি

১ দ্রষ্টব্য ১২২ পৃষ্ঠা। ২ তুলনীয়: হিমালয় নামে গিরি… পৃ ১২৩।
৩ দ্রষ্টব্য ৩-৪ পৃষ্ঠা।

নাটকে যে দুই-একটি প্রাকৃত গীত দেখিতে পাওয়া যায় তাহা কাব্যের মধ্যে স্থান পাইতে পারে না। বাঙালি জয়দেবের গীতগোবিন্দ আধুনিক এবং তাহাকে একহিসাবে গান না বলিলেও চলে। কারণ, তাহার ভাষালালিত্য ও ছন্দোবিন্যাস এমন সম্পূর্ণ যে তাহা সুরের অপেক্ষা রাখে না; বরং আমার বিশ্বাস সুরসংযোগে তাহার স্বাভাবিক শব্দনিহিত সংগীতের লাঘব করে। কিন্তু

মনে রৈল সই মনের বেদনা।
প্রবাসে যখন যায় গো সে
তারে বলি বলি বলা হল না।[১]

ইহা কাব্যকলায় অসম্পূর্ণ, অতএব সুরের প্রতি ইহার অনেকটা নির্ভর। সংস্কৃত শব্দ এবং ছন্দ ধ্বনিগৌরবে পরিপূর্ণ। সুতরাং সংস্কৃতে কাব্যরচনার সাধ গানে মিটাইতে হয় নাই, বরং গানের সাধ কাব্যে মিটিয়াছে। মেঘদূত সুরে বসানো বাহুল্য।

হিন্দিসাহিত্য সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানি না। কিন্তু এ-কথা বলিতে পারি, হিন্দিতে যে-সকল ধ্রুপদ খেয়াল প্রভৃতি পদ শুনা যায় তাহার অধিকাংশই কেবলমাত্র গান, একেবারেই কাব্য নহে। কথাকে সামান্য উপলক্ষ্যমাত্র করিয়া সুর শুনানোই হিন্দিগানের প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু বাংলায় সুরের সাহায্য লইয়া কথার ভাবে শ্রোতাদিগকে মুগ্ধ করাই কবির উদ্দেশ্য। কবির গান, কীর্তন, রামপ্রসাদী গান, বাউলের গান প্রভৃতি দেখিলেই ইহার প্রমাণ হইবে। অতএব কাব্যরচনাই বাংলাগানের মুখ্য উদ্দেশ্য, সুরসংযোগ গৌণ। এইসকল কারণে বাংলা সাহিত্যভাণ্ডারে রত্ন যাহা কিছু পাওয়া যায় তাহা গান।

সাধনা— ১২৯৯ শ্রাবণ

১ কবিওয়ালা রাম বসুর (১৭৮৬-১৮২৮) গান। দ্রষ্টব্য: সুশীলকুমার দে-প্রণীত *History of Bengali Literature* পৃ ৩৭৭ এবং জীবনস্মৃতি, অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী।

বিহারীলালের ছন্দ

সাময়িক কবিদিগের সহিত বিহারীলালের একটি প্রধান প্রভেদ তাঁহার ভাষা। ভাষার প্রতি আমাদের অনেক কবির কিয়ৎপরিমাণে অবহেলা আছে। বিশেষত মিত্রাক্ষর ছন্দের মিলটা তাঁহারা নিতান্ত কায়ক্লেশে রক্ষা করেন। অনেকে কেবলমাত্র শেষ অক্ষরের মিলকে যথেষ্ট জ্ঞান করেন এবং অনেকে 'হয়েছে, করেছে, ভুলেছে' প্রভৃতি ক্রিয়াপদের মিলকে মিল বলিয়া গণ্য করিয়া থাকেন। মিলের দুইটি প্রধান গুণ আছে, এক তাহা কর্ণতৃপ্তিকর আর এক অভাবিতপূর্ব। অসম্পূর্ণ মিলে কর্ণের তৃপ্তি হয় না, সেটুকু মিলে স্বরের অনৈক্যটা আরো যেন বেশি করিয়া ধরা পড়ে এবং তাহাতে কবির অক্ষমতা ও ভাষার দারিদ্র্য প্রকাশ পায়। ক্রিয়াপদের মিল যত ইচ্ছা করা যাইতে পারে, সেরূপ মিলে কর্ণে প্রত্যেকবার নূতন বিস্ময় উৎপাদন করে না, এইজন্য তাহা বিরক্তিজনক ও 'একঘেয়ে' হইয়া উঠে। বিহারীলালের ছন্দে মিলের এবং ভাষার দৈন্য নাই। তাহা প্রবহমান নির্ঝরের মতো সহজ সংগীতে অবিশ্রাম ধ্বনিত হইয়া চলিয়াছে। ভাষা স্থানে স্থানে সাধুতা পরিত্যাগ করিয়া অকস্মাৎ অশিষ্ট এবং কর্ণপীড়ক হইয়াছে, ছন্দ অকারণে আপন বাঁধ ভাঙিয়া স্বেচ্ছাচারী হইয়া উঠিয়াছে; কিন্তু সে কবির স্বেচ্ছাকৃত, অক্ষমতাজনিত নহে। তাঁহার রচনা পড়িতে পড়িতে কোথাও এ-কথা মনে হয় না যে, এইখানে কবিকে দায়ে পড়িয়া মিল নষ্ট বা ছন্দ ভঙ্গ করিতে হইয়াছে।

...প্রথম উপহারটি ব্যতীত 'বঙ্গসুন্দরী'র অন্য সকল কবিতার ছন্দই পর্যায়ক্রমে বার এবং এগার অক্ষরে ভাগ করা। যথা—

সুঠাম শরীর পেলব লতিকা,
আনত সুষমা-কুসুম-ভরে;

চাঁচর চিকুর নীরদ-মালিকা
লুটায়ে পড়েছে ধরণী 'পরে।

এ-ছন্দ নারীবর্ণনার উপযুক্ত বটে, ইহাতে তালে তালে নূপুর ঝংকৃত হইয়া উঠে। কিন্তু এ-ছন্দের প্রধান অসুবিধা এই যে, ইহাতে যুক্ত-অক্ষরের স্থান নাই। পয়ার ত্রিপদী প্রভৃতি ছন্দে লেখকের এবং পাঠকের অনেকটা স্বাধীনতা আছে। অক্ষরের মাত্রাগুলিকে কিয়ৎ-পরিমাণে ইচ্ছামতো বাড়াইবার কমাইবার অবকাশ আছে।[১] প্রত্যেক অক্ষরকে একমাত্রার স্বরূপ গণ্য করিয়া একেবারে একনিশ্বাসে পড়িয়া যাইবার আবশ্যক হয় না। দৃষ্টান্তের দ্বারা আমার কথা স্পষ্ট হইবে।

হে সারদে দাও দেখা,
বাঁচিতে পারিনে একা,
কাতর হয়েছে প্রাণ, কাতর হৃদয়;
কি বলেছি অভিমানে
শুনো না শুনো না কানে,
বেদনা দিও না প্রাণে ব্যথার সময়।

ইহার মধ্যে প্রায় যুক্ত-অক্ষর নাই। নিম্নলিখিত শ্লোকে অনেকগুলি যুক্তাক্ষর আছে, অথচ উভয় শ্লোকই সুখপাঠ্য এবং শ্রুতিমধুর।

পদে পৃথ্বী, শিরে ব্যোম,
তুচ্ছ তারা সূর্য সোম,
নক্ষত্র নখাগ্রে যেন গনিবারে পারে;
সমুখে সাগরাম্বরা
ছড়িয়ে রয়েছে ধরা,
কটাক্ষে কখন যেন দেখিছে তাহারে।

এই দুটি শ্লোকই কবির রচিত 'সারদামঙ্গল' হইতে উদ্ধৃত। এক্ষণে 'বঙ্গসুন্দরী' হইতে দুইটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া তুলনা করা যাক।

একদিন দেব তরুণ তপন
হেরিলেন সুরনদীর জলে,
অপরূপ এক কুমারীরতন
খেলা করে নীল নলিনীদলে।

১ তুলনীয়: পয়ার ছন্দের বিশেষ গুণ···বাড়ানো-কমানো যায় পৃ ১২০।

ইহার সহিত নিম্নউদ্ধৃত শ্লোকটি একসঙ্গে পাঠ করিলে প্রভেদ প্রতীয়মান হইবে।

অপ্সরী কিন্নরী দাঁড়াইয়ে তীরে
ধরিয়ে ললিত করুণা-তান,
বাজায়ে বাজায়ে বীণা ধীরে ধীরে
গাহিছে আদরে স্নেহের গান।

"অপ্সরী কিন্নরী" যুক্ত-অক্ষর লইয়া এখানে ছন্দোভঙ্গ করিয়াছে।[১] কবিও এই কারণে বঙ্গসুন্দরীতে যথাসাধ্য যুক্ত-অক্ষর বর্জন করিয়া চলিয়াছেন।[২]

কিন্তু বাংলা যে ছন্দে যুক্ত-অক্ষরের স্থান হয় না সে ছন্দ আদরণীয় নহে। কারণ ছন্দের ঝংকার এবং ধ্বনিবৈচিত্র্য যুক্ত-অক্ষরের উপরেই অধিক নির্ভর করে। একে বাংলা ছন্দে স্বরের দীর্ঘহ্রস্বতা নাই, তার উপরে যদি যুক্ত-অক্ষর বাদ পড়ে, তবে ছন্দ নিতান্তই অস্থিবিহীন সুললিত শব্দপিণ্ড হইয়া পড়ে। তাহা শীঘ্রই শ্রান্তিজনক তন্দ্রাকর্ষক হইয়া উঠে এবং হৃদয়কে আঘাতপূর্বক ক্ষুব্ধ করিয়া তুলিতে পারে না।[৩] সংস্কৃত ছন্দে যে বিচিত্র সংগীত তরঙ্গিত হইতে থাকে তাহার প্রধান কারণ স্বরের দীর্ঘহ্রস্বতা এবং যুক্ত-অক্ষরের বাহুল্য। মাইকেল মধুসূদন ছন্দের এই নিগূঢ় তত্ত্বটি অবগত ছিলেন, সেইজন্য তাঁহার অমিত্রাক্ষরে এমন পরিপূর্ণ ধ্বনি এবং তরঙ্গিত গতি অনুভব করা যায়।[৪]

আর্যদর্শনে বিহারীলালের সারদামঙ্গল-সংগীত যখন প্রথম বাহির হইল, তখন ছন্দের প্রভেদ মুহূর্তেই প্রতীয়মান হইল। সারদামঙ্গলের ছন্দ নূতন নহে, তাহা প্রচলিত ত্রিপদী; কিন্তু কবি তাহা সংগীতে সৌন্দর্যে সিঞ্চিত করিয়া তুলিয়াছেন। বঙ্গসুন্দরীর ছন্দোলালিত্য অনুকরণ করা সহজ, সেই মিষ্টতা একবার অভ্যস্ত হইয়া গেলে তাহার বন্ধন ছেদন করা কঠিন, কিন্তু সারদামঙ্গলের গীতসৌন্দর্য অনুকরণসাধ্য নহে।

সাধনা—১৩০১ আষাঢ়

১ তুলনীয়: বদনমণ্ডলে ভাসিছে ব্রীড়া পৃ ৫৫ ও ১২৩, লৌহশৃঙ্খলের ডোর পৃ ৬৬, এবং রয়েছে পড়িয়া শৃঙ্খলে বাঁধা পৃ ৬৭।

২ প্রাক্‌মানসী যুগের রবীন্দ্রসাহিত্যেও যুক্তাক্ষরবর্জনের প্রয়াস দেখা যায়। লক্ষণীয়: 'সেইজন্যে যুক্ত-অক্ষর...সমতল করে যাচ্ছিলুম' ইত্যাদি, পৃ ৬৬-৬৭।

৩ তুলনীয়: জিহ্বা কোথাও...জাগ্রত করিয়া রাখিতে পারে না পৃ ১৭২।

৪ তুলনীয়: মাইকেল তাঁহার মহাকাব্যে...পরিপূর্ণ ধ্বনি নষ্ট হয় পৃ ১৭৩।

সন্ধ্যাসংগীত-এর ছন্দ

একসময়ে জ্যোতিদাদারা দূরদেশে ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন, তেতালার ছাদের ঘরগুলি শূন্য ছিল। সেই সময় আমি সেই ছাদ ও ঘর অধিকার করিয়া নির্জন দিনগুলি যাপন করিতাম। এইরূপে যখন আপন মনে একা ছিলাম তখন, জানি না কেমন করিয়া, কাব্যরচনার যে-সংস্কারের মধ্যে বেষ্টিত ছিলাম সেটা খসিয়া গেল। আমার সঙ্গীরা যে-সব কবিতা ভালোবাসিতেন ও তাঁহাদের নিকট খ্যাতি পাইবার ইচ্ছায় মন স্বভাবতই যে-সব কবিতার ছাঁচে লিখিবার চেষ্টা করিত, বোধ করি তাঁহারা দূরে যাইতেই আপনা-আপনি সেই-সকল কবিতার শাসন হইতে আমার চিত্ত মুক্তিলাভ করিল।

একটা স্লেট লইয়া কবিতা লিখিতাম। সেটাও বোধ হয় একটা মুক্তির লক্ষণ। তাহার আগে কোমর বাঁধিয়া যখন খাতায় কবিতা লিখিতাম তাহার মধ্যে নিশ্চয়ই রীতিমতো কাব্য লিখিবার একটা পণ ছিল, কবিযশের পাকা সেহায় সেগুলি জমা হইতেছে বলিয়া নিশ্চয়ই অন্যের সঙ্গে তুলনা করিয়া মনে মনে হিসাব মিলাইবার একটা চিন্তা ছিল, কিন্তু স্লেটে যাহা লিখিতাম তাহা লিখিবার খেয়ালেই লেখা। স্লেট জিনিসটা বলে— ভয় কী তোমার, যাহা খুশি তাহাই লেখো-না, হাত বুলাইলেই তো মুছিয়া যাইবে।

কিন্তু এমনি করিয়া দুটো-একটা কবিতা লিখিতেই মনের মধ্যে ভারি-একটা আনন্দের আবেগ আসিল। আমার সমস্ত অন্তঃকরণ বলিয়া উঠিল— বাঁচিয়া গেলাম, যাহা লিখিতেছি, এ দেখিতেছি সম্পূর্ণ আমারই।...

এই স্বাধীনতার প্রথম আনন্দের বেগে ছন্দোবন্ধকে আমি একেবারেই খাতির করা ছাড়িয়া দিলাম। নদী যেমন কাটা খালের মতো সিধা চলে না, আমার ছন্দ তেমনি আঁকিয়া বাঁকিয়া নানামূর্তি ধারণ করিয়া

চলিতে লাগিল। আগে হইলে এটাকে অপরাধ বলিয়া গণ্য করিতাম, কিন্তু এখন লেশমাত্র সংকোচ বোধ হইল না। স্বাধীনতা আপনাকে প্রথম প্রচার করিবার সময় নিয়মকে ভাঙে, তাহার পরে নিয়মকে আপন হাতে সে গড়িয়া তুলে; তখনই সে যথার্থ আপনার অধীন হয়।...

বিহারী চক্রবর্তী মহাশয় তাঁহার 'বঙ্গসুন্দরী' কাব্যে যে-ছন্দের প্রবর্তন করিয়াছিলেন তাহা তিনমাত্রামূলক। যেমন—

একদিন দেব তরুণ তপন
হেরিলেন সুরনদীর জলে,
অপরূপ এক কুমারীরতন
খেলা করে নীল নলিনীদলে।

তিনমাত্রা জিনিসটা দুইমাত্রার মতো চৌকা নহে, তাহা গোলার মতো গোল, এইজন্য তাহা দ্রুতবেগে গড়াইয়া চলিয়া যায়।[১] তাহার এই বেগবান্ গতির নৃত্য যেন ঘনঘন ঝংকারে নূপুর বাজাইতে থাকে। একদা এই ছন্দটাই আমি বেশি করিয়া ব্যবহার করিতাম। ইহা যেন দুই পায়ে চলা নহে, ইহা যেন বাইসিক্‌ল্‌-এ ধাবমান হওয়ার মতো। এইটেই আমার অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল। 'সন্ধ্যাসংগীত'এ আমি ইচ্ছা করিয়া নহে কিন্তু স্বভাবতই এই বন্ধন ছেদন করিয়াছিলাম।[২] ...

কোনোপ্রকার পূর্বসংস্কারকে খাতির না করিয়া এমনি করিয়া লিখিয়া যাওয়াতে যে জোর পাইলাম তাহাতেই প্রথম এই আবিষ্কার করিলাম যে, যাহা আমার সকলের চেয়ে কাছে পড়িয়া ছিল তাহাকেই আমি দূরে সন্ধান করিয়া ফিরিয়াছি। কেবলমাত্র নিজের উপর ভরসা করিতে পারি নাই বলিয়াই নিজের জিনিসকে পাই নাই। হঠাৎ স্বপ্ন হইতে জাগিয়াই যেন দেখিলাম আমার হাতে শৃঙ্খল পরানো নাই। সেইজন্যই হাতটাকে যেমন-খুশি ব্যবহার করিতে পারি এই আনন্দটাকে প্রকাশ করিবার জন্যই হাতটাকে যথেচ্ছ ছুঁড়িয়াছি।

প্রবাসী—১৩১৯ বৈশাখ

১ তুলনীয়: তিনমাত্রা তালটা যেন গোল গড়নের, গড়িয়ে চলে পৃ ১২৪।
২ তুলনীয়: বঙ্গসুন্দরীর ছন্দোলালিত্য...বন্ধন ছেদন করা কঠিন পৃ ১৭৮।

বিবিধ

বাংলা ছন্দে যুক্তাক্ষর

এই গ্রন্থের অনেকগুলি কবিতায় যুক্তাক্ষরকে দুই অক্ষর স্বরূপ গণ্য করা হইয়াছে।[১] সেরূপ স্থলে সংস্কৃত ছন্দের নিয়মানুসারে যুক্তাক্ষরকে দীর্ঘ করিয়া না পড়িলে ছন্দ রক্ষা করা অসম্ভব হইবে।[২] যথা—

নিম্নে যমুনা বহে স্বচ্ছ শীতল ;
ঊর্ধ্বে পাষাণতট, শ্যাম শিলাতল।[৩]

'নিম্নে, স্বচ্ছ এবং ঊর্ধ্ব' এই কয়েকটি শব্দে তিন মাত্রা গণনা না করিলে পয়ার ছন্দ থাকে না। আমার বিশ্বাস যুক্তাক্ষরকে দুই অক্ষর স্বরূপ গণনা করাই স্বাভাবিক এবং তাহাতে ছন্দের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে, কেবল বাংলা ছন্দ পাঠ করিয়া বিকৃত অভ্যাস হওয়াতেই সহসা তাহা দুঃসাধ্য মনে হইতে পারে। শব্দের আরম্ভ-অক্ষর যুক্ত হইলেও তাহাকে যুক্তাক্ষর স্বরূপে গণনা করা যায় নাই।[৪] পাঠকেরা এইরূপ আরো দুই-একটি ব্যতিক্রম দেখিতে পাইবেন।

মানসী (প্রথম সং), ভূমিকা— ১২৯৭ পৌষ

১ দ্রষ্টব্য পৃ ৫, ৬৭, ১২৩। 'মানসী' কাব্যে প্রবর্তিত এই নূতন ছন্দোরীতির নাম 'মাত্রাবৃত্ত'। গ্রন্থপরিচয় দ্রষ্টব্য।

২ সংস্কৃত ছন্দের নিয়মে যুক্তাক্ষরকে নয়, যুক্তাক্ষরের পূর্ববর্তী অক্ষরকে, দীর্ঘ (অর্থাৎ দ্বিমাত্রক) বলে গণ্য করা হয় : দ্রষ্টব্য পৃ ১৮৬ পাদটীকা ৪। সেজন্যই 'শব্দের আরম্ভ-অক্ষর' যুক্ত হলেও দ্বিমাত্রক হয় না। উক্ত নিয়ম অনুসারে 'নিম্ন' ও 'স্বচ্ছ' শব্দের 'নি' ও 'স্ব' দ্বিমাত্রক। আসলে ও-দুই শব্দের 'নিম্‌' ও 'স্বচ্‌' এই দুটি যুগ্মধ্বনি দ্বিমাত্রক বলে গণনীয়। এই নূতন ছন্দে ঐ, ঔ প্রভৃতি যুগ্মস্বরও দ্বিমাত্রক বলে স্বীকৃত হয়।

৩ 'নিষ্ফল উপহার' থেকে উদ্ধৃত। এর ছন্দ মাত্রাবৃত্ত পয়ার। পরে এটি সাধারণ পয়ার ছন্দে রূপান্তরিত হয় : দ্রষ্টব্য 'কথা ও কাহিনী'।

বাংলা ছন্দে অনুপ্রাস

সৌন্দর্যের সরলতায় যাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে না, ভাবের গভীরতায় যাহাদের নিমগ্ন হইবার অবসর নাই, ঘনঘন অনুপ্রাসে অতি শীঘ্রই তাহাদের মনকে উত্তেজিত করিয়া দেয়। সংগীত যখন বর্বর অবস্থায় থাকে তখন তাহাতে রাগরাগিণীর যতই অভাব থাক, তাল-প্রয়োগের খচমচ কোলাহল যথেষ্ট থাকে। সুরের অপেক্ষা সেই ঘনঘন সশব্দ আঘাতে অশিক্ষিত চিত্ত সহজে মাতিয়া উঠে। একশ্রেণীর কবিতায় অনুপ্রাস সেইরূপ ক্ষণিক ত্বরিত সহজ উত্তেজনার উদ্রেক করে। সাধারণ লোকের কর্ণ অতি শীঘ্র আকর্ষণ করিবার এমন সুলভ উপায় অল্পই আছে। অনুপ্রাস যখন ভাব ভাষা ও ছন্দের অনুগামী হয় তখন তাহাতে কাব্যের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে, কিন্তু সে সকলকে ছাড়াইয়া ছাপাইয়া উঠিয়া যখন মূঢ়লোকের বাহবা লইবার জন্য অগ্রসর হয় তখন তদ্দ্বারা সমস্ত কবিতা ইতরতা প্রাপ্ত হয়।

কবিদলের গানে অনেক স্থলে অনুপ্রাস, ভাব ভাষা এমন কি ব্যাকরণকে ঠেলিয়া ফেলিয়া শ্রোতাদের নিকট প্রগল্‌ভতা প্রকাশ করিতে অগ্রসর হয়।...

একে বাংলা শব্দের কোনো ভার নাই, ইংরেজি প্রথামতো তাহাতে একসেন্‌ট্‌ নাই, সংস্কৃত প্রথামতো তাহাতে হ্রস্বদীর্ঘ রক্ষা হয় না,[১] তাহাতে আবার সমালোচ্য কবির গানে সুনিয়মিত ছন্দের বন্ধন না থাকাতে এইসমস্ত অযত্নকৃত রচনাগুলিকে শ্রোতার মনে মুদ্রিত করিয়া দিবার জন্য ঘনঘন অনুপ্রাসের বিশেষ আবশ্যক হয়। সোজা দেওয়ালের উপর লতা উঠাইতে গেলে যেমন মাঝে মাঝে পেরেক মারিয়া তাহার অবলম্বন সৃষ্টি করিয়া যাইতে হয়, এই অনুপ্রাসগুলিও সেইরূপ ঘনঘন

১ তুলনীয়: সংস্কৃত ভাষায়...জানান দেবার পৃ ১২২, বাংলা শব্দ উচ্চারণের মধ্যে... লোপ পাইয়াছে পৃ ১৭২।

শ্রোতাদের মনে পেরেক মারিয়া যাওয়া। অনেক নির্জীব রচনাও এই কৃত্রিম উপায়ে অতি দ্রুতবেগে মনোযোগ আচ্ছন্ন করিয়া বসে। বাংলা পাঁচালিতেও এই কারণেই এত অনুপ্রাসের ঘটা।[১]

সাধনা— ১৩০২ জ্যৈষ্ঠ

কৌতুককাব্যের ছন্দ

পদ্যকে সমিল গদ্যরূপে চালাইবার কোনো হেতু নাই।[২] ইহাতে পদ্যের স্বাধীনতা বাড়ে না, বরঞ্চ কমিয়া যায়। কারণ কবিতা পড়িবার সময় পদ্যের নিয়ম রক্ষা করিয়া পড়িতে স্বতই চেষ্টা জন্মে, কিন্তু মধ্যে মধ্যে যদি স্খলন হইতে থাকে তবে তাহা বাধাজনক ও পীড়াদায়ক হইয়া উঠে।

বায়রনের ডন জুয়ানে কবি অবলীলাক্রমে যথেচ্ছ কৌতুকের অবতারণা করিয়াছেন। কিন্তু নির্দোষ ছন্দের সুকঠিন নিয়মের মধ্যেই সেই অনায়াস অবলীলাভঙ্গি পাঠককে এরূপ পদে পদে বিস্মিত করিয়া তোলে। ইনগোলডসবি-কাহিনী[৩] প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত নিম্নশ্রেণীর কৌতুককাব্যেও ছন্দের অস্খলিত পারিপাট্য বিশেষরূপে লক্ষিত হয়।

বস্তুত ছন্দের শৈথিল্যে হাস্যরসের নিবিড়তা নষ্ট করে। কারণ হাস্যরসের প্রধান দুইটি উপাদান অবাধ দ্রুতবেগ ও অভাবনীয়তা। যদি পড়িতে গিয়া ছন্দে বাধা পাইয়া যতিস্থাপন সম্বন্ধে দুই-তিন বার দুই-তিন রকম পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হয় তবে সেই চেষ্টার মধ্যে হাস্যের তীক্ষ্ণতা আপন ধার নষ্ট করিয়া ফেলে।[৪]

১ দৃষ্টান্ত ২-৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

২ এই রচনাংশটি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'আষাঢ়ে' (১৩০৫) কাব্যের ছন্দ-সমালোচনা। উক্ত কাব্যের ভূমিকায় গ্রন্থকার লিখেছেন, "এ-কবিতাগুলির…ছন্দোবন্ধ অতীব শিথিল। ইহাকে সমিল গদ্য নামেই অভিহিত করা সংগত"।

৩ বস্তুত 'আষাঢ়ে'র কবিতাগুলি Rev. R. A. Burham-রচিত *Ingoldsby Legends*-এর অনুকরণেই লেখা। দ্রষ্টব্য নবকৃষ্ণ ঘোষের 'দ্বিজেন্দ্রলাল', একাদশ পরিচ্ছেদ।

৪ তুলনীয়: কোন্‌খানে হাঁপ ছাড়িতে হইবে…বাহির করিতে হয় পৃ ১৭০।

অবশ্য কোনো নূতন ছন্দ প্রথম পড়িতে কষ্ট হয় এবং যাঁহাদের ছন্দে স্বাভাবিক কান নাই তাঁহারা পরের উপদেশ ব্যতীত তাহা কোনো কালেই পড়িতে পারেন না। কিন্তু আলোচ্য ছন্দের প্রধান বাধা তাহার নূতনত্ব নহে। তাহার সর্বত্র এক নিয়ম বজায় থাকে নাই, এইজন্য পড়িতে পড়িতে আবশ্যকমতো কোথাও টানিয়া কোথাও ঠাসিয়া কমি-বেশি করিয়া চলিতে হয়। এমন করিয়া বরঞ্চ মনে মনে পড়া চলে, কিন্তু কাহাকেও পড়িয়া শুনাইতে হইলে পদে পদে অপ্রতিভ হইতে হয়।...

অথচ ছন্দের এবং মিলের উপর গ্রন্থকারের যে আশ্চর্য দখল তাহাতে সন্দেহ নাই। উত্তপ্ত লৌহচক্রে হাতুড়ি পড়িতে থাকিলে যেমন স্ফুলিঙ্গবৃষ্টি হইতে থাকে তাঁহার ছন্দের প্রত্যেক ঝোঁকের মুখে তেমনি করিয়া মিলবর্ষণ হইয়াছে। সেই মিলগুলি বন্দুকের ক্যাপের মতো আকস্মিক হস্যোদ্দীপনায় পরিপূর্ণ। ছন্দের কঠিনতাও যে কবিকে দমাইতে পারে না, তাহারও অনেক উদাহরণ আছে। কবি নিজেই তাঁহার অপেক্ষাকৃত পরবর্তী রচনাগুলিকে নিয়মিত ছন্দের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে স্থায়িত্ব এবং উপযুক্ত মর্যাদা দান করিয়াছেন। তাঁহার 'বাঙালিমহিমা', 'ইংরেজস্তোত্র', 'ডিপুটিকাহিনী' ও 'কর্ণবিমর্দন' সর্বত্র উদ্ধৃত, পঠিত ও ব্যবহৃত হইবার পক্ষে অত্যন্ত অনুকূল হইয়াছে। এই লেখাগুলির মধ্যে যে সুনিপুণ হাস্য ও সুতীক্ষ্ণ বিদ্রূপ আছে তাহা শাণিত সংযত ছন্দের মধ্যে সর্বত্র ঝকঝক করিতেছে।

ভারতী— ১৩০৫ অগ্রহায়ণ

ছড়ার ছন্দ

ছড়ার ছন্দ প্রাকৃতভাষার ঘরাও ছন্দ। এ-ছন্দ মেয়েদের মেয়েলি আলাপ, ছেলেদের ছেলেমি প্রলাপের বাহনগিরি করে এসেছে। ভদ্রসমাজে সভাযোগ্য হবার কোনো খেয়াল এর মধ্যে নেই।[১] এর ভঙ্গিতে এর সজ্জায় কাব্যসৌন্দর্য সহজে প্রবেশ করে, কিন্তু সে অজ্ঞাতসারে। এই ছড়ায় গভীর কথা হালকা চালে পায়ে নূপুর বাজিয়ে চলে, গাম্ভীর্যের

১ দ্রষ্টব্য পৃ ৬-৭, ১২৯, ১০৮।

গুমর রাখে না। অথচ এই ছড়ার সঙ্গে ব্যবহার করতে গিয়ে দেখা গেল যেটাকে মনে হয় সহজ সেটাই সবচেয়ে কম সহজ।

ছড়ার ছন্দকে চেহারা দিয়েছে প্রাকৃত-বাংলা শব্দের চেহারা। আলোর স্বরূপ সম্বন্ধে আধুনিক বিজ্ঞানে দুটো উলটো কথা বলে। এক হচ্ছে আলোর রূপ ঢেউএর রূপ, আর হচ্ছে সেটা কণাবৃষ্টির রূপ। বাংলা সাধুভাষার রূপ ঢেউএর, বাংলা প্রাকৃতভাষার রূপ কণাবৃষ্টির। সাধুভাষার শব্দগুলি গায়ে গায়ে মিলিয়ে গড়িয়ে চলে, শব্দগুলির ধ্বনি স্বরবর্ণের মধ্যবর্তিতায় আঁট বাঁধতে পারে না।[১] দৃষ্টান্ত যথা—

শমন-দমন রাবণ রাজা, রাবণ-দমন রাম।[২]

বাংলা প্রাকৃতভাষায় হসন্তপ্রধান ধ্বনিতে ফাঁক বুজিয়ে শব্দগুলিকে নিবিড় করে দেয়। পাতলা, আঁজলা, বাদলা, পাপড়ি, চাঁদনি প্রভৃতি নিরেট শব্দগুলি সাধুভাষার ছন্দে গুরুপাক। সাধুভাষার ছন্দে ভদ্র বাঙালি চলতে পারে না, তাকে চলিতে হয়, বসতে তার নিষেধ, বসিতে সে বাধ্য।[৩]

ছড়ার ছন্দটি যেমন ঘেঁষাঘেঁষি শব্দের জায়গা, তেমনি সেইসব ভাবের উপযুক্ত—যারা অসতর্ক চালে ঘেঁষাঘেঁষি করে রাস্তায় চলে, যারা পদাতিক, যারা রথচক্রের মোটা চিহ্ন রেখে যায় না পথে পথে, যাদের হাটে মাঠে যাবার পায়ে-চলার চিহ্ন ধুলোর উপর পড়ে আর লোপ পেয়ে যায়।

ছড়ার ছবি, ভূমিকা—১৩৪৪ আশ্বিন

বাংলা ছন্দে স্বরবর্ণ

স্বরবর্ণের কোঠায় আমরা ঋ-কে ঋণস্বরূপে নিয়েছি বর্ণমালায়, কিন্তু উচ্চারণ করি ব্যঞ্জনবর্ণের রি। সেইজন্যে অনেক বাঙালি 'মাতৃভূমি'কে বলেন 'মাত্রিভূমি'। যে-কবি তাঁর ছন্দে ঋ-কারকে স্বরবর্ণরূপে ব্যবহার করেন তাঁর ছন্দে ঐ বর্ণে অনেকের রসনা ঠোকর খায়।[৪]

১ দ্রষ্টব্য পৃ ৬, ১৩৯।

২ কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড।

৩ দ্রষ্টব্য পৃ ৬, ৭৪। এই প্রসঙ্গটি 'ছন্দের হসন্ত-হলন্ত' প্রবন্ধে বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। তুলনীয়: 'টোটকা এই মুষ্টিযোগ...' পৃ ৬০, 'ছুটল কেন...' পৃ ৭৬ ইত্যাদি।

৪ বস্তুত ঋ-কার বাংলাছন্দে বিকল্পে স্বরবর্ণ বলে গণ্য হয়ে থাকে। গ্রন্থপরিচয় দ্রষ্টব্য।

সাধারণত বাংলায় স্বরের দীর্ঘ উচ্চারণ নেই, তবু কোনো কোনো স্থলে স্বরের উচ্চারণ কিছু পরিমাণে বা সম্পূর্ণ পরিমাণে দীর্ঘ হয়ে থাকে। হসন্তবর্ণের পূর্ববর্তী স্বরবর্ণের দিকে কান দিলে সেটা ধরা পড়ে।[১] যেমন 'জল'। এখানে জ-এ যে অকার আছে তার দীর্ঘতা প্রমাণ হয় 'জলা' শব্দের জ-এর সঙ্গে তুলনা করে দেখলে। 'হাত' আর 'হাতা'য় প্রথমটির 'হা' দীর্ঘ, দ্বিতীয়টির হ্রস্ব। 'পিঠ' আর 'পিঠে', 'ভূত' আর 'ভূতো', 'ঘোল' আর 'ঘোলা' তুলনা করে দেখলে কথাটা স্পষ্ট হবে। সংস্কৃতে দীর্ঘস্বরের দীর্ঘতা সর্বত্রই, বাংলায় স্থানবিশেষে। কথায় ঝোঁক দেবার সময় বাংলা স্বরের উচ্চারণ সব জায়গাতেই দীর্ঘ হয়। যেমন— ভা- রি তো পণ্ডিত, কে- বা কার খোঁজ রাখে, আ- জই যাব, হল- ই বা, অবা- ক্ করলে, হাজা- রো লোক, কী- যে বকো, একধা- র থেকে লাগা- ও মার।[২] যুক্তবর্ণের পূর্বে সংস্কৃতে স্বর দীর্ঘ হয়, বাংলায় তা হয় না।[৩]

বাংলাভাষা-পরিচয়—১৩৫০ কার্তিক

গদ্যকবিতা ও ছন্দ

গীতাঞ্জলির গানগুলি ইংরেজি গদ্যে অনুবাদ করেছিলেম। এই অনুবাদ কাব্যশ্রেণীতে গণ্য হয়েছে। সেই অবধি আমার মনে এই প্রশ্ন ছিল যে পদ্যছন্দের সুস্পষ্ট ঝংকার না রেখে ইংরেজিরই মতো বাংলা গদ্যে কবিতার রস দেওয়া যায় কি না। মনে আছে সত্যেন্দ্রনাথকে অনুরোধ করেছিলেম, তিনি স্বীকার করেছিলেন। কিন্তু চেষ্টা করেননি। তখন আমি নিজেই পরীক্ষা করেছি, 'লিপিকা'র অল্প কয়েকটি লেখায় সেগুলি আছে। ছাপবার সময় বাক্যগুলিকে পদ্যের মতো খণ্ডিত করা হয়নি, বোধ করি ভীরুতাই তার কারণ।

১ দ্রষ্টব্য পৃ ৫-৬, ৫৩।

২ তুলনীয়: ও- ই দেখ...বুঝি পৃ ৫৫, আমরা দ্রুত লয়ে... 'এ- ই রে' পৃ ৬১-৬২।

৩ দ্রষ্টব্য পৃ ১৮১ পাদটীকা ১, ২। বাংলা মাত্রাবৃত্ত ছন্দে যুক্তবর্ণের পূর্ববর্তী ধ্বনি দীর্ঘ বলেই গণ্য হয়। আধুনিক কালে 'মানসী' কাব্যে এই নিয়ম প্রথম প্রবর্তিত হয়।

তারপরে আমার অনুরোধক্রমে একবার অবনীন্দ্রনাথ এই চেষ্টায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন।[১] আমার মত এই যে, তাঁর লেখাগুলি কাব্যের সীমার মধ্যে এসেছিল, কেবল ভাষাবাহুল্যের জন্য তাতে পরিমাণরক্ষা হয়নি। আর-একবার আমি সেই চেষ্টায় প্রবৃত্ত হয়েছি।

এই উপলক্ষ্যে একটা কথা বলবার আছে। গদ্যকাব্যে অতিনিরূপিত ছন্দের বন্ধন ভাঙাই যথেষ্ট নয়, পদ্যকাব্যে ভাষায় ও প্রকাশরীতিতে যে একটি সসজ্জ সলজ্জ অবগুণ্ঠনপ্রথা আছে তাও দূর করলে তবেই গদ্যের স্বাধীনক্ষেত্রে তার সঞ্চরণ স্বাভাবিক হতে পারে। অসংকুচিত গদ্যরীতিতে কাব্যের অধিকারকে অনেকদূর বাড়িয়ে দেওয়া সম্ভব এই আমার বিশ্বাস এবং সেইদিকে লক্ষ্য রেখে এই গ্রন্থে প্রকাশিত কবিতাগুলি লিখেছি। এর মধ্যে কয়েকটি কবিতা আছে তাতে মিল নেই, পদ্যছন্দ আছে; কিন্তু পদ্যের বিশেষ ভাষারীতি ত্যাগ করবার চেষ্টা করেছি।[২] যেমন— তরে, সনে, মোর প্রভৃতি যে-সকল শব্দ গদ্যে ব্যবহার হয় না সেগুলিকে এইসকল কবিতায় স্থান দিইনি।

পুনশ্চ (প্রথম সং), ভূমিকা—১৩৩৯ আশ্বিন

১ দ্রষ্টব্য 'পাহাড়িয়া' নামক চারটি গদ্যকবিতা : বিচিত্রা ১৩৩৪ শ্রাবণ-কার্তিক।

২ কোমল গান্ধার, শালিখ, অস্থানে, ঘরছাড়া, ছুটি, গানের বাসা, পয়লা আশ্বিন, এই সাতটি কবিতায় মিল নেই, চলতি বাংলার ছন্দ আছে। 'মৃত্যু' কবিতায় আছে সাধু বাংলার ছন্দ, 'খেলনার মুক্তি' প্রভৃতি যে ছয়টি কবিতা 'পরিশেষ' থেকে এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে গৃহীত হয়েছে সেগুলিতেও তাই; এই সাতটি কবিতায় সাধু ছন্দ ব্যবহৃত হলেও সাধুভাষারীতি ব্যবহৃত হয়নি—সাধু ছন্দে হসন্তমধ্য চলতি ক্রিয়াপদের ব্যবহার বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এ ছাড়া এই কাব্যের অনেক কবিতাই অল্পবিস্তর ছন্দঘেঁষা, আগাগোড়া ছন্দ রক্ষিত না হলেও নানাস্থানেই কিছুকিছু ছন্দ এসে পড়েছে।

চিঠিপত্র

প্রমথ চৌধুরীকে লেখা

চলতি কথায় একটা লম্বা ছন্দের[১] কবিতা লিখেছি। এটা কি পড়া যায় কিংবা বোঝা যায় কিংবা ছাপানো যেতে পারে। নাম-রূপের মধ্যে রূপটা আমি দিলুম, নাম দিতে হয় তুমি দিয়ো।[২]

যারা আমার সাঁঝ-সকালের গানের দীপে জ্বালিয়ে দিলে আলো
আপন হিয়ার পরশ দিয়ে, এই জীবনের সকল সাদা-কালো
যাদের আলো-ছায়ার লীলা, বাইরে বেড়ায় মনের মানুষ যারা
তাদের প্রাণের ঝরনাস্রোতে আমার পরান হয়ে হাজার-ধারা
চলছে বয়ে চতুর্দিকে। কালের যোগে নয় তো মোদের আয়ু,
নয় সে কেবল দিবস-রাতির সাতনলি হার, নয় সে নিশাসবায়ু।
নানান প্রাণের প্রেমের মিলে নিবিড় হয়ে আত্মীয়ে বান্ধবে
মোদের পরমায়ুর পাত্র গভীর ক'রে পূরণ করে সবে।
সবার বাঁচায় আমার বাঁচা আপন সীমা ছাড়ায় বহুদূরে,
নিমেষগুলির ফল পেকে যায় বিচিত্র আনন্দরসে পুরে;
অতীত হয়ে তবুও তারা বর্তমানের বৃন্ত-দোলায় দোলে,—
গর্ভ হতে মুক্ত শিশু তবুও যেমন মায়ের বক্ষে কোলে
বন্দী থাকে নিবিড় প্রেমের বাঁধন দিয়ে। তাই তো যখন শেষে
একে একে আপন জনে সূর্য-আলোর অন্তরালের দেশে

১ প্রাকৃত-বাংলার মহাপয়ার বা দীর্ঘপয়ার; অধিকন্তু এটি পংক্তিলঙ্ঘক বা লাইন-ডিঙানো চালে রচিত। এ-ধরনের ছন্দের এটিই প্রথম নিদর্শন, তাই 'এটি কি পড়া যায়' এ-প্রশ্ন করা হয়েছে।

২ কবিতাটি প্রথম প্রকাশিত হয় 'সবুজপত্রে' (১৩২৪ জ্যৈষ্ঠ) 'পরমায়ু' নামে। পরে 'পলাতকা'য় 'শেষ গান' নামে ও 'পূরবী'তে 'পূরবী' নামে গৃহীত হয়। প্রত্যেকবারই কবিতাটি কিছু-কিছু পরিবর্তিত হয়েছে।

আঁখির নাগাল এড়িয়ে পালায়, তখন রিক্ত শীর্ণ জীবন মম
শুষ্ক রেখায় মিলিয়ে আসে বর্ষাশেষের নির্ঝরিণী সম
শূন্য বালুর একটি প্রান্তে ক্লান্তবারি স্রস্ত অবহেলায়।
তাই যারা আজ রইল পাশে এই জীবনের অপরাহ্ণ-বেলায়
তাদের হাতে হাত দিয়ে তুই গান গেয়ে নে থাকতে দিনের আলো,—
বলে নে ভাই, "এই যা দেখা, এই যা ছোঁওয়া, এই ভালো, এই ভালো।
এই ভালো আজ এ-সংগমে কান্নাহাসির গঙ্গাযমুনায়
ঢেউ খেয়েছি, ডুব দিয়েছি, ঘট ভরেছি, নিয়েছি বিদায়।
এই ভালো রে প্রাণের রঙ্গে এই আসঙ্গ সকল অঙ্গে মনে
পুণ্য ধরার ধুলো-মাটি ফল-হাওয়া-জল তৃণ-তরুর সনে।
এই ভালো রে ফুলের সঙ্গে আলোয় জাগা, গান-গাওয়া এই ভাষায়,
তারার সাথে নিশীথ-রাতে ঘুমিয়ে-পড়া নূতন প্রাতের আশায়।"

এই জাতের সাধু ছন্দে আঠার অক্ষরের আসন থাকে।[১] কিন্তু এটাতে কোনো কোনো লাইনে পঁচিশ পর্যন্ত উঠেছে। ফার্স্ট ক্লাসের এক বেঞ্চিতে ছ-জনের বেশি বসবার হুকুম নেই কিন্তু থার্ড ক্লাসে ঠেসাঠেসি ভিড়, এ সেইরকম। কিন্তু যদি এটা ছাপাও তাহলে লাইন ভেঙো না, তাহলে ছন্দ পড়া কঠিন হবে। স্মল পাইকায় মার্জিন কম দিয়ে ছাপলে পঁচিশ অক্ষর ধরতে পারবে।

১৩২৪ জ্যৈষ্ঠ ৪

প্যারীমোহন সেনগুপ্তকে লেখা

সংস্কৃত কাব্য অনুবাদ সম্বন্ধে আমার মত এই যে, কাব্যধ্বনিময় গদ্যে ছাড়া বাংলা পদ্যচ্ছন্দে তার গাম্ভীর্য ও রস রক্ষা করা সহজ নয়। দুটি-চারটি শ্লোক কোনোমতে বানানো যেতে পারে, কিন্তু দীর্ঘ কাব্যের অনুবাদকে সুখপাঠ্য ও সহজবোধ্য করা দুঃসাধ্য। নিতান্ত সরল পয়ারে তার অর্থটিকে প্রাঞ্জল করা যেতে পারে। কিন্তু তাতে ধ্বনিসংগীত মারা

১ তুলনীয়: গম্ভীর পাতাল, যথা… পৃ ৪৬, ১২০ এবং হিমাদ্রির ধ্যানে যাহা…পৃ ৬৯।

যায়, অথচ সংস্কৃত কাব্যে এই ধ্বনিসংগীত অর্থসম্পদের চেয়ে বেশি বই কম নয়।

মন্দাক্রান্তা ছন্দের আলোচনা-প্রসঙ্গে প্রবোধ বাঙালির কানের উল্লেখ করেছেন।[১] বাঙালির কান বলে কোনো বিশেষ পদার্থ আছে বলে আমি মানিনে।[২] মানুষের স্বাভাবিক কানের দাবি অনুসরণ করলে দেখা যায় মন্দাক্রান্তা ছন্দের চার পর্ব। যথা—

মেঘালোকে | ভবতি সুখিনো | প্যন্যথাবৃৎ | তি চেতঃ।

অর্থাৎ মাত্রাহিসাবে আট-সাত-সাত-চার।[৩] শেষের চারকে ঠিক চার বলা চলে না। কারণ লাইনের শেষে একমাত্রা আন্দাজের যতি বিরামের পক্ষে অনিবার্য। এই ছন্দকে বাংলায় আনতে গেলে এই রকম দাঁড়ায়।

দূরে ফেলে গেছ জানি,
স্মৃতির বীণাখানি
বাজায় তব বাণী
মধুরতম।
অনুপমা, জেনো অয়ি,
বিরহ চিরজয়ী
করেছে মধুময়ী
বেদনা মম॥

সংস্কৃতের অমিত্রাক্ষর রীতি অনুবর্তন করা যেতে পারে। যথা—

অভাগা যক্ষ কবে করিল কাজে হেলা, কুবের তাই তারে দিলেন শাপ,
নির্বাসনে সে রহি প্রেয়সী-বিচ্ছেদে বর্ষ ভরি স'বে দারুণ জ্বালা।
গেল চলি রামগিরি-শিখর-আশ্রমে হারায়ে সহজাত মহিমা তার,
সেখানে পাদপরাজি স্নিগ্ধছায়াবৃত সীতার স্নানে পূত সলিলধারা।[৪]

১৯৩১ মার্চ ১৩

১ প্যারীমোহন সেনগুপ্তের 'মেঘদূত' গ্রন্থের (১৩৩৭) ভূমিকায় 'মেঘদূতের অনুবাদ' অংশে মন্দাক্রান্তা ছন্দের আলোচনা দ্রষ্টব্য।

২ তুলনীয়: বাংলাভাষারও নিজের একটা বিশেষ ধ্বনিস্বরূপ আছে পৃ ১২৮, বাঙালি পাঠকের কান একে রীতিমতো ছন্দ বলে মানতে বাধা পাবে পৃ ১৫৮।

৩ দ্রষ্টব্য পৃ ৪৭ পাদটীকা ১।

৪ তুলনীয়: 'যক্ষ সে কোনো জনা ...' পৃ ৯০।

দিলীপকুমার রায়কে লেখা

১

গীতাঞ্জলির কয়েকটি গানের ছন্দ সম্বন্ধে কৈফিয়ত চেয়েছ। গোড়াতেই বলে রাখা দরকার, গীতাঞ্জলিতে এমন অনেক কবিতা আছে যার ছন্দোরক্ষার বরাত দেওয়া হয়েছে গানের সুরের 'পরে।[১] অতএব যে-পাঠকের ছন্দের কান আছে তিনি গানের খাতিরে এর মাত্রা কম-বেশি নিজেই দুরস্ত করে নিয়ে পড়তে পারেন, যাঁর নেই তাঁকে ধৈর্য অবলম্বন করতে হবে।

১। 'নবনব রূপে এস প্রাণে'— এই গানের অন্তিম পদগুলির কেবল অন্তিম দুটি অক্ষরের দীর্ঘহ্রস্ব স্বরের সম্মান স্বীকৃত হয়েছে। যথা 'প্রাণে, গানে' ইত্যাদি। একটিমাত্র পদে তার ব্যতিক্রম আছে। এস দুঃখে সুখে, এস মর্মে—এখানে 'সুখে'র এ-কারকে অবাঙালি রীতিতে দীর্ঘ করা হয়েছে। 'সৌখ্যে' কথাটা দিলে বলবার কিছু থাকত না। তবু সেটাতে রাজি হইনি, মানুষ চাপা দেওয়ার চেয়ে মোটর ভাঙা ভালো।

২। 'অমল ধবল পা- লে লেগেছে মন্দ-মধুর হাওয়া'—এ-গানে গানই মুখ্য, কাব্য গৌণ। অতএব তালকে সেলাম ঠুকে ছন্দকে পিছিয়ে থাকতে হল। যদি বল, পাঠকেরা তো শ্রোতা নয়, তারা মাপ করবে কেন। হয়তো করবে না— কবি জোড়হাত করে বলবে, 'তালদ্বারা ছন্দ রাখিলাম, ত্রুটি মার্জনা করিবেন'।

৩। ৩৪ নম্বরটাও গান।[২] তবুও এর সম্বন্ধে বিশেষ বক্তব্য হচ্ছে এই

[১] তুলনীয়: "প্রবাহিণীতে যে-সমস্ত রচনা প্রকাশ করা হইল তাহার সবগুলিই গান, সুরে বসানো। এই কারণে কোনো কোনো পদে ছন্দের বাঁধন নেই। তৎসত্ত্বেও এগুলিকে গীতিকাব্যরূপে পড়া যাইতে পারে বলিয়া আমার বিশ্বাস।" প্রবাহিণী (১৩৩২), ভূমিকা।

[২] 'আমার মিলন লাগি তুমি আসছ কবে থেকে' ইত্যাদি।

যে, যে-ছন্দগুলি বাংলার প্রাকৃত ছন্দ, অক্ষর গণনা করে তাদের মাত্রা নয়। বাঙালি সেটা বরাবর নিজের কানের[১] সাহায্যে উচ্চারণ করে এসেছে। যথা—

বৃষ্টি পড়ে- টাপুর টুপুর নদেয় এল- বা- ন,
শিবু ঠাকুরের বিয়ে- হবে- তিন কন্তে দা- ন।

আক্ষরিক মাত্রা গুনতি করে একে যদি সংশোধন করতে চাও তাহলে নিখুঁত পাঠান্তরটা দাঁড়াবে এই রকম :

বৃষ্টি পড়ছে টাপুর টুপুর নদেয় আসছে বন্যা,
শিবু ঠাকুরের বিবাহ হচ্ছে দান হবে তিন কন্যা।

রামপ্রসাদের একটি গান আছে :

মা আমায় ঘুরাবি কত
যেন | চোখ-বাঁধা বলদের মতো।

এটাকে যদি সংশোধিত মাত্রায় কেতাদুরস্ত করে লিখতে চাও তাহলে তার নমুনা একটা দেওয়া যাক।

হে মাতা আমারে ঘুরাবি কতই
চক্ষু-বন্ধ বৃষের মতোই।[২]

একটা কথা তোমাকে মনে রাখতে হবে, বাঙালি আবৃত্তিকার সাধুভাষা-প্রচলিত ছন্দেও নিজের উচ্চারণসম্মত মাত্রা রাখেনি বলে ছন্দের অনুরোধে হ্রস্বদীর্ঘের সহজ নিয়মের সঙ্গে রফানিষ্পত্তি করে চলেছে। যথা—

মহাভারতের কথা অমৃত সমান,
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান্।

উচ্চারণ-অনুসারে 'মহাভারতের কথা' লিখতে হয় 'মহাভারতের্কথা', তেমনি 'কাশীরাম দাস কহে' লেখা উচিত 'কাশীরাম দাস্কহে'।[৩] কারণ

১ দ্রষ্টব্য পৃ ১৯০ পাদটীকা ২।

২ বাংলা প্রাকৃত ছন্দের এই উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্যের বিবর এইসব দৃষ্টান্তযোগেই ৬২-৬৩ পৃষ্ঠায় বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে। অন্যত্রও এ-প্রসঙ্গের আলোচনা আছে : পৃ ১৫৩।

৩ দ্রষ্টব্য পৃ ১৭১ পাদটীকা ৩।

হসন্ত শব্দ পরবর্তী স্বর বা ব্যঞ্জন শব্দের সঙ্গে মিলে যায়, মাঝখানে কোনো স্বরবর্ণ তাদের ঠোকাঠুকি নিবারণ করে না। কিন্তু বাঙালি বরাবর সহজেই 'মহাভারতে- কথা' পড়ে এসেছে, অর্থাৎ 'তে'র এ-কারকে দীর্ঘ করে আপসে মীমাংসা করে দিয়েছে।[১] তারপরে 'পুণ্যবান্' কথাটার 'পুণ্যে'র মাত্রা কমিয়ে দিতে সংকোচ করেনি, অথচ 'বান্' কথাটার আক্ষরিক দুই মাত্রাকে টান এবং যতির সাহায্যে চার মাত্রা করেছে।[২]

৪। 'নিভৃত প্রাণের দেবতা'— এই গানের ছন্দ তুমি কী নিয়মে পড় আমি ঠিক বুঝতে পারছিনে। 'দেবতা' শব্দের পরে একটা দীর্ঘ যতি আছে সেটা কি রাখ না। যদি সেই যতিকে মান্য করে থাক তাহলে দেখবে, 'দেবতা' এবং 'খোল দ্বার' মাত্রায় অসমান হয়নি। এসব ধ্বনিগত তর্ক মোকাবিলায় মীমাংসা করাই সহজ। লিখিত বাক্যের দ্বারা এর শেষ সিদ্ধান্তে পৌঁছনো সম্ভব হবে কিনা জানিনে। ছাপাখানাশাসিত সাহিত্যে ছন্দোবিলাসী কবির এই এক মুশকিল— নিজের কণ্ঠ স্তব্ধ, পরের কণ্ঠের করুণার উপর নির্ভর। সেইজন্যেই আমাকে সম্প্রতি এমন কথা শুনতে হচ্ছে যে, আমি ছন্দ ভেঙে থাকি, তোমাদের স্তুতিবাক্যের কল্লোলে সেটা আমার কানে ওঠে না। তখন আকাশের দিকে চেয়ে বলি, 'চতুরানন, কোন্ কানওয়ালাদের 'পরে এর বিচারের ভার'।

৫। 'আজি গন্ধবিধুর সমীরণে'— কবিতাটি সহজ নিয়মেই পড়া উচিত। অবশ্য এর পঠিত ছন্দে ও গীত ছন্দে প্রভেদ আছে।

৬। 'জনগণমনঅধিনায়ক' গানটায় যে মাত্রাধিক্যের কথা বলেছ

১ এ-প্রসঙ্গে 'সতত হে নদ…' রচনাটির ছন্দোবিশ্লেষণপ্রণালী (পৃ ১৪২-৪৩) তুলনীয়।

২ টান এবং যতির সাহায্যে 'বান্' কিভাবে চার মাত্রার স্থান অধিকার করে তা ১০, ২৫-২৬, ও ১২০ পৃষ্ঠায় দেখানো হয়েছে।

সেটা অন্যায় বলনি। ঐ বাহুল্যের জন্যে 'পঞ্জাব' শব্দের প্রথম সিলেব্‌ল্‌টাকে দ্বিতীয় পদের গেটের বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখি—

পন্ | জাব সিন্ধু গুজরাট মারাঠা ইত্যাদি।

'পঞ্জাব'কে 'পঞ্জব' করে নামটার আকার খর্ব করতে সাহস হয়নি, ওটা দীর্ঘকায়াদের দেশ। ছন্দের অতিরিক্ত অংশের জন্যে একটু তফাতে আসন পেতে দেওয়া রীতি বা গীতি বিরুদ্ধ নয়।[১]

এই গেল আমার কৈফিয়তের পালা।

তোমার ছন্দের তর্কে আমাকে সালিস মেনেছ। 'লীলানন্দে'র যে-লাইনটা নিয়ে তুমি অভিযুক্ত আমার মতে তার ছন্দঃপতন হয়নি। ছন্দ রেখে পড়তে গেলে কয়েকটি কথাকে অস্থানে খণ্ডিত করতে হয় বলেই বোধ হয় সমালোচক ছন্দঃপাত কল্পনা করেছেন।[২] ভাগ করে দেখাই।

নৃত্য | শুধু বি- | লানো লা- | বণ্য | ছন্দ |

আসলে 'বিলানো' কথাটাকে দুভাগ করলে কানে খটকা লাগে।

নৃত্য শুধু লাবণ্য-বিলানো ছন্দ

লিখলে কোনোরকম আপত্তি মনে আসে না, অর্থ হিসাবেও স্পষ্টতর হয়। ঐ কবিতায় যে-লাইনে তোমার ছন্দের অপরাধ ঘটেছে সেটা এই

সংগীতসুধা নন্দনে(র) সে আলিম্পনে।

ভাগ করে দেখ

সংগী | ত সুধা | নন্দ | নের সে আ | লিম্পনে |

১ পৃ ১৭১ পাদটীকা ১ এবং সঞ্চয়িতা (চতুর্থ সং) গ্রন্থপরিচয় অংশে এই গানটির ছন্দোবিশ্লেষণ দ্রষ্টব্য।

২ তুলনীয়: বোধ হয় অখণ্ড শব্দকে...কৃত্রিম ঠেকেছে পৃ ১০৪। শব্দমধ্যবর্তী ঝোঁকের ঠিক পূর্বেই হচ্ছে ছেদস্থাপন করার স্বাভাবিক স্থান, অন্যত্র করলেই সেটা হয় 'অস্থান'। শব্দকে অস্থানে খণ্ডিত করলেই কানে খটকা লাগে, যথাস্থানে করলে লাগে না। পরবর্তী 'বিলানো' ও 'লাবণ্য' শব্দের ছেদগত পার্থক্য লক্ষণীয়।

যদি লিখতে

সংগীতসুধা নন্দনেরি আলিম্পনে

তাহলে ছন্দের ত্রুটি হত না।

যাক। তারপরে 'ঐকান্তিকা'। ওটা প্রাকৃত ছন্দে লেখা। সে ছন্দের স্থিতিস্থাপকতা[১] যথেষ্ট। মাত্রার ওজনের একটু-আধটু নড়চড় হলে ক্ষতি হয় না। তবুও নেহাত ঢিলেমি করা চলে না। বাঁধামাত্রার নিয়মের চেয়ে কানের নিয়ম সূক্ষ্ম, বুঝিয়ে বলা বড়ো শক্ত কেন ভালো লাগল বা লাগল না। 'ঐকান্তিকা'র ছন্দটা বন্ধুর হয়েছে সে-কথা বলতেই হবে। অনেক জায়গায় দুরান্বয়ের জন্যে এবং ছন্দের বিভাগে বাক্য বিভক্ত হয়ে গেছে বলে অর্থ বুঝতে কষ্ট পেয়েছি। তন্ন তন্ন আলোচনা করতে হলে বিস্তর বাক্য ও কাল ব্যয় করতে হয়। তাই আমার কান ও বুদ্ধি অনুসরণ করে তোমার কবিতাকে কিছু কিছু বদল করেছি। তুমি গ্রহণ করবে এ আশা করে নয়, আমার অভিমতটা অনুমান করতে পারবে এই আশা করেই।

১৩৩৬ কার্তিক ১

২

তুমি এমন করে সব প্রশ্ন ফাঁদ যে দুচার কথায় সেরে দেওয়া অসম্ভব হয়, তোমার সম্বন্ধে আমার এই নালিশ।

১। 'আবার এরা ঘিরেছে মোর মন'— এই পংক্তির ছন্দোমাত্রার সঙ্গে 'দাহ আবার বেড়ে ওঠে ক্রমে'র মাত্রার অসাম্য ঘটেছে এই তোমার মত। 'ক্রমে' শব্দটার 'ক্র'র উপর যদি যথোচিত ঝোঁক দাও তাহলে

১ দ্রষ্টব্য পৃ ১৯২ পাদটীকা ২। এ-প্রসঙ্গে সাধুছন্দের 'স্থিতিস্থাপকতা'র আলোচনাও লক্ষিতব্য পৃ ১২০-২১।

হিসাবের গোল থাকে না। 'বেড়ে ওঠেক্রমে'— বস্তুত সংস্কৃত ছন্দের নিয়মে 'ক্র' পরে থাকাতে 'ওঠে'র 'এ' স্বরবর্ণে মাত্রা বেড়ে ওঠা উচিত। তুমি বলতে পার আমরা সাধারণত শব্দের প্রথম বর্ণস্থিত র-ফলাকে দুই মাত্রা দিতে কৃপণতা করি। 'আক্রমণ' শব্দের 'ক্র'কে তার প্রাপ্য-মাত্রা দিই, কিন্তু 'ওঠে ক্রমে'র 'ক্র' হ্রস্বমাত্রায় খর্ব করে থাকি। আমি সুযোগ বুঝে বিকল্পে দুইরকম নিয়মই চালাই।[১]

২। ভক্ত | সেথায় | খোল দ্বা | ০০র্ | — এইরকম ভাগে কোনো দোষ নেই। কিন্তু তুমি যে ভাগ করেছিলে | র০০ | এটা চলে না; যেহেতু 'র' হসন্ত বর্ণ, ওর পরে স্বরবর্ণ নেই, অতএব টানব কাকে।

৩। 'জনগণ' গান যখন লিখেছিলেম তখন 'মারাঠা' বানান করিনি। মরাঠিরাও প্রথমবর্ণে আকার দেয় না। আমার ছিল 'মরাঠা'। তারপরে যাঁরা শোধন করেছেন তাঁরাই নিরাকারকে সাকার করে তুলেছেন, আমার চোখে পড়েনি।[২]

১ দ্রষ্টব্য পৃ ১৮১ পাদটীকা ২। সংস্কৃত ছন্দে কোনো শব্দের আরম্ভে যুক্তাক্ষর থাকলে পূর্ববর্তী শব্দের শেষ স্বরটি গুরু বলে গণ্য হয়। বাংলায় সাধারণত তা হয় না। তবে সুযোগ বুঝে বৈকল্পিক নিয়ম চালানো যায়। যথা—

গুরু গুরু গুরু নাচের ডমরু
বাজিল ক্ষণে ক্ষণে।
—বর্ষামঙ্গল, নটরাজ (বনবাণী)

এখানে 'ক্ষণে ক্ষণে'র উচ্চারণরূপ হচ্ছে 'ক্ষণেক্‌ক্ষণে'। কিন্তু

ক্ষণে ক্ষণে আসি তব দুয়ারে
অকারণে গান গাই গো।
—অহৈতুক, নটরাজ (বনবাণী)

এখানে 'ক্ষণে ক্ষণে'র উচ্চারণরূপ 'ক্ষণে-ক্ষণে'। এ-প্রসঙ্গে "বাংলাছন্দে ধ্বনিপ্রয়োগ" প্রবন্ধ (বৈশাখী ১৩৫১ পৃ ১৩-২০) দ্রষ্টব্য।

২ এই গানটি প্রথম প্রকাশিত হয় 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় (১৮৩৩ শক, মাঘ)। সেখানে 'মারাঠা'ই আছে। সম্ভবত পাণ্ডুলিপিতে ছিল 'মরাঠা'।

৪। 'জাগিয়ে' ও 'রটিয়ে' শব্দের 'গিয়ে' ও 'টিয়ে' প্রাকৃত-বাংলার মতে একমাত্রাই। আমি যদি পরিবর্তন করে থাকি সেটাকে স্বীকার করবার প্রয়োজন নেই।

১৯২৯ নবেম্বর ১০

৩

তুমি যে 'ম্লান' শব্দটিকে হসন্তভাবে উচ্চারণ কর এ আমার কাছে নতুন লাগল। আমি কখনই 'ম্লান্' বলিনে। প্রাকৃত-বাংলায় যে-সব শব্দ অতিপ্রচলিত তাদেরই উচ্চারণে এইরকম স্বরলুপ্তি সহ্য করা চলে। 'ম্লান' শব্দটা সে-জাতের নয় এবং ওটা অতি সুন্দর শব্দ, ওকে বিনা দোষে জরিমানা করে ওর স্বরহরণ কোরো না, তোমার কাছে এই আমার দরবার।[১]

যতি বলতে বোঝায় বিরাম।[২] ছন্দ জিনিসটাই হচ্ছে আবৃত্তিকে বিরামের বিশেষ বিধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করা।

ললিত ল | বঙ্গ ল | তা পরি | শীলন।[৩]

প্রত্যেক চারমাত্রার পরে বিরাম।

বদসি যদি | কিঞ্চিদপি।[৪]

পাঁচ পাঁচ মাত্রার শেষে বিরাম। তুমি যদি লেখ 'বদসি যত্তপি' তাহলে

১ মিল বা ছন্দের খাতিরে 'ম্লান' শব্দটিকে কখনও কখনও 'ম্লান্'-রূপে উচ্চারণ করার প্রয়োজন হয়। যথা—

দেবী, আজি আসিয়াছে অনেক যন্ত্রী শুনাতে গান
অনেক যন্ত্র আনি।
আমি আনিয়াছি ছিন্নতন্ত্রী নীরব ম্লান
এই দীন বীণাখানি।
— চিত্রা, সাধনা

২ যতির্জিহ্বেষ্টবিশ্রামস্থানম্, ছন্দোমঞ্জরী ১।১৯ ; যতির্বিচ্ছেদঃ, পিঙ্গলচ্ছন্দঃসূত্রম্ ৬।১।
৩ গীতগোবিন্দ, প্রথম সর্গ, তৃতীয় গীত।
৪ গীতগোবিন্দ, দশম সর্গ, প্রথম গীত। দ্রষ্টব্য পৃ ১২৬।

এই ছন্দে যতির যে পঞ্চায়তী বিধান আছে তা রক্ষা হবে না। এখানে যতিভঙ্গ ছন্দোভঙ্গ একই কথা। প্রত্যেক পদক্ষেপের সমষ্টি নিয়ে নৃত্য, কিন্তু একটিমাত্র পদপাতে যদি চ্যুতি ঘটে তাহলে সে ত্রুটি পদবিক্ষেপের ত্রুটি, সুতরাং সমস্ত নৃত্যেরই ত্রুটি।

১৩৩৮ শ্রাবণ ৯

৪

'তোমারই' কথাটাকে সাধুভাষার ছন্দেও আমরা 'তোমারি' বলে গণ্য করি।[১] এমন একদিন ছিল যখন করা হত না। আমিই প্রথমে এটা চালাই। 'একটি' শব্দকে সাধুভাষায় তিনমাত্রার মর্যাদা যদি দেও তবে ওর হসন্ত হরণ করে অত্যাচারের দ্বারা সেটা সম্ভব হয়। যদি হসন্ত রাখ তবে দ্বৈমাত্রিক বলে ওকে ধরতেই হবে। যদি মাছের উপর কবিতা লেখার প্রয়োজন হয় তবে 'কাৎলা' মাছকে কা-ত-লা উচ্চারণের জোরে সাধুত্বে উত্তীর্ণ করা আর্যসমাজি শুদ্ধিতেও বাধবে। তুমি কি লিখতে চাও

পাতলা করিয়া কাটো কাতলা মাছেরে,
উৎসুক নাতনী যে চাহিয়া আছে রে।

আর আমি যদি লিখি

পাৎলা করি কাটো প্রিয়ে কাৎলা মাছটিরে
টাট্‌কা করি দাও ঢেলে সরষে আর জিরে,
ভেট্‌কি যদি জোটে তাহে মাখো লঙ্কাবাঁটা,
যত্ন করে বেছে ফেলো টুকরো যত কাঁটা।

১ দ্রষ্টব্য পৃ ৫৮-৫৯।

আপত্তি করবে কি। 'উষ্ট্র' যদি দুইমাত্রায় পদক্ষেপ করতে পারে তবে 'একটি' কী দোষ করেছে।[১]

'জনগণমনঅধিনায়ক' সংস্কৃত ছন্দে বাংলায় আমদানি।

১৩৩৮ ভাদ্র ৭

৫

ছন্দ সম্বন্ধে তুমি অতিমাত্র সচেতন হয়ে উঠেছ। শুধু তাই নয়, কোনো মতো নতুন ছন্দ তৈরি করাকে তুমি বিশেষ সার্থকতা বলে কল্পনা কর। আশা করি এই অবস্থা একদিন তুমি কাটিয়ে উঠবে এবং ছন্দ সম্বন্ধে একেবারেই সহজ হবে তোমার মন। আজ তুমি ভাগবিভাগ করে ছন্দ যাচাই করছ, প্রাণের পরীক্ষা চলছে দেহব্যবচ্ছেদ করে। যারা ছান্দসিক তাদের উপর এই কাটাছেঁড়ার ভার দাও, তুমি যদি ছন্দরসিক হও তবে ছুরিকাঁচি ফেলে দিয়ে কানের পথ খোলসা রাখ যেখান দিয়ে বাঁশি মরমে প্রবেশ করে।[২]

গীতার একটা শ্লোকের আরম্ভ এই

অপরং ভবতো জন্ম,

ঠিক তার পরবর্তী শ্লোক

বহুনি মে ব্যতীতানি।[৩]

দ্বিতীয়টির সমান ওজনে প্রথমটি যদি লিখতে হয় তাহলে লেখা উচিত 'অপারং ভাবতো জন্ম'। কিন্তু যাঁরা এই ছন্দ[৪] বানিয়েছিলেন তাঁরা ছান্দসিকের হাটে গিয়ে নিক্তি নিয়ে বসেননি। আমি যখন 'পঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মরাঠা' লিখেছিলুম তখন জানতুম কোনো কবির কানে খটকা লাগবে না, ছান্দসিকের কথা মনে ছিল না।

১৩৩৯ মাঘ ১৩

১ দ্রষ্টব্য 'ছন্দের হসন্ত-হলন্ত' প্রবন্ধের দ্বিতীয় পর্যায় পৃ ৫৯-৬১, ৬৪।

২ তুলনীয়: চণ্ডীদাসের গানে···মরমে পৌঁছত না পৃ ৫৬।

৩ চতুর্থ অধ্যায়, চতুর্থ-পঞ্চম শ্লোক। ৪ অনুষ্টুপ্ বক্ত্র ছন্দ। 'সংজ্ঞাপরিচয়' দ্রষ্টব্য।

৬

ছন্দ নিয়ে যে-কথাটা তুলেছ সে সম্বন্ধে আমার বক্তব্যটা বলি। বাংলার উচ্চারণে হ্রস্বদীর্ঘ উচ্চারণভেদ নেই, সেইজন্যে বাংলাছন্দে সেটা চালাতে গেলে কৃত্রিমতা আসেই।[১]

| | || | |
হেসে হেসে হল যে অস্থির,
||| | |
মেয়েটা বুঝি ব্রাহ্মণ-বস্তির।

এটা জবরদস্তি। কিন্তু

হেসে কুটিকুটি এ কী দশা এর,
এ মেয়েটি বুঝি রায়মশায়ের।

এর মধ্যে কোনো অত্যাচার নেই। রায়মশায়ের চঞ্চল মেয়েটির কাহিনী যদি বলে যাই লোকের মিষ্টি লাগবে, কিন্তু দীর্ঘে হ্রস্বে পা ফেলে চলেন যিনি তাঁর সঙ্গে বেশিক্ষণ আলাপ চলে না। যেটা একেবারে প্রকৃতিবিরুদ্ধ তার নৈপুণ্যে কিছুক্ষণ বাহবা দেওয়া চলে, তার সঙ্গে ঘরকরা চলে না।

'জনগণমনঅধিনায়ক'— ওটা যে গান। দ্বিতীয়ত সকল প্রদেশের কাছে যথাসম্ভব সুগম করবার জন্যে যথাসাধ্য সংস্কৃত শব্দ লাগিয়ে ওটাকে আমাদের পাড়া থেকে জয়দেবীয় পল্লীতে চালান করে দেওয়া হয়েছে। বাংলা শব্দে এক্‌সেন্‌ট্‌ দিয়ে বা ইংরেজি শব্দে না দিয়ে কিংবা সংস্কৃত কাব্যে দীর্ঘহ্রস্বকে বাংলার মতো সমভূম করে যদি রচনা করা যায় তবে কেবলমাত্র ছন্দকৌশলের খাতিরে সাহিত্যসমাজে তার নতুন মেলবন্ধন

১ তুলনীয়: বাংলায় এ-জিনিস…সুব্যক্ত নহে পৃ ৫, সংস্কৃতের অনুকরণে…এই কৃত্রিমতা বেশিক্ষণ সয় না পৃ ১২২।

করা চলবে না। বিশেষত চিহ্ন উঁচিয়ে চোখে খোঁচা দিয়ে পড়াতে চেষ্টা করলে পাঠকদের প্রতি অসৌজন্য করা হয়।

| | |
Autumn flaunteth in his bushy bowers

এতে একটা ছন্দের সূচনা থাকতে পারে, কিন্তু সেইটেই কি যথেষ্ট। অথবা

| | | |
সম্মুখ সমরে পড়ি বীর চূড়ামণি বীরবাহু।

একসেন্‌টুএর তাড়ায় ধাক্কা মেরে চালালে এইরকম লাইনের আলস্য ভেঙে দেওয়া যায় যদি মানি, তবু আর কিছু মানবার নেই কি।

১৯৩৬ জুলাই ৬

৭

দীর্ঘহ্রস্ব ছন্দ সম্বন্ধে আর-একবার বলি। ও এক বিশেষ ধরনের লেখায় বিশেষ ভাষারীতিতেই চলতে পারে। আকবর বাদশার যোধপুরী মহিষীর জন্যে তিনি মহল বানিয়েছিলেন স্বতন্ত্র, সমগ্র প্রাসাদের মধ্যে সে আপন জাত বাঁচিয়ে নির্লিপ্ত ছিল। বাংলার উচ্চারণরীতিকে মেনে চলে যে ছন্দ, তার চলাফেরা সাহিত্যের সর্বত্র, কোনো গণ্ডির মধ্যে নয়। তা পণ্ডিত-অপণ্ডিত সকল পাঠকের পক্ষেই সুগম। তুমি বলতে পার সকল কবিতাই সকলের পক্ষে সুগম হবেই এমনতরো কবুলতিনামায় লেখককে সই দিতে বাধ্য করতে পারিনে। সে তর্ক খাটে ভাবের দিক্ থেকে চিন্তার দিক্ থেকে, কিন্তু ভাষায় সর্বজনীন উচ্চারণরীতির দিক্ থেকে নয়। তুমি বেলের শরবতই কর দইএর শরবতই কর মূল উপাদান জলটা সাধারণ জল, ভাষার উচ্চারণটাও সেইরকম। My heart aches— কোনো ধ্বনিসৌষ্ঠবের খাতিরেই বা বাঙালির অভ্যাসের অনুরোধে heartএর আ এবং achesএর এ-কে হ্রস্ব করা

চলবে না। এই কারণে বাংলায় বিশুদ্ধ সংস্কৃত ছন্দ চালাতে গেলে দীর্ঘ স্বরধ্বনির জায়গায় যুক্তবর্ণের ধ্বনি দিতে হয়। সেটার জন্যে বাংলাভাষা ও পাঠককে সর্বদা ঠেলা মারতে হয় না। অথবা দীর্ঘস্বরকে দুই মাত্রার মূল্য দিলেও চলে।[১] যদি লিখতে

হে অমল চন্দনগন্ধিত, তনু রঞ্জিত
হিমানীতে সিঞ্চিত স্বর্ণ,[২]

তাহলে চতুষ্পাঠীর বহির্বর্তী পাঠকের দুশ্চিন্তা ঘটাত না।

১৯৩৬ জুলাই ৮

৮

বাংলায় প্রাক্‌হসন্ত স্বর দীর্ঘায়ত হয় একথা বলেছি। জল এবং জলা, এই দুটো শব্দের মাত্রাসংখ্যা সমান নয়।[৩] এইজন্যেই 'টুমুস্ টুমুস্ বাদ্যি বাজে' পদটাকে ত্রৈমাত্রিক বলেছি। টু-মু দুই সিলেব্‌ল্, পরবর্তী হসন্ত স্-ও এক সিলেব্‌ল্‌এর মাত্রা নিয়েছে পূর্ববর্তী উ স্বরকে সহজেই দীর্ঘ করে। 'টুমু টুমু বাজা বাজে' এবং 'টুমুস্ টুমুস বাদ্যি বাজে' এক ছন্দ নয়। 'রণিয়া রণিয়া বাজিছে বাজনা' এবং 'টুমুস্ টুমুস্ বাদ্যি বাজে' এক ওজনের ছন্দ। দুটোই ত্রৈমাত্রিক। আমি প্রচলিত ছড়ার দৃষ্টান্তও দেখিয়েছি।

১৯৩৬ জুলাই ২৫

১ তুলনীয়: বাংলার সেই ···দাঁড় করানো যেতে পারে পৃ ৯৩।

২ এ-ছন্দটি জয়দেবের

দিনমণিমণ্ডলমণ্ডন ভবখণ্ডন
মুনিজনমানসহংস

ইত্যাদি গানটির (গীতগোবিন্দ, প্রথম সর্গ, দ্বিতীয় গীত) অনুসরণে রচিত।

৩ দ্রষ্টব্য পৃ ১৮৩ পাদটীকা ১। ৪ দ্রষ্টব্য পৃ ১২৭

ধূর্জটীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে লেখা

১

যখন কবিতাগুলি[১] পড়বে তখন পূর্বাভ্যাস মতো মনে কোরো না ওগুলো পদ্য। অনেকে সেই চেষ্টা করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়ে রুষ্ট হয়ে ওঠে। গদ্যের প্রতি গদ্যের সম্মানরক্ষা করে চলা উচিত। পুরুষকে সুন্দরী রমণীর মতো ব্যবহার করলে তার মর্যাদাহানি হয়। পুরুষেরও সৌন্দর্য আছে, সে মেয়ের সৌন্দর্য নয়—এই সহজ কথাটা বলবার প্রয়াস পেয়েছি পরবর্তী পাতাগুলিতে।

১৩৩৯ আশ্বিন ২৬

২

'পুনশ্চ'র কবিতাগুলোকে কোন্ সংজ্ঞা দেবে। পদ্য নয়, কারণ পদ নেই। গদ্য বললে অতিব্যাপ্তি দোষ ঘটে। পক্ষিরাজ ঘোড়াকে পাখি বলবে, না ঘোড়া বলবে? গদ্যের পাখা উঠেছে একথা যদি বলি, তবে শত্রুপক্ষ বলে বসবে, 'পিঁপিড়ার পাখা ওঠে মরিবার তরে'। জলে স্থলে যে সাহিত্য বিভক্ত, সেই সাহিত্যে এ-জিনিসটা জল নয়, তাই বলে মাটিও নয়। তাহলে খনিজ বলতে দোষ আছে কি। সোনা বলতে পারি এমন অহংকার যদি বা মনে থাকে মুখে বলবার সাহস নেই। না হয় তাঁবাই হল। অর্থাৎ এমন কোনো ধাতু যাতে মূর্তিগড়ার কাজ চলে। গদাধরের মূর্তিও হতে পারে, তিলোত্তমারও হয়। অর্থাৎ রূপরসাত্মক গদ্য, অর্থভারবহ গদ্য নয়। তৈজস গদ্য।

সংজ্ঞা পরে হবে, আপাতত প্রশ্ন এই— ওতে চেহারা গড়ে উঠেছে কিনা। যদি উঠে থাকে তাহলেই হল।

১৩৩৯ কার্তিক ৭

১ এই পংক্তি কয়টি 'পুনশ্চ' কাব্যের উপহৃত কপিতে লিখিত।

৩

গানের আলাপের সঙ্গে 'পুনশ্চ' কাব্যগ্রন্থের গদ্যিকারীতির যে তুলনা করেছ সেটা মন্দ হয়নি। কেননা আলাপের মধ্যে তালটা বাঁধনছাড়া হয়েও আত্মবিস্মৃত হয় না। অর্থাৎ বাইরে থাকে না মৃদঙ্গের বোল, কিন্তু নিজের অঙ্গের মধ্যেই থাকে চলবার একটা ওজন।

কিন্তু সংগীতের সঙ্গে কাব্যের একটা জায়গায় মিল নেই। সংগীতের সমস্তটাই অনির্বচনীয়। কাব্যে বচনীয়তা আছে সে কথা বলা বাহুল্য। অনির্বচনীয়তা সেইটেকেই বেষ্টন করে হিল্লোলিত হতে থাকে, পৃথিবীর চারদিকে বায়ুমণ্ডলের মতো। এ পর্যন্ত বচনের সঙ্গে অনির্বচনের, বিষয়ের সঙ্গে রসের গাঁঠ বেঁধে দিয়েছে ছন্দ। পরস্পরকে বলিয়ে নিয়েছে, যদেতদ্ হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব। বাক্ এবং অবাক্ বাঁধা পড়েছে ছন্দের মাল্যবন্ধনে। এই বাক্ এবং অবাক্-এর একান্ত মিলনেই কাব্য। বিবাহিত জীবনে যেমন কাব্যেও তেমনি, মাঝে মাঝে বিরোধ বাধে, উভয়ের মাঝখানে ফাঁক পড়ে যায়, ছন্দও তখন জোড় মেলাতে পারে না। সেটাকেই বলি আক্ষেপের বিষয়। বাসরঘরে এক শয্যায় দুই পক্ষ দুই দিকে মুখ ফিরিয়ে থাকার মতোই সেটা শোচনীয়। তার চেয়ে আরো শোচনীয়, যখন "এক কন্তে না খেয়ে বাপের বাড়ি যান"। যথাপরিমিত খাদ্যবস্তুর প্রয়োজন আছে একথা অজীর্ণ রোগীকেও স্বীকার করতে হয়। কোনো কোনো কাব্যে বাগ্‌দেবী স্থূলখাদ্যাভাবে ছায়ার মতো হয়ে পড়েন। সেটাকে আধ্যাত্মিকতার লক্ষণ বলে উল্লাস না করে আধিভৌতিকতার অভাব বলে বিমর্ষ হওয়াই উচিত।

'পুনশ্চ' কাব্যগ্রন্থে আধিভৌতিককে সমাদর করে ভোজে বসানো হয়েছে। যেন জামাইষষ্ঠী। এ মানুষটা পুরুষ। একে সোনার ঘড়ির চেন পরালেও অলংকৃত করা হয় না। তা হোক, পাশেই আছেন কাঁকনপরা অর্ধাবগুণ্ঠিতা মাধুরী, তিনি তাঁর শিল্পসমৃদ্ধ ব্যজনিকার আন্দোলনে

এই ভোজের মধ্যে অমরাবতীর মৃদুমন্দ হাওয়ার আভাস এনে দিচ্ছেন। নিজের রচনা নিয়ে অহংকার করছি মনে করে আমাকে হঠাৎ সদুপদেশ দিতে বোসো না। আমি যে কীর্তিটা করেছি তার মূল্য নিয়ে কথা হচ্ছে না, তার যেটি আদর্শ, এই চিঠিতে তারি আলোচনা চলছে। বক্ষ্যমাণ কাব্যে গদ্যটি মাংসপেশল পুরুষ বলেই কিছু প্রাধান্য যদি নিয়ে থাকে তবু তার কলাবতী বধূ দরজার আধখোলা অবকাশ দিয়ে উঁকি মারছে, তার সেই ছায়াবৃত কটাক্ষ-সহযোগে সমস্ত দৃশ্যটি রসিকদের উপভোগ্য হবে বলেই ভরসা করেছিলুম। এর মধ্যে ছন্দ নেই বললে অত্যুক্তি হবে, ছন্দ আছে বললেও সেটাকে বলব স্পর্ধা। তবে কী বললে ঠিক হবে ব্যাখ্যা করি। ব্যাখ্যা করব কাব্যরস দিয়েই।

বিবাহসভায় চন্দনচর্চিত বর-কনে টোপর মাথায় আলপনা-আঁকা পিঁড়ির উপর বসেছে। পুরুত পড়ে চলেছে মন্ত্র, ওদিকে আকাশ থেকে আসছে সাহানা-রাগিণীতে সানাইএর সংগীত। এমন অবস্থায় উভয়ের যে বিবাহ চলেছে সেটা নিঃসন্দিগ্ধ সুস্পষ্ট। নিশ্চিত ছন্দওয়ালা কাব্যে সেই সানাইবাজনা সেই মন্ত্রপড়া লেগেই আছে। তার সঙ্গে আছে লাল চেলি, বেনারসির জোড়, ফুলের মালা, ঝাড়লণ্ঠনের রোশনাই। সাধারণত যাকে কাব্য বলি সেটা হচ্ছে বচন-অনির্বচনের সদ্য-মিলনের পরিভূষিত উৎসব। অনুষ্ঠানে যা যা দরকার সযত্নে তা সংগ্রহ করা হয়েছে। কিন্তু তার পরে? অনুষ্ঠান তো বারোমাস চলবে না। তাই বলেই তো নীরবিত সাহানা-সংগীতের সঙ্গে সঙ্গেই বরবধূর মহাশূন্যে অন্তর্ধান কেউ প্রত্যাশা করে না। বিবাহ-অনুষ্ঠানটা সমাপ্ত হল কিন্তু বিবাহটা তো রইল, যদি না কোনো মানসিক বা সামাজিক উপনিপাত ঘটে। এখন থেকে সাহানা-রাগিণীটা অশ্রুত বাজবে। এমন কি মাঝে মাঝে তার সঙ্গে বেসুরো নিখাদে অত্যন্তশ্রুত কড়া সুরও না-মেশা অস্বাভাবিক, সুতরাং একেবারে না-মেশা প্রার্থনীয় নয়। চেলিবেনারসিটা

তোলা রইল, আবার কোনো অনুষ্ঠানের দিনে কাজে লাগবে। সপ্তপদীর বা চতুর্দশপদীর পদক্ষেপটা প্রতিদিন মানায় না। তাই বলেই প্রাত্যহিক পদক্ষেপটা অস্থানে পড়ে বিপদ্‌জনক হবেই এমন আশঙ্কা করিনে। এমন কি বামদিক্ থেকে ঝুনুঝুনু মলের আওয়াজ গোলমালের মধ্যেও কানে আসে। তবু মোটের উপর বেশভূষাটা হল আটপৌরে। অনুষ্ঠানের বাঁধারীতি থেকে ছাড়া পেয়ে একটা সুবিধে হল এই যে, উভয়ের মিলনের মধ্যে দিয়ে সংসারযাত্রার বৈচিত্র্য সহজ রূপ নিয়ে স্থূল সূক্ষ্ম নানাভাবে দেখা দিতে লাগল। যুগলমিলন নেই অথচ সংসারযাত্রা আছে এমনো ঘটে। কিন্তু সেটা লক্ষ্মীছাড়া। যেন খবুরে-কাগজি সাহিত্য। কিন্তু যে সংসারটা প্রতিদিনের, অথচ সেই প্রতিদিনকেই লক্ষ্মীশ্রী চিরদিনের করে তুলছে, যাকে চিরন্তনের পরিচয় দেবার জন্যে বিশেষ বৈঠকখানায় অলংকৃত আয়োজন করতে হয় না তাকে কাব্যশ্রেণীতেই গণ্য করি। অথচ চেহারায় সে গদ্যের মতো হতেও পারে। তার মধ্যে বেসুর আছে, প্রতিবাদ আছে, নানাপ্রকার বিমিশ্রতা আছে, সেইজন্যেই চারিত্রশক্তি আছে। যেমন কর্ণের চারিত্রশক্তি যুধিষ্ঠিরের চেয়ে অনেক বড়ো। অথচ একরকম শিশুমতি আছে যারা ধর্মরাজের কাহিনী শুনে অশ্রুবিগলিত হয়। রামচন্দ্র নামটার উল্লেখ করলুম না, সে কেবল লোকভয়ে। কিন্তু আমার দৃঢ়বিশ্বাস আদিকবি বাল্মীকি রামচন্দ্রকে ভূমিকাপত্তনস্বরূপে খাড়া করেছিলেন তার অসবর্ণতায় লক্ষ্মণের চরিত্রকে উজ্জ্বল করে আঁকবার জন্যেই, এমন কি হনুমানের চরিত্রকেও বাদ দেওয়া চলবে না। কিন্তু সেই একঘেয়ে ভূমিকাটা অত্যন্ত বেশি রংফলানো চওড়া বলেই লোকে ঐটের দিকে তাকিয়ে হায় হায় করে। ভবভূতি তা করেননি। তিনি রামচন্দ্রের চরিত্রকে অশ্রদ্ধেয় করবার জন্যেই কবিজনোচিত কৌশলে 'উত্তররামচরিত' রচনা করেছিলেন। তিনি সীতাকে দাঁড় করিয়েছেন রামভদ্রের প্রতি প্রবল গঞ্জনারূপে।

ঐ দেখ, কী কথা বলতে কী কথা এসে পড়ল। আমার বক্তব্য ছিল এই—কাব্যকে বেড়াভাঙা গদ্যের ক্ষেত্রে স্ত্রীস্বাধীনতা দেওয়া যায় যদি, তাহলে সাহিত্যসংসারের আলংকারিক অংশটা হালকা হয়ে তার বৈচিত্র্যের দিকে অনেকটা খোলা জায়গা পায়। কাব্য জোরে পা ফেলে চলতে পারে। সেটা সযত্নে নেচে চলার চেয়ে সবসময়ে যে নিন্দনীয় তা নয়। নাচের আসরের বাইরে আছে এই উঁচুনিচু বিচিত্র বৃহৎ জগৎ, রূঢ় অথচ মনোহর, সেখানে জোরে চলাটাই মানায় ভালো, কখনো ঘাসের উপর কখনো কাঁকরের উপর দিয়ে।

রোসো। নাচের কথাটা যখন উঠল ওটাকে সেরে নেওয়া যাক। নাচের জন্য বিশেষ সময়, বিশেষ কায়দা চাই। চারদিক বেষ্টন করে আলোটা মালাটা দিয়ে তার চালচিত্র খাড়া না করলে মানানসই হয় না। কিন্তু এমন মেয়ে দেখা যায় যার সহজ চলনের মধ্যেই বিনা ছন্দের ছন্দ আছে। কবিরা সেই অনায়াসের চলন দেখেই নানা উপমা খুঁজে বেড়ায়। সে মেয়ের চলনটাই কাব্য, তাতে নাচের তাল নাইবা লাগল, তার সঙ্গে মৃদঙ্গের বোল দিতে গেলে বিপত্তি ঘটবে। তখন মৃদঙ্গকে দোষ দেব, না তার চলনকে? সেই চলন নদীর ঘাট থেকে আরম্ভ করে রান্নাঘর, বাসরঘর পর্যন্ত। তার জন্যে মালমসলা বাছাই করে বিশেষ ঠাট বানাতে হয় না। গদ্যকাব্যেরও এই দশা। সে নাচে না, সে চলে। সে সহজে চলে বলেই তার গতি সর্বত্র। সেই গতিভঙ্গি আবাঁধা। ভিড়ের ছোঁওয়া বাঁচিয়ে পোশাকি শাড়ির প্রান্ত তুলে-ধরা আধাঘোমটা-টানা সাবধান চাল তার নয়।

এই গেল আমার ‘পুনশ্চ’ কাব্যগ্রন্থের কৈফিয়ত। আরো একটা পুনশ্চ-নাচের আসরে নাট্যাচার্য হয়ে বসব না, এমন পণ করিনি। কেবলমাত্র কাব্যের অধিকারকে বাড়াব মনে করেই একটা দিকের বেড়ায় গেট বসিয়েছি। এবারকার মতো আমার কাজ ঐ পর্যন্ত। সময় তো

বেশি নেই। এর পরে আবার কোন্ খেয়াল আসবে বলতে পারিনে। যাঁরা দৈব দুর্যোগে মনে করবেন গদ্যে কাব্যরচনা সহজ তাঁরা এই খোলা দরজাটার কাছে ভিড় করবেন সন্দেহ নেই। তা নিয়ে ফৌজদারি বাধলে আমাকে স্বদলের লোক বলে স্বপক্ষে সাক্ষী মেনে বসবেন। সেই দুর্দিনের পূর্বেই নিরুদ্দেশ হওয়া ভালো। এর পরে মন্ত্রচিত আরো একখানা কাব্যগ্রন্থ বেরবে, তার নাম 'বিচিত্রিতা'। সেটা দেখে ভদ্রলোকে এই মনে করে আশ্বস্ত হবে যে আমি পুনশ্চ প্রকৃতিস্থ হয়েছি।

১৩৩৯ দেওয়ালি

৪

সম্প্রতি কতকগুলো গদ্যকবিতা জড়ো করে 'শেষসপ্তক' নাম দিয়ে একখানি বই বের করেছি। সমালোচকরা ভেবে পাচ্ছেন না ঠিক কী বলবেন। একটা কিছু সংজ্ঞা দিতে হবে, তাই বলছেন আত্মজৈবনিক। অসম্ভব নয়, কিন্তু তাতে বলা হল না এগুলো কবিতা কিংবা কবিতা নয় কিংবা কোন্ দরের কবিতা। এদের সম্বন্ধে মুখ্য কথা যদি এই হয় যে এতে কবির আত্মজীবনের পরিচয় আছে তাহলে পাঠক অসহিষ্ণু হয়ে বলতে পারে, আমার তাতে কী। মদের গেলাসে যদি রংকরা জল রাখা যায় তাহলে মদের হিসাবেই ওর বিচার আপনি উঠে পড়ে। কিন্তু পাথরের বাটিতে রঙিন পানীয় দেখলে মনের মধ্যে গোড়াতেই তর্ক ওঠে ওটা শরবত না ওষুধ; এরকম দ্বিধার মধ্যে পড়ে সমালোচক এই কথাটার 'পরেই জোর দেন যে, বাটিটা জয়পুরের কি মুঙ্গেরের। হায় রে, রসের যাচাই করতে যেখানে পিপাসু এসেছিল সেখানে মিলল পাথরের বিচার। আমি কাব্যের পসারি, আমি শুধোই— লেখাগুলোর ভিতরে ভিতরে কি স্বাদ নেই, ভঙ্গি নেই, থেকে থেকে কটাক্ষ নেই, সদর দরজার চেয়ে এর খিড়কির দুয়ারের দিকেই কি ইশারা নেই, গদ্যের

বকুনির মুখে রাস টেনে ধরে তার মধ্যে কি কোথাও তুলকির চাল আনা হয়নি, চিন্তাগর্ভ কথার মুখে কোনোখানে অচিন্ত্যের ইঙ্গিত কি লাগল না, এর মধ্যে ছন্দোরাজকতার নিয়ন্ত্রিত শাসন না থাকলেও আত্মরাজকতার অনিয়ন্ত্রিত সংযম নেই কি। সেই সংযমের গুণে থেমে-যাওয়া কিংবা হঠাৎ-বেঁকে-যাওয়া কথার মধ্যে কোথাও কি নীরবের সরবতা পাওয়া যাচ্ছে না। এই সকল প্রশ্নের উত্তরই হচ্ছে এর সমালোচনা। কালিদাস 'রঘুবংশে'র গোড়াতেই বলেছেন বাক্য এবং অর্থ একত্র সম্পৃক্ত থাকে, এমন স্থলে বাক্য এবং অর্থাতীতকে একত্র সম্পৃক্ত করার দুঃসাধ্য কাজ হচ্ছে কবির, সেটা গদ্যেই হোক আর পদ্যেই হোক তাতে কী এল গেল।

১৯৩৫ জুন ৩

৫

অন্তরে যে ভাবটা অনির্বচনীয় তাকে প্রেয়সী নারী প্রকাশ করবে গানে নাচে, এটাকে লিরিক বলে স্বীকার করা হয়। এর ভঙ্গিগুলিকে ছন্দের বন্ধনে বেঁধে দেওয়া হয়েছে ; তারা সেই ছন্দের শাসনে পরস্পরকে যথাযথভাবে মেনে চলে বলেই তাদের সুনিয়ন্ত্রিত সম্মিলিত গতিতে একটি শক্তির উদ্ভব হয়, সে আমাদের মনকে প্রবল বেগে আঘাত দিয়ে থাকে। এর জন্যে বিশেষ প্রসাধন, আয়োজন, বিশেষ রঙ্গমঞ্চের আবশ্যক ঘটে। সে আপনার একটি স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টি করে, একটি দূরত্ব।

কিন্তু একবার সরিয়ে দাও ঐ রঙ্গমঞ্চ, জরির আঁচলা-দেওয়া বেনারসি শাড়ি তোলা থাক পেটিকায়, নাচের বন্ধনে তনুদেহের গতিকে মধুর নিয়মে নাইবা সংযত করলে, তাহলেই কি রস নষ্ট হল। তাহলেও দেহের সহজ ভঙ্গিতে কান্তি আপনি জাগে, বাহুর ভাষায় যে বেদনার ইঙ্গিত ঠিকরে ওঠে সে মুক্ত বলেই যে নিরর্থক এমন কথা যে বলতে পারে তার রসবোধ অসাড় হয়েছে। সে নাচে না বলেই যে তার চলনে

মাধুর্যের অভাব ঘটে কিংবা সে গান করে না বলেই যে তার কানে কানে কথার মধ্যে কোনো ব্যঞ্জনা থাকে না একথা অশ্রদ্ধেয়। বরঞ্চ এই অনিয়ন্ত্রিত কলায় একটি বিশেষ গুণের বিকাশ হয়, তাকে বলব ভাবের স্বচ্ছন্দতা, আপন আন্তরিক সত্যেই তার আপনার পর্যাপ্তি। তার বাহুল্যবর্জিত আত্মনিবেদনে তার সঙ্গে আমাদের অত্যন্ত কাছের সম্বন্ধ ঘটে। অশোকের গাছে সে আলতা-আঁকা নূপুরশিঞ্জিত পদাঘাত নাই করল; না হয় কোমরে আঁট আঁচল বাঁধা, বাঁ হাতের কুক্ষিতে ঝুড়ি, ডান হাত দিয়ে মাচা থেকে লাউশাক তুলছে, অযত্নশিথিল খোঁপা ঝুলে পড়েছে আলগা হয়ে; সকালের রৌদ্রজড়িত ছায়াপথে হঠাৎ এই দৃশ্যে কোনো তরুণের বুকের মধ্যে যদি ধক করে ধাক্কা লাগে তবে সেটাকে কি লিরিকের ধাক্কা বলা চলে না, না হয় গদ্য-লিরিকই হল। এ রস শালপাতায় তৈরি গদ্যের পেয়ালাতেই মানায়, ওটাকে তো ত্যাগ করা চলবে না। প্রতিদিনের তুচ্ছতার মধ্যে একটি স্বচ্ছতা আছে তার মধ্য দিয়ে অতুচ্ছ পড়ে ধরা, গদ্যের আছে সেই সহজ স্বচ্ছতা। তাই বলে একথা মনে করা ভুল হবে যে, গদ্যকাব্য কেবলমাত্র সেই অকিঞ্চিৎকর কাব্যবস্তুর বাহন। বৃহতের ভার অনায়াসে বহন করবার শক্তি গদ্যছন্দের মধ্যে আছে। ও যেন বনস্পতির মতো, তার পল্লবপুঞ্জের ছন্দোবিন্যাস কাটাছাঁটা সাজানো নয়, অসম তার স্তবকগুলি, তাতেই তার গাম্ভীর্য ও সৌন্দর্য।[১]

প্রশ্ন উঠবে গদ্য তাহলে কাব্যের পর্যায়ে উঠবে কোন্ নিয়মে। এর উত্তর সহজ। গদ্যকে যদি ঘরের গৃহিণী বলে কল্পনা কর তাহলে জানবে তিনি তর্ক করেন, ধোবার বাড়ির কাপড়ের হিসেব রাখেন, তাঁর কাশি সর্দি জ্বর প্রভৃতি হয়, 'মাসিক বসুমতী' পাঠ করে থাকেন, এ সমস্তই প্রাত্যহিক হিসেব, সংবাদের কোঠার অন্তর্গত, এই ফাঁকে ফাঁকে

১ দ্রষ্টব্য পৃ ১৫২।

মাধুরীর স্রোত উছলিয়ে ওঠে, পাথর ডিঙিয়ে ঝরনার মতো। সেটা সংবাদের বিষয় নয়, সে সংগীতের শ্রেণীয়। গদ্যকাব্যে তাকে বাছাই করে নেওয়া যায় অথবা সংবাদের সঙ্গে সংগীত মিশিয়ে দেওয়া চলে। সেই মিশ্রণের উদ্দেশ্য সংগীতের রসকে পরুষের স্পর্শে ফেনায়িত উগ্রতা দেওয়া। শিশুদের সেটা পছন্দ না হতে পারে, কিন্তু দৃঢ়দন্ত বয়স্কের রুচিতে এটা উপাদেয়।

আমার শেষ বক্তব্য এই যে, এই জাতের কবিতায় গদ্যকে কাব্য হতে হবে। গদ্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে কাব্য পর্যন্ত পৌঁছল না এটা শোচনীয়। দেবসেনাপতি কার্তিকেয় যদি কেবল স্বর্গীয় পালোয়ানের আদর্শ হতেন তাহলে শুম্ভনিশুম্ভের চেয়ে উপরে উঠতে পারতেন না, কিন্তু তাঁর পৌরুষ যখন কমনীয়তার সঙ্গে মিশ্রিত হয় তখনই তিনি দেবসাহিত্যে গদ্যকাব্যের সিংহাসনের উপযুক্ত হন। দোহাই তোমার, বাংলাদেশের ময়ূরে-চড়া কার্তিকটিকে সম্পূর্ণ ভোলবার চেষ্টা কোরো।

১৯৩৫ মে ১৭

শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষকে লেখা

১

গদ্যের চালটা পথে চলার চাল, পদ্যের চাল নাচের। এই নাচের গতির প্রত্যেক অংশের মধ্যে সুসংগতি থাকা চাই। যদি কোনো গতির মধ্যে নাচের ধরনটা থাকে অথচ সুসংগতি না থাকে তবে সেটা চলাও হবে না, নাচও হবে না, হবে খোঁড়ার চাল অথবা লম্ফঝম্প। কোনো ছন্দে বাঁধন বেশি কোনো ছন্দে বাঁধন কম, তবু ছন্দমাত্রের অন্তরে একটা ওজন আছে। সেটার অভাব ঘটলে যে টলমলে ব্যাপার দাঁড়ায় তাকে বলা যেতে পারে মাতালের চাল, তাতে সুবিধাও নেই সৌন্দর্যও নেই।

১৯৩২ জুলাই ২২

২

গদ্যকে গদ্য বলে স্বীকার করেও তাকে কাব্যের পংক্তিতে বসিয়ে দিলে আচারবিরুদ্ধ হলেও সুবিচারবিরুদ্ধ না হতেও পারে যদি তাতে কবিত্ব থাকে। ইদানীং দেখছি গদ্য আর রাস মানছে না, অনেক সময় দেখি তার পিঠের উপর সেই সওয়ারটিই নেই যার জন্যে তার খাতির। ছন্দের বাঁধা সীমা যেখানে লুপ্ত সেখানে সংগত সীমা যে কোথায় সে তো আইনের দোহাই দিয়ে বোঝাবার জো নেই। মনে মনে ঠিক করে রেখেছি স্বাধীনতার ভিতর দিয়েই বাঁধনছাড়ার বিধান আপনি গড়ে উঠবে—এর মধ্যে আমার অভিরুচিকে আমি প্রাধান্য দিতে চাইনে। নানারকম পরীক্ষার ভিতর দিয়ে অভিজ্ঞতা গড়ে উঠছে। সমস্ত বৈচিত্র্যের মধ্যে একটা আদর্শ ক্রমে দাঁড়িয়ে যাবে। আধুনিক ইংরেজি কাব্যসাহিত্যে এই পরীক্ষা আরম্ভ হয়েছে।

তুমি যে রচনাটি পাঠিয়েছ তাকে কবিতা বলে মেনে নিতে দ্বিধা করিনে, যদিও তুমি অসংকোচে তাকে গদ্যের পুরুষবেশ পরিয়েছ। একটুও বেমানান হয়নি। গদ্যসওয়ারি কবিতার শাড়িশেমিজ নেইবা রইল।

১৩৪৩ আশ্বিন ২৮

সঞ্জয় ভট্টাচার্যকে লেখা

গদ্য বলতে বুঝি যে-ভাষা আলাপ করবার ভাষা; ছন্দোবদ্ধ পদে বিভক্ত যে ভাষা তাই পদ্য। আর রসাত্মক বাক্যকেই আলংকারিক পণ্ডিত কাব্য সংজ্ঞা দিয়েছেন। এই রসাত্মক বাক্য পদ্যে বললে সেটা হবে পদ্যকাব্য আর গদ্যে বললে হবে গদ্যকাব্য। গদ্যেও অকাব্য ও কুকাব্য হতে পারে, পদ্যেও তথৈবচ। গদ্যে তার সম্ভাবনা বেশি, কেননা ছন্দেরই একটা স্বকীয় রস আছে—সেই ছন্দকে ত্যাগ করে যে কাব্য, সুন্দরী বিধবার মতো তার অলংকার তার আপন বাণী-দেহেই, বাইরে

নয়। একথা বলা বাহুল্য যে, গদ্যকাব্যেও একটা আবাঁধা ছন্দ আছে। আন্তরিক প্রবর্তনা থেকে কাব্য সেই ছন্দ চলতে চলতে আপনি উদ্ভাবিত করে, তার ভাগগুলি অসম হয় কিন্তু সবসুদ্ধ জড়িয়ে ভারসামঞ্জস্য থেকে সে স্খলিত হয় না। বড়ো ওজনের সংস্কৃত ছন্দে এই আপাতপ্রতীয়মান মুক্তগতি দেখতে পাওয়া যায়।[১] যেমন—

মেঘৈ র্মেদুর | মম্বরং বনভুবঃ | শ্যামাস্তমা | লদ্রুমৈঃ।[২]

এই ছন্দ সমান ভাগ মানে না, কিন্তু সমগ্রের ওজন মেনে চলে। মুখের কথায় আমরা যখন খবর দিই তখন সেটাতে নিশ্বাসের বেগে ঢেউ খেলায় না। যেমন—

তার চেহারাটা মন্দ নয়।

কিন্তু ভাবের আবেগ লাগবামাত্র আপনি ঝোঁক এসে পড়ে। যেমন—

কী সুন্দর তার চেহারাটি।

একে ভাগ করলে এই দাঁড়ায়—

কী সুন্ | দর তার | চেহারাটি।

"মরে যাই তোমার বালাই নিয়ে।"
"এত গুমর সইবে না গো, সইবে না— এই বলে দিলুম।"
"কথা কয়নি তো কয়নি
চলে গেছে সামনে দিয়ে,
বুক ফেটে মরব না তাই বলে।"

এ-সমস্তই প্রতিদিনের চলতি কথার সহজ ছন্দ, গদ্যকাব্যের গতিবেগে আত্মরচিত। মনকে খবর দেবার সময় এর দরকার হয় না, ধাক্কা দেবার সময় আপনি দেখা দেয়, ছান্দসিকের দাগকাটা মাপকাঠির অপেক্ষা রাখে না।

১৯৩৫ মে ২২

১ তুলনীয়: গদ্য সাহিত্যে…তুলনা মেলে পৃ ১৫৩, সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষায়…প্রকাশ পায়নি পৃ ১৫৭।

২ দ্রষ্টব্য পৃ ১৪৮ পাদটীকা ২।

ভাষণ

ছন্দবিচার

সব ছন্দের unitগুলো আকারে সমান নয়।··· কিন্তু একসময়ে বাংলায় সব unitকেই সমান মূল্য দেওয়া হত; যুগ্ম-অযুগ্ম ধ্বনির পার্থক্য স্বীকার করা হত না। কিন্তু তিন unitএর ছন্দে, যাকে আমি বলেছি অসম ছন্দ, তাতে যুগ্মধ্বনিকে এক unit ধরলে ভারি খারাপ শোনায়। এইটে অনুভব করেই তখনকার দিনে কবিরা এ-জাতীয় যুক্ত-অক্ষর যথাসম্ভব বর্জন করে চলতেন। যুক্ত-অক্ষর সম্পূর্ণ বর্জন করে একটি কবিতা রচনা করতে পারলে আত্মপ্রসাদ লাভ করতেন; মনে করতেন কবিতাটি খুব প্রাঞ্জল, সরল ও শ্রুতিমধুর হল। কবি বিহারীলালের কাছে আমার প্রথম শিক্ষা। তাঁর রচনাতেও যুক্তাক্ষর বড়ো কম।[১] আমারও বাল্যকালের রচনায় যুক্তাক্ষর খুব কম; তবু মাঝে মাঝে যুক্তাক্ষর ব্যবহৃত হয়ে ছন্দকে বন্ধুর করে তুলেছে। 'রাহুর প্রেম' কবিতাটিতেই তার নিদর্শন পাবে।[২] তখনও আমি যুগ্মধ্বনিকে দুমাত্রা বলে ধরতে আরম্ভ করিনি; কারণ খারাপ শোনালেও তখনকার দিনে জবাবদিহি ছিল না। কিন্তু 'মানসী'র সময় থেকে আমি যুগ্মধ্বনিকে দুমাত্রা বলে ধরতে শুরু করেছি।[৩]···

'মানসী'র সময় থেকে আমি অসমমাত্রার ছন্দে যুগ্মধ্বনিকে দুমাত্রার value দিয়ে আসছি এবং বাংলা সাহিত্যে এই রীতিটাই চলে গেছে। আজকাল আর কোনো কবি অসমমাত্রার ছন্দে যুগ্মধ্বনিকে এক unit বলে চালাতে সাহস করেন না, আর করলেও তাঁকে কেউ ক্ষমা করবে না। কিন্তু আমি নিজেও একটিমাত্র রচনায় এরকম করেছি। যথা—

প্রভু বুদ্ধ লাগি আমি ভিক্ষা মাগি
ওগো পুরবাসী কে রয়েছ জাগি।

১ তুলনীয়: কবিও এই কারণে···বর্জন করিয়া চলিয়াছেন পৃ ১৭৮।

২ দ্রষ্টব্য পৃ ১৭৮ পাদটীকা ২।

৩ দ্রষ্টব্য পৃ ৫, ৬৭ পাদটীকা ৩, ১৮১।

...ও-রকম না করলেই ভালো হত। বাস্তবিক ও-কবিতাটির জন্তে আমি একটু কুণ্ঠিত আছি। ও-রকম করার একটু কারণও আছে। যুগ্মধ্বনিকে দুমাত্রা হিসেব করে ছন্দ রচনা করলে ও-ছন্দে 'অনাথপিণ্ডদ' কথাটা ব্যবহার করা মুশকিল। তাই সমস্ত কবিতাটিতেই যুগ্মধ্বনিকে এক unit বলেই চালিয়ে দিয়েছিলুম। কিন্তু অসমমাত্রার আর-কোনো ছন্দেই আমি যুগ্মধ্বনিকে এক unit বলে গণ্য করিনি।...

সমমাত্রার ছন্দের অর্থাৎ পয়ারজাতীয় ছন্দের বিশেষত্বই হচ্ছে এই যে, এছন্দে দুই চার ছয় আট দশ প্রভৃতি দুয়ের multipleএর পর ইচ্ছামতো যতি স্থাপন করা যায়। এখানেই এছন্দের শক্তি। আর এজন্যেই এজাতীয় ছন্দে আঁজাঁবুমাঁ (*enjambement*) চালানো সম্ভব হয়েছে।... যেখানেই দুয়ের multiple পাওয়া যায় সেখানেই থামতে পারা যায় বলেই প্রবহমান পয়ার রচনা করা সম্ভব হয়েছে।[১] এছন্দে অযুগ্মসংখ্যার পর যতি দেওয়া চলে না। মধুসূদন অবশ্য 'অকালে'র পর যতি দিয়েছেন।[২] এটাকে অবশ্য একরকম করে সমর্থনও করা যায়। কিন্তু তথাপি বলতে হয় যে, এছন্দে অযুগ্ম unitএর পর যতি না দেওয়াই রীতি। আর এজন্যেই অসমমাত্রার ছন্দে আঁজাঁবুমাঁ বা প্রবহমানতা আনা যায় না।[৩] যেছন্দে তিনের পরে ভাগ, যাকে আমি বলেছি অসমমাত্রার ছন্দ, তাতে যেখানে-সেখানে থামা যায় না, লাইনের মধ্যেও থামা যায় না, একেবারে লাইনের শেষে গিয়ে থামতে হয়।[৪]

১ আঁজাঁবুমাঁ বা প্রবহমানতা মানে পংক্তিলঙ্ঘন বা লাইনডিঙানো চাল। দ্রষ্টব্য পাদটিকা ১৫৩ ও ১৬৩ পৃষ্ঠা।

২ তুলনীয়: তার অকাল মৃত্যুর ...অকালে পৃ ৪৫।

৩ অসম ও বিষম মাত্রার ছন্দে কেন প্রবহমানতা আনা যায় না তা দৃষ্টান্তযোগে ব্যাখ্যাত হয়েছে ১৫৪-৫৬ পৃষ্ঠায়।

৪ দ্রষ্টব্য পৃ ১৮০ পাদটীকা ১।

যেমন—

একদিন দেব তরুণ তপন
হেরিলেন সুরনদীর জলে,
অপরূপ এক কুমারীরতন
খেলা করে নীল নলিনীদলে।

... অসম সংখ্যার পর ধ্বনি থামতে পারে না। সেখানে একটা ভাগ থাকলেও ধ্বনিটা পরবর্তী বিভাগের গায়ে গড়িয়ে পড়ে। যেমন—

পঞ্চশরে দগ্ধ করে করেছ এ কী সন্ন্যাসী

এখানে 'পঞ্চশরে' কথাটার পরে যতিটা স্থায়ী হয় না।...

ইংরেজি ভাষার একটা মস্ত গুণ এই যে, ওভাষায় প্রত্যেকটি শব্দেরই একটা বিশেষ জোর আছে; সেটা ওভাষার accentএর জন্যেই হয়। প্রত্যেকটি শব্দই নিজের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে চলে, অন্য কথার মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলে না। শব্দগুলিকে এভাবে জোর দিয়ে দিয়ে উচ্চারণ করতে হয় বলেই ইংরেজি ছন্দ এরূপ তরঙ্গিত হয়ে ওঠে। কিন্তু বাংলা শব্দগুলি বড়ো শান্তশিষ্ট, তারা ধ্বনিকে আঘাত করে তরঙ্গিত করে তোলে না। এজন্য বাংলায় আমরা এক ঝোঁকে অনেকগুলো শব্দ উচ্চারণ করে আবৃত্তি করে যাই, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই অর্থবোধ হয় না।[১] অর্থবোধের জন্যে বিষয়টাকে আবার ফিরে পড়তে হয়। এ অভাবটা মধুসূদন খুব অনুভব করেছিলেন। তাই তিনি বেছে বেছে যুক্তাক্ষরবহুল সংস্কৃত শব্দের ব্যবহারের দ্বারা বাংলার এই দুর্বলতাটা দূর করতে চেয়েছিলেন। এজন্যেই তাঁর কাব্যে 'ইরম্মদ' প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার হয়েছে। আর তাতে ছন্দের মধ্যেও অনেকখানি তরঙ্গায়িত ভঙ্গি দেখা দিয়েছে। 'যাদঃপতিরোধঃ যথা চলোর্মি-আঘাতে' প্রভৃতি পংক্তিতে ধ্বনিটা আঘাতে আঘাতে কেমন তরঙ্গিত হয়ে উঠেছে তা দেখতে পাচ্ছ।[২] অল্পবয়সে

১ দ্রষ্টব্য পৃ ১৮২ পাদটীকা ১।
২ দ্রষ্টব্য পৃ১৭৮ পাদটীকা ৩,৪।

আমি মধুসূদনের যে কঠোর সমালোচনা করেছিলুম[১] পরবর্তী কালে আমাকে তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়েছে। বাংলা ভাষার এই সমতলতা, এই দুর্বলতাটা দূর করবার জন্যে গদ্যে ও পদ্যে আমিও বহু সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করেছি।...

তুমি যে প্রাকৃত ছন্দকে চার-চার সিলেব্‌ল্‌এ ভাগ কর সেটা ঠিক বলে আমার মনে হয় না। আমি বলি এ-ছন্দে তিনমাত্রার ভাগটাই মূলকথা। এ-ছন্দে আমি যত গান রচনা করেছি তার সবগুলিতেই দাদরা তাল, সবসময়েই তিনমাত্রার ভাগ হয়।...সেইজন্যে তিনের ভাগে যেখানে কম পড়েছে সেখানে টেনে পুরিয়ে দিতে হয়।[২] যেমন—

আমি- | যদি- | জন্‌ম | নিতেম।

কালি—দাসের | কালে- |

এ-রকম ছন্দে আমরা যে প্রত্যেক পর্বে ফাঁক ভরিয়ে নিই তা নয়, গানের তালের মতোই যেখানে সুবিধে পাই সেখানেই কর্তব্য সেরে নিয়ে থাকি। তাতে ছন্দোনৃত্যের বৈচিত্র্য ঘটে। ভালো করে বিচার করে দেখলে বুঝতে পারবে, ঐ লাইনটাতে 'আমি যদি' দুই-দুই মাত্রায় দ্রুত পাঠ করে 'জন্ম' এবং 'নিতেম' শব্দের কাছ থেকে উভয়ের জরিমানা ডিক্রি করে নিয়েছি। নইলে ছন্দের তাল কাটতই, কেননা এটা নিঃসন্দেহে তিনমাত্রার তাল। 'কালিদাসের' শব্দটাতেও ঐ রকম রফা-নিষ্পত্তি করতে হয়েছে। অর্থাৎ 'কালি'তে যেটুকু কম পড়েছে 'দাসের' মধ্যে সেটা আদায় করে নিতে হল।[৩] সব ফাঁকগুলি সমান ভরিয়ে দিয়েও আমি কবিতা লিখেছি।[৪]...পূরবীর 'বিজয়ী' কবিতাটিতে আমি মাত্রার

১ ভারতী ১২৮৪ শ্রাবণ-পৌষ, ১২৮৯ ভাদ্র।

২ দ্রষ্টব্য পৃ ৬২-৬৩, ৭৪-৭৫।

৩ 'হারিয়ে-ফেলা বাঁশি আমার' এবং 'রূপ-সাগরে ডুব দিয়েছি' এই রচনা-দুটির ছন্দোবিশ্লেষণ তুলনীয়, পৃ ৬৩-৬৪ এবং ৮৫-৮৬। গ্রন্থপরিচয়ে 'পুনশ্চ বক্তব্য' অংশ দ্রষ্টব্য।

৪ প্রাকৃত-বাংলার বেঁকা ছন্দের দৃষ্টান্ত ৬৩-৬৪, ১৪৩ ও ১৯২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ফাঁক পূরণ করে দিতে চেষ্টা করেছিলুম। কিন্তু সর্বত্র তা আমি পারিনি। কারণ ছন্দের নূতনত্ব বজায় রাখতে চেষ্টা করে কবিতাকে তো খর্ব করতে পারিনে। কাজেই এ কবিতাটিতে কোনো কোনো জায়গায় মাত্রার ফাঁক আর পূরণ করা হয়নি। যারা কবিতা পড়বে তারাই ফাঁক পূরণ করে নেবে। ছন্দের ঝোঁক আপনিই পাঠককে ঠিক পথে চালায়।···

ছন্দ এমন একটা বিষয় যাতে সকলে একমত হতে পারে না। তোমার সঙ্গে একমত হতে পারব এমন আশা করা যায় না। ছন্দ হচ্ছে কানের জিনিস; একেক জনের কান একেক রকম ধ্বনি পছন্দ করে। তাই আবৃত্তির ভঙ্গির মধ্যে এতটা পার্থক্য ঘটে। আমি দেখেছি কেউ কেউ খুব বেশি টেনে টেনে আবৃত্তি করে, আবার কেউ কেউ আবৃত্তি করে খুব তাড়াতাড়ি। কানেরও একটা শিক্ষার প্রয়োজন আছে, আর আবৃত্তি করারও অভ্যাস থাকা চাই। আমি কিন্তু কবিতা রচনার সময় আবৃত্তি করতে করতেই লিখি; এমন কি কোনো গদ্য রচনাও যখন ভালো করে লিখব মনে করি তখন গদ্য লিখতে লিখতেও আবৃত্তি করি। কারণ রচনার ধ্বনিসংগতি ঠিক হল কিনা তার একমাত্র প্রমাণ হচ্ছে কান।···

বাংলায় rhythmic prose রচনা নেই। এক সময়ে আমি rhythmic prose রচনার চেষ্টা করেছি। 'লিপিকা'তে সে rhythm ধরতে পারবে। 'লিপিকা'র রচনাগুলিকে আমি প্রথমে rhythm রক্ষার জন্য পদ্যের মতো ভাঙাভাঙা লাইনেই লিখেছিলুম। পরে গদ্যের মতো করেই ছাপানো হয়েছে।···আমি একসময় সত্যেনকে বলেছিলুম বাংলায় rhythmic prose রচনা করতে। কিন্তু সে তো তা করলে না। সে কবিতার ছন্দের ঝংকারে এমন আকৃষ্ট হল যে, সে শেষের দিকে একরকম ছন্দে-পাওয়া হয়েই গিয়েছিল। অবন। (অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

একসময় rhythmic prose লিখতে চেষ্টা করেছিল। তার লেখা আমার ভালো লেগেছিল, কিন্তু বেশি প্রলম্বিত এবং অসংশ্লিষ্ট হওয়াতে চলল না।...'গীতাঞ্জলি'র ইংরেজি অনুবাদের proseএ যে rhythm রয়েছে তাতে সে দেশের লোকেরা আকৃষ্ট হয়েছে। মনে করেছি বাংলা গদ্যেও ও-রকম rhythm রেখে কিছু রচনা করব।[১]...

আধুনিক কবিরা যে মিল বর্জন করে লাইন ভেঙে ভেঙে কবিতা রচনা করছে তাতে কিছু দোষ নেই। মিল না দেওয়াটা মোটেই অন্যায় নয়। কিন্তু অমিল কবিতা রচনা করা খুবই শক্ত, তাতে বিশেষ শক্তির প্রয়োজন।...মিল জিনিসটার প্রতি কিছুকাল পূর্বেকার কবিদের যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও সতর্কতা ছিল না। তাঁদের অনেকে পংক্তির শেষে কোনো রকমে একটুখানি মিল ঘটিয়েই তৃপ্ত হতেন; অনেক সময় তো শুধু রে হে ইত্যাদি দিয়েই মিলের কাজ শেষ করতেন।[২]...

ছন্দ কেমন হবে কবিরাই ঠিক করবেন, তাঁরা নিজের কান আর ছন্দবোধের উপর নির্ভর করে নতুন নতুন ছন্দ রচনা করবেন। ইংরেজি সাহিত্যে একসময়ে ছন্দের ভাগ অত্যন্ত নির্দিষ্ট ছিল, কোথাও ব্যতিক্রম হত না। তারপর কোলরিজ প্রভৃতি কবিরা এসে নতুন ছন্দের প্রবর্তন করলেন, তাঁরা কাটাকাটা ছন্দের ভাগ মানলেন না, কোথাও বেশি কোথাও কম চালাতে লাগলেন। প্রথম প্রথম তাতে আপত্তি হয়েছিল। পরে কিন্তু তাঁদের প্রথাটাই চলে গেল। সুতরাং ছন্দের কোনো অকাট্য নিয়ম নেই, এ কথাটা মনে রাখা দরকার।...যে-ছন্দ কানকে খুশি করতে পারবে না সে-ছন্দ কেউ পড়বে-না। এর চেয়ে বড়ো শাস্তি আর কী আছে। কাজেই যেখানটাতে কান খুশি হয় না সেখানটাতে ছন্দপতন হয়েছে এ-কথাও বলা চলে।

বিচিত্রা— ১৩৩৯ জ্যৈষ্ঠ

১ দ্রষ্টব্য 'গদ্য কবিতা ও ছন্দ' পৃ ১৮৬-৮৭।

২ মিলের প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে ১৭৬ ও ১৮৪ পৃষ্ঠায়।

আমার ছন্দের গতি

মনে হয় কবিতা যখন ছাপা হত না তখনই তার স্বরূপ উজ্জ্বল ছিল; কারণ কণ্ঠে আবৃত্তিতেই ছন্দের বিশেষত্ব ভালো করে প্রকাশ পায়। ছাপায় আমরা চোখ দিয়ে কবিতাকে দেখি, তার পংক্তি, গঠন লক্ষ্য করি। মনে মনে ধ্বনি উচ্চারণ করে কবিতাকে সম্ভোগ করতে আমরা আজকাল শিখেছি। কিন্তু কবিতা নিঃশব্দে পড়বার বস্তু নয়, কণ্ঠস্বরের মধ্য দিয়েই তার রূপ ভালো করে প্রকাশ পায়, স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বাল্যকালের সেই ইচ্ছাই ছিল স্বাভাবিক— শোনালেই কবিতার সম্পূর্ণ রস পাওয়া যায়, নইলে অভাব ঘটে।...

অল্পবয়সে প্রথমটা কিছুকাল অন্যের অনুকরণ অবশ্য করেছি। আমাদের বাড়িতে যে কবিদের সমাদর ছিল মনে করতুম তাঁদের মতো কবিতা লিখতে পারলে ধন্য হব। তাই তখনকার প্রচলিত ছন্দ অনুকরণের চেষ্টা অল্পকাল কিছু করেছি। অকস্মাৎ একসময় খাপছাড়া হয়ে কেমন ভাবে নিজের ছন্দে পৌঁছলাম। শুধু এইটুকু মনে আছে, একদিন তেতলার ছাদে স্লেট হাতে, মনটা বিষণ্ণ— কাগজে পেনসিলে নয়, স্লেটে লিখতে অভ্যাসের পরিবর্তনেই হয়তো ছন্দের একটা পরিবর্তন এল যেটা তৎকাল-প্রচলিত নয়, আমি বুঝতে পারলুম এটা আমার নিজস্ব। তারই প্রবল আনন্দে সেই নূতন ধারাতে চললাম। ভয় করিনি।[১]...

আমার কাব্যজীবনে দেখছি ক্রমাগত এক পথ থেকে অন্য পথে চলবার প্রবণতা, নদী যেমন করে বাঁক ফেরে। এক-একটা ছন্দ বা ভাবের পর্ব যখন শেষ হয়ে এসেছে বোধ হয় তখন নূতন ছন্দ বা ভাব মনে না এলে আর লিখিইনে।...

'মানসী'তে আবার নূতন ভাঙন লেগেছিল, অন্যপথে চলেছিলাম, ছন্দেরও কতকগুলি বিশেষ ভঙ্গি চেষ্টা করেছিলাম। একথা মনে রাখতে

১ দ্রষ্টব্য 'সন্ধ্যাসংগীতএর ছন্দ' পৃ ১৭৯।

অনুরোধ করি যে কৌতূহলবশত বাহাদুরি নেবার জন্ত আমি কখনও নূতন ছন্দ বানাবার চেষ্টা করিনি, সেটা আমার কাছে অদ্ভুত বলে মনে হয়। মানসীতে যে ছন্দের পরিবর্তন এসেছিল সেটা ধ্বনির দিক্‌ থেকে। লক্ষ্য করেছিলাম, বাংলা কবিতায় জোর পাওয়া যায় না, তার মধ্যে ধ্বনির উচ্চনীচতা নেই, বাংলা কবিতা অতি দ্রুত গড়িয়ে চলে যায়। ইংরেজিতে একসেন্‌ট্‌, সংস্কৃতে তরঙ্গায়িততা আছে। বাংলায় তা নেই বলেই পূর্বে পয়ারে সুর করে পড়া হত, টেনে টেনে অতিবিলম্বিত করে পড়া হত, তাই অর্থবোধে কষ্ট হত না। লক্ষ্য করেছি বাংলা কবিতা কানের ভিতর ধরে না, বোঝবার সম্ভাবনাও ঝাপসা হয়ে যায়।[১] এর প্রতিকার চাই। বাংলায় দীর্ঘহ্রস্ব উচ্চারণ চালানোটা হাস্যকর, সেটা হাস্যরসেই প্রযুক্ত হতে পারে, যেমন আমার বড়োদাদা চালিয়ে ছিলেন।[২]

বিলাতে পালাতে ছটফট করে নব্য-গউড়ে।

কিন্তু সাধারণ ব্যবহারে সেটা অচল। এজন্য আমি যুক্তাক্ষরগুলিকে পুরোমাত্রার ওজন দিয়ে ছন্দ রচনা মানসীতে আরম্ভ করেছিলাম। এখন সেটা চলতি হয়ে গেছে; ছন্দের ধ্বনিগাম্ভীর্য তাতে বেড়েছে।[*] পরে পরে নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে চলেছি। 'ক্ষণিকা' যখন লিখলুম তখন লোকের ধাঁধা লেগে গেল।...এমনি করে নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এসেছি। 'বলাকা'য় নূতন পর্ব এসেছে, ভাব ভাষা ও ছন্দ নূতন পথে গেছে। দেখেছি কাব্যের নূতন রূপ স্বীকার করে নিতে সময় লাগে, অনভ্যস্ত ধ্বনি ও ভাবের রস গ্রহণে মন স্বভাবতই বিমুখ হয়।...

১. দ্রষ্টব্য পৃ ১৭৩ পাদটীকা ৩, পৃ ২১৬ পাদটীকা ১।

২ তুলনীয়: আমার বড়োদাদা...কৌতুক করিয়া পৃ ৫, তার অসংগতি...মেটাতে পারে পৃ ১২২-২৩। দ্রষ্টব্য পৃ ২০০ পাদটীকা ১।

* দ্রষ্টব্য 'বাংলা ছন্দে যুক্তাক্ষর' পৃ ১৮১।

বাংলায় নূতন ছন্দ অনেক আমিই প্রবর্তিত করেছি। একসময় যা রীতিবিরুদ্ধ ছিল আজ সেটাই orthodox, classical হয়ে গেছে। আমার এখনকার কবিতার বিরুদ্ধে অভিযোগ এই, যা গদ্য তা কখনো কবিতা হতে পারে না।··· ভাষার যে একটুখানি আড়াল কাব্যে মাধুর্য জোগায় গদ্যে তার অভাব ; গদ্য হচ্ছে কথার ভাষা, খবর দেবার ভাষা। যে ভাষা সর্বদা প্রচলিত নয় তার মধ্যে যে একটা দূরত্ব আছে তারই প্রয়োগে কাব্যের রস জমে ওঠে। অধুনা 'শেষসপ্তক' প্রভৃতি গ্রন্থে আমি যে ভাষা, ছন্দ প্রয়োগ করেছি তাকে 'গদ্য' বিশেষণে অভিহিত করা হয়েছে। গদ্যের সঙ্গে তার সাদৃশ্য আছে বলে কেউ কেউ তাকে বলেছেন গদ্যকাব্য, সোনার পাথরবাটি। আমি বলি, যাকে সচরাচর আমরা গদ্য বলে থাকি সেটা আর আমার আধুনিক কাব্যের ভাষা এক নয়,[১] তার একটা বিশেষত্ব আছে যাতে সেটা কাব্যের বাহন হতে পারে ; সে ভাষায় ও ভঙ্গিতে কোনো সাপ্তাহিক পত্রিকা লিখিত হলে তার গ্রাহকসংখ্যা কমবেই, বাড়বে না। এর একটা বিশেষত্ব আছে যাকে আমার মন কাব্যের ভাষা বলে স্বীকার করে নিয়েছে। এই ভঙ্গিতে আমি যা লিখেছি, আমি জানি তা অন্য কোনো ছন্দে বলতে পারতুম না।···অনেকে মনে করেন কবিতা লেখা এতে সহজ হয়েছে। কিন্তু আমার মনে হয় বাঁধা ছন্দেই তো রচনা হুহু করে চলে, ছন্দই প্রবাহিত করে নিয়ে যায় ; কিন্তু যেখানে বন্ধন নেই অথচ ছন্দ আছে, সেখানে মনকে সর্বদা সতর্ক করে রাখতে হয়।

প্রবাসী—১৩৪৩ আষাঢ়

১ তুলনীয় : গদ্য বললে অতিব্যাপ্তি দোষ ঘটে।···তৈজস গদ্য। পৃ ২০৩।

গদ্যকাব্য

···তর্কের বিষয় এই যে, কাব্যের স্বরূপ ছন্দোবদ্ধ সজ্জার 'পরে একান্ত নির্ভর করে কি না। কেউ মনে করেন করে, আমি মনে করি করে না। অলংকরণের বহিরাবরণ থেকে মুক্ত করে কাব্য সহজে আপনাকে প্রকাশ করতে পারে, এ-বিষয়ে আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে একটি দৃষ্টান্ত দেব। আপনারা সকলেই অবগত আছেন, জবালাপুত্র সত্যকামের কাহিনী অবলম্বন করে আমি একটি কবিতা রচনা করেছি। ছান্দোগ্য উপনিষদে এই গল্পটি সহজ গদ্যের ভাষায় পড়েছিলাম, তখন তাকে সত্যিকার কাব্য বলে মেনে নিতে একটুও বাধেনি। উপাখ্যানমাত্র—কাব্যবিচারক একে বাহিরের দিকে তাকিয়ে কাব্যের পর্যায়ে স্থান দিতে অসম্মত হতে পারেন; কারণ এ তো অনুষ্টুপ্, ত্রিষ্টুপ্ বা মন্দাক্রান্তা ছন্দে রচিত হয়নি। আমি বলি হয়নি বলেই শ্রেষ্ঠ কাব্য হতে পেরেছে, অপর কোনো আকস্মিক কারণে নয়। এই সত্যকামের গল্পটি যদি ছন্দে বেঁধে রচনা করা হত, তবে হালকা হয়ে যেত।[১]

সপ্তদশ শতাব্দীতে নাম-না-জানা কয়েকজন লেখক ইংরেজিতে গ্রীক ও হিব্রু বাইবেল অনুবাদ করেছিলেন। এ-কথা মানতেই হবে যে সলোমনের গান ডেভিডের গাথা সত্যিকার কাব্য। এই অনুবাদের ভাষার আশ্চর্য শক্তি এদের মধ্যে কাব্যের রস ও রূপকে নিঃসংশয়ে পরিস্ফুট করেছে। এই গানগুলিতে গদ্যছন্দের যে মুক্ত পদক্ষেপ আছে, তাকে যদি পদ্যপ্রথার শিকলে বাঁধা হত তবে সর্বনাশই হত।[১]

যজুর্বেদে যে উদাত্ত ছন্দের সাক্ষাৎ আমরা পাই, তাকে আমরা পদ্য বলি না, বলি মন্ত্র। আমরা সবাই জানি যে, মন্ত্রের লক্ষ্য হল শব্দের অর্থকে ধ্বনির ভিতর দিয়ে মনের গভীরে নিয়ে যাওয়া। সেখানে সে যে

১ দ্রষ্টব্য 'রবীন্দ্রনাথের গদ্যকবিতার ছন্দ'— রবীন্দ্রস্মৃতি পূর্বাশা পৃ ২৮।

কেবল অর্থবান্ তা নয়, ধ্বনিমান্‌ও বটে। নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে, এই গদ্যমন্ত্রের সার্থকতা অনেকে মনের ভিতর অনুভব করেছেন কারণ তার ধ্বনি থামলেও অনুরণন থামে না।[১]

একদা কোনো এক অসতর্ক মুহূর্তে আমি আমার গীতাঞ্জলি ইংরেজি গদ্যে অনুবাদ করি। সেদিন বিশিষ্ট ইংরেজ সাহিত্যিকেরা আমার অনুবাদকে তাঁদের সাহিত্যের অঙ্গস্বরূপ গ্রহণ করলেন। এমন কি ইংরেজি গীতাঞ্জলিকে উপলক্ষ্য করে এমন সব প্রশংসাবাদ করলেন যাকে অত্যুক্তি মনে করে আমি কুণ্ঠিত হয়েছিলাম। আমি বিদেশী, আমার কাব্যে মিল বা ছন্দের কোনো চিহ্নই ছিল না, তবু যখন তাঁরা তার ভিতর সম্পূর্ণ কাব্যের রস পেলেন, তখন সে-কথা তো স্বীকার না করে পারা গেল না। মনে হয়েছিল ইংরেজি গদ্যে আমার কাব্যের রূপ দেওয়ায় ক্ষতি হয়নি, বরঞ্চ পদ্যে অনুবাদ করলে হয়তো তা ধিক্কৃত হত, অশ্রদ্ধেয় হত।[২]

মনে পড়ে একবার শ্রীমান্ সত্যেন্দ্রকে বলেছিলুম, "ছন্দের রাজা তুমি, অ-ছন্দের শক্তিতে কাব্যের স্রোতকে তার বাঁধ ভেঙে প্রবাহিত কর দেখি।" সত্যেনের মতো বিচিত্র ছন্দের স্রষ্টা বাংলায় খুব কমই আছে। হয়তো অভ্যাস তাঁর পথে বাধা দিয়েছিল, তাই তিনি আমার প্রস্তাব গ্রহণ করেননি। আমি স্বয়ং এই কাব্য রচনার চেষ্টা করেছিলুম লিপিকায়, অবশ্য পদ্যের মতো পদ ভেঙে দেখাইনি। লিপিকা লেখার পর বহুদিন আর গদ্যকাব্য লিখিনি। বোধ করি সাহস হয়নি বলেই।[২]

কাব্যভাষার একটা ওজন আছে, সংযম আছে, তাকেই বলে ছন্দ। গদ্যের বাছবিচার নেই, সে চলে বুক ফুলিয়ে। সেজন্যেই রাষ্ট্রনীতি প্রভৃতি প্রাত্যহিক ব্যাপার প্রাঞ্জল গদ্যে লেখা চলতে পারে। কিন্তু

১ তুলনীয় : যজুর্বেদের গদ্যমন্ত্রের...থেকে বায় পৃ ১৫৩।

২ দ্রষ্টব্য পৃ ২১৮ পাদটীকা ১।

গদ্যকে কাব্যের প্রবর্তনায় শিল্পিত করা যায়। তখন সেই কাব্যের গতিতে এমন কিছু প্রকাশ পায় যা গদ্যের প্রাত্যহিক ব্যবহারের অতীত। গদ্য বলেই এর ভিতরে অতিমাধুর্য, অতিলালিত্যের মাদকতা থাকতে পারে না। কোমলে কঠিনে মিলে একটা সংযত রীতির আপনা-আপনি উদ্ভব হয়। নটীর নাচে শিক্ষিতপটু অলংকৃত পদক্ষেপ। অপর পক্ষে ভালো চলে এমন কোনো তরুণীর চলনে ওজন-রক্ষার একটি স্বাভাবিক নিয়ম আছে। এই সহজ সুন্দর চলার ভঙ্গিতে একটা অশিক্ষিত ছন্দ আছে, যে ছন্দ তার রক্তের মধ্যে, যে ছন্দ তার দেহে। গদ্যকাব্যের চলন হল সেই রকম,—অনিয়মিত উচ্ছৃঙ্খল গতি নয়, সংযত পদক্ষেপ।...

গদ্য ও পদ্যের ভাসুর-ভাদ্রবউ সম্পর্ক আমি মানি না। আমার কাছে তারা ভাই আর বোনের মতো, তাই যখন দেখি গদ্যে পদ্যের রস ও পদ্যে গদ্যের গাম্ভীর্যের সহজ আদানপ্রদান হচ্ছে, তখন আমি আপত্তি করিনে।

প্রবাসী—১৩৪৬ মাঘ

সংযোজন

পয়ার ও দ্বাদশাক্ষর ছন্দ

বাঙ্গলা ভাষায় সংস্কৃত কাব্যগ্রন্থের অনুবাদ করা নিরতিশয় কঠিন কাজ; কারণ সংস্কৃত কবিতার শ্লোকগুলি ধাতুময় কারুকার্যের ন্যায় অত্যন্ত সংহতভাবে গঠিত,[১]—বাঙ্গলা অনুবাদে তাহা বিশ্লিষ্ট এবং বিস্তীর্ণ হইয়া পড়ে। কিন্তু নবীন[২] বাবুর রঘুবংশ অনুবাদখানি পাঠ করিয়া আমরা বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছি। মূল গ্রন্থখানি পড়া না থাকিলেও এই অনুবাদের মাধুর্যে পাঠকদের হৃদয় আকৃষ্ট হইবে সন্দেহ নাই। অনুবাদক সংস্কৃত কাব্যের লাবণ্য বাঙ্গলা ভাষায় অনেকটা পরিমাণে সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার যথেষ্ট ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু পঞ্চদশ সর্গে তিনি যে দ্বাদশাক্ষর ছন্দ[৩] ব্যবহার করিয়াছেন তাহা আমাদের কর্ণে ভালো ঠেকিল না। বাঙ্গলার পয়ার ছন্দে প্রত্যেক ছত্রে যথেষ্ট বিশ্রাম আছে, তাহা চতুর্দশ অক্ষরের হইলেও তাহাতে অন্যূন ষোলটি মাত্রা আছে।[৪] এই জন্য পয়ার ছন্দে যুক্ত অক্ষর ব্যবহার করিবার স্থান পাওয়া যায়; কিন্তু দ্বাদশাক্ষর ছন্দে যথেষ্ট বিশ্রাম না থাকাতে যুক্ত অক্ষর ব্যবহার করিলে ছন্দের সামঞ্জস্য নষ্ট হইয়া যায়[৫]; যেন কুঠির পানসিতে মহাজনী নৌকার মাল তোলা হয়।

১ তুলনীয়; প্রত্যেক শ্লোকটি স্বতন্ত্র হীরকখণ্ডের ন্যায় উজ্জ্বল।—প্রাচীন সাহিত্য, কাদম্বরীচিত্র।

২ নবীনচন্দ্র দাস।

৩ সংজ্ঞাপরিচয় দ্রষ্টব্য।

৪ দ্রষ্টব্য ৪১, ৪৬, ৭১ এবং ১১৮-১৯ পৃষ্ঠা। 'অন্যূন' কথার দ্বারা বোঝা যায় পয়ারে ষোলর বেশি মাত্রাও ধরা যায়। তার প্রমাণ দ্রষ্টব্য ১২০ পৃষ্ঠায়। পয়ারে চোদ্দর বেশী মাত্রার স্থান হয়, কারণ এ ছন্দ 'স্থিতিস্থাপক'।

৫ দ্রষ্টব্য ৪০, ৫৪-৫৫, ৬৬-৬৭, ৯৭, ১২৪-২৫, ১৪৬ এবং ১৭৭-৭৮ পৃষ্ঠা।

দ্বাদশাক্ষর ছন্দে ধীর গমনের গাম্ভীর্য না থাকাতে[১] তাহাতে সংস্কৃত কাব্যসুলভ ঔদার্য নষ্ট করে। আমরা সমালোচ্য অনুবাদ হইতে একটি পয়ারের এবং একটি দ্বাদশাক্ষরের শ্লোক পরে পরে উদ্‌ধৃত করিলাম।—

প্রসবান্তে কৃশা এবে কোশলনন্দিনী,
শয্যায় শোভিছে পাশে শয়ান কুমার—
শরদে ক্ষীণাঙ্গী যথা সুরতরঙ্গিণী
শোভিছে পূজার পদ্ম পুলিনে যাঁহার।[২]

সে প্রভামণ্ডলী মাঝে সমুজ্জ্বলা
ফণীন্দ্রের ফণা-উৎক্ষিপ্ত আসনে
রাজিলা বসুধা স্ফুরিত কিরণে,
কটিতটে যাঁর সমুদ্র-মেখলা।[৩]

শেষোদ্‌ধৃত শ্লোকটির প্রত্যেক যুক্ত অক্ষরে রসনা বাধা প্রাপ্ত হয়।[৪] কিন্তু পূর্বোদ্‌ধৃত পয়ারে প্রত্যেক যুক্ত অক্ষরে ছন্দের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করিয়াছে। এমন কি, দ্বিতীয় ছত্রে আরএকটি যুক্ত অক্ষরের জন্য কর্ণের আকাঙ্ক্ষা থাকিয়া যায়।

সাধনা—১৩০২ বৈশাখ

১ দ্রষ্টব্য ৩৯-৪০, ৯৭, ১২৪-২৫, ১৮০ এবং ২১৪-১৬ পৃষ্ঠা।

২ রঘুবংশ ১০।৬৯।

৩ রঘুবংশ ১৫।৮৩।

৪ দ্রষ্টব্য ৫, ৫৪, ৬৬-৬৭, ১২৪-২৫ এবং ২১৪-১৫ পৃষ্ঠা।

গ্রন্থপরিচয়

সংজ্ঞাপরিচয়

অক্ষর (পৃ ৩-৪)—বাংলায় অক্ষর শব্দের অর্থ অনিশ্চিত। এ শব্দে কখনও বোঝায় হসন্ত বর্ণ, কখনও স্বরান্ত (যুক্ত বা অযুক্ত) বর্ণ। ছন্দের আলোচনায় অক্ষর শব্দটি সাধারণত একই সঙ্গে এই দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়। এই জন্যই পু. ণ্য. বা. ন্ শব্দে চার অক্ষর ধরা হয়। অক্ষরসংখ্যা অনেক সময়ই লিপি ও বানানরীতির উপরে নির্ভর করে। তাই আ. ল্. প. না শব্দে চার অক্ষর, অথচ ক. ল্প. না শব্দে তিন অক্ষর। রবীন্দ্রনাথ এই প্রচলিত অর্থেই অক্ষর শব্দটিকে ব্যবহার করেছেন।

কেউ কেউ বর্ণ এবং অক্ষর এই শব্দদুটিকে ভিন্নার্থক বলে গণ্য করেন। তাঁদের মতে বর্ণ মানে letter এবং অক্ষর মানে syllable। সংস্কৃত ছন্দশাস্ত্রে এই দুটি শব্দ একার্থেই ব্যবহৃত হয়। উক্ত শাস্ত্রে প্রযুক্ত অক্ষর বা বর্ণ শব্দের দ্বারা অনেক সময় সিলেব্‌ল্ বোঝালেও অক্ষর আর সিলেব্‌ল্ এক নয়। ছন্দ শব্দে দুটি অক্ষর ছ+ন্দ, প্রথমটি অযুক্ত এবং দ্বিতীয়টি যুক্ত। কিন্তু তার সিলেব্‌ল্-বিভাগ হচ্ছে ছন্+দ। শব্দের মধ্যে বা অন্তে যুক্তাক্ষর বা যুক্তবর্ণ থাকলেই অক্ষর-বিভাগ ও সিলেব্‌ল্-বিভাগের পার্থক্য স্পষ্ট বোঝা যায়। রবীন্দ্রনাথ বর্ণ বা অক্ষর শব্দকে সিলেব্‌ল্ অর্থে ব্যবহার করেন নি।

অক্ষরবৃত্ত (পৃ ৫২)—বাংলা ছন্দের তিনটি শাখার (পৃ ১৩২) মধ্যে যে শাখাটিকে রবীন্দ্রনাথ সাধুছন্দ বা সাধুভাষার ছন্দ নাম দেন, তাকে অনেক সময় বলা হয় অক্ষরবৃত্ত। কেননা প্রচলিত হিসাবে এ শাখার সব ছন্দেই একএক অক্ষরকেই একএক মাত্রা বলে গণনা করা হয়। তাই রবীন্দ্রনাথও এই শ্রেণীর ছন্দকে 'অক্ষরগোনা' বলে পরিচয় দিয়েছেন (পৃ ১৪২, ১৯২)। কিন্তু অক্ষরবৃত্ত নামটি সমীচীন নয়, কারণ অক্ষর শব্দটাই অনিশ্চিতার্থক। রবীন্দ্রনাথই বলেছেন, "আক্ষরিক ছন্দ

বলে কোনো অদ্ভুত পদার্থ বাংলায় কিংবা অন্য কোনো ভাষাতেই নেই। অক্ষর ধ্বনির চিহ্ন মাত্র" (পৃ ৬১)। ছন্দ ধ্বনির উপরেই প্রতিষ্ঠিত, তার চিহ্নের উপরে নয়।

অতিপর্ব (anacrusis)—অনেক সময় ছন্দপংক্তির সমুখে একটি করে দুই বা তিন মাত্রা পরিমিত খণ্ডপর্ব থাকে, যা ঠিক ছন্দপংক্তির অন্তর্ভুক্ত নয় অথচ যার প্রভাবে ছন্দের দোলায় বেশ একটু বৈচিত্র্য দেখা দেয়। এ-রকম অতিরিক্ত খণ্ডপর্বকে বলা হয় অতিপর্ব (পৃ ১৭১)। অতিপর্ব মূল পংক্তি থেকে একটু বিচ্ছিন্নভাবে উচ্চারিত ও লিখিত হয়। চলতি কথায় এ-রকম উচ্চারণকে বলা হয় 'আড়ে' রাখা (পৃ ১০২)। ১২৯-১৩১ পৃষ্ঠায় উদাহৃত তিনটি দৃষ্টান্তের ওরে, এমন, শুনি প্রভৃতি বিচ্ছিন্ন শব্দগুলি অতিপর্ব।

অনুষ্টুপ্ (পৃ ৫০)—একটি সংস্কৃত ছন্দোবর্গের নাম। যে সকল সংস্কৃত ছন্দের প্রত্যেকপাদে অর্থাৎ চতুর্থাংশে আটটি করে স্বরান্ত বর্ণ থাকে তাদেরই সাধারণ নাম অনুষ্টুপ্। অনুষ্টুপ্ ছন্দের দুই শ্রেণী। এক শ্রেণীর অনুষ্টুপ্ ছন্দে লঘুগুরুভেদে প্রত্যেক বর্ণের রূপ নিদিষ্ট থাকে। অন্য শ্রেণীর ধ্বনিবিন্যাস অপেক্ষাকৃত স্বাধীন। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর ছন্দসমূহকে বলা হয় অনুষ্টুপ্-বক্ত্র বা শুধু বক্ত্র। বক্ত্রশ্রেণীর সব চেয়ে বেশি প্রচলিত ও পরিচিত বিশেষ ছন্দটির নাম পথ্যাবক্ত্র। বাংলায় পয়ারের যে স্থান, সংস্কৃতে পথ্যাবক্ত্রের সেই স্থান। এই ছন্দের নিয়ম এই— পঞ্চম বর্ণ সব পাদেই লঘু এবং ষষ্ঠ বর্ণ সব পাদেই গুরু; সপ্তম বর্ণ প্রথম ও তৃতীয় পাদে গুরু, কিন্তু দ্বিতীয় ও চতুর্থ পাদে লঘু; অন্যান্য বর্ণের লঘুত্ব-গুরুত্ব নিয়মিত নয়। ৫০ পৃষ্ঠায় উদ্‌ধৃত দৃষ্টান্তটির ছন্দোবিশ্লেষ হচ্ছে এ-রকম।—

| ‖ ‖ | ‖ |
পাঁচালী না। ম বিখ্যাতা | সাধারণ। মনোরমা।

| ‖ ‖ | ‖ |
পয়ার ত্রি। পদী আদি | প্রাকৃতে হ। য় চালনা॥

অনুষ্টুপ্ বর্গের অন্তর্গত এই পথ্যাবক্ত্র ছন্দই সব চেয়ে সুপরিচিত। তাই অনুষ্টুপ্ ছন্দ বলতে সাধারণত এই ছন্দকেই বোঝায়।

অবয়ব (পৃ ১১৯)—এটিকে যথার্থ পারিভাষিক শব্দ বলা যায় না। পূর্ণযতির ছন্দোবিভাগ অর্থাৎ পংক্তিকেই বলা হয়েছে অবয়ব। অন্যত্র তাকেই বলা হয়েছে রূপকল্প (পৃ ৯৯)। দ্রষ্টব্য 'চাল'।

অমিত্রাক্ষর—অমিত্রাক্ষর মানে অমিল। কিন্তু অমিল ছন্দ মাত্রকেই অমিত্রাক্ষর বলা যায় না। ছন্দপরিভাষায় এ শব্দটি একটি বিশিষ্ট রূঢ়ার্থ অর্জন করেছে। রূঢ়ার্থে অমিত্রাক্ষর নামের দ্বারা পয়ারের প্রকারভেদ বোঝা যায়। যে পয়ারের পংক্তিপ্রান্তে মিল থাকে না এবং পংক্তির শেষে 'বড়ো যতি' অর্থাৎ পূর্ণযতি স্থাপন আবশ্যিক বলে গণ্য হয় না, সে পয়ারেরই পারিভাষিক নাম অমিত্রাক্ষর (পৃ ১৫৩)। এ ছন্দে পূর্ণযতির বিভাগ প্রায়শই পয়ারের চোদ্দ বা আঠার মাত্রার নির্দিষ্ট পংক্তিসীমা অতিক্রম করে যায়। তাই একে পংক্তিলঙ্ঘক (পয়ার) ছন্দ বলেও অভিহিত করা হয়েছে (পৃ ১৫৬) এবং পয়ার রচনার এই নূতন রীতিকে বলা হয়েছে পংক্তিলঙ্ঘন, লাইন ডিঙোনো চাল (পৃ ৬৯) বা প্রবহমানতা (*enjambement*, পৃ ২১৫)। কিন্তু 'সংস্কৃতের অমিত্রাক্ষর রীতি' (পৃ ১৯০) বলতে পংক্তিলঙ্ঘন বোঝায় নি, শুধু মিলহীনতাই বুঝিয়েছে।

অযুগ্মধ্বনি (open syllable)—দ্রষ্টব্য 'ধ্বনি'।

অসমমাত্রার ছন্দ (পৃ ৩৬)—যে ছন্দে পূর্ণপর্বের আয়তন ছয় মাত্রা তাকে কোথাও বলা হয়েছে 'ছয়মাত্রার ছন্দ' (পৃ ১১-১২) এবং কোথাও বলা হয়েছে 'ষড়ঙ্গী' (পৃ ১০০)। এ ছন্দের পর্বগুলিতে অনেক স্থলেই দুটি করে তিনমাত্রার উপপর্ব থাকে। উপপর্বের এই আয়তনের হিসাবে

রবীন্দ্রনাথ এ ছন্দকে তিনমাত্রার ছন্দ (পৃ ২৪২), তিনবর্গ মাত্রার ছন্দ, ত্রৈমাত্রিক ছন্দ প্রভৃতি নানা নাম দিয়েছেন। তিন সংখ্যাটা অসম অর্থাৎ বিজোড়। সেজন্য এ ছন্দকে তিনি 'অসমমাত্রার ছন্দ' নামেও অভিহিত করেছেন। যে ছন্দের উপপর্ব দুইমাত্রা-পরিমিত তাকে বলেছেন 'সমমাত্রার ছন্দ,' আর দুই মাত্রা ও তিন মাত্রার দু-রকম উপপর্ব নিয়ে গঠিত ছন্দকে বলেছেন 'বিষমমাত্রার ছন্দ' (পৃ ১৪-১৫, ৩৫-৩৬)।

বিষমমাত্রার ছন্দের উপপর্বগুলি স্বভাবতই সমান নয়। এজন্য বিষমমাত্রার ছন্দকে এক স্থলে 'অসমান মাত্রার ছন্দ' (পৃ ১৩-১৪) এবং অন্যত্র 'অসমমাত্রার ছন্দ' (পৃ ১৪, ১৪১) নামও দেওয়া হয়েছে। 'অসমান মাত্রাভাগের ছন্দ' (পৃ ১৩৩) বলতে কিন্তু সম্পূর্ণ অন্য বিষয় বোঝাচ্ছে। এখানে মাত্রাভাগ মানে যতিবিভাগ বা পর্ব (পৃ ১৩৫ পাদটীকা ১)।

ষণ্মাত্রপর্বিক ছন্দের উপপর্বে সাধারণত তিন মাত্রা থাকে বলেই তাকে বলা হয়েছে অসমমাত্রার ছন্দ। কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন যে, এ ছন্দের পর্বে অনেক সময় তিনটি করে দুইমাত্রার উপপর্বও থাকে (পৃ ১০০-১০১, ২৩৯)।

আর্যা (পৃ ১৫৩)—সংস্কৃত মাত্রাবৃত্ত বিভাগের অন্তর্গত একটি ছন্দোবর্গের নাম আর্যা। আর্যার রূপভেদ অনেক। তার মধ্যে যে রূপটি সব চেয়ে বেশি পরিচিত তার নাম পথ্যার্যা। তাই আর্যা ছন্দ বলতে সাধারণত এই পথ্যার্যা ছন্দকেই বোঝায়। আর্যাবর্গের প্রধান নিয়মগুলি হচ্ছে এই।—

১। প্রতি গণে বা পর্বে চার কলামাত্রা থাকা চাই। আর্যা হচ্ছে মূলত একটি চতুর্মাত্রপর্বিক ছন্দোবর্গের নাম।

২। প্রথমার্ধে সাড়ে সাত পর্ব, ত্রিশ মাত্রা।

৩। দ্বিতীয়ার্ধেও সাড়ে সাত পর্বই গণনা করা হয়। কিন্তু এই

অর্ধের ষষ্ঠ পর্বটি একমাত্রক বলে স্বীকার্য। সুতরাং এর মোট মাত্রাসংখ্যা সাতাশ।

৪। প্রথম বা দ্বিতীয় কোনো অর্ধেই অযুগ্মসংখ্যক পর্বগুলি মধ্যগুরু (।॥।) হতে পারে না। কিন্তু প্রথমার্ধের ষষ্ঠ পর্বটি মধ্যগুরুই হওয়া চাই, বিকল্পে চতুর্লঘু হতে পারে।

যে আর্যা ছন্দের উভয়ার্ধেই তৃতীয় পর্বের অর্থাৎ বার মাত্রার পরে যতি থাকে তার বিশেষ নাম পথ্যার্যা। আর যে আর্যার কোনো এক অর্ধে বা উভয়ার্ধে সাড়ে তিন পর্বের অর্থাৎ চোদ্দ মাত্রার পরে যতি পড়ে তার নাম বিপুলার্যা। আর্যার আরও বহু রূপভেদ আছে। তার মধ্যে পথ্যার্যার প্রয়োগই দেখা যায় সব চেয়ে বেশি। পথ্যার্যার দৃষ্টান্ত—

।॥।
আ পরি | তোষাদ্ | বিদুষাং ‖ ন সাধু | মন্যে | প্রয়োগ | বিজ্ঞা | নম্।

।
বলবদ | পি শিক্ষি | তানাম্ ‖ আত্ম- | ন্যপ্র- | ত্য | য়ং চে | তঃ ‖

—অভিজ্ঞানশকুন্তলম্, প্রথম অঙ্ক

উভয়ার্ধেই শেষ ধ্বনিটি দ্বিমাত্রক। শুধু সংস্কৃতে নয়, প্রাকৃতেও আর্যার বহুল প্রয়োগ দেখা যায়। আর্যা ছন্দে পাদবিভাগের অসমানতা তথা যতিস্থাপনের স্বাধীনতা এ ছন্দকে অনেকাংশে গদ্যের বৈশিষ্ট্য দান করেছে (পৃ ১৫৩, ১৫৭)।

উপপর্ব—দ্রষ্টব্য 'পর্ব'।

একতালা—দ্রষ্টব্য 'তাল'।

কলা (পৃ ৯৬)—একটি লঘুধ্বনি উচ্চারণ করতে যে সময় লাগে, সংস্কৃত ও প্রাকৃত ছন্দশাস্ত্রে তাকেই বলা হয় কলা। সংস্কৃত ও প্রাকৃতে এই কলাই মাত্রারূপে ব্যবহৃত হয়, অর্থাৎ কলাসংখ্যা দ্বারাই ছন্দোগত ধ্বনি পরিমিত হয়। তাই 'চতুষ্কল গণ' বলতে বোঝায় চতুর্মাত্রক পর্ব। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু এই শব্দটিকে অন্য অর্থে ব্যবহার করেছেন। তিনি সাধারণত পর্বকেই

বলেছেন কলা। যেমন—মেঘ ডাকে | গম্ভীর | গরজনে (পৃ ১০৪), সকল বেলা | কাটিয়া গেল (পৃ ১০২), অন্তর তার | কী বলিতে চায় (পৃ ১০৩) প্রভৃতি দৃষ্টান্তের চার, পাঁচ ও ছয় মাত্রার পর্বকেই তিনি কলা বলে পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু কোনো কোনো স্থলে উপপর্বকেও বলেছেন কলা। যেমন—শ্রাবণ-গগন, | ঘোর ঘনঘটা (পৃ ১০৫), এ দৃষ্টান্তটা হচ্ছে 'ষড়ঙ্গী' এবং রবীন্দ্রনাথের মতেই এর প্রতিকলায় ছয় মাত্রা গণ্য হওয়া উচিত (পৃ ১০০-১০১)। কিন্তু তা না করে তিনি এই দৃষ্টান্তটির প্রতিকলায় গণনা করেছেন তিন মাত্রা, অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে উপপর্বকেই বলেছেন কলা।

কাওয়ালি—দ্রষ্টব্য 'তাল'।

গগনাঙ্গ (পৃ ১০৮)—একটি প্রাকৃত ছন্দ। এ ছন্দের প্রতিপাদে কুড়িটি স্বরান্ত অক্ষর এবং পঁচিশ কলামাত্রা থাকে। মাত্রাস্থাপনের বিশেষ বিধান এই যে, পাদের প্রথমেই থাকবে একটি চতুষ্কল গণ (অর্থাৎ চার কলামাত্রার পর্ব) এবং পাদের শেষ দুটি অক্ষর হবে যথাক্রমে লঘু ও গুরু। অন্যান্য অক্ষরের লঘুত্ব-গুরুত্ব নিয়মিত নয়। যথা—

। ॥
ভংজিঅ | মলঅচোলবই ণিবলিঅ গংজিঅ গুজ্জরা।

চতুষ্পদ—দ্রষ্টব্য 'পদ'।

চরণ—দ্রষ্টব্য 'পদ'।

চলন (পৃ ৩৪)—এটি পারিভাষিক শব্দ নয়। রবীন্দ্রনাথ এই শব্দটি ব্যবহার করেছেন ছন্দপংক্তির বিভাগ অর্থে। এক রকম বিভাগকে বলা যায় পর্ব এবং পর্বের উপবিভাগকে বলা যায় উপপর্ব। চলন শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে কখনও পর্ব অর্থে, কখনও উপপর্ব অর্থে। যেমন—

শরদচন্দ | পবন মন্দ | বিপিন ভরল | কুসুমগন্ধ |

এটি হচ্ছে ষড়ঙ্গী অর্থাৎ ষন্মাত্রপবিক ছন্দ। রবীন্দ্রনাথের মতে এর প্রতিপদক্ষেপে অর্থাৎ চলনে ছয় মাত্রা (পৃ ৩৪)। সুতরাং চলন মানে

পর্ব। তার পরেই চার মাত্রার চলন বা পদক্ষেপের দৃষ্টান্ত (পৃ ৩৫) দিয়েছেন এবং অন্যত্রও (পৃ ৪০) এ-রকম চলনের উল্লেখ করেছেন। এ সব স্থলেও চলন মানে পর্ব। কিন্তু আবার দুই মাত্রার (সমমাত্রার) তথা তিন মাত্রার (অসমমাত্রার) চলনের কথাও বলা হয়েছে (পৃ ৩৫-৩৬)। সে সব স্থলে চলন মানে উপপর্ব। যেমন— 'নয়নধারায় | পথ সে হারায় | চায় সে পিছন | পানে' এটাও ষড়ঙ্গী, কেননা এর প্রতিপদক্ষেপে ছয় মাত্রা। অন্য পরিভাষায় এর প্রতিপর্বে ছয় মাত্রা এবং প্রতিউপপর্বে তিন মাত্রা। সুতরাং এ স্থলে তিন মাত্রার চলন বলতে উপপর্বই বোঝাচ্ছে। সমচলন, অসমচলন, বিষমচলন প্রভৃতি কথায় (পৃ ৩৫-৩৬) চলন মানে উপপর্ব।

চাল (পৃ ৩৪)—এটিও পারিভাষিক শব্দ নয়। ছন্দের পূর্ণযতির বিভাগ বা পংক্তিকেই বলা হয়েছে চাল। একএকটি পূর্ণযতির পরে প্রত্যেক ছন্দেরই পূর্ণরূপের পুনরাবৃত্তি ঘটে। তাই এই পূর্ণযতির বিভাগ বা চালকে প্রদক্ষিণ বলেও অভিহিত করা হয়েছে। যেমন—

শরদচন্দ পবন মন্দ বিপিন ভরল কুসুমগন্ধ
ফুল্ল মল্লি মালতি যুথি মত্ত মধুপ ভোরনী।

এখানে "আটটি চলনে এই ছন্দের চাল সারা হচ্ছে।" অর্থাৎ আটটি পর্ব নিয়ে এই ছন্দের পূর্ণরূপ বা পংক্তি গঠিত হয়েছে ; কেননা আট পর্বের পরেই উক্ত পূর্ণরূপের এক প্রদক্ষিণ সমাপ্ত হয়েছে, তার পরেই পুনরাবর্তন। সুতরাং এখানে চাল বা প্রদক্ষিণ মানে পূর্ণযতির বিভাগ অর্থাৎ পংক্তি। কিন্তু তার পরেই চাল বা প্রদক্ষিণ বলতে পংক্তি না বুঝিয়ে বোঝাচ্ছে দুই পংক্তি নিয়ে গঠিত শ্লোক বা যুগ্মক (couplet)। যেমন—

মহাভার | তের কথা | অমৃত স | মান।
কাশীরাম | দাস কহে | শুনে পুণ্য | বান ॥

এখানে চার পর্বের পরে পূর্ণযতি, তার পরেই পুনরাবর্তন। সুতরাং আট পদক্ষেপে (চলনে) এর প্রদক্ষিণ (চাল), এই উক্তিতে বুঝতে হবে এখানে দুই পংক্তির যুক্ত রূপটাই অভিপ্রেত। অন্যত্র (পৃ ১২) ত্রিপদী প্রভৃতি বন্ধের পদবিভাগ অর্থেও চাল শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। দ্রষ্টব্য 'প্রদক্ষিণ'।

চৌতাল—দ্রষ্টব্য 'তাল'।

চৌপদী (পৃ ১১)—যে ছন্দোবন্ধের প্রতিপংক্তিতে চার পদ অর্থাৎ অর্ধযতির বিভাগ থাকে, তাকেই বলা যায় চৌপদী। পয়ার (বা দ্বিপদী) এবং ত্রিপদীর ন্যায় চৌপদীও ত্রিবিধ: সাধু ছন্দের অক্ষরগোনা, প্রাকৃত-বাংলার সিলেব্‌ল্‌গোনা এবং মাত্রাবৃত্তের কলাগোনা।

প্রথম শীতের মাসে |
শিশির লাগিল ঘাসে |
হুহু করে হাওয়া আসে |
হিহি করে কাঁপে গাত্র।

এই পংক্তিটিতে চার পদ সুস্পষ্ট। প্রতিপদে 'অক্ষর'সংখ্যা হিসাবে আট মাত্রা। 'হাওয়া' শব্দের 'ওয়া'র উচ্চারণরূপ wa, সুতরাং এক অক্ষর। এটা সাধু ছন্দের চৌপদী পংক্তি। প্রাকৃত-বাংলার চৌপদীর দৃষ্টান্ত এই (পৃ ১৭)।—

কই পালঙ্ক, কই রে কম্বল |
কপ্‌নি-টুকরো রইল সম্বল |
একলা পাগলা ফিরবে জঙ্গল |
মিটবে সংকট ঘুচবে ধন্দ।

এর প্রতিপদে সিলেব্‌ল্‌সংখ্যা হিসাবে আট মাত্রা। এর সাধুরূপ দ্রষ্টব্য ১৮ পৃষ্ঠায়। এর মাত্রাবৃত্ত রূপ হতে পারে এ-রকম।—

শয্যা-বস্ত্র নাই |
শুধু কৌপীন চাই |
অরণ্যে তার ঠাঁই |
অন্তরে নাই ভয়-চিন্তা।

এর প্রতিপদে কলাসংখ্যা হিসাবে আট মাত্রা, কেবল চতুর্থ পদে এগার কলামাত্রা।

রবীন্দ্রনাথ মনে করেন পয়ার ত্রিপদী চৌপদী সবই দুইবর্গ মাত্রার ছন্দ (পৃ ১৩) ; সেজন্য এগুলিকে কখনও বলেছেন সমমাত্রার ছন্দ (পৃ ৩৬), আর কখনও বলেছেন দ্বৈমাত্রিক ছন্দ (পৃ ৬৭)। অর্থাৎ তাঁর মতে এ সব ছন্দোবদ্ধ দুইমাত্রার উপপর্ব নিয়েই গঠিত হয়। পয়ার সম্বন্ধে এই উক্তি সত্য বটে, কিন্তু ত্রিপদী-চৌপদী সম্বন্ধে এ কথা সম্পূর্ণ সত্য নয়। কেননা তিন মাত্রার উপপর্ব কিংবা তিন ও দুই মাত্রার পর্যায়ক্রমিক উপপর্ব নিয়েও ত্রিপদী চৌপদী হতে পারে। ত্রৈমাত্রিক উপপর্বের চৌপদীর দৃষ্টান্ত দিলাম (পৃ ১৩৯)।—

সে ধারার টানে | তরীখানি চলে,
সেই ডাক শুনে | মন মোর টলে,
এই টানাটানি | ঘুচাও জগার,
হয়েছে বিষম | দায়।

এই চৌপদী পংক্তিটির প্রতিপদে দুই পর্ব ; প্রতিপর্বে ছয় ও প্রতি-উপপর্বে তিন মাত্রা, শেষ উপপর্বটি অপূর্ণ। প্রথম পাঁচটি পর্বে উপযতি লুপ্ত, সুতরাং উপপর্ববিভাগ সুস্পষ্ট নয়। এটাও চৌপদী, অথচ এটা দুইবর্গ মাত্রার ছন্দ নয়, এটুকুই লক্ষণীয়।

'পদ' শব্দের সংজ্ঞাপরিচয় দ্রষ্টব্য।

ছন্দ (পৃ ১১৫)—ছন্দ কথাটি বিভিন্ন স্থলে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। এক অর্থ সৌষম্য বা সুসংগত ভঙ্গি। যেমন—মুখের ছন্দ, ছবির ছন্দ,

চলার ছন্দ। ছন্দশাস্ত্রেও ছন্দ কথাটি প্রসঙ্গভেদে অন্তত তিনটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। প্রথমত, পদ্যরচনার বিশেষ রীতি বা পদ্ধতি। যেমন— সাধু- বা সংস্কৃত-বাংলার ছন্দ, প্রাকৃত-বাংলার বা ছড়ার ছন্দ। দ্বিতীয়ত, ছন্দ মানে স্পন্দ বা rhythm। যেমন—সম ও অসম চলনের ছন্দ, চার মাত্রার ছন্দ। গদ্য-ছন্দ বলতেও গদ্যের স্পন্দ বা রিদ্‌ম্‌ই বোঝায়। যে গদ্যে সুস্পষ্ট স্পন্দ অনুভূত হয় তাকেই বলা যায় ছন্দোময় গদ্য। তৃতীয়ত, ছন্দ মানে পদ্য রচনার বন্ধ বা পদসমাবেশ। যেমন— পয়ার, ত্রিপদী, অমিত্রাক্ষর, মন্দাক্রান্তা। সংকীর্ণার্থে ছন্দ শব্দটি পদ্য-রচনার রীতি, স্পন্দ ও বন্ধ এই তিনের যে-কোনো একটিকে বোঝাতে পারে, ব্যাপকার্থে ওই তিনের সমষ্টিকেই বোঝায়। দ্রষ্টব্য ১১৫ পৃষ্ঠা পাদটীকা ১ এবং 'লয়' শব্দের সংজ্ঞাপরিচয়।

ঝাঁপতাল—দ্রষ্টব্য 'তাল'।

ঝুল্লণা (পৃ ১০৯)—প্রাকৃত মাত্রাবৃত্ত রীতির একটি ছন্দোবন্ধের নাম ঝুল্লণা। ঝুল্লণা দুই 'রূপকল্প' বা পংক্তি নিয়ে গঠিত। প্রতিপংক্তিতে তিন পদ; প্রথম ও দ্বিতীয় পদে দশ কলামাত্রা এবং তৃতীয় পদে সতর কলামাত্রা। যতিও তিনটি; প্রথম ও দ্বিতীয় পদের পরে অর্ধযতি, তৃতীয় পদের পরে পূর্ণযতি। প্রাকৃতপৈঙ্গল গ্রন্থে প্রদত্ত ঝুল্লণার বর্ণনাটিও এই ছন্দেই রচিত। ঝুল্লণার বাংলা প্রতিরূপ এই।—

আজি রাতের যে ফুলগুলি
জীবনে মম উঠিল দুলি
ঝরুক তারা কালি প্রাতের ফুলেরে দিতে প্রাণ।

—বীথিকা, মরণমাতা

তাল[১]—গানের সুরপ্রবাহের গতিসাম্য রক্ষার জন্যে কালপরিমাপের যে ব্যবস্থা, তাকেই বলা হয় তাল। এই ব্যবস্থা অনুসারে গীতকালকে

১ এই অংশটি প্রধানত কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় -কৃত 'গীতসূত্রসার' অবলম্বনে রচিত।

কতকগুলি অংশে বিভক্ত করা হয়। এই কালপর্ব গানভেদে বিভিন্ন রকমের হয়। এই কালপর্ব বা তালবিভাগের বৈচিত্র্যের দ্বারাই গানের ছন্দ নিয়ন্ত্রিত হয় (পৃ ২১, ২১৭)। গানের তালবিভাগ ও পদ্যের পর্ব- বা উপপর্ব-বিভাগ মূলত একজাতীয় বস্তু। গানের কালপরিমাপের একক বা য়ুনিটকে বলা হয় মাত্রা। মাত্রার আয়তন আপেক্ষিক ; স্বরপ্রবাহের লয় অর্থাৎ গতিবেগের দ্রুততা- বা মন্থরতা-ভেদে একই গানের মাত্রা হ্রস্ব বা দীর্ঘ হয়। কালপর্বের মাত্রাসংখ্যা ও আবর্তনের ভিন্নতা অনুসারে গানের তালের বিভিন্ন নাম আছে। এই গ্রন্থোক্ত তালগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া গেল।

একতালা— ত্রিমাত্রক বিভাগের তালবিশেষ। একতালায় চারটি করে বিভাগ থাকে এবং প্রত্যেক বিভাগে থাকে তিন মাত্রা (পৃ ৯৭-৯৮)। মোট মাত্রাসংখ্যা বার। একতালা নামের সার্থকতা সুস্পষ্ট নয়।

কাওয়ালি— এর প্রতিবিভাগ চতুর্মাত্রক। কাওয়ালির তালে চারটি বিভাগ এবং প্রত্যেক বিভাগে চার মাত্রা (পৃ ১২)। মোট মাত্রাসংখ্যা ষোল। কাওয়ালির এক বিভাগে ফাঁক ও তিন বিভাগে তালি পড়ে। এজন্য কাওয়ালিকে তেতালা বলে গণ্য করা হয়।

চৌতাল— এই তাল ছয়টি দ্বিমাত্রক বিভাগ নিয়ে গঠিত। একতালার ন্যায় এরও মোট মাত্রাসংখ্যা বার। এর দ্বিতীয় ও চতুর্থ ভাগে ফাঁক, বাকি চার ভাগে তালি। এজন্যই এর নাম চৌতাল।

ঝাঁপতাল— এটি হচ্ছে দশ মাত্রার তাল। এর মাত্রাবিন্যাস হয় দুই-তিন+দুই-তিন এই পর্যায়ক্রমে। চিত্ত আজি | দুঃখদোলে ইত্যাদি দৃষ্টান্তটি (পৃ ১৫৫) প্রচলিত ঝাঁপতাল নয়। কেননা এর মাত্রাবিন্যাসক্রম হচ্ছে তিন-দুই+ তিন-দুই। তবে এটিকে ঝাঁপতালের প্রকারভেদ বলে গণ্য করা চলে। রবীন্দ্রনাথ এই ঝাঁপতালজাতীয় বিশিষ্ট তালটির নাম দিয়েছেন 'ঝম্পক'।

দাদরা— এটি একতালার মতোই একটি ত্রিমাত্রক বিভাগের তাল। প্রধান পার্থক্য এই যে, একতালায় চার বিভাগ ও মোট মাত্রাসংখ্যা বার, কিন্তু দাদরার দুই বিভাগ ও মোট মাত্রাসংখ্যা ছয়। দাদরার লয় দ্রুত।

ধামার— চোদ্দ মাত্রার তাল। এই তালের তিন বিভাগ এবং এর মাত্রাবিন্যাসপদ্ধতি হচ্ছে পাঁচ-পাঁচ-চার।

বনের পথে পথে | বাজিছে বায়ে ইত্যাদি দৃষ্টান্তটির (পৃ ২৬) তাল-বিভাগ হচ্ছে তিন-দুই-দুই+তিন-দুই। সুতরাং এটি স্পষ্টতই চৌতাল, একতালা, ধামার বা ঝাঁপতালের পর্যায়ে পড়ে না। বস্তুত এটি একটি নূতন তাল।

এই হল 'তাল' শব্দের সংগীতশাস্ত্রসম্মত পারিভাষিক অর্থ। এই অর্থে তাল শব্দের দ্বারা কয়েকটি কালপর্ব বা তালবিভাগ নিয়ে গঠিত সমগ্র পংক্তির পূর্ণরূপ বোঝায়। এ ছাড়াও তাল শব্দের একটি অপারিভাষিক সাধারণ অর্থ আছে। এই অর্থে তাল মানে রিদ্‌ম্ বা 'ছন্দঃস্পন্দন'। যেমন, 'তিনমাত্রার তাল' (পৃ ২১৭) মানে তিন মাত্রার স্পন্দবিভাগ বা উপপর্ব। দ্রষ্টব্য 'লয়'।

তিনমাত্রার ছন্দ—যে ছন্দের উপপর্ব বা 'চলন' তিনমাত্রা-পরিমিত তাকে বলা হয়েছে তিনের ছন্দ (পৃ ৩৬), তিনের মাত্রার ছন্দ (পৃ ৪৪), ত্রৈমাত্রিক ভূমিকার ছন্দ (পৃ ৫৪), ত্রৈমাত্রিক ছন্দ (পৃ ৬৭), তিনমাত্রার ছন্দ (পৃ ৭৩) বা তিন য়ুনিটের ছন্দ (পৃ ২১৩)। এরই অপর নাম অসম ছন্দ। অর্থাৎ ছয়মাত্রা পর্বের ছন্দকেই রবীন্দ্রনাথ বলতেন তিনমাত্রার ছন্দ।

বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, রবীন্দ্রনাথ দুই প্রকৃতির দুটি বিভিন্ন ছন্দকে তিনমাত্রার ছন্দ নামে অভিহিত করেছেন। তিন-মাত্রার ছন্দ মানে তিনমাত্রা-উপপর্বের ছন্দ। মাত্রাবৃত্তবর্গের ছয়মাত্রা-পর্বের ছন্দে প্রতিউপপর্বে থাকে তিন মাত্রা (পৃ ৭৩)। যথা—

চাষের : সময়ে | যদিও : করিনি | হেলা,
ভুলিয়া : ছিলাম | ফসল : কাটার | বেলা।

এর প্রতিপর্বে ছয় মাত্রা এবং প্রতি পূর্ণ উপপর্বে তিন মাত্রা সুস্পষ্ট।

শরতে : শিশির | বাতাস : লেগে
জল ভ'রে আসে | উদাসী : মেঘে।

এখানে দ্বিতীয় লাইনের প্রথম পর্বের উপপর্ববিভাগ সুস্পষ্ট নয়। 'ভরে' শব্দের মধ্যবর্তী উপযতি লুপ্ত হয়েছে বলে গণ্য করতে হবে।

এই দুটি দৃষ্টান্তই মাত্রাবৃত্তবর্গীয়। প্রতিপর্বে ছয় মাত্রা নিয়ে এদের রূপ। সুতরাং এ দুটিকে তিনমাত্রা-উপপর্বের ছন্দ বলতে বাধা নেই।

রবীন্দ্রনাথের মতে বাংলা প্রাকৃতবর্গের ছন্দও তিনমাত্রা-উপপর্ব নিয়ে গঠিত (পৃ ৬২)। যথা—

বৃষ্টি : পড়ে- | টাপুর : টুপুর | নদেয় : এল- | বা-ন

এখানেও প্রতিউপপর্বে তিন মাত্রা গণনীয়। তিনটি উপপর্বে এক মাত্রার ফাঁক রয়েছে, আবৃত্তির টানে সে ফাঁক পূরণ করে নিতে হয়। মাত্রাবৃত্ত-বর্গের ত্রৈমাত্রিক ছন্দে এ-রকম ফাঁক রাখা চলে না। প্রাকৃতবর্গের ছন্দে সাধারণত মাঝে মাঝে উক্তরকম ফাঁক থেকে যায়, তবে প্রয়োজন-মতো বেফাঁক ছন্দও রচনা করা চলে (পৃ ৬৪)। যথা—

স্বপ্ন : আমার | বন্ধন্-হীন | সন্ধ্যা : তারার | সঙ্গী
মরণ : যাত্রী | দলে।

কোনো উপপর্বেই ফাঁক নেই। দ্বিতীয় পর্বে উপযতি লুপ্ত হয়েছে বলে উপপর্ববিভাগ সম্ভব নয়। যা হক, এ-রকম বেফাঁক ছন্দকে লৌকিক ও মাত্রাবৃত্ত উভয় বর্গের অন্তর্গত বলেই গণ্য করা যায়। এ-রকম উভচারী ছন্দের দৃষ্টান্ত বিরল। দ্রষ্টব্য 'ফাঁক'।

মাত্রাবৃত্তবর্গীয় তিনমাত্রার ছন্দে অমিত্রাক্ষরের মতো যতিস্থাপনের স্বাধীনতা নেই, অর্থাৎ এ ছন্দকে প্রবহমান করা চলে না (পৃ ২১৫)।

প্রাকৃতবর্গীয় ছন্দে প্রবহমানতার বিষয় অন্য প্রসঙ্গে আলোচিত হল। দ্রষ্টব্য 'অসমমাত্রার ছন্দ'।

ত্রিপদী (পৃ ১২)—যে ছন্দোবন্ধের প্রতিপংক্তিতে পদসংখ্যা অর্থাৎ অর্ধযতির বিভাগসংখ্যা তিন, তাকেই বলা যায় ত্রিপদী। রবীন্দ্রনাথ মনে করেন পয়ার-চৌপদীর ন্যায় ত্রিপদীও দুইবর্গ-মাত্রার ছন্দ (পৃ ১২), অর্থাৎ দুইমাত্রা-উপপর্বের ছন্দ। বস্তুত অসম- এবং বিষম-পর্বিক ছন্দেও দ্বিপদী ত্রিপদী চৌপদী সবই হতে পারে। অসম- ও বিষম-পর্বিক দ্বিপদী প্রভৃতি একমাত্র কলাগোনা পদ্ধতিতেই রচিত হয়। কিন্তু সমপর্বিক দ্বিপদী প্রভৃতি বদ্ধ কলাগোনা, অক্ষরগোনা ও সিলেবল্‌গোনা এই তিন পদ্ধতিতেই রচিত হতে পারে। দ্রষ্টব্য 'চৌপদী', 'দ্বিপদী' ও 'পয়ার'।

অক্ষরগোনা ত্রিপদীর দৃষ্টান্ত আছে ১২ এবং ৩৩ পৃষ্ঠায়। উভয়ত্রই তৃতীয় পদে দুই মাত্রা করে বেশি আছে। কিন্তু ১১৯ পৃষ্ঠার 'চেয়ে থাকে মুখপানে' ইত্যাদি দৃষ্টান্তটিতে তৃতীয় পদে দুই মাত্রা কম। এই দুই নিয়মই সুপ্রচলিত। রবীন্দ্রনাথ মনে করেন সারদামঙ্গল কাব্যের ছন্দও ত্রিপদী (পৃ ১৭৮)। বস্তুত তা নয়। ত্রিপদীর ভঙ্গিতে লিখিত হলেও আসলে ওই ছন্দের প্রতিপংক্তিতে আছে চার পদ। তৃতীয় লাইনটা দ্বিপদী, আট মাত্রার পরে পদচ্ছেদ অর্থাৎ অর্ধযতি সুস্পষ্ট। প্রথম দুই পদের সঙ্গে তৃতীয় পদের মিল নেই বলে তৃতীয় ও চতুর্থ পদ এক লাইনে লিখিত হয়েছে। কিন্তু মিল না থাকলেও ওই যতিটি ঠিকই আছে। যেখানে আকস্মিকভাবে মিল এসে গেছে সেখানে ওই পদবিভাগ সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে না। দৃষ্টান্ত এই (পৃ ১৭৭)।—

কি বলেছি অভিমানে
শুনো না শুনো না কানে,
বেদনা দিও না প্রাণে
ব্যথার সময়।

দণ্ডকল (পৃ ১০৯)—এই ছন্দে প্রতিপাদে বত্রিশ কলামাত্রা থাকে। প্রাকৃতপৈঙ্গলে এই বত্রিশ মাত্রার সমাবেশরীতি সম্বন্ধে কোনো স্পষ্ট নির্দেশ নেই। তবে এই ছন্দের পরিচয় ও দৃষ্টান্ত দেওয়া উপলক্ষ্যে যে দুটি রচনা পাওয়া যায় তার থেকে মনে হয় প্রতিপংক্তির প্রথম দুই মাত্রা আড়ে থাকবে, অর্থাৎ প্রতিপংক্তির গোড়াতেই একটি করে দুই মাত্রার অতিপর্ব থাকা চাই, আর প্রতিপংক্তির শেষ ধ্বনিটি গুরু অর্থাৎ দ্বিমাত্রক হওয়া চাই। 'কুংতঅরু'র (পৃ ১০৯) কুং এবং 'কুঞ্জপথে'র (পৃ ১১০) কুঞ্, এই দুটিকে অতিপর্ব বলে গণ্য করলেই এ ছন্দের আসল রূপ পরিস্ফুট হবে। রবীন্দ্ররচিত দৃষ্টান্তটিকে যদি এভাবে রূপান্তরিত করে দেওয়া যায়—

আজি জ্যোৎস্নাহসিত রাতে
মল্লিকা-মালা হাতে
চলিয়াছে সখীসাথে
কুঞ্জপথে-।

তা হলেই দণ্ডকল ছন্দের প্রকৃতি অব্যাহত থাকবে। এখানে অতিপর্ব সহ বত্রিশ মাত্রা গণনীয়। সুতরাং দণ্ডকল ছন্দের ভাগগুলি অসমান বলে মনে করা যায় না।

দল (পৃ ১০৯)—প্রাকৃতপৈঙ্গলের টীকায় এই শব্দটি পূর্ণযতির বিভাগ অর্থাৎ পংক্তি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এই অর্থে 'দল' শব্দটির প্রয়োগ প্রায় দেখা যায় না। বস্তুত এটি পারিভাষিক শব্দ নয়।

দল শব্দের একটি অর্থ পাপড়ি। যেমন— ফুলের দল, শতদল কমল। এরই সাদৃশ্যে কথাটিকে শব্দপর্ব বা সিলেব্‌ল্ অর্থে পারিভাষিক শব্দ হিসাবে স্বীকার করে নিলে সুবিধা হয়। তা হলে সিলেব্‌ল্‌গোনা (syllabic) ছন্দকে সহজেই 'দলমাত্রিক' ছন্দ বলে বর্ণনা করা যায়। তেমনি দুই সিলেব্‌ল্ ও তিন সিলেব্‌ল্ -এর শব্দকেও অনায়াসেই

দ্বিদল ও ত্রিদল শব্দ বলে পরিচিত করা যায়। যেমন— ছন্‌+দ দ্বিদল শব্দ, বুদ্‌+ধি+মান্‌ ত্রিদল শব্দ। তা ছাড়া open syllableকে বলা যায় মুক্তদল (দ, ধি) এবং closed syllableকে বলা যায় রুদ্ধদল (ছন্‌, বুদ্‌, মান্‌)। অযুগ্মধ্বনি-যুগ্মধ্বনি অপেক্ষা মুক্তদল-রুদ্ধদল অধিকতর সহজবোধ্য ও নিশ্চিতার্থক। দ্রষ্টব্য 'ধ্বনি', 'যুগ্মধ্বনি' ও 'সিলেব্‌ল্‌'।

দাদরা— দ্রষ্টব্য 'তাল'।

দুইমাত্রার ছন্দ (পৃ ৩৮)—যে ছন্দের উপপর্ব বা 'চলন' দুইমাত্রা-পরিমিত তাকেই বলা হয়েছে দুইমাত্রার ছন্দ বা দ্বৈমাত্রিক ছন্দ (পৃ ৬৭)। এরই অপর নাম সমমাত্রার ছন্দ। অর্থাৎ চতুর্মাত্রপর্বিক ছন্দকেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন দুইমাত্রার ছন্দ। এই ছন্দেই অমিত্রাক্ষরের প্রবহমানতা স্বাভাবিক (পৃ ১৫৪)। দ্রষ্টব্য 'সমমাত্রার ছন্দ'।

দ্বাদশাক্ষর ছন্দ (পৃ ২২৬)—এটি পারিভাষিক নাম নয়। যে ছন্দোবন্ধের প্রতিলাইনে বারটি করে অক্ষরমাত্রা থাকে, তাকেই রবীন্দ্রনাথ দ্বাদশাক্ষর বলে বর্ণনা করেছেন। পয়ারের প্রতিলাইনে থাকে চোদ্দ অক্ষর। তারই তুলনায় একে বলা হয়েছে দ্বাদশাক্ষর। ২২৭ পৃষ্ঠায় যে দৃষ্টান্তটি উদ্‌ধৃত হয়েছে সেটিকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, এর প্রত্যেক লাইনে আছে দুটি করে ছয় মাত্রার পর্ব। যেমন—

সে প্রভামণ্ডলী | মাঝে সমুজ্জ্বলা।

এ-রকম ছয়মাত্রা-পর্বের ছন্দে অযুক্তযুক্তনির্বিশেষে অক্ষরমাত্রার প্রয়োগ রবীন্দ্রনাথের কানকে পীড়া দিত। তাই তিনি বলেছেন, এ-রকম ছন্দে 'প্রত্যেক যুক্ত অক্ষরে রসনা বাধা প্রাপ্ত হয়' (পৃ ২২৭)। সেইজন্য তিনি নিজেও এককালে 'তিনমাত্রামূলক' অর্থাৎ ছয়মাত্রা-পর্বের ছন্দে যুক্তাক্ষর বর্জন করে চলতেন (পৃ ৬৬, ১২৫)। পরবর্তী কালে মানসী রচনার সময়ে যখন তিনি এইজাতীয় ছন্দে অক্ষরমাত্রার পরিবর্তে

কলামাত্রা গণনার রীতি প্রবর্তন করেন, তখন আর 'দ্বাদশাক্ষর'-শ্রেণীর ছন্দে যুক্তাক্ষর প্রয়োগে বাধা রইল না (পৃ ৫, ৬৭, ১২৫)। ফলে মানসী রচনার সময় থেকে বাংলা সাহিত্যে ছয়মাত্রা-পর্বের ছন্দে অক্ষরমাত্রা গণনার রীতি অর্থাৎ যুগ্মধ্বনি বা রুদ্ধদলকে সংকুচিত করে একমাত্রা বলে গণনার রীতি অচল হয়ে গিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের মতে আজকাল এই রীতির ছন্দে রুদ্ধদলের সংকোচন ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ বা অত্যাচার (পৃ ৫৪, ১২৪, ২১৪)। কড়ি ও কোমল কাব্যের 'বিরহ' এবং মানসী কাব্যের 'ভুলভাঙা', এই দুটি কবিতা রচনার সময় (১৮৮৭) থেকেই রবীন্দ্রনাথ ছয়মাত্রা-পর্বের ছন্দে সংকুচিত রুদ্ধদলের প্রয়োগ বর্জন করেন। এইজাতীয় ছন্দে উক্তপ্রকার ধ্বনিসংকোচের ফলেই 'প্রত্যেক যুক্ত অক্ষরে রসনা বাধা প্রাপ্ত হয়'। তাই তাঁর মতে দ্বাদশাক্ষর-জাতীয় ছন্দে যুক্তাক্ষর (শব্দের মধ্য- ও অন্ত-স্থিত) ব্যবহার 'অত্যাচার' অর্থাৎ 'ছন্দোভঙ্গ' (পৃ ১৭৮) বলেই গণ্য।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, তিনি দায়ে পড়ে একটিমাত্র রচনায় এ-রকম অত্যাচার করেছেন অর্থাৎ ছয়মাত্রা-পর্বের ছন্দে যুগ্মধ্বনি বা রুদ্ধদলকে সংকুচিত করে এক য়ুনিট বা কলামাত্রা বলে গণ্য করেছেন (পৃ ১২৪-২৫, ২১৪-১৫)। যথা—

প্রভু বুদ্ধ লাগি | আমি ভিক্ষা মাগি।

বস্তুত 'বিরহ' এবং 'ভুলভাঙা' রচনার (১৮৮৭) পরবর্তী কালেও রবীন্দ্রসাহিত্যে এ-রকম রচনার আরও দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া প্রয়োজন। প্রথমত, মানসী কাব্যেরই কোনো কোনো রচনাতে এ-রকম ব্যতিক্রমের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। যেমন, 'নববঙ্গ-দম্পতির প্রেমালাপ' কবিতাটিতে (১৮৮৮) আছে—

বসন্ত কি নাই | বনলক্ষ্মী তাই |
কাঁদিছে আকুল | স্বরে ?

অতঃপর চিত্রা কাব্যের 'দুঃসময়'-নামক কবিতাটি (১৮৯৪) উল্লেখযোগ্য। এর প্রথম দুই লাইন এই।—

বিলম্বে এসেছ | রুদ্ধ এবে দ্বার,
জনশূন্য পথ | রাত্রি অন্ধকার।

—দুঃসময়, চিত্রা (রচনাবলী ৪)

'কথা' কাব্যের 'প্রভু বুদ্ধ লাগি' ইত্যাদি পূর্বোল্লিখিত কবিতাটি (শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা, ১৮৯৭) 'দুঃসময়' রচনায় পরবর্তী। 'কাহিনী' গ্রন্থের 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা' নাটিকাটিতেও (১৮৯৭) কিছু কিছু ব্যতিক্রমের দৃষ্টান্ত আছে। যথা—

মরেওনি বটে | জন্মেওনি কভু।…
খবর্দার কেউ | নোড়ো চোড়ো নাকো।

এগুলিকে দ্বাদশাক্ষর ছন্দের পর্যায়ভুক্ত করা যায় না। বস্তুত এগুলি মাত্রাবৃত্ত বা কলাগোনা ছয়মাত্রা-পর্ব ছন্দের ব্যতিক্রম মাত্র। অতঃপর এ প্রসঙ্গে নৈবেদ্য কাব্যের (১৯০১) প্রথম কবিতাটির উল্লেখ করা যেতে পারে। যথা—

তোমার বিচিত্র | এ ভবসংসারে |
কর্মপারাবার | পারে হে,
নিখিল জগৎ | জনের মাঝারে |
দাঁড়াব তোমারি | সম্মুখে।

এটিও ছয়মাত্রা-পর্বের ছন্দ। অথচ এখানে যুগ্মধ্বনি বা রুদ্ধদলকে সংকুচিত করে এক কলামাত্রা বলে গণ্য করা হয়েছে। ফলে এ সব রচনা পড়বার সময় যুক্তাক্ষরগুলিতে রসনা বাধা প্রাপ্ত হয়। এইজন্যই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'তখন ছন্দের সদর রাস্তাও গ্রাম্য রাস্তার মতো এবড়ো-খেবড়ো থাকত, অভ্যাসের গতিকে কেউ সেটাকে নিন্দনীয় বলে মনেও করেনি' (পৃ ৬৬)।

দ্বিপদী—যে ছন্দোবন্ধের প্রতিপংক্তিতে পদসংখ্যা অর্থাৎ অর্ধযতির বিভাগসংখ্যা দুই, তাকেই বলা যায় দ্বিপদী। ত্রিপদী-চৌপদীর ন্যায় দ্বিপদীও প্রকৃতিভেদে ত্রিবিধ : সাধু ছন্দের অক্ষরগোনা, প্রাকৃত-বাংলার সিলেব্‌ল্‌গোনা এবং মাত্রাবৃত্তের কলাগোনা।

দ্বিপদীরই প্রকারবিশেষের প্রচলিত নাম পয়ার। যে দ্বিপদীর প্রথম পদে আট এবং দ্বিতীয় পদে ছয় মাত্রা, তাকেই বলা হয় পয়ার। পয়ারের প্রথম পদে দুই পর্ব এবং দ্বিতীয় পদে দেড় পর্ব ; প্রতিপর্বে চার মাত্রা এবং প্রতিউপপর্বে দুই মাত্রা। এইজন্যই রবীন্দ্রপরিভাষায় পয়ারকে সমমাত্রার ছন্দ, দুইবর্গ-মাত্রার ছন্দ, দ্বৈমাত্রিক ভূমিকার ছন্দ ইত্যাদি নাম দেওয়া হয়েছে।

পয়ার অক্ষরগোনা, সিলেব্‌ল্‌গোনা ও কলাগোনা, এই তিন রকমই হতে পারে। দ্রষ্টব্য 'পয়ার'।

যে-সব দ্বিপদী দুইমাত্রা-উপপর্ব নিয়ে গঠিত নয়, তাদের শুধু কলাগোনা রূপই হয়, অন্য রূপ আজকাল স্বীকৃত হয় না।

সকল : বেলা | কাটিয়া : গেল ||
বিকাল : নাহি ׀ যায়।

দুই ছত্রে লেখা হলেও এখানে ছন্দের পংক্তি একটাই (পৃ ১০৭-০৮)। পংক্তিটা দ্বিপদী ; প্রত্যেক পদ তিন-দুই মাত্রার বিষম পর্ব নিয়ে গঠিত, শেষ পদ খণ্ডিত। এ রকম ছন্দের কলাগোনা রূপই চলে, অক্ষরগোনা কিংবা সিলেব্‌ল্‌গোনা রূপ অচল।

আরএকটা দৃষ্টান্ত (পৃ ৭১) এই।—

তরণী বেয়ে শেষে | এসেছি ভাঙা ঘাটে।

এটা তিন-দুই-দুই মাত্রার বিষমপর্বিক একপদী। এরও অক্ষরগোনা রূপ অচল। যেমন—

সায়াহ্ন অন্ধকারে | এসেছি ভগ্ন ঘাটে।

রবীন্দ্রনাথ বলেন, এর কোমর ভেঙে গেছে (পৃ ৭২)। এর কারণ অসম- ও বিষম-পর্বিক ছন্দের 'শোষণশক্তি' অর্থাৎ সংকোচনক্ষমতা নেই। কিন্তু এসব ছন্দ যে যুগ্মধ্বনিকেই সইতে পারে না তা নয়। তার দৃষ্টান্তও রবীন্দ্রনাথ দিয়েছেন (পৃ ৭২)।—

অন্ধ রাতে যবে | বন্ধ হল দ্বার।

এখানে যুগ্মধ্বনিগুলি সংকুচিত না হয়ে সম্প্রসারিতই হয়েছে।

দ্বিপদী শব্দটি রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার করেন :নি। অবশ্য এক স্থানে (পৃ ১১৮) ওই শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, কিন্তু পারিভাষিক অর্থে নয়।

ধামার—দ্রষ্টব্য 'তাল'।

ধ্বনি (পৃ ৫৩)—অপারিভাষিক অর্থে ধ্বনি মানে স্বর বা রব। যেমন—কুহুধ্বনি, ধ্বনিমাধুর্য। ছন্দশাস্ত্রের পরিভাষায় ধ্বনি মানে সিলেব্‌ল্‌ অর্থাৎ একপ্রযত্নোচ্চারিত শব্দাংশ (পৃ ৫৩, ৭৪, ৯০)। র+বীন্‌+দ্র শব্দে তিনটি ধ্বনি বা সিলেব্‌ল্‌। ছন্দের আলোচনায় ধ্বনি শব্দটি যখন লঘু, গুরু, অযুগ্ম, যুগ্ম প্রভৃতি বিশেষণাধীন অথবা গণনীয় বিষয় হয়, তখনই এটি সিলেব্‌ল্‌ অর্থে স্বীকার্য। আকৃতিভেদে ধ্বনি দ্বিবিধ, অযুগ্ম এবং যুগ্ম। দৈ, বৌ, দুই্‌, ঢেউ্‌ প্রভৃতি রুদ্ধস্বরান্ত এবং জল্‌, তান্‌, দিন্‌, কুল্‌, শেষ্‌ প্রভৃতি ব্যঞ্জনান্ত ধ্বনিকে বলা যায় যুগ্মধ্বনি (closed syllable) এবং মা, কি, সু, সে, দো প্রভৃতি মুক্তস্বরান্ত ধ্বনিকে বলা যায় অযুগ্মধ্বনি (open syllable)। 'সৌভাগ্য' শব্দে সৌ এবং ভাগ্‌ যুগ্মধ্বনি, গ্য অযুগ্ম-ধ্বনি। সুতরাং 'যুগ্মধ্বনি' শব্দটার পরিবর্তে শুধু 'সিলেব্‌ল্‌' শব্দ ব্যবহার করাই যথেষ্ট নয় (পৃ ৫৩)। দ্রষ্টব্য 'দল'।

পংক্তি (পৃ ১৫৩)—অপারিভাষিক অর্থে পংক্তি মানে লাইন বা ছত্র (পৃ ১০৭)। পারিভাষিক অর্থে অপ্রবহমান বন্ধের পূর্ণযতি-বিভাগের নাম পংক্তি।

প্রবহমান বন্ধেও অপ্রবহমান বন্ধের নির্দিষ্ট পূর্ণযতি-বিভাগকেই

পংক্তি বলা হয় (পৃ ১২২)। অর্থাৎ প্রবহমান বন্ধে পূর্ণযতির বিভাগকে পংক্তি বলা হয় না, কেননা ভাবের প্রয়োজনে পূর্ণযতিনির্দিষ্ট পংক্তি-সীমাকে অতিক্রম করে যাওয়াই এই বন্ধের বৈশিষ্ট্য। এইজন্যই প্রবহমানতার নাম দেওয়া হয়েছে পংক্তিলজ্ঘন (পৃ ১৫৬)। এই বৈশিষ্ট্যের কথা স্মরণ করেই রবীন্দ্রনাথ অমিত্রাক্ষর ছন্দকে পংক্তিলজ্ঘক নামে অভিহিত করেছেন।

পংক্তি বোঝাতে রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন স্থলে বিভিন্ন শব্দ ব্যবহার করেছেন। যথা— অবয়ব, চাল, পদ, প্রদক্ষিণ, রূপকল্প।

পদ—পারিভাষিক অর্থে পদ মানে অর্ধযতিনির্দিষ্ট ছন্দোবিভাগ। দ্বিপদী, ত্রিপদী, চৌপদী প্রভৃতি শব্দে পদ কথাটি পারিভাষিক অর্থেই প্রযুক্ত হয়। পয়ার ছন্দের প্রতিপংক্তি অর্ধযতির দ্বারা দুই পদে বিভক্ত (পৃ ১০)। অর্থাৎ পয়ারপংক্তি হচ্ছে আসলে দ্বিপদী। ত্রিপদীর প্রতি-পংক্তি তিন পদে বিভক্ত (পৃ ১২)। চৌপদীতে চার পদ (পৃ ১১)। 'প্রথম শীতের মাসে···হি হি করে কাঁপে গাত্র' এই পংক্তিটিকে 'আট মাত্রার ঝোঁক' দিয়েই পড়া যাক আর 'ছয় মাত্রার কায়দায়'ই পড়া যাক, এই পংক্তিটি যে চৌপদী তাতে সন্দেহ নেই; কারণ উভয় রীতিতেই এটি তিনটি অর্ধযতির দ্বারা চার ভাগে বিভক্ত হয়। এই প্রসঙ্গে সহজপাঠ প্রথম ভাগের একটি কবিতার (সপ্তম পাঠ) ছন্দও উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'এ ছন্দটি দুই মাত্রায় অথবা তিন মাত্রায় পড়া যায়'। দুই মাত্রা, যথা—

> কাল | ছিল | ডাল | খালি।
> আজ | ফুলে | যায় | ভরে।

এ হচ্ছে উপপর্ব-বিভাগ, প্রতিউপপর্বে দুই মাত্রা। অর্থাৎ আসলে এটি চতুর্মাত্রপর্বিক ছন্দ। এখানে পর্ববিভাগ না দেখিয়ে উপপর্ববিভাগ দেখানো হয়েছে। তিন মাত্রা, যথা—

কাল ছিল ডাল | খালি— ।
আজ ফুলে যায় | ভরে— ।

এ হচ্ছে পর্ববিভাগ, প্রতিপর্বে ছয় মাত্রা। অর্থাৎ এটি 'ছয় মাত্রার কায়দায়' পড়ার বিভাগ। এর প্রতিউপপর্বে তিন মাত্রা। কিন্তু এখানে উপযতি লোপ পেয়েছে। তাই দণ্ডচিহ্নের দ্বারা তিন মাত্রার উপপর্ব বিভাগ না দেখিয়ে একেবারে পর্ববিভাগই দেখানো হয়েছে। 'তিন মাত্রার তালে' পড়া আর 'ছয় মাত্রার কায়দায়' পড়া মূলত একই। তিন মাত্রার উপপর্ব নিয়েই ছয় মাত্রার পর্ব গঠিত হয়।

প্রথম : শীতের | মাসে— ।
শিশির : লাগিল | ঘাসে— ।

এ হচ্ছে উপপর্ব-বিভাগ। এখানে উপযতি লোপ পায়নি (পৃ ১১)।

এই প্রসঙ্গে 'নটরাজ' কাব্যের (১৯৩১) 'মনের মানুষ' কবিতাটিও স্মরণীয়। গ্রন্থের পাদটীকায় কবি স্বয়ং এই কবিতাটির ছন্দোবিশ্লেষ করেছেন এভাবে।— "এই ছন্দ চৌপদীজাতীয় নহে। ইহার যতিবিভাগ নিম্নলিখিতরূপে—

কত না দিনের | দেখা
কত না রূপের | মাঝে।
সে কার বিহনে | একা
মন লাগে নাই | কাজে ॥"

অর্থাৎ এটিকে চার মাত্রার কায়দায় পড়তে হবে না, ছয় মাত্রার কায়দায় পড়াই কবির অভিপ্রেত। চিহ্নযোগে দেখানো না হলেও এর তিনমাত্রা-উপপর্বের বিভাগ সহজেই বোঝা যায়। চতুর্থ লাইনে এই বিভাগ কানে লাগে না। কারণ এখানে উপযতি লুপ্ত হয়েছে।

অপারিভাষিক অর্থে পদ মানে পূর্ণযতিনির্দিষ্ট ছন্দোবিভাগ অর্থাৎ পংক্তি। যেমন—চতুর্দশপদী কবিতা। রবীন্দ্রনাথ এই অর্থেই পদ

শব্দটির প্রয়োগ করেছেন বেশি (পৃ ৬৯-৭০, ৭৩, ১০১)। চতুর্দশপদী কবিতা মানে চোদ্দ পংক্তির কবিতা, যদিও এর প্রত্যেক পংক্তিই পারিভাষিক অর্থে দ্বিপদী। অনুরূপভাবে রবীন্দ্রনাথ চার পংক্তি বা লাইনের রচনাকে চৌপদী নামে অভিহিত করেছেন। ফাল্গুনী নাটকে এ-রকম চৌপদী রচনার অনেক দৃষ্টান্ত আছে। যথা—

যে পদ্মে লক্ষ্মীর বাস, দিন অবসানে
সেই পদ্ম মুদে দল সকলেই জানে।
গৃহ যার ফুটে আর মুদে পুনঃপুনঃ
সে লক্ষ্মীরে ত্যাগ করো, শুন, মূঢ়, শুন ॥

পারিভাষিক অর্থে এটিকে চৌপদী বলা চলে না। অপারিভাষিক অর্থে এই 'রচনা'টিকে চৌপদী বলা যেতে পারে, কিন্তু ছন্দের বিচারে এর প্রতি পংক্তিই দ্বিপদী।

কোনো কোনো স্থলে পর্ব এবং অন্যত্র উপপর্ব অর্থেও পদ শব্দ প্রযুক্ত হয়েছে। যেমন—'কাঁপিলে : পাতা | নড়িলে : পাখি' এখানে প্রত্যেকটি উপপর্ব পদ নামে অভিহিত হয়েছে (পৃ ১৪)। 'অহহ কল | -য়ামি বল | -য়াদিমণি | -ভূষণং' এই দৃষ্টান্তটির প্রত্যেক পর্ব (পাঁচ মাত্রার) পদ নামে বর্ণিত হয়েছে (পৃ ৪০)। পয়ারের পর্বকে কোথাও বলা হয়েছে 'পদক্ষেপ' (পৃ ৩৫), আবার অন্যত্র পয়ারের পদকেই 'পদক্ষেপ' বলা হয়েছে (পৃ ৪১)।

সংস্কৃতে শ্লোকের একচতুর্থাংশকে পাদ বা পদ বলা হয়। 'চরণ' পদের প্রতিশব্দ। এই হিসাবে উক্ত চতুর্থাংশ বোঝাতে চরণ শব্দও ব্যবহৃত হয়। পদ ও চরণ কখনও বিভিন্নার্থে প্রযুক্ত হয় না। বাংলায় পংক্তি অর্থে পদ শব্দের ন্যায় চরণ শব্দের প্রয়োগও দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথ ছন্দ-আলোচনায় কোনো অর্থেই চরণ শব্দ ব্যবহার করেন নি। পংক্তি

অর্থাৎ পূর্ণযতির বিভাগ বোঝাতে তিনি সাধারণত পদ শব্দই ব্যবহার করেছেন (পৃ ১০৩, ১০৭)।

পদ ও চরণ এই দুটি সমার্থক শব্দকে বিভিন্নার্থে প্রয়োগ করা সংগত নয়। আর, পদ শব্দটিকেও একই সঙ্গে অর্ধযতির বিভাগ ও পূর্ণযতির বিভাগ এই দুই অর্থে ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয় নয়। ত্রিপদী চৌপদী প্রভৃতি সর্বস্বীকৃত পারিভাষিক কথায় পদ শব্দের যা অর্থ, তাই স্বীকার্য।

পয়ার (পৃ৭০-৭১)—যে ছন্দোবন্ধের পংক্তি আট মাত্রা ও ছয় মাত্রার দুই পদ নিয়ে গঠিত তার প্রচলিত পারিভাষিক নাম পয়ার। পয়ার-পংক্তি দ্বিপদী, আট মাত্রার পরে অর্ধযতি। আধুনিক কালে আট ও দশ মাত্রার দীর্ঘ পয়ার রচনার রীতি দেখা দিয়েছে (পৃ ৪৬, ৬৯)। দ্বিজেন্দ্রনাথের স্বপ্নপ্রয়াণ কাব্যে (১৮৭৫) এই দীর্ঘ দ্বিপদীর প্রয়োগ দেখা যায়। কিন্তু আঠার মাত্রার 'মহাপয়ার' অর্থাৎ দীর্ঘ দ্বিপদী 'দ্বিজেন্দ্রনাথের সৃষ্টি' (পৃ ১২০) এবং স্বপ্নপ্রয়াণেই 'এর প্রথম প্রবর্তন দেখা গেছে' (পৃ ৪৬), এ কথা স্বীকার্য নয়। রঙ্গলালের পদ্মিনী--উপাখ্যান কাব্যেও (১৮৫৮) এই মহাপয়ারের দৃষ্টান্ত আছে। রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত এই ছন্দ রচনার প্রবর্তনা পেয়েছিলেন স্বপ্নপ্রয়াণ থেকেই এবং তিনিই এটিকে সুপ্রচলিত করেছেন।

প্রকৃতিভেদে পয়ার ত্রিবিধ। প্রথম, সাধু ছন্দের 'অক্ষরগোনা' পয়ার। দৃষ্টান্ত—সতত হে নদ তুমি ইত্যাদি (পৃ ১৪২)। এই অক্ষরগোনা পয়ারের বহু দৃষ্টান্ত আছে গ্রন্থের নানা অধ্যায়ে। এ ছন্দে এক 'অক্ষরে' এক মাত্রা ধরা হয়। দ্বিতীয়, ছড়া বা লোকসাহিত্যের 'মাত্রাগোনা' পয়ার। দৃষ্টান্ত—এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা ইত্যাদি (পৃ ১৪৩)। এ ছন্দে প্রত্যেক সিলেব্‌লকেই এক মাত্রা বলে গণ্য করা হয়। শব্দের হসন্ত বর্ণকে বাদ দিয়ে গণনা করলে তার সিলেব্‌ল্‌-সংখ্যাই পাওয়া যায়। 'এপার্‌' শব্দে দুই সিলেব্‌ল্‌, সুতরাং দুই মাত্রা। এটাই লৌকিক

ছন্দের রীতি। পলাতকার ছন্দকেও রবীন্দ্রনাথ লৌকিক রীতির পয়ার বলেই মনে করেন, যদিও তা 'বেড়াভাঙা' অর্থাৎ অসমপংক্তিক ও প্রবহমান (পৃ ১৫৭)। আঠার মাত্রায় লৌকিক দীর্ঘপয়ারের দৃষ্টান্তও আছে। এই দীর্ঘপয়ার প্রবহমান ও অপ্রবহমান দুই-ই হতে পারে (পৃ ১৮৮)। তৃতীয়, মাত্রাবৃত্ত (পৃ ১৩২ পাদটীকা ৫) বা কলাগোনা পয়ার। এ ছন্দে এক কলায় এক মাত্রা ধরা হয়। অযুগ্মধ্বনিতে এক কলা, যুগ্মধ্বনিতে দুই কলা। মানসী কাব্যের 'নিষ্ফল উপহার' কবিতাটি মাত্রাবৃত্ত পয়ারের প্রথম দৃষ্টান্ত—'নিম্নে যমুনা বহে' ইত্যাদি (পৃ ১৮১ এবং পাদটীকা)। অনতিকাল পরেই রবীন্দ্রনাথ এই নূতন রীতির পয়ার রচনা ত্যাগ করেন (পৃ ৬৭) এবং উক্ত 'নিষ্ফল উপহার' কবিতাটিকে 'নিম্নে আবর্তিয়া ছুটে যমুনার জল' ইত্যাদি রূপে সাধু বা অক্ষরগোনা পয়ারে পরিবর্তিত করেন (পৃ ১২৩)। সম্ভবত তিনি মাত্রাবৃত্ত পয়ার রচনায় তৃপ্তিলাভ করতে পারেন নি। আরও পরবর্তী কালে কিন্তু তিনি মাত্রাবৃত্ত রীতিতে বহু পয়ার রচনা করেছেন (পৃ ৭৮)। পরবর্তিকালীন মাত্রাবৃত্ত পয়ারের একটি দৃষ্টান্ত এই।—

> সূর্য চলেন ধীরে সন্ন্যাসী-বেশে
> পশ্চিম নদীতীরে সন্ধ্যার দেশে
> বনপথে প্রান্তরে লুণ্ঠিত করি
> গৈরিক গোধূলির ম্লান উত্তরী।
>
> —তপস্যা, পাঠপ্রচয় চতুর্থ ভাগ

পয়ারের ন্যায় ত্রিপদী-চৌপদীও সাধু, লৌকিক ও মাত্রাবৃত্ত -ভেদে ত্রিবিধ। দ্রষ্টব্য 'মালঝাঁপ'।

পয়ারজাতীয় ছন্দ (পৃ ৬৬-৬৭)—রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেন সাধু, সমমাত্রার বা দুইমাত্রার ছন্দ তাকেই বলেছেন পয়ারজাতীয়, পয়ারশ্রেণীয় (পৃ ১১৮) বা পয়ারসম্প্রদায় (পৃ ৬৭)। এই বর্গের

ছন্দকেই বলা হয় অক্ষরবৃত্ত বা অক্ষরগোনা (পৃ ১৪২); প্রচলিত মতে অক্ষরসংখ্যা অনুসারেই এ শ্রেণীর ছন্দের মাত্রাগণনা করা হয়।

অক্ষরবৃত্ত নামের মতো পয়ারজাতীয় নামটিও সমীচীন নয়। কেননা বাংলা ছন্দের তিন শাখাতেই পয়ার রচনা সুপ্রচলিত। ত্রিবিধ পয়ারের কথা পূর্বেই বলা হয়েছে।

এই পয়ারজাতীয় ছন্দের বিশেষত্ব হচ্ছে তার শোষণশক্তি (পৃ ৩৮) বা স্থিতিস্থাপকতা (পৃ ১২১)। এ কথার অর্থ এই যে, এ রীতির ছন্দে ব্যঞ্জনান্ত যুগ্মধ্বনিকে প্রায় সর্বত্রই সংকুচিত করে এক মাত্রায় পরিণত করা হয়, ফলে যথেচ্ছভাবে যুক্তাক্ষরবহুল শব্দপ্রয়োগ করলেও মাত্রাবৃদ্ধি দোষ ঘটে না। বলা প্রয়োজন যে, এ রীতির ছন্দে শব্দের অন্তস্থিত যুগ্মধ্বনির সংকোচন হয় না।

পর্ব (পৃ ৯৪)—পংক্তির লঘুযতিনির্দিষ্ট বিভাগকে বলা হয় পর্ব। পর্বই ছন্দের প্রধান নির্ভর। পর্বের প্রকৃতি, আকৃতি ও সমাবেশপদ্ধতির দ্বারাই ছন্দের রূপ ও অবয়ব নিয়ন্ত্রিত হয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ পর্বের চেয়ে উপপর্বকেই ছন্দের প্রধান অবলম্বন মনে করতেন। তাই তিনি সমস্ত বাংলা ছন্দকে সম, অসম ও বিষম এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন (পৃ ১৫)। সমমাত্রার ছন্দ মানে দুইমাত্রা-উপপর্বের ছন্দ; অসমমাত্রার ছন্দ মানে তিনমাত্রা-উপপর্বের ছন্দ; আর, যে ছন্দের পর্ব তিনমাত্রা- ও দুইমাত্রা-উপপর্বের সমবায়ে গঠিত তাকেই বলেছেন বিষমমাত্রার ছন্দ। উপপর্ব বোঝাতে রবীন্দ্রনাথ কখনও ব্যবহার করেছেন 'চলন' (পৃ ৩৫) এবং কখনও ব্যবহার করেছেন 'ভূমিকা' (পৃ ৫৪)। ত্রৈমাত্রিক ভূমিকা মানে তিন মাত্রার উপপর্ব।

উপপর্বকে ছন্দের প্রধান অবলম্বন মনে করলেও রবীন্দ্রনাথ পর্ব-বিভাগকে অস্বীকার করেননি। যখন তিনি বলেন পাঁচ মাত্রার ছন্দ (পৃ ১৫), তখন পাঁচ মাত্রার পর্ব-গঠিত ছন্দই তাঁর অভিপ্রেত; ছয় মাত্রার

ছন্দ, ছয়মাত্রার কায়দা (পৃ ১১-১২) বা 'ষড়ঙ্গী' (পৃ ১০০) বলতে ছয়মাত্রা-পর্বের ছন্দ বোঝায়। পর্ব শব্দ ব্যবহার না করলেও তার প্রতিশব্দ হিসাবে রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি অপারিভাষিক শব্দ ব্যবহার করেছেন। যেমন—পা (পৃ ১১), পদক্ষেপ (পৃ ৩৪), মাত্রাভাগ (পৃ ৯২), পূর্ণভাগ (পৃ ৯৬), ভাগ (পৃ ১০০), কলা (পৃ ১০১), ধ্বনিগুচ্ছ (পৃ ১৫৩)। এক জায়গায় তিনি পর্ব শব্দটি ব্যবহার করেছেন সংস্কৃত ছন্দের যতিবিভাগ অর্থে (পৃ ১৯০)। সংস্কৃত ও প্রাকৃত ছন্দশাস্ত্রে পর্ব অর্থে 'গণ' শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। যেমন—চতুষ্কল গণ, মানে চার-কলামাত্রার পর্ব।

পর্বাঙ্গ (পৃ ৯৫)—এটি অমূল্যবাবুর ব্যবহৃত পরিভাষা। রবীন্দ্রনাথ নিজে এই শব্দটি ব্যবহার করেন নি। পর্বের উপযতি-নির্দিষ্ট উপবিভাগকে অর্থাৎ উপপর্বকেই অমূল্যবাবু বলেন পর্বাঙ্গ। রবীন্দ্রনাথ তাকে কখনও বলেছেন 'চলন', কখনও 'ভূমিকা'।

প্রদক্ষিণ (পৃ ৩৪)—ছন্দের পূর্ণযতির বিভাগ অর্থাৎ পংক্তিকেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন প্রদক্ষিণ। এ শব্দটিকে পারিভাষিক বলে মনে করা যায় না। এর অর্থেরও স্থিরতা নেই। দ্রষ্টব্য 'পংক্তি'।

প্রস্বর (accent)—ইংরেজিতে যাকে বলা হয় একসেণ্ট্, তার বাংলা অপারিভাষিক নাম ঝোঁক। এই গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ নানা প্রসঙ্গেই একসেণ্ট্ অর্থে ঝোঁক শব্দটি ব্যবহার করেছেন। যেমন, 'ইংরেজিতে প্রত্যেক শব্দেরই একটি নিজস্ব ঝোঁক আছে' (পৃ ১)। ছন্দের পরিভাষায় ঝোঁক বা একসেণ্ট্‌কে বলা যায় প্রস্বর; তাতে প্রস্বরণ, প্রস্বরিত, প্রাস্বরিক প্রভৃতি শব্দ গঠনের সুবিধা হয়।

বাংলা গদ্যে উচ্চারণের ঝোঁকটা সাধারণত বাক্যের আরম্ভে পড়ে (পৃ ১)। কিন্তু প্রয়োজনমতো 'বাক্যের পর্বে পর্বে'ও ঝোঁক দেওয়া যায়। আর "বাংলা ছন্দে যে পদবিভাগ হয় সেই প্রত্যেক পদের গোড়াতেই একটি করিয়া ঝোকালো শব্দ কাপ্তেনি করে" (পৃ ৯)।

এখানে 'পদ' শব্দ প্রয়োজনমতো পদ, পর্ব বা উপপর্ব অর্থে গ্রহণীয়। এর দৃষ্টান্ত দ্রষ্টব্য ১১-১৫ পৃষ্ঠায়। বাংলা ছন্দে যতিবিভাগের গোড়াতে যেখানে ঝোঁক পড়ে সেখানেই তালি দিতে হয় এবং তদনুসারেই ছন্দের স্পন্দন বা লয় অর্থাৎ রিদ্‌ম্‌ ধরা পড়ে (পৃ ৪২-৪৩)। তিনমাত্রার ঝোঁক (পৃ ৯৮) কথার দ্বারা বোঝা যায় তিনমাত্রা-উপপর্বের ঝোঁক।

একটা প্রচলিত ধারণা এই যে, শুধু চলতি বাংলার ছড়াজাতীয় ছন্দেই ঝোঁক বা প্রস্বরের প্রভাব দেখা যায় অর্থাৎ শুধু এইজাতীয় ছন্দকেই বলা যায় প্রাস্বরিক ছন্দ। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যে-সব দৃষ্টান্তে প্রস্বরচিহ্ন দিয়ে ঝোঁক বা তালি দেবার নিয়ম ও বৈচিত্র্য সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন, সেগুলি প্রায় সবই ছড়াজাতীয় ছন্দোরীতির বহির্বর্তী। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের মতে বাংলা ছন্দের তিন শাখাতেই ঝোঁক বা প্রস্বরের ক্রিয়া আছে এবং সর্বত্রই ছন্দের প্রত্যেক যতি-বিভাগের গোড়াতেই ঝোঁক পড়ে। 'খুব তার | বোলচাল | সাজ ফিট | ফাট' ইত্যাদি দৃষ্টান্তটি (পৃ ৭০) ছড়াজাতীয় নয়। এটি রচিত হয়েছে কলামাত্রিক ছন্দে, অথচ এ ছন্দটা যে বেশ ঝোঁকালো তাতেও কোনো সন্দেহ নেই। তবে চলতি বাংলার ছড়াজাতীয় দলমাত্রিক (syllabic) ছন্দেই প্রস্বরের প্রভাব বেশি, এ কথা রবীন্দ্রনাথের উক্তি থেকেও বোঝা যায়। 'বাংলার অসাধু ভাষাটা খুব জোরালো ভাষা' (পৃ ৬) এবং বাংলা ভাষার চলতি রীতিতেই তার 'অন্তরের স্বাভাবিক সুর' (পৃ ৭) প্রকাশ পেয়েছে, আর এ জন্যই চলতি বাংলার ছন্দকেই বলা হয়েছে 'বাংলা ভাষার স্বাভাবিক ছন্দ' (পৃ ১৭০-৭১)। "বাংলা চলতি ভাষার ধ্বনিটা হসন্তের সংঘাতধ্বনি, এই জন্য ধ্বনিহিসাবে সংস্কৃতের চেয়ে ইংরেজির সঙ্গে তাহার মিল বেশি" (পৃ ১৭, ১২৮)। ছন্দের দিক্‌ থেকেও ইংরেজির সঙ্গে চলতি বাংলা ছন্দের মিল দেখা যায় ; উভয়ত্রই 'হসন্তের সংঘাতধ্বনি'কে ছন্দের কাজে লাগানো হয়। 'কই পালঙ্ক,

কই রে কম্বল' ইত্যাদি দৃষ্টান্ত দিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "ইহার সঙ্গে Ah distinctly I remember শ্লোকটি মিলাইয়া দেখিলে দেখা যাইবে ধ্বনির বিশেষ কোনো তফাত নাই" (পৃ ১৭)। এই মিল শুধু দলবিভাজনগত নয়, প্রস্বরস্থাপনগতও বটে। উভয়ত্রই প্রস্বর বা ঝোঁক পড়েছে ছন্দোবিভাগগুলির আদিতে। কিন্তু ইংরেজি ছন্দের সঙ্গে বাংলা চলতি ছন্দের অমিলও আছে। "দেখা গিয়াছে ইংরেজি ছন্দে ঝোঁক পদের [ছন্দোবিভাগের] আরম্ভেও পড়িতে পারে, পদের শেষেও পড়িতে পারে" ; কিন্তু "বাংলায় আরম্ভে ছাড়া পদের আর কোথাও ঝোঁক পড়িতে পারে না" (পৃ ১৯)।

প্রাকৃত-বাংলার ছন্দ—দ্রষ্টব্য 'শাখা'।

ফাঁক (পৃ ১০)—এটি একটি অপারিভাষিক শব্দ। রবীন্দ্রনাথ এ শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করেছেন। এক জায়গায় এটি ব্যবহৃত হয়েছে ছেদ বা যতি অর্থে (পৃ ৯৪)। কোনো কোনো স্থলে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে মাত্রাসংযোগের অবকাশ অর্থে (পৃ ১০)। যেমন—

মহাভারতের কথা | অমৃতসমান --।

এই পয়ারপংক্তিটার প্রথম পদে আট মাত্রা এবং দ্বিতীয় পদে ছয় মাত্রা গণনা করাই সাধারণ রীতি। রবীন্দ্রনাথও তাই করেন (পৃ ৭১, ১৪৩)। কিন্তু তিনি কখনও কখনও পয়ারে চোদ্দ মাত্রা গণনা না করে ষোল মাত্রাও ধরেছেন। সে ক্ষেত্রে তিনি চোদ্দটি শ্রুতমাত্রার পরে পূর্ণযতির স্থলে আরও দুটি অশ্রুতমাত্রা আছে বলে ধরে নেন ; চোদ্দটি শ্রুত-মাত্রাকে বলেছেন 'উচ্চারিত মাত্রা' বা 'ধ্বনির মাত্রা' এবং দুটি অশ্রুতমাত্রাকে বলেছেন 'অনুচ্চারিত মাত্রা' বা 'যতির মাত্রা' (পৃ ৪১,৪৬, ১১৮)। এই যতির মাত্রার অবকাশকেই বলেছেন ফাঁক। পয়ারে শুধু পূর্ণযতির স্থলে নয়, অর্ধযতির স্থলে এবং অন্যত্রও দুই মাত্রার ফাঁক রাখা সম্ভব বলে তিনি মনে করেন (পৃ ১২০)।

গানে যতিমাত্রার হিসাব রাখা হয়। কারণ, "সুরের বিরাম হয়, কিন্তু কালের বিরাম হয় না। যেমন সুরের মাত্রা আছে, সেইরূপ বিরামেরও মাত্রা আছে" (জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর-প্রণীত স্বরলিপি-গীতিমালা, প্রথম খণ্ড, তৃতীয় সং, পৃ ৭)। গানে অবিরত-বিরত-নির্বিশেষে সমগ্র গীতকালের হিসাব রাখার প্রয়োজন আছে। কাব্যছন্দের বিচারে এ-রকম হিসাব রাখা অনাবশ্যক। বস্তুত রবীন্দ্রনাথও সর্বত্র, অর্থাৎ অমিত্রাক্ষর, ত্রিপদী, চৌপদী প্রভৃতি সমস্ত বন্ধে, পূর্ণ, অর্ধ, লঘু এবং উপ-যতির মাত্রাগণনা প্রয়োজন মনে করেন নি।

ধ্বনিসংকোচের অবকাশ অর্থেও ফাঁক শব্দটির প্রয়োগ দেখা যায় (পৃ ৩৮)। যেমন—

পাষাণ মিলায়ে যায় | গায়ের বাতাসে।

এই পয়ারপংক্তিটাতে যুগ্মধ্বনি আছে মাত্র তিনটি—ষাণ্‌ যায়্‌ য়ের্‌, এবং তিনটিই আছে শব্দের শেষে; বাকি আটটি ধ্বনিই অযুগ্ম। অযুগ্ম-ধ্বনিতে এক মাত্রা এবং যুগ্মধ্বনিতে দুই মাত্রা ধরে হিসাব করলে পাওয়া যাবে প্রথম পদে আট এবং দ্বিতীয় পদে ছয়, মোট চোদ্দ মাত্রা।

V Λ I V I I I V Λ V I I
সংগীত্‌ তরঙ্‌গি উঠে | অঙ্‌গের্‌ উচ্‌ছ্বাসে।

এখানেও চোদ্দ মাত্রা। হিসাবটা এই। ছয়টি অযুগ্মধ্বনিতে ('।' দণ্ড-চিহ্নযুক্ত—ত, গি, উ, ঠে, ছ্বা, সে) ছয় মাত্রা, শব্দের প্রান্তস্থ দুটি যুগ্মধ্বনিতে ('Λ' প্রসারচিহ্নযুক্ত—গীত্‌, গের্‌) চার মাত্রা এবং শব্দের অপ্রান্তস্থ চারটি যুগ্মধ্বনিতে ('V' সংকোচচিহ্নযুক্ত—সং, রঙ্‌, অঙ্‌, উচ্‌) চার মাত্রা—মোট চোদ্দ মাত্রা, প্রথম পদে আট এবং দ্বিতীয় পদে ছয়। এই দুই পংক্তির মধ্যে তুলনা করলে দেখা যাবে যে, দ্বিতীয় পংক্তিতে চারটি যুগ্মধ্বনি সংকুচিত হয়ে মাত্র চার মাত্রার স্থান পেয়েছে, এটাই এই দুই পংক্তির পার্থক্য। এই শ্রেণীর পয়ারে যুগ্মধ্বনিকে

সংকুচিত করবার এই যে অবকাশ, তাকেই বলা হয়েছে 'ফাঁক'। আর, যুগ্মধ্বনিকে একমাত্রা-পরিমাণের মধ্যে সংকুচিত করে আনবার এই যে শক্তি, তাকেই বলা হয়েছে 'শোষণশক্তি'।

এই সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, পয়ারের পদক্ষেপ যেখানে ঘন ঘন, সেখানে এই শোষণশক্তির প্রয়োগ চলে না (পৃ ১১, ৩৮)। দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেছেন, "যদি লেখা যায়

ধরিত্রীর চক্ষুনীর মুঞ্চনের ছলে
কংসারির শঙ্খরব সংসারের তলে।

তা হলে ও একটা স্বতন্ত্র ছন্দ হয়ে যায়" (পৃ ৩৯)। এই দৃষ্টান্তটিকে তিনি পাঁচমাত্রা-পর্বের মাত্রাবৃত্ত বলে ধরে নিয়েছেন, অর্থাৎ এখানে সবগুলি যুগ্মধ্বনিই প্রসারিত ও দ্বিমাত্রক। কিন্তু এটিকে সাধারণ পয়ারের কায়দায়ও পড়া যায়, অর্থাৎ শব্দের আদি- ও মধ্য-স্থিত যুগ্মধ্বনিগুলিকে সংকুচিত করে এই পংক্তিটিকে চোদ্দ মাত্রার সাধারণ পয়ার বলেও গণ্য করা যায়। রবীন্দ্রকাব্যেও তার প্রমাণ আছে।—

সমুদ্রের তরঙ্গের কলধ্বনি সম।
—মেঘদূত, মানসী

এ সুন্দর অরণ্যের পল্লবের স্তরে।
—বসুন্ধরা, সোনার তরী

দুটোই পয়ারপংক্তি, তার ঘন ঘন পদক্ষেপও সুস্পষ্ট। অবশ্য এ দুটিকে পাঁচমাত্রা-পর্বের ভঙ্গিতেও পড়া যায়। ঘন ঘন পদক্ষেপওয়ালা পয়ারও যে যুগ্মধ্বনির বোঝা সইতে পারে, এ কথা রবীন্দ্রনাথ নিজেই স্বীকার করেছেন অন্যত্র (পৃ ৬৮, ৭০)। যথা—

বেণীবন্ধ তরঙ্গিত কোন্ ছন্দ নিয়া।

এবং

তর্ক-যুদ্ধে উগ্র তেজ, শেষ যুক্তি গালি।

শুধু ধ্বনিসংকোচের অবকাশ নয়, ধ্বনিপ্রসারের অবকাশ অর্থেও ফাঁক শব্দের প্রয়োগ আছে (পৃ ৬২)। এই অর্থটা প্রাকৃত-বাংলা ছন্দের অর্থাৎ লৌকিক ছন্দের সম্পর্কেই প্রযোজ্য। রবীন্দ্রনাথ মনে করেন, এ ছন্দ হচ্ছে আসলে 'তিন মাত্রার ছন্দ।...এর প্রত্যেক পা-ফেলার লয় হচ্ছে তিনের'। অর্থাৎ তাঁর মতে এটি হচ্ছে তিনমাত্রা-উপপর্বের ছন্দ। এখানে 'পা-ফেলা' বা পদক্ষেপ মানে উপপর্ব। কিন্তু এ ছন্দে প্রতিপর্বে প্রত্যক্ষত তিন মাত্রা পাওয়া যায় না। মাঝে মাঝে মাত্রার অভাব দেখা যায়। যেমন—

বৃষ্টি | পড়ে- | টাপুর | টুপুর | নদেয় | এল- | বা-ন।

এখানে তিনটি উপপর্বে এক মাত্রা কম দেখা যায়। কিন্তু আবৃত্তির টানে ওই তিন জায়গায় স্বরধ্বনির প্রসার ঘটে, ফলে মাত্রার অভাব পূর্ণ হয়ে যায়। ধ্বনিপ্রসারের এই অবকাশকে বলা হয়েছে ফাঁক।

রবীন্দ্রনাথের মতে বাংলার প্রাকৃত ছন্দের 'প্রত্যেক' পা-ফেলার লয় হচ্ছে তিনের (পৃ ৬২)। কিন্তু অন্যত্র তার বিপরীত কথাই বলেছেন (পৃ ৬৩, ৮৫)। যেমন—

হারিয়ে-ফেলা | বাঁশি আমার | পালিয়েছিল | বুঝি
লুকোচুরির | ছলে।

এখানে প্রত্যেক উপপর্বে তিন মাত্রা গণনা করা হয় নি। এমন কি, এটিকে উপপর্বেও বিভক্ত করা হয় নি; করা হয়েছে পর্ববিভাগ। তা ছাড়া এখানে 'যতির মাত্রা'ও ধরা হয়েছে অনেকটা সাধু পয়ারের পদ্ধতিতে (পৃ ১২০)।

আমি | যদি | জন্ম | নিতেম | কালি | দাসের | কালে।

এটা উপপর্বেই বিভক্ত হয়েছে। কিন্তু প্রত্যেক উপপর্বেই তিন মাত্রা আছে বলে স্বীকৃত হয় নি (পৃ ২১৭)। সুতরাং বাংলার প্রাকৃত ছন্দকে 'তিনমাত্রার ছন্দ' বলা কঠিন। যা হক, এ ছন্দে রবীন্দ্রনাথ যে ফাঁক

অর্থাৎ ধ্বনিপ্রসার বা মাত্রাসংযোগের অবকাশ আছে বলে মনে করেন সেটুকুই লক্ষণীয়।

বাংলা লৌকিক ছন্দের এই ফাঁকগুলিকে হসন্ত বর্ণ দিয়ে অনায়াসেই পূর্ণ করা যায়। এ রকম 'বেফাঁক' লৌকিক ছন্দের দৃষ্টান্তও তিনি রচনা করে দেখিয়েছেন (পৃ ৬৪)। পূরবী কাব্যের 'বিজয়ী' কবিতাটিতেও বেফাঁক রচনার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় (পৃ ২১৭-১৮)।—

বিহঙ্গগান | শান্ত তখন | অন্ধরাতের | পক্ষছায়ে।

কিন্তু কবিতাটির সর্বত্র তার বেফাঁক প্রকৃতি বজায় থাকেনি। মহুয়া কাব্যের 'অর্ঘ্য' কবিতাটিতে লৌকিক ছন্দের বেফাঁক প্রকৃতি সর্বত্র অব্যাহত আছে। 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর' ইত্যাদি ছড়াটির 'তিন কন্যে' পর্বটাকে রবীন্দ্রনাথ যে-ভাবে বিশ্লেষণ করেছেন (পৃ ৬২), তা না করে 'তি-ন | কন্যে' এ-ভাবেও বিশ্লেষণ করা চলত। যা হক, এটিকে তিনি বেফাঁক পদ্ধতিতেও রূপান্তরিত করেছেন (পৃ ৬৩)। তার একটি পর্ব হচ্ছে 'বিয়ের বাসরে'। এই পর্বটিতে লৌকিক ছন্দের ভঙ্গি অব্যাহত আছে বলা যায় না। এ ছড়াটার আরএক রূপান্তর আছে ১৯২ পৃষ্ঠায়। সেটি সম্বন্ধেও এই মন্তব্যই প্রযোজ্য। 'শিব ঠাকুরের বিয়ের লগ্নে' লিখলে ওই ভঙ্গি বজায় থাকত। 'বিয়ের বাসরে' এবং 'শিব্ ঠাকুরের বিবাহ হচ্ছে' থাকলে এই দৃষ্টান্ত-দুটিকে লৌকিক না বলে মাত্রাবৃত্ত বলাই সংগত হবে। রামপ্রসাদের 'মা আমায় ঘুরাবি কত' ইত্যাদি গানটির যে বেফাঁক চেহারা দেখানো হয়েছে (পৃ ৬৩) তাও লৌকিক নয়, ছয়মাত্রা-পর্বের মাত্রাবৃত্ত। 'আমার সকল কাঁটা ধন্য করে' ইত্যাদি চলতি ছন্দের দৃষ্টান্তটি যে দুটি রূপে পরিবর্তিত হয়েছে (পৃ ৭), তার প্রথমটি 'মাত্রাবৃত্ত', দ্বিতীয়টি 'সাধু'। এগুলিকে বেফাঁক লৌকিক ছন্দের দৃষ্টান্ত বলা যায় না। এই প্রসঙ্গে 'টুমুস্ টুমুস্ বাদ্যি বাজে' ছড়াটাও স্মরণীয় (পৃ ২০২)।

সংগীতশাস্ত্রে ফাঁক শব্দের একটা পারিভাষিক অর্থ আছে। গানে তালের শেষ ঝোঁক বা প্রস্বরকেই বলা হয় 'ফাঁক' (পৃ ৯৮)[১]। ছন্দের আলোচনায় ফাঁকের এই পারিভাষিক অর্থ প্রযুক্ত হয় না।

বক্ত্র (পৃ ১৯৯)—অনুষ্টুপ্ বর্গের পথ্যাবক্ত্র ছন্দে প্রতিপাদের শেষ চার বর্ণের লঘুত্বগুরুত্ব নির্দিষ্ট নিয়মের অধীন, প্রথম চার বর্ণ অনিয়মিত। তাই 'অপরং ভবতো জন্ম' এবং 'বহূনি মে ব্যতীতানি', এই দুটি পদের শেষ চার বর্ণের লঘুত্বগুরুত্বক্রমে সমতা আছে, আর প্রথম চার বর্ণের বিন্যাসক্রমে সমতার অভাব ঘটেছে। দ্বিতীয়টির সঙ্গে সমতা রাখতে হলে প্রথমটির রূপ হত 'অপার ভাবতো জন্ম'। দ্রষ্টব্য 'অনুষ্টুপ্'।

বিষমমাত্রার ছন্দ (পৃ ১৫, ৩৬)—যে ছন্দের পর্ব তিন মাত্রা ও দুই মাত্রার দ্বিবিধ উপপর্ব নিয়ে গঠিত, তাকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন বিষম-মাত্রার ছন্দ। দ্রষ্টব্য 'অসমমাত্রার ছন্দ'।

তিন-দুই মাত্রার উপপর্ব নিয়ে গঠিত বিষমমাত্রার ছন্দের বিস্তার ও বৈচিত্র্য ঘটানো যেতে পারে নানা ভাবে (পৃ ১৩৩)। যথা—

শিমুল : রাঙা : রঙে | চোখেরে : দিল : ভরে।

এখানে প্রত্যেক পর্বে তিন-দুই-দুই মাত্রার তিনটি উপপর্ব।

তটের বুকে লাগে | জলের ঢেউ | তবে সে কলতান | উঠে,
বাতাসে বন-সভা | শিহরি কাঁপে | তবে সে মর্মর | ফুটে।

—গানভঙ্গ, সোনার তরী

এখানে শুধু উপপর্ব নয়, পর্বের বিষমতাও লক্ষণীয়। আরও বৈচিত্র্য আছে স্বপ্নপ্রয়াণ কাব্যে। রবীন্দ্রপরিভাষায় এ সমস্তই বিষমমাত্রার ছন্দ বলে স্বীকার্য। বিষমমাত্রা ছন্দের আরও বৈচিত্র্যের দৃষ্টান্ত আছে ৪২-৪৩

১ এটাই গানের ছন্দের মূলনিয়ম। কিন্তু অনেক তালে তার ব্যতিক্রম দেখা যায় (কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়-কৃত 'গীতসূত্রসার', তৃতীয় সং, পৃ ১৫৫)।

পৃষ্ঠায়। 'চাহিছ বারে বারে | আপনারে | ঢাকিতে', এই দৃষ্টান্তটি মানসী কাব্যের 'ছিলাম নিশিদিন | আশাহীন | প্রবাসী' ইত্যাদি 'বিরহানন্দ'-নামক রচনাটির অবিকল প্রতিরূপ। কবি মানসীতে এটির সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, "এই ছন্দে যে যে স্থানে ফাঁক, সেইখানে দীর্ঘ যতিপতন আবশ্যক"।

৩৬ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে 'দুই-তিনের যোগে বিষমমাত্রার ছন্দ'। এখানে দুই ও তিন মাত্রার চলনের যোগ বা সমাবেশের কথা বলাই অভিপ্রেত, বিন্যাসক্রমের কথা নয়। 'যতই চলে' ইত্যাদি দৃষ্টান্তটির বিন্যাসক্রম হচ্ছে তিন-দুই।

ভুজঙ্গপ্রয়াত—এটি একটি সংস্কৃত ছন্দ। এই ছন্দের প্রতিপদে লঘু-গুরু-গুরু (⏑— —) এই পর্যায়ক্রমে বিন্যস্ত বারটি বর্ণ থাকে। রবীন্দ্রনাথ এ ছন্দের নাম উল্লেখ করেন নি, কিন্তু বাংলায় সংস্কৃত ছন্দের প্রসঙ্গে ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কাব্য (শিবের দক্ষালয়যাত্রা) থেকে একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করেছেন (পৃ ৫)। যথা—

⏑ — — ⏑ — — ⏑ — — ⏑ — —
ম হারুদ্রবেশে ম হা দেব সাজে।

এখানে মূলপাঠ একটু বদলে গেছে, মূলে আছে 'মহারুদ্ররূপে'। কিন্তু তাতে ছন্দে কোনো ত্রুটি ঘটে নি।

মদিরা (পৃ ৪৭)—এটিও একটি সংস্কৃত ছন্দ। এই ছন্দের প্রত্যেক পদে আটটি করে গণ বা পর্ব থাকে। প্রত্যেক গণের প্রথমে একটি গুরুধ্বনি ও পরে দুটি লঘুধ্বনি থাকে এবং অষ্টম গণে থাকে একটি-মাত্র গুরুধ্বনি, এই হচ্ছে এ ছন্দের নিয়ম। এ ছন্দের দৃষ্টান্ত ও বিশ্লেষণ গ্রন্থমধ্যে দ্রষ্টব্য। মদিরা ছন্দের বিন্যাসক্রম (— ⏑⏑) ভুজঙ্গপ্রয়াতের বিন্যাসক্রমের (⏑ — —) বিপরীত। গ্রীক ছন্দপরিভাষায় এই দুই ছন্দের ধ্বনিবিন্যাসপদ্ধতি যথাক্রমে dactyl ও anti-Bacchic নামে পরিচিত।

মন্দাক্রান্তা (পৃ ৪৬)—এই বিখ্যাত সংস্কৃত ছন্দটির প্রতি পদে অর্থাৎ পংক্তিতে থাকে সতরটি করে 'অক্ষর' বা ধ্বনি, অর্থাৎ সিলেব্‌ল্‌। এই সতরটি ধ্বনি আবার তিনটি যতিবিভাগে বিভক্ত ; প্রথম ভাগে চার, দ্বিতীয় ভাগে ছয় এবং তৃতীয় ভাগে সাতটি ধ্বনি থাকে। প্রথম ভাগের চারটি ধ্বনিই গুরু, দ্বিতীয় ভাগে শেষ ধ্বনিটি গুরু এবং তৃতীয় ভাগে দ্বিতীয় ও পঞ্চম বাদে বাকি সব গুরু। এই হল মন্দাক্রান্তার নিয়ম। দৃষ্টান্ত (পৃ ১৯০) দিলেই সহজে বোঝা যাবে।—

মেঘালোকে | ভবতি সুখিনোঽ | প্যন্যথাবৃত্তিচেতঃ।

সংস্কৃত ছন্দশাস্ত্রকারেরা মন্দাক্রান্তার পংক্তিকে তিনটি যতিবিভাগেই বিভক্ত করেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এটিকে বিভক্ত করেন চার ভাগে (পৃ ৪৬-৪৭, ১৯০)। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং সত্যেন্দ্রনাথ দত্তও তাই করতেন। এঁরা সকলেই উল্লিখিত তৃতীয় অংশটিকে দুই যতিভাগে বিভক্ত করেন ; প্রথম ভাগে ধ্বনিসংখ্যা চার এবং দ্বিতীয় ভাগে তিন।

রবীন্দ্রনাথের মতে মন্দাক্রান্তার ধ্বনিবিভাগ চার-ছয়-চার-তিন। গুরুধ্বনিকে বিশ্লিষ্ট করে দুই মাত্রা বলে ধরলে মন্দাক্রান্তার মাত্রাবিভাগ হয় যথাক্রমে—আট-সাত-সাত-পাঁচ। রবীন্দ্রনাথের ধারণা শেষভাগে চার মাত্রা (পৃ ৪৭,১৯০) ; কেবল যতির প্রভাবে তা পাঁচ মাত্রায় পরিণত হয়। মাত্রাপরিমাণ হিসাবে মন্দাক্রান্তাকে সর্বপ্রথম বাংলায় রূপান্তরিত করেন দ্বিজেন্দ্রনাথ। যথা—

ফুল তাহে ধরিয়াছে,
লাবণ্যে ভরি' আছে,
বনেরে করিয়াছে
জীবন-দান।

—স্বপ্নপ্রয়াণ, ৩য় সং (১৯১৪), ২।১৪০

শেষভাগে পাঁচ মাত্রা। সত্যেন্দ্রনাথ-কৃত মন্দাক্রান্তার রূপান্তরেও শেষভাগে পাঁচ মাত্রা।—

ভরপুর অশ্রুর
বেদনা-ভারাতুর
মৌন কোন্ সুর
বাজায় মন।
—কুহু ও কেকা (১৯১২), যক্ষের নিবেদন

রবীন্দ্রনাথ মন্দাক্রান্তাকে মাত্রা হিসাবে বাংলায় রূপান্তরিত করেছেন তিন স্থলে। তার মধ্যে দুই স্থলেই শেষভাগে চার মাত্রা (পৃ ৯৩, ১৩৪) এবং এক স্থলে পাঁচ মাত্রা (পৃ ১৯০)।

সংস্কৃত মন্দাক্রান্তা 'অমিত্রাক্ষর', অর্থাৎ তার পংক্তিতে পংক্তিতে কিংবা ভাগে ভাগে মিল থাকে না। মিলহীন মাত্রিক বাংলা মন্দাক্রান্তার দৃষ্টান্ত দ্রষ্টব্য ১৯০ পৃষ্ঠায়।

মন্দাক্রান্তার শুধু মাত্রিক রূপ নয়, তার মূল 'আক্ষরিক' (অর্থাৎ দলমাত্রিক বা সিলেবিক) রূপের বাংলা দৃষ্টান্তও রবীন্দ্রনাথ উদ্‌ধৃত করেছেন (পৃ ৫)। যথা—

ইচ্ছা সম্যক্ ভ্রমণগমনে কিন্তু পাথেয় নাস্তি।
পায়ে শিক্লী মন উড়ু উড়ু, এ কি দৈবেরি শাস্তি!

এটির রচয়িতা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথ দুটিমাত্র পদ উদ্‌ধৃত করেছেন। তার পূর্ণ চতুষ্পদ রূপ এই।—

– – – – ◡◡◡◡◡ – – ◡ – – ◡ – –
টঙ্কাদেবী | কর যদি কৃপা | না রহে কোন জ্বালা।
বিদ্যাবুদ্ধী | কিছুই কিছু না | খালি ভস্মে ঘি ঢালা॥

ইচ্ছা সম্যক্ | ভব দরশনে | কিন্তু পাথেয় নাস্তি- ।
পায়ে শিক্লী | মন উড়ু উড়ু- | একি দৈবের শাস্তি- ॥[১]

—সুপ্রভাত, ১৩১৭ ভাদ্র, পৃ ৭৫

'কোন' 'মন' এবং 'দৈবের' শব্দের শেষ অক্ষরটির অকারান্ত উচ্চারণ করতে হবে। 'কিছুই' শব্দের ই-র স্বাতন্ত্র্যও স্বীকার্য। সংস্কৃত ছন্দ-শাস্ত্রের নিয়মে পদের অন্তস্থিত লঘুধ্বনিও ছন্দের প্রয়োজনমতো গুরু বলে স্বীকৃত হয়। তদনুসারে 'নাস্তি' এবং 'শাস্তি' শব্দের ইকার দীর্ঘরূপেই উচ্চার্য। এ সব স্থলে পূর্ণযতির প্রভাবেই তৎপূর্ববর্তী লঘুধ্বনিও গুরুত্ব লাভ করে। বাংলায় এই নিয়মটিকে প্রসারিত করে ছন্দের প্রয়োজনে যে-কোনো সুস্পষ্ট যতির পূর্ববর্তী লঘুধ্বনিকে গুরু বলে গণ্য করা চলে। তদনুসারে 'উড়ু উড়ু' শব্দের শেষ উকারটির উচ্চারণ হবে দীর্ঘ।

লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে, এই শ্লোকটিতে সংস্কৃত শাস্ত্র অনুসারে প্রতি-পংক্তি স্বাভাবিকভাবে তিন যতিভাগে বিভক্ত হয়েছে; বাংলা পদ্ধতি অনুসারে চার ভাগ হয় নি।

১ এটি রাজনারায়ণ বসু-কে লিখিত পত্ররূপে রচিত হয়। রচনাটির নাম ছিল 'দীন দ্বিজের রাজ-দর্শন না ঘটিবার কারণ'। দ্রষ্টব্য সাহিত্যসাধক-চরিতমালা ৬৩ (মাঘ ১৩৫৪), পৃ ৩৯ এবং বিশ্বভারতী-পত্রিকা, ১৩৫৯ বৈশাখ-আষাঢ়, পৃ ১৮১।

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর বাল্যস্মৃতিপ্রসঙ্গে এই রচনাটি উদ্‌ধৃত করেছেন। তাঁর উদ্‌ধৃতিতে কয়েকটি পরিবর্তন দেখা যায়। (১) শেষ দুই পদ পূর্বে এবং প্রথম দুই পদ পরে স্থাপিত হয়েছে। (২) 'কর যদি কৃপা' হয়েছে 'করে যদি কৃপা'। এই পরিবর্তনটুকু হয়েছে সম্ভবত অর্থসংগতির খাতিরে, যদিও তাতে ছন্দোগত ত্রুটি ঘটে। (৩) 'ভব দরশনে' রূপ নিয়েছে 'জগদরশনে', সম্ভবত সর্বত্র-ব্যবহার্যতার খাতিরে। এই পরিবর্তনগুলি রচয়িতারই কৃত বা অভিপ্রেত বলে মনে হয়। রবীন্দ্রনাথের উদ্‌ধৃতিতে আছে 'ভ্রমণগমনে', এটা রচয়িতার অনুমোদিত কিনা বলা কঠিন। দ্রষ্টব্য সত্যেন্দ্রনাথকৃত 'আমার বাল্যকথা'—ভারতী, ১৩১৯ ভাদ্র, পৃ ৪৫৪ এবং 'আমার বাল্যকথা ও বোম্বাইপ্রবাস' গ্রন্থ (১৯১৫), পৃ ২৮।

এই প্রসঙ্গে বলা সংগত যে, দ্বিজেন্দ্রনাথ মন্দাক্রান্তাকে রূপান্তরিত করেছেন খাঁটি সংস্কৃত আক্ষরিক ও বাংলা মাত্রিক, এই দুই পদ্ধতিতেই। রবীন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথ করেছেন শুধু বাংলা মাত্রিক পদ্ধতিতে। তিন জনের বাংলা মাত্রিক পদ্ধতিতে পার্থক্য আছে। দ্বিজেন্দ্রনাথের পদ্ধতি বিশিষ্ট কলামাত্রিক আর রবীন্দ্রনাথের পদ্ধতি সরল কলামাত্রিক। উভয়ের মন্দাক্রান্তাই সংস্কৃত ছন্দশাস্ত্রসম্মত 'অক্ষর'সংখ্যা -নিরপেক্ষ, মানে তাঁদের মন্দাক্রান্তায় প্রতিপদে সতর 'অক্ষর' অর্থাৎ দল (সিলেব্‌ল্) নেই। সত্যেন্দ্রনাথের পদ্ধতিকে বলা যায় দলকলামাত্রিক। তাঁর রচনায় যথানির্দিষ্ট গুরুলঘুক্রমে দলসংখ্যা স্থির আছে, ফলে কলাসংখ্যাও স্থির আছে। তিন জনের রচিত দৃষ্টান্তগুলির পারস্পরিক তুলনা করলেই এই তিন রূপের পার্থক্য ধরা পড়বে। বিশিষ্ট কলামাত্রিক মানে বাংলা অক্ষর-মাত্রিক, অর্থাৎ বাংলা কায়দায় যে পদ্ধতির প্রতি অক্ষরে এক মাত্রা। দ্রষ্টব্য 'মাত্রা'।

মাত্রা—এ শব্দটি বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। মাত্রা শব্দের একটি সাধারণ অর্থ মাপ। এই অর্থে মাত্রা শব্দের প্রয়োগ দ্রষ্টব্য 'ছন্দের অর্থ' প্রবন্ধে (পৃ ৪৮-৪৯)। কোনো ক্লাসের সব ছেলেই 'সমান মাত্রার,' অর্থ 'সমান মাপের'। এই অর্থকে আরএকটু নিরূপিত করে নিলে মাত্রা মানে দাঁড়ায় কোনো নির্দিষ্ট য়ুনিট বা একক, যার সাহায্যে কোনো কিছুর পরিমাপ করা যায়। এই বিশিষ্ট অর্থে মাত্রা শব্দের প্রয়োগ আছে ওই 'ছন্দের অর্থ' প্রবন্ধেই (পৃ ৩৪-৩৫)।

১	২	৩	৪
শরদচন্দ	পবনমন্দ	বিপিন ভরল	কুসুমগন্ধ
৫	৬	৭	৮
ফুল্ল মল্লি	মালতিযুথি	মত্তমধুপ	ভোরনী-।

এখানে 'আটটি চলনে ছন্দের চাল সারা হচ্ছে'। অর্থাৎ চালের মাত্রা হচ্ছে চলন। এ দৃষ্টান্তটি সম্বন্ধে আরও বলা হয়েছে, 'ছয়ের মাত্রায় এ পা

ফেলছে এবং আটের মাত্রায় ঘুরে আসছে'। এই উক্তির দ্বিতীয়াংশটির মানে আটটি পদক্ষেপে এর প্রদক্ষিণ। অর্থাৎ প্রদক্ষিণের মাত্রা পদক্ষেপ। চলন ও পদক্ষেপ একার্থক, মানে পর্ব। তেমনি চাল ও প্রদক্ষিণ, দুটোরই মানে পংক্তি। সুতরাং পর্বই পংক্তির মাত্রা বলে গণ্য হয়েছে। উদ্‌ধৃত দৃষ্টান্তটিতে আটটি পর্ব-মাত্রায় এক পংক্তি সম্পূর্ণ হয়েছে। কিন্তু পর্বের অর্থাৎ চলন বা পদক্ষেপের মাত্রা কি? শরদ, কুসুম, মধুপ প্রভৃতি যুগ্মধ্বনিহীন শব্দে তিন মাত্রা ধরা হয়েছে। অতএব বলতে হবে এ ক্ষেত্রে একটি অযুগ্ম বা লঘু ধ্বনির উচ্চারণকাল অর্থাৎ এক 'কলা'ই এক মাত্রা বলে গণিত হয়েছে। যুগ্ম বা গুরু ধ্বনিতে দুই কলা, অতএব দুই মাত্রা। 'চন্দ' শব্দে একটি গুরুধ্বনি (চন্) ও একটি লঘুধ্বনি (দ), অতএব তিন কলা-মাত্রা। 'মালতি' শব্দের 'মা'এর দীর্ঘ উচ্চারণ, অতএব গুরু ; তাই 'মালতি' শব্দে চার কলা-মাত্রা গণনীয়। 'ভোরনী' শব্দের 'ভো' এবং 'নী'ও গুরু ; অধিকন্তু তার শেষে একটি অনুচ্চারিত মাত্রাও গণনীয়। এই হিসাবে উপরের দৃষ্টান্তটির প্রত্যেক পর্বে (চলনে বা পদক্ষেপে) পাওয়া যাবে ছয়টি করে কলা-মাত্রা। এর পুরো পরিচয় এই যে, ছয় কলা-মাত্রায় এর পর্ব এবং আট পর্ব-মাত্রায় এর পংক্তি। রবীন্দ্রপরিভাষায় এর চাল বা প্রদক্ষিণের মাত্রা আট এবং চলন বা পদক্ষেপের মাত্রা ছয় (পৃ ৩৫, ৪১)। মনে রাখা প্রয়োজন—চালের মাত্রা চলন, ভাষান্তরে প্রদক্ষিণের মাত্রা পদক্ষেপ, অর্থাৎ পংক্তির মাত্রা পর্ব, আর চলন বা পদক্ষেপের মাত্রা কলা। যার সাহায্যে পরিমাপ করা যায় তারই নাম মাত্রা। **এখানে পংক্তি পরিমিত হয়েছে পর্বের সাহায্যে, সুতরাং পর্বই তার মাত্রা ; এবং পর্ব পরিমিত হয়েছে কলার সাহায্যে, সুতরাং কলাই তার মাত্রা।**

শুধু পর্বকে নয়, রবীন্দ্রনাথ স্থলবিশেষে উপপর্বকেও মাত্রা বলে ধরে

নিয়েছেন। কেননা, অনেক সময় তিনি উপপর্বকেই ছন্দের মাপকাঠি বলে গণ্য করেছেন। তাই যখন বলেন 'তিনের মাত্রার ছন্দ' (পৃ ৪৪), তখন বুঝতে হবে তিনকলা-পরিমিত উপপর্বের ছন্দ। এখানে মাত্রা মানে উপপর্ব। যখন বলেন 'তিনের ছন্দ' (পৃ ৩৬, ৭৪) তখন সেই ছন্দকেই বোঝায় যার প্রতি 'মাত্রা'য় (এস্থলে, উপপর্বে) তিন কলা।

দেখা গেল এই গ্রন্থে পর্ব-মাত্রা, উপপর্ব-মাত্রা ও কলা-মাত্রা, এই তিন রকম মাত্রাই স্বীকৃত হয়েছে। তা ছাড়া সিলেব্‌ল-মাত্রার কথাও পাওয়া যায় নানা স্থানে। "ফল শব্দ বস্তুত এক মাত্রার কথা। অথচ সাধু বাংলাভাষার ছন্দে ইহাকে দুই মাত্রা বলিয়া ধরা হয়" (পৃ ৫-৬)। এর মানে ফল শব্দ এক সিলেব্‌ল্‌এর কথা, কিন্তু সাধু বাংলার ছন্দে এটিকে দুই কলা বলে ধরা হয়। অর্থাৎ সাধু ছন্দে অবস্থাভেদে এক সিলেব্‌ল্‌এও দুই মাত্রা ধরা যায়, কেননা কলা-ই তার মাত্রা। কিন্তু অ-সাধু বা প্রাকৃত বাংলার ছন্দে এক সিলেব্‌ল্‌এই এক মাত্রা (পৃ ১৮)। যেমন—

কই্ | পা | লঙ্ | ক ‖ কই্ | রে | কম্ | বল্।

এখানে সিলেব্‌ল্‌ই মাত্রা বলে স্বীকৃত। অর্থাৎ অ-সাধু বাংলার ছন্দ হচ্ছে সিলেব্‌ল্‌-মাত্রার ছন্দ। 'কই' শব্দে এক সিলেব্‌ল্ এবং অ-সাধু ছন্দে এটি একমাত্রা বলেই গণ্য। যা হক, ফল কই প্রভৃতির ন্যায় একসিলেব্‌ল্‌এর শব্দকেই বলা হয়েছে 'ঐকমাত্রিক' (monosyllabic) ধ্বনি (পৃ ১২৮)। অন্যত্র বলা হয়েছে, 'যে-ছন্দগুলি বাংলার প্রাকৃত ছন্দ, অক্ষর গণনা করে তাদের মাত্রা নয়' (পৃ ১৯২)। বস্তুত তাদের মাত্রা সিলেব্‌ল্ গণনা করে। "চলতি ভাষার কাব্য, যাকে বলে ছড়া,…সেটা পয়ার হলেও অক্ষরগোনা পয়ার হবে না, সে হবে মাত্রা-গোনা পয়ার" (পৃ ১৪২)। এখানে মাত্রা মানে সিলেব্‌ল্, মাত্রাগোনা

মানে সিলেবিক। তার পরেই আছে, 'বস্তুত সাধুভাষার পয়ারও মাত্রাগোনা'। এখানে মাত্রা মানে অক্ষর। এই দুই উক্তির অভিপ্রায় এই যে,—চলতি ভাষার পয়ার এবং সাধু ভাষার পয়ার দুই-ই মাত্রাগোনা, তবে সাধু ভাষার পয়ার অক্ষরগোনা এবং চলতি ভাষার পয়ার সিলেব্‌ল্-গোনা। সাধু ছন্দের মাত্রা অক্ষর, অ-সাধু ছন্দের মাত্রা সিলেব্‌ল্। 'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা' ইত্যাদি ছড়াটার যে বিশ্লেষণ আছে (পৃ ১৪৩), তাতেও এ কথা প্রতিপন্ন করাই অভিপ্রায়। 'মন বেচারির কি দোষ আছে' ইত্যাদি দৃষ্টান্তটির (পৃ ১৭০-৭১) বিশ্লেষণেও ওই একই অভিপ্রায় প্রকাশ পেয়েছে।

এই ভালো রে ফুলের সঙ্গে আলোয় জাগা, গান-গাওয়া এই ভাষায়,
তারার সাথে নিশীথ-রাতে ঘুমিয়ে-পড়া নূতন প্রাতের আশায়।

এই দৃষ্টান্তটি সম্বন্ধে বলা হয়েছে,—"এই জাতের সাধু ছন্দে আঠার অক্ষরের আসন থাকে। কিন্তু এটাতে কোনো কোনো লাইনে পঁচিশ পর্যন্ত উঠেছে" (পৃ ১৮৯)। অক্ষরসংখ্যা কোনো কোনো লাইনে একুশ পর্যন্ত নেমেছে। অর্থাৎ এটা অক্ষরগোনা সাধু ছন্দ নয়। সাধু ছন্দ হলে এটাতে থাকত আঠার অক্ষর ; কিন্তু এখানে আছে আঠার সিলেব্‌ল্ (গাওয়া দুই সিলেব্‌ল্, 'ওয়া'র উচ্চারণরূপ wā বা ৱা ; 'ঘুমিয়ে'ও দুই সিলেব্‌ল্, তার উচ্চারণ ঘুম্‌য়ে)। সাধু ছন্দের মাত্রা অক্ষর, অ-সাধু ছন্দের মাত্রা সিলেব্‌ল্। এটা হচ্ছে অক্ষরমাত্রিক সাধু দীর্ঘপয়ারের সিলেব্‌ল্‌মাত্রিক অ-সাধু প্রতিরূপ। আর, 'যুদ্ধ যখন সাঙ্গ হল' ইত্যাদি দৃষ্টান্তটি (পৃ ১৩১) হল চোদ্দ অক্ষরমাত্রার সাধু হ্রস্বপয়ারের অ-সাধু প্রতিরূপ। অধিকন্তু এই দুই দৃষ্টান্তের দুই রকম পয়ারই প্রবহমান। আসল কথা এই যে, এই দুই দৃষ্টান্তে সিলেব্‌ল্‌ই ছন্দের মাত্রা, অক্ষর বা কলা নয়। ছন্দপরিভাষায় এ দুটি হচ্ছে প্রবহমান দলমাত্রিক (দীর্ঘ ও হ্রস্ব) পয়ারের দৃষ্টান্ত।

সিলেব্‌ল্‌ অর্থে যেমন নানা স্থানে মাত্রা শব্দের ব্যবহার হয়েছে, তেমনি আবার স্থলবিশেষে মাত্রা অর্থে সিলেব্‌ল্‌ শব্দটির ব্যবহারও দেখা যায়।

এই যে এল | সেই আমারি | স্বপ্নে দেখা | রূপ।

এবং

দুই জনে জুঁই | তুলতে যখন | গেলেম বনের | ধারে।

ইত্যাদি দুটি দৃষ্টান্তে (পৃ ৫৫-৫৬) এই্‌, সেই্‌, দুই্‌, জুঁই্‌, স্বপ্‌, রূপ্‌, তুল্‌, খন্‌ প্রভৃতি ধ্বনি 'এক সিলেব্‌ল্‌এর বেশি মান দাবি করলে না' এবং 'যুগ্মধ্বনিগুলো এক সিলেব্‌ল্‌এর চাকার গাড়িতে অনায়াসে ধেয়ে চলেছে'। মানে, 'এই' প্রভৃতি সিলেব্‌ল্‌গুলি এক মাত্রা বলেই গণ্য হয়েছে, দুই মাত্রার মর্যাদা পায়নি। দুটি দৃষ্টান্তই সিলেব্‌ল্‌মাত্রার অ-সাধু পয়ার। পারিভাষিক নাম দলমাত্রিক পয়ার। দ্বিতীয়টি প্রায় বেঁকাক।

মনে পড়ে | দুই জনে | জুঁই তুলে | বাল্যে।

এবং

কাঁধে মই, | বলে 'কই | ভুঁইচাঁপা | গাছ'।

এই দুই দৃষ্টান্তে (পৃ ৫৫-৫৬) দুই, জুঁই প্রভৃতি ধ্বনি 'দুই সিলেব্‌ল্‌এর টিকিট পেয়েছে'। মানে, এই সিলেব্‌ল্‌গুলি দুই কলামাত্রা বলে গণ্য হয়েছে, এক সিলেব্‌ল্‌মাত্রা বলে নয়। কারণ দুটি দৃষ্টান্তই কলামাত্রিক পয়ার।

যুগ্মধ্বনি কলামাত্রার ছন্দে দুই কলামাত্রা বলে গণ্য হয়, আর সিলেব্‌ল্‌মাত্রার ছন্দে গণ্য হয় এক সিলেব্‌ল্‌মাত্রা বলে।

কলামাত্রা এবং সিলেব্‌ল্‌মাত্রার ন্যায় অক্ষরমাত্রার কথাও পাওয়া যায় নানা প্রসঙ্গে। সাধু বাংলার ছন্দগুলিতে 'প্রত্যেক অক্ষরটি এক মাত্রা বলিয়া গণ্য হইয়াছে' (পৃ ৩)। যেমন—

মহাভারতের কথা অমৃত সমান।

'ইহাতে চোদ্দটি অক্ষরে চোদ্দ মাত্রা'। শয্যা কই বস্ত্র কই, এই দৃষ্টান্তটির বিশ্লেষণেও দেখা যায় আট অক্ষরে আট মাত্রা ধরা হয়েছে (পৃ ১৮)। এক অক্ষরে এক মাত্রা ধরা, এটা হচ্ছে প্রচলিত রীতি। তদনুসারে বস্ • ত্র না লিখে ব • স্ত্র লিখলেই ঠিক হত। কেননা প্রচলিত রীতি অনুসারে 'হলন্তই [মানে স্বরান্ত] হোক, হসন্তই হোক আর যুক্তবর্ণ ই হোক এই ছন্দে সকলেরই সমান মাত্রা' (পৃ ৪৯)। সুতরাং 'বস্' লিখলে তাতেই দুই মাত্রা ধরতে হয়।

তব চিত্তগগনের | দূর দিক্‌সীমা।

"এখানে 'দিক্' শব্দের ক্ হসন্ত হওয়া সত্ত্বেও তাকে একমাত্রার পদবি দেওয়া গেল" (পৃ ৮০)। কেননা, এটা অক্ষরমাত্রার ছন্দ। রবীন্দ্রনাথ যখন বলেন চলতি ভাষার পয়ার 'অক্ষরগোনা' পয়ার নয় (পৃ ১৪২) কিংবা "যে-ছন্দগুলি বাংলার প্রাকৃত ছন্দ, অক্ষর গণনা করে তাদের মাত্রা নয়" (পৃ ১৯২), তখনই বুঝতে হবে তিনি সাধু বাংলার ছন্দকে অক্ষরমাত্রার ছন্দ বলেই ধরে নিচ্ছেন। কেননা, 'সাহিত্যিক কবুলতিপত্রে সাধু ভাষায় অক্ষর এবং মাত্রা এক পরিমাণের বলে গণ্য হয়েছে' (পৃ ১৪২)।

কিন্তু এই বিষয়ে তাঁর মনের দ্বিধার পরিচয়ও আছে এ গ্রন্থে। "আমাদের প্রত্যেক অক্ষরটিই যে বস্তুত একমাত্রার এ কথা সত্য নহে। যুক্ত বর্ণ[১] এবং অযুক্ত বর্ণ কখনই একমাত্রার হইতে পারে না।...'পুণ্যবান্' শব্দটি 'কাশীরাম' শব্দের সমান ওজনের নহে" (পৃ ৪)। অন্যত্র আছে "অক্ষরের সংখ্যা গণনা করে ছন্দের ধ্বনিমাত্রা গণনা বাংলায় চলে না" (পৃ ৬২), এবং "আক্ষরিক ছন্দ বলে কোনো অদ্ভুত পদার্থ বাংলায় কিংবা অন্য কোনো ভাষাতেই নেই, অক্ষর ধ্বনির চিহ্নমাত্র" (পৃ ৬১)।

১ বর্ণ ও অক্ষর সমার্থক শব্দ। সুতরাং অক্ষরমাত্রা কথাটার পরিবর্তে বর্ণমাত্রা কথাটাও ব্যবহার করা যেতে পারে।

তা হলে যে-সব সাধু ছন্দ আক্ষরিক বা অক্ষরমাত্রার ছন্দ বলে পরিচিত তার বিশ্লেষণ করা যাবে কিভাবে? "বস্তুত সাধু ভাষার পয়ারও মাত্রাগোনা" (পৃ ১৪২)। কিন্তু মাত্রা গণনা করা হবে কিভাবে? অক্ষর গণনা করে তো নয়। এর উত্তর, বাংলা উচ্চারণে স্বরের ধ্বনিকে টান দিয়ে অতি সহজেই বাড়ানো-কমানো যায় (পৃ ৫৫), অর্থাৎ ব্যবহারের প্রয়োজনে একটা সীমার মধ্যে আমাদের স্বরবর্ণগুলোর সংকোচনপ্রসারণ চলে (পৃ ৬২)। এই সংকোচনপ্রসারণ-ক্ষমতারই নামান্তর 'স্থিতিস্থাপকতা'। যেমন—

মহাভারতে-র্ কথা অমৃতসমা-ন্ - - ।
কাশীরা-ম্ দা-স্ কহে শুনে পুণ্‌্যবা-ন্ - - ॥

এখানে যুগ্মধ্বনি আছে ছয়টি—তের্ মান্ রাম্ দাস্ পুণ্ এবং বান্। তার মধ্যে একমাত্র পুণ্ ধ্বনিটা সংকুচিত হয়ে এক মাত্রা বলে গণ্য হয়েছে, বাকি পাঁচটা প্রসারিত হয়ে গণ্য হয়েছে দুই মাত্রা বলে। পুণ্-এর উচ্চারণ সংক্ষিপ্ত, বাকিগুলির বিক্ষিপ্ত; এই বিক্ষিপ্ত বা প্রসারিত উচ্চারণকেই বলা হয়েছে 'টান'। অযুগ্মধ্বনিগুলি সর্বত্রই এক মাত্রা। এই হিসাবে প্রতিপংক্তিতে চোদ্দ মাত্রা পাওয়া যাবে। এই হিসাবই সংগত, যুক্ত-অযুক্ত-হসন্ত-নির্বিশেষে চোদ্দ অক্ষরে চোদ্দ মাত্রা গণনা করা সংগত নয়,— রবীন্দ্রনাথের এই অভিমতও (পৃ ১৯২-৯৩) প্রকাশ পেয়েছে নানা স্থানে। 'সতত হে নদ তুমি' ইত্যাদি দৃষ্টান্তটির বিশ্লেষণ (পৃ ১৪২- -৪৩) লক্ষিতব্য।

Λ V Λ V V
উদয়্ দিগন্তে অই্ | শুভ্র্ শঙ্খ্ বাজে।

প্রসারিত যুগ্মধ্বনি (Λ-চিহ্নিত) দুই মাত্রা, সংকুচিত যুগ্মধ্বনি (V-চিহ্নিত) এক মাত্রা, অযুগ্মধ্বনিও (অচিহ্নিত) এক মাত্রা, এইভাবে হিসাব করলেই এই পংক্তিতে চোদ্দ মাত্রা পাওয়া যাবে (পৃ ৫২-৫৩)।

এই বিশ্লেষণটা উচ্চারণসংগত এবং এজন্যই স্বীকার্য। অক্ষরসংখ্যার হিসাবটা উচ্চারণসংগতও নয়, যুক্তিসংগতও নয়। অতএব অক্ষর-সংখ্যাগত বিশ্লেষণ স্বীকার্য নয়।

তা হলে অক্ষরমাত্রাও স্বীকার্য নয়। অক্ষরমাত্রা না হলে সাধু ছন্দের হিসাব হবে কোন্ মাত্রার গণনায়? রবীন্দ্রনাথের ছন্দোবিশ্লেষণ-প্রণালী লক্ষ্য করলে বোঝা যায় কলামাত্রা গণনাই তাঁর অভিপ্রেত। তবে সাধারণ কলামাত্রার ছন্দের সঙ্গে এই বিশিষ্ট কলামাত্রার ছন্দের একটা পার্থক্য আছে। সাধারণ কলামাত্রার ছন্দে সমস্ত যুগ্মধ্বনিই প্রসারিত ও দুইকলা-পরিমিত বলে গণ্য হয়। কিন্তু আলোচ্যমান বিশিষ্ট কলামাত্রার ছন্দে সব যুগ্মধ্বনির কলাপরিমাণ সমান নয়। কোথাও তা সংকুচিত এবং এককলা-পরিমিত, আবার কোথাও তা প্রসারিত এবং দুইকলা-পরিমিত। সাধারণত শব্দের অন্তে অবস্থিত হলে প্রসারিত এবং অন্যত্র সংকুচিত হয়; কিন্তু তার ব্যতিক্রমও আছে। এই বিষয়ে বাংলা ভাষার স্বভাবসীমার মধ্যে কবির যথেষ্ট স্বাধীনতা আছে। নানা প্রসঙ্গেই তা দেখানো হয়েছে। যেমন—

চিম্‌নি ভেঙে গেছে দেখে | গিন্‌নি রেগে খুন,
ঝি বলে আমার দোষ | নেই ঠা-কৃরুন।

চিম্ গিন্ ঠাক্, তিনটিই শব্দের আদিতে অবস্থিত। অথচ প্রথম দুটি সংকুচিত এবং তৃতীয়টি প্রসারিত (পৃ ৭৭)। আবার

চি-ম্‌নি ফেটেছে দেখে | গৃহিণী সরোষ,
ঝি বলে ঠাক্‌রুন মোর | নাই কোনো দোষ।

এখানে চিম্ প্রসারিত এবং ঠাক্ সংকুচিত।

তব চিত্তগগনের | দূর দিক্‌সীমা।

এবং

মনের আকাশে তার | দিক্‌সীমানা বেয়ে।

প্রথম দিক্ ধ্বনিটা প্রসারিত ও দুইকলা-পরিমিত ; দ্বিতীয়টা সংকুচিত ও একলা-পরিমিত (পৃ ৮০)।

যুগ্মধ্বনির এই সংকোচনপ্রসারণের ফলেই অক্ষরসংখ্যার হিসাবে এই ছন্দের পরিমাপ সম্ভব নয়। উপরের চারটি দৃষ্টান্তের প্রত্যেক পংক্তির কলামাত্রার সংখ্যা চোদ্দ ; কিন্তু অক্ষরমাত্রা স্বীকার করলে মাত্রার সমতা পাওয়া যাবে না।

বিশিষ্ট কলামাত্রার ছন্দে যুগ্মধ্বনির সংকোচন ও প্রসারণ দুই-ই চলে একই সঙ্গে। তবে তাতে প্রসারণের চেয়ে সংকোচনের প্রবণতাই বেশি। এই সংকোচনক্ষমতাই এর বিশিষ্টতা। আর এই সংকোচন-ক্ষমতাকেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'শোষণশক্তি' (পৃ ৩৮)। ফলে এ ছন্দের নির্দিষ্ট পংক্তিসীমার মধ্যে সাধারণ কলামাত্রার তুলনায় অনেক বেশি যুগ্মধ্বনির স্থান দেওয়া যায়। প্রয়োজনমতো নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে বহুসংখ্যক যুগ্মধ্বনিকে ধারণ করবার এই যে শক্তি, তাকে বলা হয়েছে 'ভারবহনশক্তি' (পৃ ১২৯), আর এজন্যই এ ছন্দকে বলা হয়েছে 'গুরুভারবহ' ছন্দ (পৃ ৬৯)।

বাংলা ছন্দে পংক্তির শেষপর্ব অনেক সময়ই অপূর্ণ থাকে। অর্থাৎ ওই পর্বে নির্দিষ্টসংখ্যক ধ্বনিমাত্রা না বসিয়ে এক বা একাধিক মাত্রার অবকাশ রেখে দেওয়া হয়। রবীন্দ্রনাথ অনেক সময়ই এই অবকাশের মাত্রাসংখ্যাকে হিসাবের মধ্যে ধরেছেন এবং তাকে বলেছেন 'অনুচ্চারিত মাত্রা' বা 'যতির মাত্রা' (পৃ ৪১, ৪৬)। পয়ারে প্রতিপংক্তিতে চার পর্ব (বা পদক্ষেপ, পৃ ৩৫), প্রতিপর্বে চার মাত্রা, শেষপর্বে উচ্চারিত মাত্রা দুই, অনুচ্চারিত বা যতির মাত্রা দুই। এই হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের হিসাব। যদি পর্ববিভাগের কথা না বলে একেবারে পদবিভাগের কথা বলা হয় তবে বলতে হয় পয়ারের প্রতিপংক্তিতে দুই পদ (বা পদক্ষেপ, পৃ ৪১) ; প্রথম পদে আট মাত্রা, দ্বিতীয় পদেও তাই, দুটি অনুচ্চারিত বা যতির মাত্রা নিয়ে (পৃ ১০, ৭১)।

মহাভারতে-র্ কথা | অমৃতসমা-ন্ -- ।
কাশীরা-ম্ দা-স্ কহে | শুনে পুণ্যবা-ন্ -- ॥

তের্ মান্ রাম্ দাস্ বান্, এই যুগ্মধ্বনিগুলি উচ্চারণের 'টানে' প্রসারিত হয়েছে; এগুলি সবই দুইমাত্রা-পরিমিত। কিন্তু মান্ এবং বান্ এই দুটির পরে আরও দুটি অনুচ্চারিত মাত্রা বা যতিমাত্রা ধরা হয়েছে। সুতরাং মান্ ও বান্ এই দুটি যুগ্মধ্বনি টান ও যতির সাহায্যে চার মাত্রায় পরিণত হয়েছে বলা চলে (পৃ ১৯৩)। সব সময়ই যে যতিমাত্রাকে হিসাবের মধ্যে ধরা হয় তা নয়। যতিমাত্রার কথা হিসাবে না এনে কোনো কোনো স্থলে শুধু আট এবং ছয় অক্ষরমাত্রার যোগেই পয়ারের প্রকৃত রূপ ধরা হয়েছে (পৃ ৬৯, ১৭৩, ১৫৭)।

মাত্রাবৃত্ত (পৃ ১৮১)—বাংলা ছন্দের তিনটি শাখার (পৃ ১৩২) অন্যতম শাখার প্রচলিত পারিভাষিক নাম 'মাত্রাবৃত্ত'। সংস্কৃত ও প্রাকৃত ছন্দের প্রধান শাখা দুটি, তার মধ্যে একটির নাম মাত্রাবৃত্ত। এই প্রাচীন মাত্রাবৃত্ত থেকেই বাংলা মাত্রাবৃত্তের উৎপত্তি হয়েছে। মাত্রাবৃত্ত নামটি অমিত্রাক্ষর নামের ন্যায় রূঢ়ার্থে গ্রহণীয়। কেননা ব্যুৎপত্তিগত সাধারণ অর্থে সমস্ত ছন্দই মাত্রাসাপেক্ষ। যে শ্রেণীর ছন্দকে বলা হয়েছে সাধারণ কলামাত্রার ছন্দ, তারই যোগরূঢ় পারিভাষিক নাম মাত্রাবৃত্ত। দ্রষ্টব্য 'শাখা'।

বাংলা মাত্রাবৃত্ত রীতির দুই রূপ, প্রাচীন ও আধুনিক। প্রাচীন মাত্রাবৃত্ত রীতির আদর্শ পাওয়া যায় জয়দেবের গীতগোবিন্দ কাব্যের ছন্দে। তাই এই রীতিকে বলা যায় জয়দেবী (পৃ ২০০)। আধুনিক মাত্রাবৃত্ত রীতির প্রবর্তক রবীন্দ্রনাথ। মানসী কাব্য তার উৎসস্থল।

প্রাচীন মাত্রাবৃত্ত রীতিতে দীর্ঘস্বর (আ, ঈ, ঊ, এ, ও) এবং রুদ্ধদল (ঐ—অই্, ঔ—অউ্, বং, দুঃ, ছন্, দস্, বিদ্, ধান্) দুই কলামাত্রা বলে গণিত হয়। এই হিসাবে প্রাচীন মাত্রাবৃত্ত পদ্ধতির ছন্দে প্রতিপর্বে

চার, পাঁচ, ছয় বা সাত কলামাত্রা থাকতে পারে। এই গ্রন্থে জয়দেবের গীতগোবিন্দ থেকে চারটি দৃষ্টান্ত উদ্‌ধৃত হয়েছে, চারকলা-পর্বের দুটি এবং পাঁচকলা-পর্বের দুটি।—

হরিরিহ | বিহরতি | সরসব | সন্তে।[১]

এই পংক্তিটিতে (প্রথম সর্গ, তৃতীয় গীত) আছে চার পর্ব এবং প্রতিপর্বে চার কলামাত্রা (পৃ ৩৯)। চারকলা-পর্বের দ্বিতীয় দৃষ্টান্তটি (প্রথম সর্গ, তৃতীয় গীত) এই।—

ললিতল | বঙ্গল | তাপরি | শীলন | কোমল | মলয়স | মীরে।

গ্রন্থমধ্যে এটি অংশত উদ্‌ধৃত হয়েছে (পৃ ১৯৭)। পূর্ণরূপে এর প্রতিপংক্তিতে সাত পর্ব। প্রথমটির বাংলা প্রতিরূপ এই (পৃ ২০০)।—

হেসে | হেসে | হল যে | অস্থির।

দ্বিতীয়টির বাংলা প্রতিরূপ সুপরিচিত (পৃ ১৯৯-২০১)।—

জনগণ | মনঅধি | নায়ক | জয় হে | ভারত | ভাগ্যবি | ধাতা।

পাঁচকলা-পর্বের দৃষ্টান্ত এই (পৃ ৭০)।—

অহহ কল | য়ামি বল | য়াদিমণি | ভূষণম্‌।

এটির (সপ্তম সর্গ, প্রথম গীত) প্রতিপংক্তিতে চার পর্ব। সাত পর্বের দৃষ্টান্ত আছে গীতগোবিন্দ কাব্যের দশম সর্গে। তার প্রথম পংক্তিটি এই (পৃ ১৫-১৬, ১২৬, ১৯৭)।—

বদসি যদি | কিঞ্চিদপি | দন্তরুচি | কৌমুদী |
হরতি দর | তিমিরমতি | ঘোরম্‌।

শেষপর্বে এক কলা কম আছে। প্রাচীন রীতিতে রচিত পাঁচকলা-পর্ব ছন্দের আধুনিক বাংলা প্রতিরূপ এই গ্রন্থে নেই, রবীন্দ্রসাহিত্যেও নেই।

আর্যা ছন্দও মাত্রাবৃত্ত এবং মূলত চতুর্মাত্রপর্বিক (পৃ ২৩৪)।

১ মূলে আছে, 'বিহরতি হরিরিহ সরসবসন্তে'।

প্রাকৃতেও এই ছন্দের বহুল প্রয়োগ দেখা যায়। প্রাকৃত ছন্দশাস্ত্রে এ ছন্দকে বলা হয় গাহা অর্থাৎ গাথা।

এই গ্রন্থে যে কয়টি প্রাকৃত ছন্দের উল্লেখ আছে সেগুলি সবই মাত্রাবৃত্তবর্গীয়। তার মধ্যে মালা ছন্দের (পৃ ১৫৭) দ্বিতীয়ার্ধ গাথার অর্থাৎ আর্যার অবিকল অনুরূপ (পৃ ২৩৪), সুতরাং চতুর্মাত্রপর্বিক। এ ছন্দের প্রথমার্ধের প্রথম ছত্রিশ কলার পর্ববিভাগ অনিয়মিত, অর্থাৎ এই অংশটিকে সুনিরূপিত পর্বে পর্বে বিভক্ত করা আবশ্যিক নয়। মাত্রাবৃত্তের মাত্রাসংখ্যাই সাধারণত নির্দিষ্ট থাকে, অক্ষরসংখ্যা থাকে অনির্দিষ্ট। মালা ছন্দের দ্বিতীয়ার্ধ সম্বন্ধে এ নিয়ম প্রযোজ্য, প্রথমার্ধ সম্বন্ধে নয়। প্রথমার্ধে অক্ষরসংখ্যা (একচল্লিশ) এবং মাত্রাসংখ্যা (পঁয়তাল্লিশ), দুই-ই নির্দিষ্ট আছে।

গগনাঙ্গ ছন্দও মাত্রাবৃত্তবর্গের অন্তর্গত। অথচ এরও প্রতিপাদে অক্ষরসংখ্যা (কুড়ি) এবং মাত্রাসংখ্যা (পঁচিশ) নির্দিষ্ট আছে (পৃ ২৩৬)। এর প্রথমে থাকে একটি চার কলামাত্রার পর্ব। বাকি একুশ কলাকে চারকলার পর্বে বা পাঁচকলার পর্বে যেভাবে ইচ্ছা বিন্যস্ত করা চলে, কেবল পাদের মোট অক্ষরসংখ্যা ঠিক থাকা চাই এবং শেষ দুটি অক্ষর লঘুগুরুক্রমে বিন্যস্ত হওয়া চাই। গ্রন্থমধ্যে উদ্‌ধৃত দৃষ্টান্তটি চারকলার পর্বে বিভাজ্য (পৃ ২৩৬)। কিন্তু এটির তৃতীয় পাদে কিছু ত্রুটি আছে। 'খুরাসাণ' পাঠে চারকলার প্রথম পর্বটিই পাওয়া যায় না। বস্তুত প্রাকৃতপৈঙ্গলের চারটি পাণ্ডুলিপিতে এবং দুইটি টীকায় পাঠ আছে 'খুরসাণ'। বলা বাহুল্য ছন্দের প্রয়োজনে এই পাঠই গ্রহণীয়। পক্ষান্তরে 'মুহিঅ লংঘিঅ' অংশে এক কলার অভাব দেখা যায়। 'মোহিঅ' বা অনুরূপ কোনো পাঠ ধরলেই কোনো ত্রুটি থাকত না। কিন্তু পাঠান্তর বা টীকাগুলিতে এই ত্রুটি পূরণের পক্ষে কোনো প্রমাণ নেই।

দণ্ডকল ছন্দও মূলত চতুষ্কলপর্বিক বলে মনে হয় (পৃ ২৪৫)। এই ছন্দটি প্রায় সর্বাংশেই জয়দেবের 'ললিতলবঙ্গলতা' বা 'মুখরমধীরং ত্যজ মঞ্জীরং' ইত্যাদি রচনার অনুরূপ। পার্থক্য শুধু এই যে, দণ্ডকল ছন্দের প্রথমে থাকে একটি দুইকলার অতিপর্ব এবং সর্বশেষে একটি অতিরিক্ত গুরুধ্বনি।

ঝুল্লণা ছন্দ মূলত পঞ্চকলপর্বিক (পৃ ২৪০)। জয়দেবের 'বদসি যদি কিঞ্চিদপি' ইত্যাদি রচনার শেষ অংশে অতিরিক্ত তিন কলা যোগ করলেই ঝুল্লণা ছন্দ হয়।

প্রাচীন বা আধুনিক বাংলায় আর্যা, মালা, গগনাঙ্গ প্রভৃতি ছন্দের প্রতিরূপ দেখা যায় না। কিন্তু জয়দেবী ছন্দের প্রাচীন ও আধুনিক অনুকৃতি প্রচুর আছে। জয়দেবের মাত্রাবৃত্ত ছন্দ অনেকাংশে স্বাধীন; সংস্কৃত বা প্রাকৃত ছন্দশাস্ত্রের নির্দিষ্ট নিয়মের অধীন নয়। প্রাচীন ও আধুনিক বাংলা মাত্রাবৃত্ত রীতির ছন্দ এই স্বাধীন জয়দেবী রীতির আদর্শেই গঠিত হয়েছে। এই গ্রন্থে বৈষ্ণব সাহিত্য থেকে তিনটি প্রাচীন মাত্রাবৃত্ত ছন্দের দৃষ্টান্ত উদ্‌ধৃত হয়েছে, একটি চতুষ্কলপর্বিক এবং দুটি ষট্‌কলপর্বিক। চারকলা-পর্বের দৃষ্টান্ত এই (পৃ ৫)।—

সুন্দরি | রাধে | আওয়ে ব | নি- |
ব্রজরম | ণীগণ | মুকুটম | ণি- ||

—গোবিন্দদাস, পদকল্পতরু, ২৭০

জয়দেবী রীতি অনুসারে এখানে রুদ্ধদল এবং দীর্ঘস্বরান্ত মুক্তদল দ্বিমাত্রক এবং হ্রস্বস্বরান্ত মুক্তদল একমাত্রক বলে স্বীকৃত হয়েছে। ব্যতিক্রম ঘটেছে 'আওয়ে' শব্দে। 'ওয়ে'র উচ্চারণ we বা বৈ। এটি দীর্ঘস্বরান্ত হলেও তার উচ্চারণ হ্রস্ব। বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যে জয়দেবী রীতির এ-রকম ব্যতিক্রম এত দেখা যায় যে, এইজাতীয় মাত্রাবৃত্তকে 'ভাঙা জয়দেবী' বলেও পরিচিত করা চলে।

'শরদচন্দ্র পবনমন্দ' এবং 'মন্দপবন কুঞ্জভবন' ইত্যাদি রচনা দুটি (পৃ ৩৫, ১৭২) ছয়কলা-পর্বের দৃষ্টান্ত। এ-দুটির মাত্রাগণনাপদ্ধতি উপরের দৃষ্টান্তটির অনুরূপ। সুতরাং বিশ্লেষণ অনাবশ্যক। বলা প্রয়োজন যে, গীতগোবিন্দ কাব্যে এ-রকম ছয়কলা-পর্বের দৃষ্টান্ত নেই।

বৈষ্ণব পদাবলীর প্রাচীন মাত্রাবৃত্ত ছন্দে আ ঈ প্রভৃতি দীর্ঘস্বরের দীর্ঘ উচ্চারণ রক্ষার প্রয়াস দেখা যায়। কিন্তু এ-রকম দীর্ঘতা বাংলার স্বভাবিক উচ্চারণ-বিরোধী। এইজন্যই পদাবলী সাহিত্যে এ বিষয়ে এত ঘন ঘন স্খলনও দেখা যায়। তথাপি পদাবলীতে যে জয়দেবী পদ্ধতিতে স্বরবর্ণের দীর্ঘতা বহুলপরিমাণে রক্ষা করা সম্ভব হয়েছিল তার কারণ ওগুলি গান। গানের সুরে স্বরবর্ণের দীর্ঘতা অস্বাভাবিক বলে বোধ হয় না; কিন্তু পঠনীয় কবিতায় ভাষার স্বাভাবিক উচ্চারণ-সম্মত বাক্‌ছন্দকে মেনে চলতে হয়। এইজন্য আধুনিক কালের পঠনীয় কবিতায় জয়দেবী মাত্রাবৃত্ত রীতি একেবারেই পরিত্যক্ত হয়েছে। আর এইজন্যই জয়দেবী মাত্রাবৃত্তের পুনঃপ্রবর্তনও এখন আর সম্ভব নয় (পৃ ২০১-০২)। কেননা তা হবে বাংলা ভাষার 'প্রকৃতিবিরুদ্ধ' সুতরাং 'কৃত্রিম'; তথাপি এই কৃত্রিমতাকেই যদি চালাতে চেষ্টা করা হয় তবে রবীন্দ্রনাথের মতে সেটা হবে 'জবরদস্তি' বা 'অত্যাচার' (পৃ ২০০)। অবশ্য তিনি নিজেও কয়েকটি রচনায় জয়দেবী মাত্রাবৃত্ত রীতির আশ্রয় নিয়েছেন, যেমন জনগণমনঅধিনায়ক। কিন্তু সেগুলি গান। জয়দেবী রীতির ছন্দে সর্বভারতীয়তার স্বাদ আছে। জনগণমন গানটিকে সর্বভারতীয় রূপ দেবার প্রয়োজন ছিল। তাই এটিতে জয়দেবী রীতির ছন্দ তথা বহুলপরিমাণ সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ করা হয়েছে (পৃ ২০০)।

আধুনিক কালের পঠনীয় কবিতায় জয়দেবী মাত্রাবৃত্ত রীতি পরিত্যক্ত হল বটে, কিন্তু মাত্রাবৃত্তসুলভ সংগীতমাধুর্য থেকেও বাংলা সাহিত্য

বঞ্চিত হল। এই অভাবটা রবীন্দ্রনাথের শ্রুতিরসবোধকে পীড়া দিচ্ছিল। তাই তিনি মানসী কাব্য রচনার সময়ে (১৮৮৭-৯০) এক নূতন মাত্রাবৃত্তরীতির প্রবর্তন করেন (পৃ ২১৪ এবং পাদটীকা ৩)। এই নূতন রীতিকে বলা যায় রাবীন্দ্রিক মাত্রাবৃত্ত। এই হিসাবে বাংলা ছন্দের ইতিহাসে গীতগোবিন্দ কাব্যের পাশেই মানসীর স্থান।

রাবীন্দ্রিক মাত্রাবৃত্ত রীতির বৈশিষ্ট্য এই যে, এই রীতিতে যুগ্মধ্বনি বা রুদ্ধদল দ্বিমাত্রক বলেই স্বীকৃত হয় কিন্তু আ ঈ প্রভৃতি দীর্ঘ স্বরের দীর্ঘতা স্বীকৃত হয় না, বাংলার স্বাভাবিক উচ্চারণ অনুসারে হ্রস্বদীর্ঘনির্বিশেষে সমস্ত স্বরান্ত বর্ণই একমাত্রক বলে গণ্য হয় (পৃ ১৮১)। কিন্তু ঋকারের ব্যবহার নিয়ে একটু দ্বিধা দেখা যায় (পৃ ১৮৫)। কারণ ঋকারের আধুনিক উচ্চারণে তার স্বরবর্ণত্ব লোপ পেয়েছে। বাংলায় এটির উচ্চারণ হয়েছে রি। ফলে 'তৃণ'কে আমরা বলি ত্রিণ। তা সত্ত্বেও ঋকারের স্বরবর্ণত্ব স্বীকারের একটি প্রয়াস দেখা যায় আধুনিক উচ্চারণে; ছন্দ-পাঠ এবং -রচনার ক্ষেত্রেও এই প্রয়াসের ক্রিয়া সুস্পষ্ট। প্রকৃত ও প্রক্রিয়া তথা বিকৃত ও বিক্রীত শব্দের তুলনা করলেই তা বোঝা যাবে। আধুনিক বাংলা উচ্চারণে বিক্রীত—বিক্‌ক্রিত আর বিকৃত—বি · ক্রিত। এভাবে লঘুপ্রযত্ন উচ্চারণের দ্বারা ব্যঞ্জনসংঘাত বাঁচিয়ে ঋকারান্ত বর্ণের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করা হয়। তাতে জাত বাঁচে বটে কিন্তু ঋকারের স্বরবর্ণত্ব বজায় থাকে না, এ কথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু সর্বত্র জাত বাঁচানোও যায় না। দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। গীতগোবিন্দে (চতুর্থ সর্গ, দ্বিতীয় গীত) আছে—

সরসম | সৃণমপি | মলয়জ | পঙ্কম্।

এখানে 'মসৃণ' শব্দের উচ্চারণটাও মসৃণ অর্থাৎ লঘুপ্রযত্নকৃত। রবীন্দ্র-রচনাতেও এই মসৃণ উচ্চারণ দেখা যায়। যথা—

সন্ধ্যাবেলার | মস্থণ অন্ধ | কারে
এখানে সেখানে | চোখে আলো খোঁচা | মারে।

—প্রহাসিনী, পরঠিকানী

উভয়ত্রই মস্থণ শব্দের উচ্চারণ ম • স্রিণ, অর্থাৎ ব্যঞ্জনসংঘাতহীন। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথের রচনাতে এই শব্দটির বেশ অমসৃণ উচ্চারণই দেখা যায়।—

মস্থণ দেহ | উচ্চ ককুদ্ | উদ্ধত বল | বান্।

—তীর্থসলিল, বৈরাগ্যোদয়

এখানে মস্থণ শব্দের উচ্চারণ মস্‌স্রিণ। মস্থণ শব্দের অভীষ্ট ব্যঞ্জন-সংঘাতই এখানে ছন্দকে তরঙ্গায়িত করে তুলেছে। তাতে ছন্দের গৌরবই বেড়েছে।

অমৃত, সরীসৃপ, রাজগৃহ, অনাদৃত প্রভৃতি শব্দেরও এ-রকম বৈকল্পিক ব্যবহার দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথ এ সব স্থলে ঋকারান্ত বর্ণের লঘুপ্রযত্ন উচ্চারণেরই পক্ষপাতী। যথা—

ধরহ রাগিণী | বিশ্বপ্লাবিনী | অমৃতউৎস | ধারা | …
সরীসৃপগতি | মিলিল তাহারা | নিষ্ঠুর অভি | মানে।…
রাজগৃহ যত | ভূতলশয়ান | পড়ে আছে ঠাঁই | ঠাঁই।

—সোনার তরী, পুরস্কার

হেমচন্দ্রের দশমহাবিদ্যায় (মহাদেবের বিলাপ) আছে—

জলনিধি | মন্থনে | অমৃত | উছলিল |
যত সুর | বাঁ-টিল | তা-হে-।

এখানে লঘুপ্রযত্ন উচ্চারণের দ্বারা মৃ ধ্বনিটির স্বাতন্ত্র্য রক্ষিত হয় নি, ফলে ব্যঞ্জনসংঘাতও বাঁচানো হয় নি। বাংলা সাহিত্যে অমৃত শব্দের এ-রকম প্রয়োগ বিরল নয়।

নিঠুর পীড়নে যার
তন্দ্রাবিহীন কঠিন দণ্ডে মথিছে অন্ধকার
তুলিছে আলোড়ি | অমৃত জ্যোতি | তাঁহারে নমস্ | কার।
—বীথিকা, নমস্কার

এখানে অমৃত শব্দকে অম্‌ম্রিত রূপে উচ্চারণ করা যেতে পারে। কিন্তু রবীন্দ্রসাহিত্যে অমৃত শব্দের এ-রকম প্রয়োগ দেখা যায় না। সুতরাং অমৃত এবং জ্যোতি শব্দের মধ্যে ব্যঞ্জনসংঘাত স্বীকার করে নেওয়া অর্থাৎ অমৃতজ্‌জ্যোতি উচ্চারণই কবির অভিপ্রেত ছিল বলে ধরতে হবে। নিভৃত, প্রকৃত প্রভৃতি শব্দেও ব্যঞ্জনসংঘাত বর্জনীয়। যথা—

যকৃৎ যদি বিকৃত হয়
স্বীকৃত রবে, কিসের ভয়,
না হয় হবে পেটের গোলযোগ।
—প্রহাসিনী, ভোজনবীর

কিন্তু পিতৃ, মাতৃ, ভ্রাতৃ, নেতৃ প্রভৃতি শব্দে ব্যঞ্জনসংঘাত মেনে নেওয়াই প্রচলিত রীতি, এমন কি রবীন্দ্রসাহিত্যেও। যথা—

'আমরা হইলাম | পিতৃহারা', | কাঁদিয়া কহে দশ | দিক্,
'সকল জগতের | বন্ধু যাঁরা | তাঁদের শত্রুরে | ধিক্'।
—কথা, মস্তকবিক্রয়

মাতৃভূমির লাগি | পাড়া ঘুরে মরেছে,
একশো টিকিট বিলি | নিজ হাতে করেছে।
—খাপছাড়া, ৩৫

এখানে পিতৃ ও মাতৃ শব্দের উচ্চারণ যথাক্রমে পিত্রি ও মাত্রি। বাংলা ছন্দের রাজ্যে নেতৃত্ব ও নেত্রীত্ব অভিন্ন। কারণ বাংলা উচ্চারণে নেতৃ ও নেত্রী দুএরই উচ্চারণ নেত্রি।

বলা প্রয়োজন যে, রাবীন্দ্রিক মাত্রাবৃত্ত অর্থাৎ সরল কলামাত্রিক

রীতির ছন্দেই ঋকারান্ত বর্ণের এই দ্বিবিধ প্রয়োগ চলে। বিশিষ্ট কলামাত্রিক বা দলমাত্রিক রীতির ছন্দে ঋকারান্ত বর্ণের বৈকল্পিকতা স্বীকার নিষ্প্রয়োজন। চিত্রা কাব্যের 'স্বর্গ হইতে বিদায়' কবিতায় আছে—

মর্ত্যভূমি স্বর্গ নহে,
সে যে মাতৃভূমি,…স্বর্গে তব বহুক অমৃত।

এখানে মাতৃ ও অমৃত শব্দের উচ্চারণ লঘুপ্রযত্ন কি না সে বিচার অনাবশ্যক। বলা বাহুল্য এটা বিশিষ্ট কলামাত্রিক রীতির ছন্দ। সত্যেন্দ্রনাথের তীর্থসলিল কাব্যের স্বদেশবন্দনা কবিতায় আছে—

স্বদেশ, আমার মাতৃভূমি,
স্বাধীনচেতার ধাত্রী তুমি,
সবে গাহি তোমার জয়-গান।

এখানে মাতৃ ও ধাত্রী শব্দ সমগোত্র ও সমমাত্রক; উভয়ত্রই ব্যঞ্জন-সংঘাত সুস্পষ্ট। বলা বাহুল্য এটা দলমাত্রিক রীতির ছন্দ। বস্তুত 'মাতৃভূমি'কে 'মাত্রিভূমি' রূপে উচ্চারণ করলে কোনো রীতির ছন্দেই রসনা ঠোকর খায় না।

মালঝাঁপ—পয়ারেরই প্রকারভেদ মাত্র। যে পয়ারবন্ধের প্রথম তিন পর্বে মিল থাকে, প্রাচীন পরিভাষায় তাকেই বলা হয় মালঝাঁপ। রবীন্দ্রনাথ এই নামটি ব্যবহার করেন নি, কিন্তু তার দৃষ্টান্ত দিয়েছেন (পৃ ১১, ৩৮)। যথা—

বাজে তীর | পড়ে বীর | ধরণীর | পরে।

তিনি মনে করেন, এ ছন্দ 'যুক্ত-অক্ষরের ভার সয় না'। কিন্তু প্রাচীন বাঙালি কবিরা মালঝাঁপ পয়ারেও যুক্তবর্ণের বোঝা চাপিয়ে দিতে দ্বিধা করতেন না। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কাব্য (দ্বিতীয় খণ্ড, কোটালের উৎসব) থেকে একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

জয় কালি ভাল ভালি যত ঢালী গাজে।
দেই লম্ফ ভূমিকম্প জগঝম্প বাজে॥
ডাকে ঠাট কাট কাট মালসাট মারে।
কম্পমান বর্ধমান বলবান্ ভারে॥

এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য 'ধরিত্রীর চক্ষুনীর' ইত্যাদি দৃষ্টান্তের আলোচনা (পৃ ২৬১)।

মালা (পৃ ১৫৭-৫৮)—যথাস্থানে পাদটীকায় এ ছন্দের পরিচয় দেওয়া হয়েছে।

মালিনী (পৃ ১৩৩)—এই সুবিদিত সংস্কৃত ছন্দটির প্রতিপংক্তিতে থাকে পনরটি বর্ণ বা অক্ষর। আট বর্ণের পরে অর্ধযতি এবং বাকি সাত বর্ণের পরে পূর্ণযতি। প্রথম ভাগে শেষ দুটি বর্ণ গুরু, দ্বিতীয় ভাগে দ্বিতীয় ও পঞ্চম বাদে বাকি সব বর্ণই গুরু। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, মালিনী ছন্দ আসলে মন্দাক্রান্তারই রকমফের মাত্র। মালিনীর প্রথমাংশ এবং মন্দাক্রান্তার দ্বিতীয়াংশ প্রায় একরূপ; পার্থক্য এই যে, মন্দাক্রান্তার দ্বিতীয়াংশে পাঁচটি লঘুর পরে একটি গুরু কিন্তু মালিনীর প্রথমাংশে ছয়টি লঘুর পরে দুটি গুরু। মালিনীর দ্বিতীয়াংশ এবং মন্দাক্রান্তার তৃতীয়াংশ অবিকল এক। দ্বিজেন্দ্রনাথের পূর্বোদ্ধৃত মন্দাক্রান্তা শ্লোকটিকে মালিনীতে রূপান্তরিত করলেই এই দুই ছন্দের পার্থক্য ও সাদৃশ্য বোঝা সহজ হবে।—

রহ যদি তুমি, টঙ্কা, | না রহে কোন জ্বালা।
কি করিব শিখি' বিদ্যা, | খালি ভস্মে ঘি ঢালা॥
তব দরশন-ইচ্ছা, | কিন্তু-পাথেয় নাস্তি-।
চলিব কি, পদ বাঁধা, | এ কি দৈবের শাস্তি-॥

বলা বাহুল্য, 'কোন' 'দরশন' 'পদ' 'দৈবের' প্রভৃতি শব্দের শেষ বর্ণটির উচ্চারণ হবে অকারান্ত।

যতি (পৃ ১৯৭)—ছন্দের ধ্বনিপ্রবাহ অবিচ্ছিন্ন নয় ; সৌষম্যসৃষ্টির প্রয়োজনে তাকে কোনো বিশেষ পদ্ধতিতে সুনিয়মিতভাবে খণ্ডিত করা হয়। ওই খণ্ডনেরই পারিভাষিক নাম যতি। ছেদ, বিরাম, বিরতি প্রভৃতি যতিরই নামান্তর।

বিরামের গুরুত্বভেদে যতির তারতম্য ঘটে। 'পদ্যছন্দের প্রধান লক্ষণ পংক্তিসীমানায় বিভক্ত তার কাঠামো। নির্দিষ্টসংখ্যক ধ্বনিগুচ্ছে এক-একটি পংক্তি সম্পূর্ণ। সেই পংক্তিশেষে একটি করে বড়ো যতি' (পৃ ১৫৩)। পংক্তিসীমায় অবস্থিত এই 'বড়ো যতি'কে বলা যায় 'পুরো যতি' (পৃ ১০০), অর্থাৎ পূর্ণযতি। উল্লিখিত প্রত্যেক 'ধ্বনিগুচ্ছ' অর্থাৎ পর্বের পরেও একটি করে যতি থাকে (পৃ ৬৩, ৭৪, ১৯৩)। এসব যতির গুরুত্ব পূর্ণযতির তুলনায় কম। তাই এ-রকম যতিকে বলা যায় লঘুযতি বা পর্বযতি। আরও এক রকম যতি আছে যার গুরুত্ব পূর্ণযতি ও লঘুযতির মধ্যবর্তী, তাকে বলা যায় 'আধা যতি' (পৃ ১০০) বা অর্ধযতি। আঠার মাত্রার দীর্ঘপয়ারে আট মাত্রার পরে থাকে একটি 'স্পষ্ট যতি' (পৃ ১০২) এবং বাকি দশ মাত্রার পরে পূর্ণযতি। চোদ্দ মাত্রার সাধারণ পয়ারেও পংক্তির মাঝখানে অর্থাৎ আট মাত্রার পরে একটি করে যতি থাকে যা লঘুযতির চেয়ে অপেক্ষাকৃত 'স্পষ্ট' অথচ যার গুরুত্ব পূর্ণযতির সমান নয় (পৃ ৭০-৭১)। এই অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট যতিকেই বলা যায় অর্ধযতি।

সাধারণ পয়ারপংক্তির পর্ব বা পদক্ষেপ চারটি (পৃ ৩৫)। যথা—

মহাভার | তের কথা || অমৃত স | মান।

পংক্তিশেষে পূর্ণযতি ; প্রথম ও তৃতীয় পর্বের পরে লঘুযতি। দ্বিতীয় পর্বের পরবর্তী যতিটি প্রথম ও তৃতীয় যতির চেয়ে স্পষ্টতর অথচ তা পূর্ণযতির সমকক্ষ নয়। এই যতিটিই অর্ধযতি। পূর্ণযতির দ্বারা নির্দিষ্ট ছন্দোবিভাগেরই নাম পংক্তি। তেমনি অর্ধযতির বিভাগই হচ্ছে পদ।

পয়ার দ্বিপদী, তার অর্ধযতি একটি। ত্রিপদীতে অর্ধযতি দুটি (পৃ ১১৯)। যেমন—

যেন ধীর | ধ্রুবতারা ||
কহে কথা | ভাষাহারা ||
জনহীন | সাঁঝে।

কাজেই অর্ধযতিকে পদযতিও বলা যায়।

পর্বযতি অপেক্ষাকৃত লঘু, সেজন্যে অনেক সময় পর্বযতির লোপ ঘটানো যায়। অর্থাৎ পর্বযতির নির্দিষ্ট স্থানে না থেমে একেবারে পদযতিতে এসে হাঁফ ছাড়া যায়। দৃষ্টান্ত এই (পৃ ৭০)।—

নিঃস্বতাসং × কোচে দিন || অবসন্ন | হলে।

এখানে প্রথম পর্বের শেষে ধ্বনিপ্রবাহ বিরত হয়নি, অর্থাৎ লঘুযতি লুপ্ত হয়েছে। অর্ধযতির লোপ সাধারণত ঘটে না। সেজন্যে ছন্দের পরিচয়ে অনেক ক্ষেত্রে পর্ববিভাগের কথা না বলে একেবারে পদবিভাগের কথাই উল্লেখ করা হয়। ছন্দের পদবিভাগ পর্ববিভাগের চেয়ে গুরুতর। কিন্তু পর্ববিভাগের কথা মনে না রাখলে ছন্দের সৌষম্য-নির্ণয় সম্ভব নয়।

পদের যেমন পর্ববিভাগ আছে, পর্বেরও তেমনি উপবিভাগ আছে। পর্বের এই উপবিভাগকেই বলা যায় উপপর্ব। লক্ষ্য করলে প্রত্যেক পর্বের মধ্যেই একটি বা দুটি করে ক্ষীণ যতির অস্তিত্ব অনুভব করা যায়। পর্বের অন্তস্থিত যতির চেয়েও তার মধ্যস্থিত যতি লঘুতর। এই লঘুতর যতিকে বলা যায় উপযতি। উপযতিই পর্বকে উপপর্বে বিভক্ত করে। উপপর্বের আয়তন দুই মাত্রার কম বা তিন মাত্রার বেশি হয় না। উপপর্বই ক্ষুদ্রতম ছন্দোবিভাগ। এইজন্যই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, দুই এবং তিন মাত্রার বিভাগ হচ্ছে সকল ছন্দের মূল (পৃ ১৪২) বা রূঢ়িক উপাদান (পৃ ১২৫)। দুই মাত্রার বিভাগকে বলা হয়েছে সমমাত্রার

চলন এবং তিন মাত্রার বিভাগকে বলা হয়েছে অসমমাত্রার চলন (পৃ ৩৫-৩৬)। এখানে চলন মানে উপপর্ব। এই চলন বা উপপর্ব নির্ণীত হয় যে ক্ষীণ বিরতির দ্বারা, তারই নাম উপযতি। যথা—

ফিরে : ফিরে | আঁখি : নীরে | পিছু : পানে | চায়।

এখানে প্রতি পূর্ণপর্বে দুই মাত্রার পরে উপযতি। প্রত্যেক পূর্ণপর্ব দুটি করে দুইমাত্রার উপপর্ব নিয়ে গঠিত। তুলনীয় 'ধরণীর আঁখিনীর' ইত্যাদির বিশ্লেষণ (পৃ ৩৮)।

নয়ন : ধারায় | পথ সে : হারায় | চায় সে : পিছন | পানে।

প্রতি পূর্ণপর্ব দুটি করে তিনমাত্রার উপপর্বে বিভক্ত। উপপর্ববিভাগ উপযতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। শেষ উপপর্বটি অপূর্ণ।

যতই : চলে | চোখের : জলে | নয়ন : ভরে | ওঠে।

প্রতি পূর্ণপর্বে দুই উপপর্ব। প্রথমটি তিনমাত্রার, দ্বিতীয়টি দুইমাত্রার। এখানেও শেষ উপপর্বটি অপূর্ণ।

লঘুযতির ন্যায় উপযতিও কখনও কখনও লুপ্ত হয়। দৃষ্টান্ত পরে দ্রষ্টব্য (পৃ ২৯১)।

এই গ্রন্থে তারতম্যভেদে যতির পূর্ণ অর্ধ লঘু ও উপ এই চার শ্রেণী প্রত্যক্ষত স্বীকৃত হয়নি। পরোক্ষ স্বীকৃতির প্রমাণ আছে। রবীন্দ্রনাথের ছন্দোবিভাজনপ্রণালী থেকেই সে প্রমাণ পাওয়া যায়। পংক্তিশেষের বড়ো যতির কথা স্বতঃস্বীকার্য। পংক্তিমধ্যবর্তী স্পষ্টযতি বা অর্ধযতির কথাও আছে এই গ্রন্থে (পৃ ১০২)।—

মন চায় | চলে আসে | কাছে ||
তবুও পা | চলে না।

পংক্তিশেষে পূর্ণযতি। তৃতীয় পর্বটি অপূর্ণ, তার পরেই স্পষ্ট- বা অর্ধ-যতি। আর প্রতিপর্বের পরবর্তী বিভাজনচিহ্ন লঘুযতির সূচক।

নয়নে | নিঠুর | চাহনি ||

হৃদয়ে | করুণা | ঢাকা।

'ঢাকা'র পরে পূর্ণযতি, 'চাহনি'র পরে অর্ধযতি। বাকি যতিগুলি উপপর্বের পরিচায়ক, সুতরাং উপযতি (পৃ ১০৩)।

অন্তর তার | কী বলিতে চায় | চঞ্চল চর | ণে।

এখানে উপপর্ববিভাগ দেখানো গেল না, কারণ উপযতিগুলি সবই লুপ্ত হয়েছে। বিভাজনচিহ্নগুলি সবই পর্বযতি বা লঘুযতির পরিচায়ক।

রবীন্দ্রনাথের মতে বাংলা ছন্দে যতি শুধু ছন্দোবিভাজনের কাজেই লাগে না, তাকে কালব্যাপ্তি দিয়ে মাত্রাপূরণের কাজেও লাগানো হয়। 'সকল ভাষারই যতি আছে, কিন্তু যতিকে বাটখারাস্বরূপ করে ছন্দের ওজনপূরণ বাংলা ছন্দ ছাড়া আর কোনো ছন্দে আছে কি না জানিনে' (পৃ ১২৬)। কিন্তু ইংরেজি এবং সংস্কৃত ছন্দেও যতির কালব্যাপ্তি তথা মাত্রাপূরণের কাজ আছে বলে তিনি মনে করতেন। O Goddess ইত্যাদি পংক্তিদুটির বিশ্লেষণে তিনি বিরামমাত্রার অস্তিত্ব ধরে নিয়েছেন (পৃ ৩৯)। এই প্রসঙ্গে One more unfortunate এবং When we two parted ইত্যাদি দৃষ্টান্তদুটির বিশ্লেষণও লক্ষিতব্য (পৃ ১৮)। O Wild West Wind ইত্যাদি দৃষ্টান্তটিতেও সিলেব্‌ল্‌মাত্রা গণনার সঙ্গে যতিমাত্রা গণিত হয়েছে (পৃ ৪৬); বস্তুত এটিতে যতিমাত্রা গণনার অবকাশ নেই। সংস্কৃত ছন্দের মধ্যে 'বদসি যদি কিঞ্চিদপি' ইত্যাদি দৃষ্টান্তটিতে দুই যতিমাত্রার অবকাশ দেখানো হয়েছে (পৃ ১২৬); অন্যত্র কিন্তু এক যতিমাত্রাই ধরা হয়েছে (পৃ ১৫-১৬)। বলা বাহুল্য দ্বিতীয়টিই স্বীকার্য।

বলা সংগত যে, যতিমাত্রার স্বাভাবিক স্থান পংক্তির অন্তে। কখনও কখনও পদের অন্তেও যতিমাত্রা দেখা যায়। যেমন—

পর্ণের পাত্রে- ||
ফাল্গুন রাত্রে- ||
মুকুলিত মল্লিকা মাল্যের বন্ধন।
—গীতবিতান (তৃতীয় সং), পৃ ৫০৫

এভাবে পদের অন্তে যতিমাত্রার অবকাশ রাখার দৃষ্টান্ত সাধারণত দেখা যায় কলামাত্রার ছন্দেই। পর্বের অন্তে এ-রকম অবকাশের দৃষ্টান্ত বিরল।

রবীন্দ্রনাথের মতে 'যতিকে কেবল বিরতির স্থান না দিয়ে তাকে পূর্তির কাজে লাগাবার অভ্যাস আরম্ভ হয়েছে আমাদের ছড়ার ছন্দ থেকে' (পৃ ১২৬)। ছড়ার ছন্দে পর্বে-পর্বে এমন কি উপপর্বে-উপপর্বে মাত্রাপূরণের অবকাশ থেকে যাবার কথা নানা স্থানেই বলা হয়েছে (পৃ ৬২-৬৩)। দ্রষ্টব্য 'ফাঁক'।

যুগ্মধ্বনি (পৃ ৫২)— এটি মূলত বর্তমান সম্পাদকের প্রযুক্ত পরিভাষা। ধ্বনি মানে সিলেব্‌ল্‌ এবং যুগ্মধ্বনি মানে সেই সিলেব্‌ল্‌ যার অন্তে আশ্রিত স্বর বা ব্যঞ্জন অবস্থিত থাকে। যথা— বৈ (=বই্), গৌ (=গউ্), যাও্, ঢং, উঃ, বিদ্, দ্বান্। সুতরাং যুগ্মধ্বনি (closed syllable) এবং যুক্তাক্ষর (compound letter) একার্থক নয়। 'ছন্দ' শব্দের 'ছন্' যুগ্মধ্বনি, 'দ' অযুগ্মধ্বনি ; আর 'ছ' অযুক্তাক্ষর এবং 'ন্দ' যুক্তাক্ষর। ছন্দোবিশ্লেষণে ছন্+দ বিভাগই স্বীকার্য, ছ+ন্দ বিভাগ বর্জনীয়। কারণ সিলেব্‌ল্‌বিভাগই উচ্চারণসম্মত, অক্ষরবিভাগ তা নয়। অক্ষর উচ্চারণের অবিকল প্রতিরূপ নয়। বস্তুত বাংলায় অক্ষরগণনা হয় কৃত্রিম লিপিরূপ দেখে। তাই বাংলায় 'পর্বত' শব্দে তিন অক্ষর অথচ 'শরবত' শব্দে চার অক্ষর গণিত হয়, যদিও উভয় শব্দেই সিলেব্‌ল্‌সংখ্যা দুই। 'কাশ্মীর' শব্দে তিন অক্ষর, 'পশমী' শব্দেও তাই। অথচ সিলেব্‌ল্‌সংখ্যা উভয়ত্রই দুই।

যুগ্মধ্বনি শব্দটিকে উল্লিখিত পারিভাষিক অর্থ থেকে ভিন্ন অর্থে গ্রহণ করবার আশঙ্কা রয়েছে। এই গ্রন্থেও তার নিদর্শন আছে। 'উদয়' শব্দে দুই ধ্বনি (syllable), উ+দয়্; উ অযুগ্ম (open) এবং দয়্ যুগ্ম (closed)। 'দিগন্ত' শব্দে তিন ধ্বনি, দি+গন্+ত; দি ও ত অযুগ্ম এবং গন্ যুগ্ম। 'উদয়'এর দয়্ শব্দান্তস্থিত এবং তার উচ্চারণ প্রসারিত, সুতরাং দুই মাত্রা। 'দিগন্ত' শব্দের গন্ শব্দমধ্যবর্তী এবং তার উচ্চারণ সংকুচিত, সুতরাং এক মাত্রা। 'উদয়' শব্দে অয়্ এবং 'দিগন্ত' শব্দে অন্ (পৃ ৫২-৫৩) উচ্চারণসম্মত ধ্বনিবিভাগ অর্থাৎ সিলেব্‌ল্ বলে গণ্য নয়। তা ছাড়া 'যুগ্মধ্বনি শব্দটার পরিবর্তে ইংরেজি সিলেব্‌ল্ শব্দ ব্যবহার' (পৃ ৫৩) করাও চলে না; কারণ সিলেব্‌ল্ শব্দ অযুগ্ম ও যুগ্ম উভয় প্রকার ধ্বনিকেই বোঝায়, শুধু যুগ্মধ্বনিকে নয়।

যুক্তাক্ষর বোঝানো পারিভাষিক যুগ্মধ্বনি শব্দের অভিপ্রেত নয়। কিন্তু এই গ্রন্থের নানা স্থানেই যুগ্মধ্বনি শব্দটি যুক্তাক্ষর অর্থেই গৃহীত হয়েছে।

দুইজনে জুঁই তুলতে যখন
গেলেম বনের ধারে।

ইত্যাদি দৃষ্টান্তটিতে দুই্, জুঁই্, তুল্, খন্, লেম্, নের্ প্রভৃতি আশ্রিতান্ত ধ্বনিকেই বলা হয়েছে যুগ্মধ্বনি (পৃ ৫৬)। এটাই হচ্ছে এই পারিভাষিক শব্দটির অভিপ্রেত। বলা বাহুল্য দুই্, জুঁই্, তুল্ প্রভৃতি যুগ্মধ্বনিগুলি যুক্তাক্ষর নয়। কিন্তু অন্যত্র আছে 'যুক্ত-অক্ষর অর্থাৎ যুগ্মধ্বনি' (পৃ ৬৬)। এখানেই সংশয় দেখা দেয়। কেননা কোনো শব্দে যুক্তাক্ষর থাকলেও যুগ্মধ্বনি না থাকতে পারে, আবার যুক্তাক্ষর না থাকলেও যুগ্মধ্বনি থাকতে পারে। ছন্দ শব্দে যুক্তাক্ষর (ন্দ) ও যুগ্মধ্বনি (ছন্) দুই-ই আছে। কিন্তু ক্ষমা ও গ্লানি শব্দে যুক্তাক্ষর (ক্ষ, গ্লা) আছে, যুগ্মধ্বনি নেই। আবার শিউলি ও টোটকা শব্দে যুক্তাক্ষর নেই, কিন্তু যুগ্মধ্বনি (শিউ্,

টোট্) আছে। সুতরাং 'যুক্ত-অক্ষর অর্থাৎ যুগ্মধ্বনি' কথায় মনে সংশয় জাগে যুগ্মধ্বনি শব্দটি হয়তো পারিভাষিক অর্থে গৃহীত হয়নি। অতঃপর যুক্তধ্বনি (পৃ ৮০), যুক্তবর্ণের ধ্বনি (পৃ ১২২), যুগ্মবর্ণ (পৃ ৬৮) প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ দেখে সন্দেহ থাকে না যুগ্মধ্বনি শব্দটি যুক্তাক্ষর অর্থেই প্রযুক্ত হয়েছে। অক্ষর ও বর্ণ একার্থক। উভয়েরই একটি অর্থ letter। যথা—নিরক্ষর, বর্ণপরিচয়।

যুক্তাক্ষর তথা যুক্তবর্ণ বলতে বোঝায় সংযুক্ত letter। রবীন্দ্রনাথ যুগ্মধ্বনি শব্দটিও ওই অর্থেই গ্রহণ করেছেন। তাই যুগ্মধ্বনি, যুক্তধ্বনি, যুগ্মবর্ণ ও যুক্তবর্ণ পরস্পরের প্রতিশব্দরূপে গণ্য হয়েছে। শুধু তাই নয়, তিনি ধ্বনির প্রতিশব্দ হিসাবে স্বর কথাটিকেও অক্ষর, বর্ণ বা letter অর্থে স্বীকার করে নিয়েছেন। তাই যুক্তাক্ষর অর্থে যুগ্মস্বর কথাটিও ব্যবহৃত হয়েছে (পৃ ৭২-৭৩)। বলা প্রয়োজন যে, যুগ্মস্বর কথাটির পারিভাষিক অর্থ closed vowel বা diphthong (পৃ ১৭১ পাদটীকা ৪ এবং পৃ ১৮১ পাদটীকা ২)। যথা—ঐ (=অই্), ঔ (=অউ্), অও্, ইউ্।

অযুগ্মধ্বনি ও যুগ্মধ্বনি, এই শব্দদুটি অযুক্তাক্ষর ও যুক্তাক্ষর অর্থে গৃহীত হবার সম্ভাবনা আছে বলে ছন্দের আলোচনায় এ দুটির পরিবর্তে অন্য পরিভাষা গ্রহণ করাই বাঞ্ছনীয়। অযুগ্মধ্বনি-যুগ্মধ্বনি অপেক্ষা মুক্তদল-রুদ্ধদল নাম দুটি সুষ্ঠুতর। তাতে অর্থগত অনিশ্চয়তা ঘটবার আশঙ্কা থাকে না। তেমনি অযুগ্মস্বর-যুগ্মস্বর না বলে মুক্তস্বর-রুদ্ধস্বর বলাই সংগত। অর্থাৎ অ আ ই উ এ ও প্রভৃতি একক স্বরকে মুক্তস্বর (open vowel) এবং ঐ (=অই্, ওই্), ঔ (=অউ্, ওউ্), অও্, আই্, ইউ্, উই্ প্রভৃতি জোড়াস্বরকে রুদ্ধস্বর (closed vowel) বলা যেতে পারে। দ্রষ্টব্য 'অক্ষর', 'দল', 'ধ্বনি' ও 'সিলেব্ল্।'

সিলেব্ল্এর মাত্রাপরিমাণ নির্ণয়-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,

'বাংলায় হসন্ত শব্দের পূর্ববর্তী স্বর দীর্ঘ হয়' অর্থাৎ 'প্রাক্‌হসন্ত স্বরকে দুই মাত্রার পদবি দেওয়া' হয় (পৃ ৫৩)। যেমন জ-ল্ ও চাঁ-দ্ শব্দের অ এবং আ দুটি স্বরই দীর্ঘ অর্থাৎ দ্বিমাত্রক। শুধু বাংলায় নয়, সংস্কৃত এবং প্রাকৃতেও তাই। পিঙ্গলাদি সমস্ত প্রাচীন ছান্দসিকের মতেই যুক্তবর্ণের (তথা হস্ বর্ণের) পূর্ববর্তী বর্ণ গুরু অর্থাৎ দ্বিমাত্রক। যেমন— দি-ক্ ও চ-ন্দ্র শব্দের দি ও চ দ্বিমাত্রক। দিক্ শব্দের শুধু ইকার- বা দি-টুকুকে দ্বিমাত্রক বলে গণ্য না করে সমস্ত দিক্ ধ্বনিটাকেই দ্বিমাত্রক বলে গণ্য করা সংগততর, কেননা হসন্ত ক্ অংশটাও ওই দুইমাত্রা-পরিমিত কালের মধ্যেই উচ্চারিত হয়। জল শব্দটা ইংরেজি মতে এক সিলেব্‌ল্ বটে, কিন্তু রুদ্ধ (closed) সিলেব্‌ল্; এবং বাংলা কলামাত্রা রীতির ছন্দে এটি দ্বিমাত্রক। কাশীরাম-এর 'রাম'ও দ্বিমাত্রক। কারণ বিশিষ্ট কলামাত্রার ছন্দে শব্দের অন্তস্থিত রুদ্ধদল দ্বিমাত্রকই হয়। তাই উদয় শব্দের দয়্ দ্বিমাত্রক; কিন্তু দিগন্ত শব্দের গন্ একমাত্রক, কারণ এটি শব্দান্তস্থিত নয়। ঐ অর্থাৎ অই্ দ্বিমাত্রক, কিন্তু শুভ্র শব্দের শুভ্ এবং শঙ্খ শব্দের শঙ্ একমাত্রক। এইভাবে হিসাব করলে 'উদয়দিগন্তে ঐ শুভ্র শঙ্খ বাজে' এই লাইনটাতে চোদ্দ মাত্রা পাওয়া যাবে, অক্ষরগণনা নিষ্প্রয়োজন—এ কথা বলাই 'ছন্দোবিৎ'এর অভিপ্রায়। বস্তুত এই লাইনটা নিয়ে কারও কোনো খটকা (পৃ ৫৪) লাগেনি।[১] ছন্দোবিশ্লেষণপ্রণালীর পার্থক্যবশতই কবির এই সংশয় দেখা দিয়েছিল।

১ "আমি অবশ্য এ লাইনটিকে কান পেতেও পড়েছি, নিয়ম পেতেও পড়েছি। ... কান পেতে ও-লাইনটিতে কিছুমাত্র ত্রুটি পাইনি এবং নিয়ম পেতেও আমার কিছুমাত্র খটকা লাগেনি।... বরং অক্ষরবৃত্ত ছন্দের একটি নিখুঁত ও সুন্দর নিদর্শন হিসেবেই আমি অগ্রহায়ণের প্রবন্ধে এই লাইনটি গ্রহণ করেছি।"

—বিচিত্রা, ১৩৩৮ মাঘ : ছন্দ-জিজ্ঞাসা, ১ম পর্ব : পৃ ১১১

'বাংলায় হসন্ত শব্দের পূর্ববর্তী স্বর দীর্ঘ হয়,' এই নিয়মটি সার্বত্রিকও নয়। 'উদয়দিগন্তে ঐ' ইত্যাদি লাইনটিতে দয়্ এবং ঐ, এই দুই স্থলে নিয়মটি প্রযোজ্য, কিন্তু গন্, শুভ্ ও শঙ্ এই তিন স্থলে এটি প্রযোজ্য নয়। 'একটি কথা এতবার হয় কলুষিত' এই লাইনটিতে (পৃ ৬০) 'বার্' এবং 'হয়্' এই দুই স্থলে ওই নিয়ম খাটে, কিন্তু 'এক্‌টি' শব্দে খাটে না। 'চিমনি ভেঙে গেছে দেখে' ইত্যাদি দৃষ্টান্তটিতে চিম্‌নি শব্দের প্রয়োগপ্রণালীও এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় (পৃ ২৭৬)। 'মন্ বেচারির কি দোষ্ আছে' (পৃ ১৭০), 'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা' (পৃ ১৪৩), এইজাতীয় দলমাত্রিক রীতির ছন্দেও সাধারণত 'প্রাক্‌হসন্ত স্বরকে দুই মাত্রার পদবি' দেওয়া হয় না।

লয়—গানে সুরপ্রবাহের কালব্যাপ্তিগত গতিসমতার নাম লয় (tempo)। সুরপ্রবাহের গতিবেগের তীব্রতাভেদে লয়কে দ্রুত মধ্য বিলম্বিত প্রভৃতি বিশেষণে নির্দিষ্ট করা হয়। দ্রুত লয়কেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'দুরন্ত' (পৃ ৩৯)।

গীতগতির সমতা অর্থাৎ লয় রক্ষার যে ব্যবস্থা, তারই নাম তাল। ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত হলেও লয় ও তাল অভিন্ন নয়; তাল লয়ের সহায়ক ও সংরক্ষক। এই গ্রন্থে লয় ও তাল শব্দদুটি সর্বতোভাবে গীতশাস্ত্রানু-মোদিত পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হয়নি।

এই গ্রন্থের কোনো কোনো উক্তিতে মনে হয় লয় ও তাল একই বস্তু। যেমন, এক জায়গায় আছে, 'কাব্যে ছন্দের যে কাজ, গানে তালের সেই কাজ' (পৃ ২১); অন্যত্র আছে, 'কবিতায় যেটা ছন্দ, সংগীতে সেইটেই লয়' (পৃ ২৩)। এই দুই উক্তি থেকে তাল ও লয়ের অভিন্নতাবোধই জন্মে। 'চৌপদীতে কাওয়ালির লয়ে ঝোঁক দিতে হয়' (পৃ ১২), এই মন্তব্যও উক্ত অনুমানেরই সমর্থক। প্রাকৃত-বাংলা ছন্দকে এক স্থানে বলা হয়েছে 'তিনমাত্রা লয়ের ছন্দ'

(পৃ ৬৩), তাকেই অন্যত্র বলা হয়েছে 'তিনমাত্রার তাল' (পৃ ২১৭)। আবার কোনো কোনো স্থলে লয়-তালের বিরোধও কল্পিত হয়েছে। যেমন, 'লয়কে যদি মানি তবে তালের সঙ্গে বিবাদ ঘটিলেও ভয় করিবার প্রয়োজন নাই' (পৃ ২৩), কিংবা 'লয়ের হিসাব দিলেও তালের হিসাব মেলে না' (পৃ ২৬)।

বস্তুত রবীন্দ্রনাথ 'লয়' কথাটিকে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 'স্পন্দন' (পৃ ৩৩) বা rhythm অর্থে প্রয়োগ করেছেন। ছন্দের এই রিদ্‌ম্‌কে স্পষ্ট করেই বলা হয়েছে 'ছন্দঃস্পন্দন' (পৃ ১৪৭)। ছন্দোবদ্ধ রচনার মধ্যে যে 'প্রাণের স্পন্দন চলতে থাকে, আমাদের চিৎস্পন্দন তার লয়টাকে স্বীকার করে, ঘটতে থাকে গতির সঙ্গে গতির সহযোগিতা বাতাসের হিল্লোলের সঙ্গে সমুদ্রের তরঙ্গের মতো' (পৃ ১৪৯)। এই স্পন্দন, হিল্লোল বা তরঙ্গই রবীন্দ্রস্বীকৃত অর্থে লয়ের মূলকথা। বেদমন্ত্রে যে ছন্দ প্রথম দেখা দিল, তার 'ক্রিয়া কেবল জ্ঞানে নয়, তা প্রাণে মনে, স্মৃতির মধ্যে তা চিরকাল স্পন্দিত হয়ে বিরাজ করে। ছন্দের এই গুণ' (পৃ ১৪৯)। অর্থাৎ স্পন্দন বা রিদ্‌ম্‌ই ছন্দের প্রধান গুণ। এই স্পন্দনগুণ যে-গদ্যরচনার প্রধান বিশিষ্টতা, সেই রিদ্‌মিক প্রোজই (পৃ ২১৮) গদ্যকবিতার বাহন। আর, এইজাতীয় গদ্যরচনার স্পন্দনলীলাকে বলা হয়েছে 'গদ্যছন্দ'।

এইজন্যই বলা হয়েছে, গদ্যকবিতার "মধ্যে ছন্দ নেই বললে অত্যুক্তি হবে, ছন্দ আছে বললেও সেটাকে বলব স্পর্ধা" (পৃ ২০৫)। এ কথার মানে গদ্যকাব্যে পদ্যের মতো 'নিশ্চিত ছন্দ' নেই, আছে তার 'আভাস'-মাত্র (পৃ ১৫২, ২০৫)। অর্থাৎ গদ্যকাব্যে সুনিয়মিত ছন্দ নেই; কিন্তু ছন্দের স্পন্দনলীলাটুকু, তার রিদ্‌ম্‌টুকু আছে। তাকে অন্যত্র বলা হয়েছে 'ছন্দের গতিলীলা' (পৃ ১৫২)। আবার রিদ্‌ম্‌ অর্থে স্পন্দন শব্দের পরিবর্তে 'ভঙ্গি' শব্দটিও ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন, কারুবিচারে

'তরঙ্গিত ভঙ্গিটাই বিশেষ আখ্যা পেয়ে থাকে' (পৃ ৮৩), কিংবা 'ভঙ্গি নিয়েই ছন্দ' (পৃ ৮৫)। আর, সঙ্গে সঙ্গে ভঙ্গির পার্থক্যেই লয়ের বিচার করা হয়েছে। এই যে ঢেউখেলানো বা তরঙ্গিত ভঙ্গি, তাকে কখনও বলা হয়েছে গতিভঙ্গি (পৃ ৮৩), কখনও বলা হয়েছে চলনের ভঙ্গি (পৃ ৮৭)। চলন কথার প্রতিশব্দ পদক্ষেপ (পৃ ৩৪)। চলন ও পদক্ষেপ, দুএরই মানে কখনও পর্ব, কখনও উপপর্ব। চলন বা পদক্ষেপের আয়তনভেদে তথা বিভিন্ন আয়তনের সমাবেশভেদে ছন্দে লয়ের অর্থাৎ রিদ্‌ম্‌এর পার্থক্য ঘটে (পৃ ৪২)। এইজন্যই চলন বা পদক্ষেপের ভঙ্গিকে বলা হয়েছে 'পা-ফেলার লয়' (পৃ ৬২)।

চলন বা পদক্ষেপের আয়তন- ও সমাবেশ-গত বৈচিত্র্যের ফলে রিদ্‌ম্‌ বা লয়ের যে বৈচিত্র্য ঘটে, তার বহু দৃষ্টান্ত আছে ৪২-৪৩ এবং ৮৮-৯১ পৃষ্ঠায়। 'বিষম মাত্রার লয়' (পৃ ১৯) কথার দ্বারাও বোঝা যায় পদক্ষেপ- বা চলন-ভঙ্গিরই নামান্তর লয়। এই চলনভঙ্গি বা রিদ্‌ম্‌ অর্থে লয় শব্দের ন্যায় 'ছন্দ' কথাটিরও বহুল প্রয়োগ দেখা যায় এই গ্রন্থে। এটাই স্বাভাবিক, রিদ্‌ম্‌ই ছন্দের প্রাণ। তাই, দুইমাত্রার ছন্দ (পৃ ৩৮) এবং দুইমাত্রার লয় (পৃ ৬৮) মানে একই। তেমনি তিনমাত্রার ছন্দ (পৃ ৬২) ও তিনমাত্রা লয়ের ছন্দ (পৃ ৬৪) অভিন্নার্থক। তাল কথাটিও অনেক স্থলেই ছন্দের স্পন্দনভঙ্গি অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে। যাকে বলা হয়েছে তিনমাত্রার ছন্দ বা তিনমাত্রা লয়ের ছন্দ (পৃ ৬২-৬৩) তাকেই অন্যত্র বলা হয়েছে তিনমাত্রার তাল (পৃ ২১৭)। বস্তুত এই সাধারণ অর্থে তাল ও লয় অভিন্ন। কিন্তু তাল শব্দটি যেখানে সংগীতশাস্ত্রের পারিভাষিক অর্থে গৃহীত হয়েছে, সেখানেই তালের সঙ্গে লয়ের 'বিবাদ' (পৃ ২৩, ২৬) সম্ভবপর। তালের একএকটি বিভাগই তার চলনভঙ্গির বা লয়ের পরিচায়ক। চিরাগত পারিভাষিক তালের কতকগুলি বাঁধা চলনভঙ্গি আছে। অথচ কাব্য বা গানের ছন্দে

নূতন নূতন চলনভঙ্গি বা লয় উদ্‌ভাবন করা সম্ভবপর। পুরাতন পারিভাষিক তাল এইসব লয়কে মানে না। তাই তালে ও লয়ে বিবাদ ঘটে এবং লয়ের হিসাব পাওয়া গেলেও সাবেক আমলের তালের হিসাব পাওয়া যায় না (পৃ ২৬)।

শাখা (পৃ ১৩২)—সমস্ত ছন্দেরই প্রাণবস্তু এক, ধ্বনির স্পন্দন অর্থাৎ রিদ্‌ম্‌। কিন্তু তার প্রকাশ বিভিন্ন, তার লীলা বিচিত্র। ধ্বনিস্পন্দনের এই লীলাবৈচিত্র্যই আমাদের কাছে ছন্দোবৈচিত্র্যরূপে প্রতিভাত হয়। ছন্দশাস্ত্রের কাজ এই বৈচিত্র্যের অন্তর্নিহিত মৌলিক নীতিগুলি আবিষ্কার করা এবং সেগুলির উপরে নির্ভর করে সমস্ত ছন্দকে সুশৃঙ্খলভাবে বিভিন্ন শ্রেণীতে সজ্জিত করা। এই শ্রেণীকেই বলা হয়েছে শাখা।

ছন্দের শ্রেণীবিভাগ করা যায় নানাভাবে, অর্থাৎ নানা প্রণালী অবলম্বন করে। রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আদর্শে বাংলা ছন্দের শ্রেণীবিভাগ করেছেন। প্রথমত তিনি উপপর্বের মাত্রাপরিমাণ অনুসারে সমস্ত ছন্দকে সমমাত্রার, অসমমাত্রার ও বিষমমাত্রার, এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন (পৃ ৩৬)। এ-রকম বিভাগে উপপর্ব রচনার মূলনীতিগুলি অর্থাৎ উপপর্বে মাত্রাসমাবেশের প্রণালীগুলিই অলক্ষিত থেকে যায়। এই বিভাগ উপপর্বের আকৃতিগত ; প্রকৃতিগত নয়। ফলে বিভিন্ন প্রকৃতির ছন্দ এক শ্রেণীর অন্তর্গত বলে গণ্য হয়। যেমন—'নিম্নে যমুনা বহে স্বচ্ছশীতল' এবং 'উন্মত্ত যমুনা বহে, আবর্তিত জল', এই দুটি দৃষ্টান্তই (পৃ ১২৩) সমমাত্রার ছন্দ, যদিও এ দুটির প্রকৃতিগত পার্থক্য প্রচুর। দ্বিতীয়ত রবীন্দ্রনাথ ভাষারীতি অনুসারে সমস্ত ছন্দকে সাধু- বা সংস্কৃত-বাংলার ছন্দ (সাধুছন্দ, পয়ারজাতীয় ছন্দ) এবং চলতি- বা প্রাকৃত-বাংলার ছন্দ (ছড়ার ছন্দ, লৌকিক ছন্দ), এই দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন। ছন্দের উপরে ভাষারীতির প্রভাব আছে সন্দেহ নেই ; কিন্তু ভাষারীতির

বিচার ছন্দের শ্রেণীবিভাগের ক্ষেত্রে অত্যাবশ্যক নয়। একই ভাষারীতিতে বিভিন্ন প্রকৃতির ছন্দ রচিত হতে পারে এবং একই প্রকৃতির ছন্দ বিভিন্ন ভাষারীতিতে রচনা করা যায়। এই গ্রন্থেও তার দৃষ্টান্ত আছে। যথা—'বেণীবন্ধ তরঙ্গিত কোন্ ছন্দ নিয়া' (পৃ ৬৮), 'ভ্রূকুটি-প্রচ্ছন্ন চক্ষু কটাক্ষিয়া চায়' (পৃ ৭০) এবং 'ছুটল কেন মহেন্দ্রের আনন্দের ঘোর' (পৃ ৭৬), এই দৃষ্টান্ত-তিনটির ছন্দোরীতি এক, কিন্তু ভাষারীতি বিভিন্ন—প্রথম দুটি সাধু, তৃতীয়টি চলতি।[১] পক্ষান্তরে 'সন্ধ্যা-আলোর মেঘের ঝালর ঢাকল অন্ধকারে' (পৃ ৭৬) এবং 'শুক্লরাতি ঢাকল মুখ মেঘাবগুণ্ঠনে' (পৃ ৭৬) একই ভাষারীতিতে রচিত, কিন্তু এ দুটির ছন্দোরীতি এক নয়। এ প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে, কোনো ছন্দোরীতিতেই অবিমিশ্র সাধু বাংলা চলে না, সর্বদাই সাধু বাংলার সঙ্গে চলতি বাংলার মিশ্রণ ঘটে থাকে। তবে সমস্ত রীতির ছন্দেই বিশুদ্ধ চলতি বাংলা চালানো সম্ভবপর (পৃ ১৩০)। তা ছাড়া অনেক ক্ষেত্রে রচনা দেখে তার ভাষারীতি নির্ণয় করা যায় না; কিন্তু মাত্রা-সমাবেশপ্রণালী দেখে তার ছন্দোরীতি নির্ণয় করা যায়। যেমন—'দিগ্‌বলয়ে নবশশিলেখা' (পৃ ৮০) এবং 'বউ কথা কও, বউ কথা কও, যতই গায় সে পাখি' (পৃ ৮৩), এ দুটি রচনা দেখে তার ভাষারীতি ঠিক করা যায় না, কিন্তু মাত্রাস্থাপনপদ্ধতির প্রতি লক্ষ্য করলে ছন্দোরীতি সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ থাকে না। শুধু ভাষা দেখে ছন্দের রীতি নির্ণয় করলে অনেক সময় ভুল করা হবে। যেমন—'অধীর বাতাস এল সকালে', 'নবারুণ চন্দনের তিলকে' (পৃ ৭৩), 'শ্রাবণের কালো ছায়া,' 'বর্ষার তমিস্রচ্ছায়া' (পৃ ১২১), ইত্যাদি রচনার ভাষারীতি দেখে এগুলিকে চলতি বাংলার ছন্দ বললে ভুল করা হবে।

১ চলতি রীতির ভাষায় সাধুছন্দের অনেক দৃষ্টান্ত আছে পরিশেষ ও পুনশ্চ কাব্যে। যথা—প্রাণ (পরিশেষ) এবং খ্যাতি (পুনশ্চ, দ্বিতীয় সংস্করণ)।

পর্ব বা উপপর্বের মাত্রাস্থাপনরীতি অনুসারে ছন্দের শ্রেণীবিভাগ করলে এইজাতীয় ত্রুটি ঘটে না। এই মাত্রাস্থাপনরীতিকেই বলা যায় ছন্দোরীতি। রবীন্দ্রনাথ বাংলা ছন্দের তিনটি রীতিকেই বলেছেন তিনটি শাখা (পৃ ১৩২)। এই তিন রীতির কথা 'মাত্রা' সংজ্ঞার পরিচয়প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে। যথা— সিলেব্‌ল্‌মাত্রিক বা দলমাত্রিক রীতি (পৃ ২৭২), সাধারণ কলামাত্রিক বা মাত্রাবৃত্ত রীতি (পৃ ২৭৬, ২৭৮) এবং বিশিষ্ট কলামাত্রিক (প্রচলিত পরিভাষায় অক্ষরবৃত্ত, অক্ষরমাত্রিক বা অক্ষরগোনা) রীতি (পৃ ২৭৬-৭৭)। দৃষ্টান্ত দিলেই বিষয়টা স্পষ্ট হবে। 'সতত হে নদ তুমি' ইত্যাদি লাইন-দুটি সুপরিচিত 'অক্ষরগোনা' পয়ার (পৃ ১৪২)। অক্ষরগোনা পয়ার মানে অক্ষরমাত্রার (অর্থাৎ বিশিষ্ট কলামাত্রার, পৃ ২৭৩-৭৬) পয়ার। 'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা' ইত্যাদি লাইন-দুটিও পয়ার; কিন্তু সিলেব্‌ল্‌মাত্রার পয়ার, অক্ষরমাত্রার নয় (পৃ ১৪৩)। 'নিম্নে যমুনা বহে' ইত্যাদি লাইন-দুটিও পয়ার (পৃ ১৮১); কিন্তু সাধারণ কলামাত্রার পয়ার, অক্ষরমাত্রারও (অর্থাৎ বিশিষ্ট কলামাত্রারও) নয়, দলমাত্রারও নয়। অর্থাৎ মাত্রাস্থাপনের ত্রিবিধ রীতিভেদে পয়ার ত্রিবিধ—সাধারণ কলামাত্রিক (মাত্রাবৃত্ত), বিশিষ্ট কলামাত্রিক (অক্ষরগোনা) এবং দলমাত্রিক (সিলেব্‌ল্‌গোনা)। পয়ারের ন্যায় ত্রিপদী চৌপদীও ত্রিবিধ।

পয়ার ত্রিপদী প্রভৃতি ছন্দোবন্ধের তিন রীতির অর্থাৎ বাংলা ছন্দের তিন শাখার নামকরণে প্রচুর মতভেদ দেখা যায়। ছন্দোবদ্ধ কবিতার ভাষার প্রতি লক্ষ্য রেখে রবীন্দ্রনাথ সিলেব্‌ল্‌- বা দল-মাত্রার ছন্দকে বলেছেন 'প্রাকৃত-বাংলার ছন্দ'। এরই নামান্তর ছড়ার ছন্দ বা লৌকিক ছন্দ। অক্ষরমাত্রার অর্থাৎ বিশিষ্ট কলামাত্রার ছন্দকে তিনি নাম দিয়েছেন 'সাধুছন্দ' বা 'সংস্কৃত-বাংলার ছন্দ'। এরই নামান্তর অক্ষরবৃত্ত।

চলতিমিশ্রিত সাধুরীতির ভাষাই এই ছন্দোরীতির সাধারণ আশ্রয়। সাধারণ কলামাত্রার ছন্দকে তিনি বিশেষ কোনো নাম দেননি; উৎপত্তির সূত্র ধরে তার পরিচয় দিয়েছেন সংস্কৃত-ভাঙা ছন্দ বলে (পৃ ১৩২)। এরই নামান্তর মাত্রাবৃত্ত। এই ছন্দোরীতি প্রত্যক্ষত সংস্কৃত থেকে উৎপন্ন হয়নি, হয়েছে প্রাকৃত থেকে। কিন্তু আধুনিক কলামাত্রারীতির প্রবর্তক স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এবং এই রীতি প্রবর্তনের ব্যাপারে তিনি অনেক পরিমাণেই নির্ভর করেছেন গীতগোবিন্দ কাব্যের গানগুলির উপরে। সুতরাং 'সংস্কৃত-ভাঙা' পরিচয়টা নিরর্থক বলা যায় না। এই ছন্দোরীতিও সাধারণত চলতিমিশ্রিত সাধু- বা সংস্কৃত-বাংলাতেই রচিত হয়; তবে অমিশ্র প্রাকৃত-বাংলাতেও এই ছন্দোরীতির বহুল প্রয়োগ দেখা যায়।[১] এই সাধারণ কলামাত্রিক রীতিরও দুই রূপ (পৃ ২৭৮)। একটি নব্য বা রাবীন্দ্রিক রূপ, মানসী কাব্যে যার প্রথম সার্থক ও ধারাবাহিক প্রয়োগ। আরএকটি রূপ সর্বতোভাবেই সংস্কৃতানুগ, জয়দেবের গীতগোবিন্দের গানগুলিই তার আদর্শ। একে বলা যায় প্রত্ন (archaic) বা জয়দেবী রূপ। এর আধুনিক দৃষ্টান্ত 'জনগণমন-অধিনায়ক' (পৃ ১৯৯-২০০)।

শার্দূলবিক্রীড়িত (পৃ ২১৩)—এই বিখ্যাত সংস্কৃত ছন্দটির প্রত্যেক পদে অর্থাৎ পংক্তিতে থাকে উনিশ অক্ষর বা বর্ণ। এই উনিশটি অক্ষর আবার দুটি যতিবিভাগে বিভক্ত থাকে; প্রথম যতিবিভাগে বার অক্ষর, দ্বিতীয় যতিবিভাগে সাত অক্ষর। লঘুগুরু হিসাবে এই ছন্দের অক্ষর-বিন্যাস এ-রকম (পৃ ১৪৮)।—

— — — ◡ ◡ — ◡ — ◡ ◡ ◡ — — — ◡ — — ◡ —
মেঘৈর্মে দু র ম ম্ব রং ব ন ভু বঃ | শ্যামাস্তমালদ্রুমৈঃ।

১ দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রহাসিনী কাব্যের 'ভাইদ্বিতীয়া' এবং সানাই কাব্যের 'সম্পূর্ণ', এই কবিতা-দুটি উল্লেখযোগ্য।

এই অসমান যতিবিভাগই শার্দূলবিক্রীড়িত ছন্দকে গদ্যরচনাসুলভ গাম্ভীর্য দান করে। বাংলা অমিত্রাক্ষর ছন্দেরও অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য তার যতিবিভাগের অসমতা, আর এই অসমতাই তার গাম্ভীর্যের একটি বড়ো কারণ। যতিবিভাগ অসমান বলে প্রতিবিভাগের মোট মাত্রা-পরিমাণও স্বভাবতই অসমান। এইজন্যই রবীন্দ্রনাথ শার্দূলবিক্রীড়িত প্রভৃতি ছন্দকে বলেছেন 'অসমান মাত্রাভাগের ছন্দ' (পৃ ১৩৩)।

শিখরিণী (পৃ ১৩৩-৩৪)—এটিও একটি অসমান মাত্রাভাগের ছন্দ। মন্দাক্রান্তার ন্যায় এটিও সতর অক্ষরের ছন্দ। মন্দাক্রান্তার প্রতিপংক্তি তিনটি যতিভাগে বিভক্ত। কিন্তু শিখরিণীর যতিভাগ দুটি, প্রথম ভাগের অক্ষরসংখ্যা ছয়, দ্বিতীয় ভাগের অক্ষরসংখ্যা এগার। লঘুগুরুক্রমে এই ছন্দের অক্ষরবিন্যাস এ-রকম।—

◡ – – – – – | ◡ ◡ ◡ ◡ ◡ – – ◡ ◡ ◡ –

দেখা যাচ্ছে এর প্রথম ভাগে ছয় অক্ষরে এগার মাত্রা, আর দ্বিতীয় ভাগে এগার অক্ষরে চোদ্দ মাত্রা।

কবি ভারতচন্দ্রের বিখ্যাত নাগাষ্টকং কবিতাটি (রচনাকাল আনু-মানিক ১৭৫০ সাল) এই শিখরিণী ছন্দে রচিত। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের "ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের জীবনবৃত্তান্ত" গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়ে এই কবিতাটি প্রকাশিত হয় ১৮৫৫ সালে। নাগাষ্টকং শিখরিণী ছন্দে রচিত হলেও এটির কিছু কিছু বিশিষ্টতা আছে। ভারতচন্দ্র নাগাষ্টকংএর অনেক স্থলেই পংক্তিমধ্যে একটি অতিরিক্ত যতি স্থাপন করেছেন এবং সুস্পষ্ট মিল দিয়ে এই যতিটিকে পরিস্ফুট করেছেন। যথা—

◡ – – – – – | ◡ ◡ ◡ ◡ ◡ – – | ◡ ◡ ◡ –

ভ ব দ্দেশে শেষে | স্থ র পু র বিশেষে | ক থ মপি-।...
সমস্তং মে নাগো | গ্রসতি সবিরাগো | হরি হরি-।...

এর প্রতিবিভাগের মাত্রাসংখ্যা হচ্ছে যথাক্রমে এগার, নয় এবং পাঁচ।

প্রথম এগার মাত্রাও আবার সাত-চার এই দুটি উপবিভাগে এবং নয় মাত্রা পাঁচ-চার উপবিভাগে বিভক্ত। তা ছাড়া, ভারতচন্দ্র দুএক স্থলে শিখরিণীর প্রথম ছয় অক্ষরকে দুই সমান ভাগে বিভক্ত করে তাতেও মিল দিয়েছেন। যথা—

দয়ালো ভূপাল- | দ্বিজকুমুদ জাল- | দ্বিজপতে।...
কুবর্ণো গোকর্ণঃ | সবিষবদনো | রক্তগমনঃ।

বলা বাহুল্য এর মাত্রাবিভাগ সর্বাংশে পূর্বোদ্‌ধৃত দুই লাইনের অনুরূপ নয়।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বিলাতে পালাতে' ইত্যাদি কৌতুকরচনাটি (পৃ ১২৩) প্রথম প্রকাশিত হয় ভারতী পত্রিকায় ১৮৭৯ সালে রবীন্দ্রনাথের পত্রধারার অন্তর্গত হয়ে। অতঃপর এটি রবীন্দ্রনাথের 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র' নামক গ্রন্থে (১৮৮১) স্থান পায় (পঞ্চম পত্র, পৃ ১০৮)। উভয়ত্রই এটি রবীন্দ্রনাথের কোনো 'মাস্তবন্ধু'র রচনা বলে পরিচিত হয়েছে। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আমার বাল্যকথা ও আমার বোম্বাইপ্রবাস' গ্রন্থ (১৯১৫) থেকে জানা যায় এই কৌতুককবিতাটি দ্বিজেন্দ্রনাথের রচনা। সত্যেন্দ্রনাথের গ্রন্থেও সমগ্র কবিতাটি উদ্‌ধৃত [illegible]। আশ্চর্যের বিষয় তিন স্থলেই কয়েকটি লাইনে শিখরিণী ছন্দের বিধান রক্ষিত হয়নি। তার প্রথম দুই লাইনেই দুটি ভুল ছিল। যথা—গৌড়ে ও দৌড়ে। এই পাঠে শিখরিণীর বিধান লঙ্ঘিত হয়। 'ছন্দের প্রকৃতি' প্রবন্ধেও রবীন্দ্রনাথ ভুল পাঠই উদ্‌ধৃত করেছিলেন। বর্তমান সংস্করণে ছন্দের খাতিরে পাঠ ঠিক করে গউড়ে-দউড়ে মুদ্রিত হল।

দ্বিজেন্দ্রনাথ এই ব্যঙ্গকবিতাটি ভারতচন্দ্রের নাগাষ্টকংএর অনুসরণেই রচনা করেছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই।[১] দ্বিজেন্দ্রনাথ ভারতচন্দ্রের

১ দেশ, শারদীয় সংখ্যা ১৩৬১ : ছন্দের খেলা : পৃ ২২৩-২৪ দ্রষ্টব্য।

মতোই অনেক স্থলে তের অক্ষরের পরে একটি অতিরিক্ত যতি স্বীকার করেছেন, মিল দিয়ে সে যতিকে পরিস্ফুট করেছেন এবং ভারতচন্দ্রের মতো দ্বিবিধ মিলেরই প্রয়োগ করেছেন, যদিও 'দয়ালো ভূপাল'-জাতীয় মিলের প্রতি তাঁর পক্ষপাত বেশি। তা ছাড়া, দ্বিজেন্দ্রনাথ এক স্থলে ভারতচন্দ্রের মতোই 'হরি হরি' কথাটিও ব্যবহার করেছেন। দৃষ্টান্ত দিলেই এ-সব কথার সমর্থন পাওয়া যাবে। যথা—

পিতা মাতা ভ্রাতা | নবশিশু অনাথা | লুট ক'রে,
বিরাজে জাহাজে | মসিমলিন কোর্তা | বুট প'রে।…
সুখ স্বপ্নে আপ্নে | বড় চতুর মানে | হরি হরি-।

এই লাইনগুলির সঙ্গে নাগাষ্টকংএর উদ্‌ধৃত লাইনগুলির তুলনা করলেই উভয় রচনার সাদৃশ্য নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হবে। শংকরাচার্যের 'সৌন্দর্য-লহরী' কাব্যও (পৃ ১৫০) শিখরিণী ছন্দে রচিত। একটু মিলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে, এ ছন্দ ভারতচন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রনাথ কারও আদর্শ নয়।

স্বপ্নপ্রয়াণ কাব্যের (১৮৭৫) 'লজ্জা বলিল' ইত্যাদি সংস্কৃত-ভাঙা মাত্রাসর্বস্ব শিখরিণী ছন্দের রচনাটিতেও[১] (পৃ ১৩৩) দ্বিজেন্দ্রনাথ মাত্রাবিভাজনের ব্যাপারে ভারতচন্দ্রেরই অনুসরণ করেছেন। ভারতচন্দ্র 'ভবদ্দেশে শেষে' ইত্যাদি অংশে মাত্রাবিভাজন করেছেন এইভাবে।—

সাত+চার | পাঁচ+চার | পাঁচ।

'লজ্জা বলিল' ইত্যাদি অংশে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠিক এইভাবেই মাত্রাবিভাজন করেছেন। এত খুঁটিনাটি সাদৃশ্য আকস্মিক নয় বলেই মনে হয়। এই প্রসঙ্গে দেশে-শেষে-বিশেষে এই মিলটার সঙ্গে হবে-তবে-রবে মিলের সাদৃশ্যটাও স্মরণীয়।

১ স্বপ্নপ্রয়াণ, প্রথম সং (১৮৭৫), দ্বিতীয় সর্গ, ১২৫; তৃতীয় সং (১৯১৪), দ্বিতীয় সর্গ, ১১৫।

রবীন্দ্রনাথের সামনে নাগাষ্টকং‌এর আদর্শ ছিল না। তাই তিনি মাত্রাবিভাজনের তথা মিলস্থাপনের ব্যাপারে অন্য আদর্শ গ্রহণ করেছেন। এই প্রসঙ্গে আরও স্মরণীয় যে, সংস্কৃত-ভাঙা ছন্দ রচনার কাজে দ্বিজেন্দ্রনাথ মেনেছিলেন অক্ষরমাত্রা, আর এই আদর্শে 'লজ্জা' শব্দে দুই মাত্রা; কিন্তু রবীন্দ্রনাথ মানতেন কলামাত্রা, এবং কলামাত্রার বিচারে 'লজ্জা' শব্দে তিন মাত্রা গণনীয়।

শিখরিণী ছন্দের প্রসঙ্গে স্বপ্নপ্রয়াণ কাব্যের

বৃক্ষগণ হেলিত সুশীতল সমীরণে।

পুষ্প যত প্রস্ফুটিত পুষ্পময় কাননে॥

ইত্যাদি শেষ শ্লোকটির কথাও বলা প্রয়োজন। উক্ত কাব্যের তৃতীয় সংস্করণে (১৯১৪) এই শ্লোকটি সংস্কৃত শিখরিণী ছন্দে রচিত বলে বর্ণিত হয়েছে। বলা বাহুল্য এটি শিখরিণী ছন্দ নয়। এই ভ্রান্ত বর্ণনার দায়িত্ব কার জানি না। স্বপ্নপ্রয়াণ কাব্যের প্রথম সংস্করণেও (১৮৭৫) এই শ্লোকটি ছিল, কিন্তু তার ছন্দপরিচয় দেওয়া ছিল না। আসলে এটি রচিত হয়েছে সংস্কৃত 'নিশিপালক' ছন্দে। লঘুগুরুক্রমে এ ছন্দের ধ্বনিবিন্যাস হচ্ছে এ-রকম।—

—⏑⏑⏑,—⏑⏑⏑,—⏑⏑⏑,—⏑—

সমমাত্রার ছন্দ (পৃ ১৫)—দুইমাত্রার উপপর্বকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন সমচলন বা সমমাত্রার চলন (পৃ ৩৫) এবং সমমাত্রা-চলনের ছন্দকেই তিনি নাম দিয়েছেন সমমাত্রার ছন্দ (পৃ ৩৬–৩৭)। সমমাত্রার চলনকে অন্যত্র বলা হয়েছে সমমাত্রার চাল (পৃ ৭৪) বা দ্বিপদীর চাল (পৃ ১১৮)। আর সমমাত্রার ছন্দকে পরিচয় দিয়েছেন 'পয়ারজাতীয়' বলে (পৃ ২১৫); কারণ পয়ারের উপপর্ব গঠিত হয় দুই মাত্রা নিয়ে।

এইজন্য পয়ারজাতীয় বা সমমাত্রার ছন্দকে 'দুইমাত্রার ছন্দ' নামও দেওয়া হয়েছে (পৃ ৩৮)।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, দুইমাত্রার ছন্দের অর্থাৎ সমমাত্রার ছন্দের একটি অসাধারণ শক্তি বা মহদ্‌গুণ আছে। সে হচ্ছে তার 'শোষণশক্তি' (পৃ ৩৮)। একেই অন্যত্র বলা হচ্ছে 'ভারবহনশক্তি' (পৃ ১২১)। তাই এ ছন্দের একটি বিশেষণ 'গুরুভারবহ' (পৃ ৬৯)। শোষণশক্তি হচ্ছে আসলে সংকোচনশক্তি। যুগ্মধ্বনি অর্থাৎ রুদ্ধদলকে সংকুচিত করে আনবার অসাধারণ শক্তিকেই বলা হয়েছে শোষণশক্তি। যেমন—

সংগীত্‌ তরঙ্গি উঠে | অঙ্গের্‌ উচ্ছ্বাসে

এখানে সং, রঙ্‌, অঙ্‌, উচ্‌ এই চারটি রুদ্ধদল সংকুচিত হয়েছে (পৃ ৩৮)। তাই এগুলির মূল্য এক মাত্রা। সংকুচিত না হলে প্রত্যেকটির মূল্য হত দুই মাত্রা। সংস্কৃত ছন্দের নিয়মে 'চন্দনচর্চিত শব্দটা অক্ষরগণনায় [বস্তুতঃ কলাগণনায়] আট মাত্রা' (পৃ ১২১)। কিন্তু বাংলা সমমাত্রার ছন্দে অর্থাৎ দুইমাত্রা-উপপর্বের ছন্দে এটা অনেক সময়ই ছয় মাত্রা বলে গণ্য হয়। অর্থাৎ চন্‌ ও চর্‌ দল-দুটি সংকুচিত হয়ে একমাত্রার স্থান নেয়। ফলে ছয় মাত্রার পরিধির মধ্যেই ঠাসাঠাসি করে আট মাত্রার স্থান সংকুলান হয়। যেমন—

চন্দনচর্চিত তার | নীলবর্ণ অঙ্গখানি |
কণ্ঠে শোভে বনপুষ্প | মালা।

এখানে প্রত্যেক পূর্ণ বিভাগে আছে আট মাত্রা এবং প্রত্যেকটিতেই দুটি করে যুগ্মধ্বনি (মানে রুদ্ধদল) সংকুচিত হয়ে এক মাত্রার স্থান পেয়েছে। 'চন্দনচর্চিত' ছয় মাত্রা।

'কিন্তু দুইমাত্রার ছন্দ মাত্রেরই যে এই রকম অসাধারণ শোষণশক্তি' তা বলা যায় না (পৃ ৩৮)। উপরের দৃষ্টান্ত-দুটিকেই একটু বদলে দেওয়া যাক।—

সংগীত হিল্লোল | অঙ্গের বায়

এটাও দুইমাত্রার ছন্দ, অর্থাৎ এটাও 'দুয়ের লয়ে চলে' (পৃ ৩৯)। অথচ এর শোষণশক্তি নেই, অর্থাৎ এখানে যুগ্মধ্বনি (রুদ্ধদল) সংকুচিত হচ্ছে না।

চন্দনচর্চিত | সুনীল অঙ্গখানি |
কণ্ঠেতে পুষ্পের | মাল্য।

এখানেও প্রতি পূর্ণ বিভাগে আট মাত্রা, কিন্তু এর যুগ্মধ্বনিগুলি প্রসারিত হয়ে দুই মাত্রার স্থান পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় এ হচ্ছে 'দুর্বল বাহন' (পৃ ১২১), অর্থাৎ এটা গুরুভারবহ নয়।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে সমমাত্রার অর্থাৎ দুইমাত্রা-উপপর্বের ছন্দের দুই রূপ—প্রসারক ও সংকোচক। এই দুই রূপেরই পারিভাষিক নাম যথাক্রমে 'সরল কলামাত্রিক' ও 'বিশিষ্ট কলামাত্রিক'। এই রূপভেদ আসলে রীতিভেদ, এবং রীতিভেদ হচ্ছে ছন্দের অন্তর্নিহিত প্রকৃতি-ভেদের পরিচায়ক। রবীন্দ্রনাথের মতে 'চলনের ভেদেই ছন্দের প্রকৃতিভেদ' (পৃ ৩৬)। কথাটা অসার্থক নয়, কারণ চলন অর্থাৎ উপপর্বের আয়তনের দ্বারাই ছন্দের রিদ্‌ম্ অর্থাৎ স্পন্দনলীলা নিয়ন্ত্রিত হয়। কিন্তু মাত্রাস্থাপনের রীতিভেদে উপপর্বেরই প্রকৃতিভেদ ঘটে। সুতরাং ছন্দপ্রকৃতির উপরে চলনভেদের চেয়ে রীতিভেদের প্রভাবই গভীরতর। দ্রষ্টব্য 'শাখা'।

এই গ্রন্থে 'সমমাত্রা' কথাটি অপারিভাষিক অর্থেও ব্যবহৃত হয়েছে কোনো কোনো স্থানে। যেমন—পালামৌ গ্রন্থের গদ্য 'সমমাত্রায় বিভক্ত নয়' কিংবা যজুর্বেদের গদ্যমন্ত্রের যে পদবিভাগ তা সমমাত্রার নয় (পৃ ১৫৩)। এখানে সমমাত্রা মানে সমানসংখ্যক-মাত্রাপরিমিত অর্থাৎ সমায়তন।

অন্যত্র 'সমমাত্রক ছন্দ' মানে তরঙ্গভঙ্গিহীন সমতল ছন্দ (পৃ ১৭৩,

পাদটীকা ১)। এ রকম মাথায়-সমান লঘুগুরুভেদহীন নিরীহ ও নিস্পন্দ মাত্রাবিন্যাসকেই বলা হয়েছে 'নখদন্তহীন' (পৃ ১৭)। গুরুত্বভেদে ধ্বনির অসমতাজাত তরঙ্গলীলাই হচ্ছে ছন্দের প্রাণ। দ্রষ্টব্য 'লয়'।

এক স্থলে সমান মাপের মাত্রা এই সাধারণ অর্থেই 'সমমাত্রা' কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে (পৃ ৪)।

সিলেব্‌ল্‌ (পৃ ৫৩)— বাগ্‌যন্ত্রের একটিমাত্র প্রয়াসে উচ্চারিত শব্দাংশের নাম সিলেব্‌ল্‌। যেমন—ছন্‌.দ, পুণ্‌.ণ্য.বান্‌। সিলেব্‌ল্‌এর প্রতিশব্দ হিসাবে 'দল' ও 'ধ্বনি' শব্দ ব্যবহৃত হয়। এ দুটির মধ্যে 'দল' শব্দই সুষ্ঠুতর। দ্রষ্টব্য 'দল', 'ধ্বনি' ও 'যুগ্মধ্বনি'।

রবীন্দ্রনাথ কোনো কোনো স্থলে সিলেব্‌ল্‌এর প্রতিশব্দ হিসাবে 'মাত্রা' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। যেমন— 'ঐকমাত্রিক' মানে monosyllabic (পৃ ২৭১)। পক্ষান্তরে তিনি বাংলা মাত্রা অর্থেও ইংরেজি সিলেব্‌ল্‌ শব্দ ব্যবহার করেছেন (পৃ ২৭৩)। যেমন—'মনে পড়ে দুই জনে জুঁই তুলে বাল্যে' ইত্যাদি দৃষ্টান্তে দুই, জুঁই, প্রভৃতি এক-সিলেব্‌ল্‌-আত্মক শব্দের দুই কলাকেই তিনি 'দুই সিলেব্‌ল্‌-এর টিকিট' দিয়েছেন।

স্পন্দন (পৃ ৩৩)—পূর্ণ শব্দ 'ছন্দঃস্পন্দন' (পৃ ১৪৭)। মানে ছন্দের তরঙ্গভঙ্গি বা রিদ্‌ম্‌। এই স্পন্দন পদ্যেও থাকে, গদ্যেও থাকে। পদ্যে এই স্পন্দনের বিভাগ থাকে সুনিয়মিত ও সুপরিমিত, গদ্যে এই বিভাগ অনিয়মিত ও অপরিমিত এবং অননুভূত। কিন্তু যে গদ্য কবিতার বাহনরূপে স্বীকৃত, তার স্পন্দনবিভাগ পদ্যের মতো 'অতিনিরূপিত' না হলেও অনুভবগম্যতার সীমার মধ্যে আসে। এই স্পন্দনশীল গদ্যকেই বলা হয় ছন্দোময় গদ্য (rhythmic prose)। কেননা, এই স্পন্দনই ছন্দের প্রাণ। দ্রষ্টব্য 'লয়'।

হসন্ত-হলন্ত (পৃ ৫২)— পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী ব্যাকরণের সাংকেতিক পরিভাষায় ব্যঞ্জনবর্ণকে বলা হয় হল্। আর বোপদেবের মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের মতে ব্যঞ্জনবর্ণের সাংকেতিক নাম হস্। সুতরাং হসন্ত ও হলন্ত অভিন্নার্থক শব্দ, দুএরই মানে 'ব্যঞ্জনান্ত'। বাংলাদেশে মুগ্ধবোধেরই চল বেশি। তাই হসন্ত শব্দটিই অধিকতর পরিচিত ও প্রচলিত। এই সুযোগে রবীন্দ্রনাথ অপেক্ষাকৃত কম পরিচিত হলন্ত শব্দটিকে স্বরান্ত অর্থে গ্রহণ করেছেন[১] (পৃ ৪৯)। পাণিনির পরিভাষায় স্বরান্তকে বলা হয় 'অজন্ত'।

১ দ্রষ্টব্য বিচিত্রা, ১৩৩৯ ভাদ্র, পৃ ১৬১ এবং আশ্বিন, পৃ ৪২৯।

পাঠপরিচয়

'ছন্দ' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৩৪৩ সালের আষাঢ় মাসে। অতঃপর এই গ্রন্থের নূতন সংস্করণ রচনাবলী একবিংশ খণ্ডে গৃহীত হয় ১৩৫৩ সালের শ্রাবণ মাসে।

'ছন্দ' গ্রন্থের বর্তমান সংস্করণে রবীন্দ্রনাথের ছন্দ-বিষয়ক প্রবন্ধ, সমালোচনা, প্রবন্ধাংশ, চিঠিপত্র ও ভাষণগুলিকে যথাসম্ভব কালক্রম অনুসারে বিন্যস্ত করা হল। রচনাগুলির ভাবানুষঙ্গ রক্ষার প্রয়োজনে কোনো কোনো স্থলে কালক্রমের কিছু ব্যত্যয় করা হয়েছে। এই গ্রন্থের প্রথম মুদ্রণে ধরা হয়নি, এমন বহু পূর্বতন প্রবন্ধ এই সংস্করণে সংকলিত হয়েছে এবং তৎপরে-প্রকাশিত সমস্ত রচনা ও ভাষণই সংকলন করবার প্রয়াস করা হয়েছে। কিছু কিছু অপ্রকাশিত চিঠিপত্র প্রভৃতিও রবীন্দ্রসদনে বা অন্যত্র রক্ষিত পাণ্ডুলিপি থেকে উদ্ধার করে প্রকাশ করা হল। যে-সব রচনার পাণ্ডুলিপি পাওয়া গিয়েছে সে-সব স্থলে প্রকাশিত রচনা ও পাণ্ডুলিপি যথাসম্ভব মিলিয়ে দেখে পাঠ নির্ণয়ের চেষ্টা করা হয়েছে। 'ছন্দ' গ্রন্থের রচনাবলী-সংস্করণে (রচনাবলী ২১) বর্তমান সংস্করণের আদর্শ ও বিন্যাসরীতি অনেকাংশে অনুসৃত হয়েছে ; এই সংস্করণের জন্য সংগৃহীত বহু নূতন উপাদানও উক্ত সংস্করণে সন্নিবিষ্ট হয়েছে।

মূলগ্রন্থের মুদ্রণ শেষ হয়ে যাবার পর যে-সব নূতন রচনা বা চিঠিপত্র চোখে পড়েছে সেগুলি 'সংযোজন' এবং 'সম্পূরণ' বিভাগে স্থাপিত হল।

'ছন্দ' গ্রন্থের প্রথম সম্পাদনাকালে সাময়িক পত্রে প্রকাশিত কোনো কোনো প্রবন্ধের কোনো কোনো অংশ বাদ দেওয়া হয়েছিল। বর্তমান সংস্করণে সেই অংশগুলিকে পুনর্গ্রহণ করে [] এই বন্ধনীচিহ্নের মধ্যে স্থাপন করা হল।

কোনো কোনো প্রবন্ধ মূলতঃ সাধুরীতির ভাষায় রচিত হয় এবং সাময়িক পত্রেও ওই রূপেই প্রকাশিত হয়। কিন্তু গ্রন্থভুক্তির সময়ে ওগুলি চলতি রীতির ভাষায় রূপান্তরিত হয়। বর্তমান সংস্করণে পুরোপুরিভাবে সাময়িক পত্রে প্রকাশিত মূলপাঠই অনুসৃত হয়েছে, তাই তৎকালীন মূল ভাষারীতিও রক্ষিত হল। রচনাবলী-সংস্করণেও এই নীতি স্বীকৃত হয়েছে। এ সম্পর্কে প্রবন্ধগুলির স্বতন্ত্র পাঠপরিচয় দ্রষ্টব্য।

কোনো কোনো রচনা লিখিত ভাষণরূপে জনসমক্ষে পঠিত হয়েছিল। কিন্তু স্বরূপতঃ সেগুলি প্রবন্ধই এবং সাময়িক পত্রে প্রকাশ-কালে তথা প্রথম গ্রন্থভুক্তির সময়ে এগুলি প্রবন্ধরূপেই স্বীকৃত হয়। বর্তমান সংস্করণেও এগুলি প্রবন্ধ বিভাগেই স্থাপিত হল। অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকৃতি অলিখিত (এবং অন্যের দ্বারা অনুলিখিত) ভাষণগুলিকে 'ভাষণ' বিভাগে স্থান দেওয়া গেল।

কোনো কোনো প্রবন্ধ বা প্রবন্ধাংশ প্রসঙ্গের সাদৃশ্যহেতু পূর্ব-প্রকাশিত অন্য প্রবন্ধের সঙ্গে তার নূতন অথচ স্বতন্ত্র অঙ্গ-রূপে একত্র গ্রথিত হয়েছে। যথাস্থানে তার পরিচয় পাওয়া যাবে।

নিম্নে তালিকা-আকারে রচনাগুলির সাময়িক পত্রাদিতে প্রকাশের তারিখ ও তৎকালীন নাম ইত্যাদি দেওয়া হল। যে-সব রচনা 'ছন্দ' গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে ছিল না, এই সংস্করণেই প্রথম গৃহীত হল, সেগুলি তারকা-চিহ্নিত করে দেওয়া গেল।—

বাংলা ছন্দ :

১ 'বাংলা ছন্দ', সবুজপত্র ১৩২১ জ্যৈষ্ঠ

*২ 'বাংলা ছন্দ', সবুজপত্র ১৩২১ শ্রাবণ

সংগীত ও ছন্দ : 'সংগীতের মুক্তি' (অংশ), সবুজপত্র ১৩২৪ ভাদ্র

ছন্দের অর্থ[১] : 'ছন্দ', সবুজপত্র ১৩২৪ চৈত্র

১ 'বিচিত্রা' ক্লাবে পঠিত ১৩২৪ সালের ৬ চৈত্র তারিখে।

ছন্দের হসন্ত-হলন্ত :

১ 'বাংলা ছন্দ', বিচিত্রা ১৩৩৮ পৌষ

২ 'ছন্দের হসন্ত-হলন্ত', পরিচয় ১৩৩৮ মাঘ

*৩ 'নবছন্দ' (প্রথমাংশ), পরিচয়, ১৩৩৯ কার্তিক

*সংস্কৃত-বাংলা ও প্রাকৃত-বাংলার ছন্দ :

'ছন্দবিতর্ক', পরিচয় ১৩৩৯ শ্রাবণ

ছন্দের মাত্রা :

১ 'নবছন্দ' (শেষাংশ), পরিচয় ১৩৩৯ কার্তিক

২ 'ছন্দের মাত্রা', উদয়ন ১৩৪১ জ্যৈষ্ঠ

ছন্দের প্রকৃতি[১] : 'ছন্দ', উদয়ন ১৩৪১ বৈশাখ

*চলতি ভাষার ছন্দ :

'বাংলাভাষা-পরিচয়' গ্রন্থ (১৩৪৫ কার্তিক), একাদশ অধ্যায় (প্রথমাংশ)

গদ্য-ছন্দ[২] : 'গদ্যছন্দ', বঙ্গশ্রী ১৩৪১ বৈশাখ

*কাব্য ও ছন্দ : 'গদ্যকাব্য', কবিতা ১৩৪৩ পৌষ

পরিশেষ

*বাংলাভাষার স্বাভাবিক ছন্দ :

'সংক্ষিপ্ত সমালোচনা : সিন্ধুদূত', ভারতী ১২৯০ শ্রাবণ। লেখকের নাম অপ্রকাশিত।

১ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠিত ১৩৪০ সালের ভাদ্র (১৯৩৩ সেপ্‌টেম্বর) মাসে। দ্রষ্টব্য প্রমথ চৌধুরীকে লিখিত ১১২ ও ১১৩-সংখ্যক পত্র, 'চিঠিপত্র' পঞ্চম খণ্ড ১৩৫২ পৌষ), পৃ ২৯৭-৯৮। প্রথম সংস্করণে প্রবন্ধটির নাম 'বাংলা ছন্দের প্রকৃতি'।

২ এই প্রবন্ধটিও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠিত ১৯৩৩ সালে।

*বাংলা শব্দ ও ছন্দ :

'বাংলা শব্দ ও ছন্দ', সাধনা ১২৯৯ শ্রাবণ

*বিহারীলালের ছন্দ :

'বিহারীলাল' (অংশ), সাধনা ১৩০১ আষাঢ়। 'আধুনিক সাহিত্য' গ্রন্থে (১৯০৭) সংকলিত।

*সন্ধ্যাসংগীতের ছন্দ :

'জীবনস্মৃতি : সন্ধ্যাসংগীত (অংশ)', প্রবাসী ১৩১৯ বৈশাখ। 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থে (১৯১২) সংকলিত।

বিবিধ

*বাংলা ছন্দে যুক্তাক্ষর : 'ভূমিকা', মানসী (কাব্য), ১২৯৭ পৌষ

*বাংলা ছন্দে অনুপ্রাস : 'গুপ্তরত্নোদ্ধার' (অংশ), সাধনা ১৩০২ জ্যৈষ্ঠ। 'লোকসাহিত্য' গ্রন্থে (১৯০৭) 'কবিসংগীত' নামে সংকলিত।

*কৌতুককাব্যের ছন্দ : 'আষাঢ়ে' (অংশ), ভারতী ১৩০৫ অগ্রহায়ণ। 'আধুনিক সাহিত্য' গ্রন্থে (১৯০৭) সংকলিত।

*ছড়ার ছন্দ : 'ভূমিকা' (অংশ), ছড়ার ছবি (কাব্য), ১৩৪৪ আশ্বিন

*বাংলা ছন্দে স্বরবর্ণ :

'বাংলাভাষা-পরিচয়' গ্রন্থ (১৩৪৫ কার্তিক), অধ্যায় ১২ (অংশ)

*গদ্যকবিতার ছন্দ : 'পুনশ্চ' কাব্য (১৩৩৯ আশ্বিন), 'ভূমিকা' (অংশ)

চিঠিপত্র

*প্রমথ চৌধুরীকে লেখা : সবুজপত্র ১৩২৪ জ্যৈষ্ঠ। 'চিঠিপত্র' পঞ্চম খণ্ডে (১৩৫২ পৌষ) সংকলিত। প্রমথ চৌধুরীকে লিখিত ৫৫-সংখ্যক পত্র।

*প্যারীমোহন সেনগুপ্তকে লেখা : রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত প্রতিলিপি।
'সংস্কৃত কাব্যের অনুবাদ' (অংশ), উদয়ন ১৩৪০ জ্যৈষ্ঠ

*দিলীপকুমার রায়কে লেখা : ১-৮ রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত প্রতিলিপি।
১ ও ৪ : 'পত্রধারা' (প্রাসঙ্গিক অংশ), উত্তরা ১৩৩৮ আশ্বিন। এই দুটি পত্র দিলীপকুমারের 'অনামী' গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে (১৯৩৩) আংশিকভাবে প্রকাশিত এবং দ্বিতীয় সংস্করণে বর্জিত। ৬-সংখ্যক পত্রটি 'চলার পথে' পত্রিকায় (১৩৪৫ ফাল্গুন) প্রকাশিত।

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে লেখা :

*১ প্রাসঙ্গিক অংশ। প্রতিলিপি রবীন্দ্রসদনে। তাতে মন্তব্য আছে—' 'পুনশ্চে'র মলাটের পর প্রথম পৃষ্ঠায় লিখিত'।

*২ প্রাসঙ্গিক অংশ। প্রতিলিপি রবীন্দ্রসদনে।

৩ প্রাসঙ্গিক অংশ। খড়দহ থেকে লেখা। প্রতিলিপি রবীন্দ্রসদনে। 'পরিচয়' পত্রিকায় (১৩৪০ বৈশাখ) 'পুনশ্চ' নামে প্রকাশিত এবং 'সাহিত্যের স্বরূপ' গ্রন্থে (১৯৪৩) 'কাব্যে গদ্যরীতি : ১' নামে সংকলিত।

৪ প্রাসঙ্গিক অংশ। প্রকাশ—পূর্বাশা ১৩৪২ শ্রাবণ।

৫ 'পূর্বাশা' পত্রিকায় প্রকাশিত (১৩৪২ শ্রাবণ) এবং 'সাহিত্যের স্বরূপ' গ্রন্থে (১৯৪৩) 'কাব্যে গদ্যরীতি : ২' নামে সংকলিত।

*শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষকে লেখা :

১ ও ২ : শান্তিনিকেতন থেকে লেখা। শৈলেন্দ্রনাথ-কর্তৃক প্রদত্ত ফটো-প্রতিলিপি রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত। দ্বিতীয় পত্রটি 'নিরুক্ত' পত্রিকায় (১৩৫১ আশ্বিন) প্রকাশিত।

সঞ্জয় ভট্টাচার্যকে লেখা :

চন্দননগর থেকে লেখা। 'পূর্বাশা'-সম্পাদক সঞ্জয় ভট্টাচার্য-কর্তৃক প্রদত্ত মূলপত্র রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত। পত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় বামকোণে মন্তব্য আছে—'ধূর্জটীকে আমার এ চিঠি দেখিয়ো'। প্রথম সংস্করণের 'মোটকথা' বিভাগে 'গদ্যছন্দ' নামে সংকলিত।

ভাষণ

*ছন্দবিচার : 'ছন্দবিচার' (কবিকথিত অংশ), বিচিত্রা ১৩৩৯ জ্যৈষ্ঠ প্রবোধচন্দ্র সেনের সহিত আলোচনার (১৩৩৮ চৈত্র) খণ্ডিতাংশ[১]। তৎকর্তৃক অনুলিখিত ও কবিকর্তৃক সংশোধনান্তে অনুমোদিত। এই উপলক্ষে কবিকর্তৃক নবলিখিত 'কবির পুনশ্চ বক্তব্য' অংশটি পূর্ণতর পাঠপরিচয়-প্রসঙ্গে যথাস্থানে উদ্‌ধৃত হল। 'ছন্দবিচার' নামটিও কবির দেওয়া।

প্রবোধচন্দ্র সেন-কর্তৃক লিখিত ও কবিকর্তৃক স্বহস্তে সংশোধিত পাণ্ডুলিপি বিশ্বভারতী রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত।

আমার ছন্দের গতি : 'আমার কাব্যের গতি' (প্রাসঙ্গিক অংশ), প্রবাসী ১৩৪৩ আষাঢ়, পৃ ৪৫১-৫৩। "কলিকাতা বিশ্বভারতী-সম্মিলনীতে বক্তার আধুনিক কাব্যপাঠের ভূমিকা। শ্রীপুলিনবিহারী সেন-কর্তৃক অনুলিখিত।"

•

১ এই আলোচনার পূর্ণরূপের জন্য দ্রষ্টব্য 'বিচিত্রা' পত্রিকা (১৩৩৯ জ্যৈষ্ঠ, পৃ ৫৭৪-৮২) এবং প্রবোধচন্দ্র সেন-কৃত 'ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে (প্রথম সংস্করণ, ১৩৫২ বৈশাখ) লেখকের 'নিবেদন' (পৃ ১০-১১) ও 'ছন্দ-সংলাপ ক'এর প্রথম তিন বিভাগ (পৃ ১৮২-৯৭)।

*গদ্যকাব্য : 'গদ্যকাব্য' (প্রাসঙ্গিক অংশ), প্রবাসী ১৩৪৬ মাঘ, পৃ ৪৪৮-৫০। "২৯শে আগষ্ট ১৯৩৯ তারিখে শান্তিনিকেতনে কথিত। শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র রায়-কর্তৃক অনুলিখিত ও বক্তা-কর্তৃক সংশোধিত।" 'সাহিত্যের স্বরূপ' গ্রন্থে এই নামেই সংকলিত।

সংযোজন

*পয়ার ও দ্বাদশাক্ষর ছন্দ :

'গ্রন্থসমালোচনা : রঘুবংশ', সাধনা ১৩০২ বৈশাখ। লেখকের নাম অপ্রকাশিত।

এবার একে একে মুখ্য রচনাগুলির পূর্ণতর পরিচয় দেওয়া হল।—

বাংলা ছন্দ

আধুনিক যুগে বাংলা ছন্দের বিশ্লেষণ ও স্বরূপনির্ণয়ের প্রতি বাংলা দেশে যে আগ্রহ দেখা দিয়েছে, তার মূলে রয়েছে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যা-লয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক জে. ডি. এণ্ডারসনের জিজ্ঞাসা ও আলোচনার প্রেরণা। তিনি দীর্ঘকাল ধরে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পত্রালাপ চালিয়েছিলেন। পত্রালাপের বিষয় প্রধানতঃ বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে হলেও তার অধিকাংশই বাংলা ছন্দ-বিষয়ক। ইংরেজিতে লিখিত তাঁর প্রায় সব পত্রই রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত আছে।[১]

১ এণ্ডারসন মহাশয় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচয় লাভ করেন ১২ জুলাই ১৯১২ তারিখে। তার অব্যবহিত পর থেকে স্বীয় মৃত্যুর (২৪ অক্টোবর ১৯২০) অতি অল্পকাল পূর্ব পর্যন্ত তিনি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পত্রালাপের যোগ রক্ষা করেছিলেন। রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত তাঁর পত্রের সংখ্যা ৪৫; প্রথম পত্রের তারিখ ১৫ জুলাই ১৯১২ এবং শেষ পত্রের তারিখ ৩ সেপ্টেম্বর ১৯২০। উক্ত পঁয়তাল্লিশখানি পত্রের মধ্যে অন্ততঃ কুড়িখানিতে প্রধানতঃ বা প্রসঙ্গক্রমে ছন্দের কথা আলোচিত হয়েছে (১৯১৩ সালে চারখানি, শেষ তিনখানি পর-পর; ১৯১৪ সালে ছয়খানি পর-পর; ১৯১৮ সালে আটখানি পর-পর এবং ১৯১৯ সালে দুইখানি)। এই কুড়িখানির মধ্যে প্রথমটির তারিখ ২৬ মার্চ ১৯১৩, আর শেষটির তারিখ ৫ এপ্রিল ১৯১৯।

বাংলা ছন্দ আলোচনার পক্ষে এগুলির মূল্য প্রচুর এবং এগুলি নিয়ে স্বতন্ত্র আলোচনারও প্রয়োজনীয়তা আছে।

দুঃখের বিষয়, রবীন্দ্রনাথ এ-সব পত্রের যে উত্তর দিয়েছিলেন সেগুলি সহজপ্রাপ্য নয়। তাঁর বাংলায় লেখা দুটি উত্তর সবুজপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল, আর একটিমাত্র ইংরেজি পত্রের প্রতিলিপি রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত আছে। বাংলা পত্র-দুটি বর্তমান সংস্করণে প্রথমেই স্থান পেয়েছে; ইংরেজি পত্রটি 'সম্পূরণ' বিভাগে স্থাপিত হল।

নিম্নে বাংলা পত্র-দুটির বিশদ পরিচয় দেওয়া গেল।—

প্রথম পত্র

এই পত্রটি সবুজপত্রে[১] (১৩২১ জ্যৈষ্ঠ) প্রকাশিত হয়েছিল খণ্ডিত-ভাবে। নিষ্প্রয়োজনবোধে এটির প্রথম ও শেষের দিক্ থেকে কিছু কিছু অংশ বর্জিত হয়েছিল। বর্তমান সংস্করণে ওই খণ্ডিত অংশটুকুই সংকলিত হল। 'ছন্দ' গ্রন্থ প্রথম প্রকাশের সময় এই খণ্ডিত পত্রটি স্থাপিত হয়েছিল পরিশিষ্টের 'পত্র' বিভাগে। তৎকালে এই খণ্ডিত পত্রেরও কোনো কোনো অংশ বর্জিত হয়েছিল। তা ছাড়া তৎকালে মূলপত্রের সাধুভাষাটিও চলতি ভাষায় রূপান্তরিত হয়েছিল। বর্তমান সংস্করণে শেষোক্ত বর্জিত অংশগুলি পুনর্গৃহীত হল, তবে সেগুলিকে [ ] এই বন্ধনীচিহ্নের দ্বারা চিহ্নিত করে দেওয়া গেল; আর, রূপান্তরিত চলতি ভাষার পরিবর্তে মূল সাধুভাষাই রক্ষিত হল। রচনাবলী-সংস্করণে বর্তমান সংস্করণের আদর্শে সাধুভাষাই স্বীকৃত হয়েছে; তবে এই

১ সবুজপত্রে রচনাটির গোড়াতেই পাদটীকায় আছে—"কেম্ব্রিজের বাংলা অধ্যাপক জে. ডি. এণ্ডারসন, আই. সি. এস. মহাশয়কে লিখিত পত্র হইতে অধ্যাপক মহাশয়ের অনুমতিক্রমে মুদ্রিত"।

ও আপনি যখন আমাকে ইংরেজিতে পত্র লেখেন
তখন আমার কর্ত্তব্য আপনাকে বাংলাভাষায় তাহার উত্তর দেওয়া,
নহিলে ঠিক পাল্টা জবাব হয় না। আপনার দেশে আমার যত
বন্ধু আছেন সকলকেই আমার ইংরেজিতে চিঠিপত্র লিখিতে হয়
ভাগ্যক্রমে একটি লোক পাইয়াছি যাঁহার কাছে আমার আপন ভাষায়
মনের কথা খুলিয়া বলিবার কোনো বাধা নাই— এমন সুযোগ হেলায়
নষ্ট করিব কেন? ইংরেজি ভাষার কাছে পদে পদে আমি যে কত অপরাধ
করিয়া থাকি তাহার আর সংখ্যা নাই; কলমের মুখে আপনাদের ব্যাকরণের
হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া দিই, কত অব্যয়ের অন্যায় অপব্যয় করি, কত article কে
বিনা দোষে বর্জ্জন করি এবং বিনা কারণে গ্রহণ করিয়া থাকি

অধ্যাপক এণ্ডারসনকে লিখিত পত্রের প্রথমাংশ : ১৩২০ ফাল্গুন ৬ · ১৯১৪ ফেব্রুআরি ১৮

সংস্করণের বন্ধনীধৃত অংশগুলি বাদ দেওয়া হয়েছে, আর এটি স্থাপিত হয়েছে পরিশিষ্টের 'চিঠিপত্র' বিভাগে।

এই পত্রখানির পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় নি। তবে সুখের বিষয় অধ্যাপক এণ্ডারসনের *A Manual of the Bengali Language* নামক পুস্তকে (প্রকাশ ১৯২০) এই পত্রখানির প্রথমাংশ বাংলা ও রোমক লিপিতে প্রকাশিত হয়েছে (পৃ ১৪৯-১৫৩)। শুধু তাই নয়, রবীন্দ্রনাথের হস্তাক্ষরের নিদর্শনস্বরূপে পত্রখানির মূলপাঠের প্রথম দশ লাইনের প্রতিরূপও ওই পুস্তকে মুদ্রিত হয়েছে (পৃ ১৪৮)। যা হক, এর থেকে পত্রখানি রচনার স্থানকালও জানা গিয়েছে। এই প্রথমাংশটি ছন্দ-বিষয়ক নয়, তথাপি সম্পূর্ণতার খাতিরে ওটুকু এখানে উদ্‌ধৃত হল।—

ওঁ

শিলাইদহ
নদিয়া
৬ই ফাল্গুন, ১৩২০

প্রিয়বরেষু

আপনি যখন আমাকে ইংরেজিতে পত্র লেখেন, তখন আমার কর্তব্য আপনাকে বাংলা ভাষায় তাহার উত্তর দেওয়া, নহিলে ঠিক পালটা জবাব হয় না। আপনার দেশে আমার যত বন্ধু আছেন সকলকেই আমার ইংরেজিতে চিঠিপত্র লিখিতে হয়। ভাগ্যগুণে একটি লোক পাইয়াছি যাঁহার কাছে আমার আপন ভাষায় মনের কথা খুলিয়া বলিবার কোনো বাধা নাই— এমন সুযোগ বৃথা নষ্ট করিব কেন? ইংরেজি ভাষার কাছে পদে পদে আমি যে কত অপরাধ করিয়া থাকি তাহার আর

সংখ্যা নাই; কলমের মুখে আপনাদের ব্যাকরণের হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া দিই, কত অব্যয়ের অন্যায় অপব্যয় করি, কত articleকে বিনাদোষে বর্জন করি এবং বিনাকারণে গ্রহণ করিয়া থাকি[১]। এ সত্ত্বেও আপনাদের ইংরেজি ভাষাসরস্বতী তাঁহার এই অধম সেবকটিকে যে এত দয়া করিলেন তাহা স্মরণ করিয়া আমি বিস্মিত হইতেছি। শ্বেতদ্বীপের শ্বেতভুজা ভারতীকে যখন আমার কাব্যপুষ্প দিয়া পূজা করিয়াছি, তখন তাহা আমি আমার সাধ্যমত যত্নপূর্বক চয়ন করিয়াছি এবং তাঁহার প্রসাদও পাইয়াছি। কিন্তু আমার এই শুষ্ক পত্রগুলা যখন তাঁহার গায়ে গিয়া পড়ে তখন স্পষ্টই দেখিতে পাই তাঁহার মুখ অপ্রসন্ন হইয়া উঠে। অতএব যেখানে সম্ভব সেখানে এ অপরাধ আর বাড়াইব না, পত্র আপনাকে বাংলাতেই লিখিব।

ছন্দ সম্বন্ধে আপনি যে আলোচনা করিতেছেন, আমি বড় আনন্দ পাইয়াছি। বাংলা ছন্দ সম্বন্ধে আজ পর্যন্ত কোনো বাঙালি কোনো কথা কহে নাই। আমার ইচ্ছা ছিল কিছু লিখিব, কিন্তু আমার কলম অলস হইয়া আসিয়াছে, এখন সে আর নিজের বেগে চলে না, তাহাকে ঠেলিয়া চালাইতে হয়। মোটরগাড়ির কল যখন বিকল হয়, তখন তাহাকে ঠেলাগাড়ি করা সহজ নহে, তখন তাহাকে বিশ্রাম করিতে দেওয়াই ভালো।...

এই পত্রটির শেষাংশ সবুজপত্রেও নেই, এণ্ডারসনের উক্ত পুস্তকেও নেই। সেটি পাওয়া গিয়েছে এণ্ডারসনের একখানি পত্রে। রবীন্দ্রনাথের পত্রখানি পেয়ে এণ্ডারসন যে উত্তর দেন তাতেই ওই শেষাংশটুকু উদ্‌ধৃত

১ 'আপনি যখন...করিয়া থাকি'—এই অংশটুকুর হস্তাক্ষর-প্রতিরূপ মুদ্রিত আছে উক্ত পুস্তকে।

হয়েছে। এই উত্তর খুবই মূল্যবান্, শুধু ঐতিহাসিক তথ্য নির্ণয়ের জন্য নয়, রবীন্দ্রনাথের ছন্দ-আলোচনা অনুধাবন করবার পক্ষেও। তাই শুধু অপ্রাসঙ্গিক অংশ বাদ দিয়ে ওই পত্রখানি সমগ্রভাবেই উদ্ধৃত হল।—

18th March 1914
Mostyn House,
Brooklands Avenue,
Cambridge

My dear Kavivar,

I am very pleased and proud to have been favoured with so long, so interesting, so characteristic, so delightful, so learned and yet so charmingly humorous and revealing a letter. Alas, it reached me when my wife and I were both victims to a severe attack of influenza, and though I read it at once, it was with a fever-clouded brain, and so I am not going to venture to comment on it until I have been able to think out all that you say. This much, however, even so incompetent a person as myself may be allowed to say at once—a more illuminating piece of criticism can hardly have been written before by a poet on his own art. I was particularly struck by the beauty and justice of what you say as to the musical nature of rhythm, both in verse and prose, in Bengali. There is something of the same in French, in which language as in Bengali, metre does not mean the sorting of words into a pattern, so that the fixed word-stresses shall form a regular succession of beats. In French

and in Bengali alike, the *accent* (which in French may be accent of (1) pitch, (2) stress, or (3) duration or 'quantity') can be shifted, and indeed *must* be shifted according to the place a word occupies in a phrase or verse. Still, there *is* a difference between the music of prose and the music of verse, even in Bengali and French. If I may misapply your own very apt comparison, in verse you have a series of chairs—in prose the words, fat and thin alike, are on the ground, crowded together, so that they must be deliberately counted. In verse, the poet—and even the hearer—counts at sight. In most modern languages, the intervals between the "chairs" are marked by the *stress*-beats. In Bengali and French, it is not so. What is it that marks the numbers in Bengali and in French? In French, it is undoubtedly the syllables, which are fixed in number. (Note that in French a syllable consists of a vowel with the consonants *preceding* it. Consonants following go with the next vowel.) The final syllable of a phrase or a part of a verse has a strong "tonic accent", in French.

What have we in Bengali? Well, your letter tells us as no one else could tell us. It is evidently something quite different from a counting of beats in Bengali verse. Before I dare say any more, I must try to put your delightful and most interesting letter into something like adequate English. One difficulty about such discussions is the use of technical terms, such as *accent*, *mātrā* etc. One has to make sure that the disputants are using such terms with the same sense.

But let me think out what you have said. It is clearly not a subject for haste.

You say ইহার পরেও যদি দেখি আপনার মেজাজ ঠাণ্ডা আছে, তবে বাংলা ছন্দ সম্বন্ধে মোট কথাগুলা আপনাকে বুঝাইয়া বলিবার চেষ্টা করিব। Well, my মেজাজ is যারপরনাই ঠাণ্ডা! মহাশয়, আমি বুড়া মানুষ। I am an old man, who spent all my happiest years in Bengal. To read Bengali is to be reminded of old times and old friends. I have no prejudices ; I am most humbly willing to learn. Also experience tells me that a well-meaning foreigner can sometimes be of use to those to the nearer born, because he can suggest *comparative* means of study. It is very difficult to analyse one's own language, simply because one has mastered its peculiarities so completely that they escape one's attention. This is not so with you, because you have, in addition to your poetical genius, a gift for critical and philological enquiry. So was it with Milton and Dryden among English poets. But an old Anglo-Indian, who knows a little Bengali, may perhaps help you[১], as the mouse helped the lion in the fable. It is the mouse who must

১ প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় যে, অধ্যাপক এণ্ডারসন বাংলা ছন্দ সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য সংক্ষেপে বিবৃত করেছেন দীনেশচন্দ্র সেন-কৃত *The Vaisnava Literature of Mediaeval Benga* গ্রন্থের (১৯১৭) *Preface*-এ (তারিখ ১৯১৫, পৃ *V-XI*) এবং *A Manual of the Bengali Language* গ্রন্থে (পৃ ১০৬-০৮)। দীনেশচন্দ্র সেন-সম্পাদিত 'বঙ্গসাহিত্যপরিচয়' প্রথম খণ্ড (১৯১৪), *Introduction* অংশে (পৃ ৮১-৮৪) বাংলা ছন্দ সম্বন্ধে এণ্ডারসন মহাশয়ের অভিমত ও তৎসম্বন্ধে দীনেশচন্দ্রের মন্তব্যও দ্রষ্টব্য।

ask if the lion's মেজাজ is ঠাণ্ডা! But I have had the great privilege of meeting you[1] and of experiencing your extraordinary patience and kindness....

My dear Kavivar, I will write no more at present. I am still very shaky and weak, and cannot do justice to the delightful subject you are good enough to discuss. Let me merely say once more, that I am greatly pleased and proud.

Pray forgive me if I have made any blunders in this hastily written letter. I will write again in a day or two.

Meanwhile, believe me,

Yours very sincerely
J. D. Anderson

রবীন্দ্রনাথ অধ্যাপক এণ্ডারসনকে এই পত্রখানি লেখেন শিলাইদহ থেকে ৬ ফাল্গুন ১৩২০ (১৮ ফেব্রুআরি ১৯১৪) তারিখে। প্রায় সে সময়েই মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় শিলাইদহে গিয়ে কবির সঙ্গে দেখা করেন[2], এবং সম্ভবতঃ কবির নির্দেশেই তিনি অবিলম্বে উক্ত পত্রখানি 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশের অনুমতি চেয়ে এণ্ডারসন মহাশয়কে পত্র লেখেন। এণ্ডারসন সাহেব কবিকে ওই পত্রের প্রাপ্তিসংবাদ জানিয়ে উত্তর লেখার (১৮ মার্চ ১৯১৪) আগের দিনই সেটি ভারতীতে

১ এণ্ডারসনের প্রথম পত্র (১৫ জুলাই ১৯১২) থেকে জানা যায় যে, কেম্‌ব্রিজের কিংস্ কলেজে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে অধ্যাপক ডিকিনসন ও অধ্যাপক এণ্ডারসনের সাক্ষাৎকার হয় ১৪ জুলাই ১৯১২ তারিখে।

২ দ্রষ্টব্য প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়-কৃত 'রবীন্দ্রজীবনী' দ্বিতীয় খণ্ড (দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৫৫ মাঘ), পৃ ৩৪৬।

প্রকাশের অনুমতি জানিয়ে মণিলালকে একখানি পত্র লেখেন। পত্রখানির ঐতিহাসিক মূল্য আছে। তাই এটি এখানে সমগ্রভাবেই উদ্‌ধৃত হল।[১]—

17th March 1914
Mostyn House,
Brooklands Avenue,
Cambridge

My dear Sir,

It would be a thousand pities if the charming and most interesting letter which our Kavivar has been so good as to address to me were not published. Will you kindly present my respects to Mr. Tagore's distinguished sister[২] and assure her that, so far as I am concerned, the letter is very much at her disposal. I wonder if you would be so kind as to send me the copy of the *Bhārati* in which it appears?

The letter seems to me to be a marvel of poetic wit and wisdom, the metaphorical illustrations being especially delightful and illuminating. I have only read it through, and have not had time to think out the various problems it discusses. But it has been a sheer

১ মূলপত্র আছে মণিলালের পুত্র শ্রীশোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে। খামের উপরে বাংলায় লেখা ছিল—"বিজ্ঞবর শ্রীল শ্রীযুক্ত মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়েষু"। পত্রখানি কলকাতায় পৌঁছে ৫ এপ্রিল তারিখে (পোষ্টমার্ক)। মণিলাল সে সময়ে পুরীতে। তাই, ৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, জোড়াসাঁকো—এই ঠিকানা কেটে পত্রখানি পুরীতে পাঠানো ল

২ স্বর্ণকুমারী দেবী।

delight to read the matter so suggestive and original. The critical work of poets in England (Dryden was a remarkable exception) is often not so interesting as their verses. But Mr. Tagore's letter is as full of matter for thought as one of Victor Hugo's prefaces, and I am not a little proud that he should have addressed his remarks to a[n] old গুরুমহাশয় like me.

Believe me, dear Sir,
Yours very sincerely
J. D. Anderson

এই পত্রের সঙ্গে পরের দিন রবীন্দ্রনাথকে লিখিত পত্রের ভাবগত সাদৃশ্য, বিশেষতঃ Dryden-এর উল্লেখ, লক্ষ্য করবার মত। বস্তুতঃ এই পত্র-দুখানি পরস্পরের পরিপূরক।

যে সময়ে মণিলাল রবীন্দ্রনাথের পত্রখানি 'ভারতী'তে প্রকাশের অনুমতি চেয়ে এণ্ডারসনকে পত্র লেখেন সে সময়ে তিনি ভারতীর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কিন্তু ঠিক তখনই প্রমথ চৌধুরী ও মণিলাল একটি নূতন পত্রিকার পরিকল্পনা নিয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালাচ্ছিলেন। এই নূতন পত্রিকার নামকল্পনাও তখন হয় নি। তাই ছন্দের পত্রপ্রবন্ধটি ভারতীতে প্রকাশেরই অনুমতি চাওয়া হয়েছিল। কিন্তু এণ্ডারসনের অনুমতিপত্র যখন এসে পৌঁছল (১৯১৪ সালের ৫ এপ্রিলের পর), তখন 'সবুজপত্রে'র প্রথম সংখ্যার (সম্ভবতঃ ১৫ বৈশাখ ১৩২১) প্রবন্ধাদি সব প্রস্তুত বা প্রায়-প্রস্তুত ; 'কিন্তু হাতে দুতিন মাসের সম্বল' জমা ছিল না।[১] বোধ করি সেই জন্যই ভারতীতে

১ 'চিঠিপত্র' পঞ্চম খণ্ড (১৩৫২ পৌষ), পৃ ১৭১-৭৫ : পত্রসংখ্যা ১৮, ১৯, ২১, ২২।

প্রকাশের অনুমতি পাওয়া সত্ত্বেও এই পত্রপ্রবন্ধটি মুদ্রিত হল সবুজপত্রের দ্বিতীয় সংখ্যায় (১৩২১ জ্যৈষ্ঠ)।

এই পত্রখানির গোড়াতেই আছে, "আপনি বলিয়াছেন আমাদের উচ্চারণের ঝোঁকটা বাক্যের আরম্ভে পড়ে"। বস্তুতঃ এটা হচ্ছে অধ্যাপক এণ্ডারসনের অন্যতম মুখ্য বক্তব্য। অনেকগুলি পত্রে তিনি বারবারই একথার উপরে জোর দিয়েছেন। ১৯১৩ সালে তিনি যে-সব পত্রে ছন্দের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন (২৬ মার্চ, ১২ মে, ২২ মে, ২ জুন), রবীন্দ্রনাথের পক্ষে সেগুলির যথোচিত উত্তর দেবার সুযোগ বা অবকাশ ছিল না ; কারণ তখন তিনি ইউরোপ-আমেরিকায় ভ্রমণে নিরত। অতঃপর এণ্ডারসনের ১৭ জানুআরি ১৯১৪ (৪ মাঘ ১৩২০) তারিখের পত্র তিনি পান এদেশে (মাঘের চতুর্থ সপ্তাহে)। তার কিছুকাল পরে তিনি শিলাইদহে গিয়ে এণ্ডারসনের ছন্দ-জিজ্ঞাসার যে উত্তর দেন তা উক্ত সব পত্রেরই জবাব বলে গণ্য হতে পারে। এণ্ডারসন একাধিক পত্রেই বাংলা একসেণ্ট বা ঝোঁকের বিষয় উত্থাপন করেছেন। যথা—

২৬ মার্চ ১৯১৩ তারিখের পত্র (এটাই ছন্দ-বিষয়ক প্রথম পত্র)—

May I, with much diffidence, make a suggestion which only you, or someone who has an equally open mind and an equal knowledge of Indian languages, could test and develope ? Have you noticed that French (the most western of the Romance languages, and spoken chiefly by descendants of Celts, who spoke *another* language) is unique in Europe, in the fact that the audible quality in its uccāraṇ is *not* the *word-accent* (which is the dominant quality in English, German, Hindi etc.), *but* what is called the *phrase-accent*, which

I should perfer to call the *pause-accent*, since it precedes a cessation of the voice, and that Bengali (the most eastern of Indo-European languages) has also this phrase-accent ?···

There are two languages in which phrase-accent ('accent' includes both *stress* and *pitch*) is more audible than word-accent. These are Bengali and French. In Bengali, this phrase-accent comes immediately *after* the pause ; in French it immediately *precedes* a pause.···

In French and Bengali, the word-accents exist, of course, but they are dominated by the phrase-accent, which is (I diffidently suggest to a poet) the quality which in French and Bengali verse constitutes metre....

Now I take a specimen of পয়ার at random from the কৃত্তিবাসী রামায়ণ। I take a bit out of the tale of Rāma's education :—

> pa″ñcavarṣa ga′ta ha′y(a) | hā″te di′la kha′ṛi
> pa″ṛite pā′ṭhān(a) rā′jā | Va″śiṣṭher(a) bā′ṛi...

২ জুন ১৯১৩ তারিখের পত্র—

I think that there is something to be said for my theory that the dominant feature in Bengali verse is an initial tonic accent and not a recurrent beat of word-stress as in most Indian and European languages. I think you will feel this if you try to write *payār* couplets in English,—you will find that the frequent word-stresses in English make the task very difficult. Here is some doggrel (*sic.*) which I made up to show

an English friend what the metrical effect of *payār* verse is :—

Su″ch is the melo″dious, the de″licately chi″ming
Me″tre of Benga″li, in its pau″ses and its rhy″ming,
Trip″ping to the mea″sure of a da″nce of little fee″t,
Pe″rilously si″mple, like the jin″gle of the swee″t
Be″lls upon the a″nkles of the da″ncers as they po″se,
Be″lls upon their a″nkles, yes, and ri″ngs upon their to″es.

That is poor stuff, of course, but it shows the four beats followed by three atonic syllables. In English, it is very difficult to get three or more atonic syllables together, but in French it is easy, because French, too, has a tonic phrase-accent, which differs from the Bengali phrase-accent in being final instead of initial....

In the old fashioned *payār*, the second and fourth accents seem to be artificial metre accents not necessarily heard in prose. In your beautiful innovation on the *payār*[১] (singularly like Victor Hugo's use of ternary and quaternary cæsuras) it seems to me that by introducing intermediate cæsuras, you are giving a more natural and easy effect to the second and fourth beats, so that they fall on initial syllables which could be accented in ordinary speech.

১ এই নূতন পয়ারের অর্থাৎ প্রাকৃত-বাংলা পয়ারের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন ১৭ জানুআরি ১৯১৪ তারিখের পত্রে—'আমার মিলন লাগি তুমি' এবং 'রূপসাগরে ডুব দিয়েছি' ইত্যাদি।

১৭ জানুআরি ১৯১৪ তারিখের পত্র—

It seems to me (I may be wrong) that in Bengali as in French words have an accentuation which varies according to their place in a phrase or verse. Whereas in Hindi, English, Italian and other *stressed* languages, a word (or at all counts a word which is not merely atonic and auxiliary) has its *fixed* stresses and has to be fitted into its place accordingly. Consequently, there are many words in such languages which cannot be used metrically at all. One thing I note in your verse is the remarkable use to which you put *dis*-syllablic words. For instance, in the following two lines *all* the words are dissyllables.—

আমার মিলন লাগি তুমি আসছ কবে থেকে,
তোমার চন্দ্র সূর্য্য তোমায় রাখবে কোথায় ঢেকে ?

The slight initial stress on each of these gives the verse a tripping trochaic effect which is common enough in quantitative verse, but is rare in the verse of stressed languages.•••

I only want to say that my attempt to analyse your metres has filled me with a new sense of the beauty of your poetry. One of the loveliest things, to my feeling (forgive me if I am wrong), are the lines beginning—

রূপসাগরে ডুব দিয়েছি অরূপ রতন আশা করি।

অধ্যাপক এণ্ডারসন-কৃত ইংরেজি পয়ারের দৃষ্টান্তটির প্রথম ও দ্বিতীয় পংক্তিতে চলতি বাংলার পয়ারের মতোই চৌদ্দটি করে দল (সিলেব্‌ল্)

আছে, বাকি প্রত্যেক পংক্তিতে আছে তেরো দল ; প্রতিপর্বে চার দল এবং দুই পর্বের পরে অর্থাৎ আট দলের পরে অর্ধযতি। প্রতিপর্বের প্রথম দলের উপরেই প্রস্বর (এক্‌সেন্ট্‌)।

অধ্যাপক মহাশয় এই দৃষ্টান্তটি দীনেশচন্দ্র সেনকেও পাঠিয়েছিলেন ছন্দ-আলোচনা-প্রসঙ্গে।[১] এই স্বরচিত ইংরেজি পয়ারের নিদর্শনটি সম্বন্ধে তিনি তৎকালে যে মন্তব্য করেছিলেন, এ প্রসঙ্গে তাও উল্লেখযোগ্য।—

Observe that the stresses here are much further apart than they would be in normal English verse or prose, and that I have had to choose many small atonic words to separate them. In French and in Bengali the poet has no such difficulty, since the accents are further apart than in English or Hindi, being phrase, accents, not word-stresses.

—দীনেশচন্দ্র সেন-সম্পাদিত 'বঙ্গসাহিত্যপরিচয়' প্রথম খণ্ড (১৯১৪), *Introduction*, পৃ ৮২-৮৩

এই পত্রের 'আমার মিলন লাগি তুমি' এবং 'রূপসাগরে ডুব দিয়েছি'

১ দীনেশচন্দ্রকে লেখা অধ্যাপক এণ্ডারসনের ৩৩ খানি পত্র রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত আছে। কিন্তু এগুলির মধ্যে ইংরেজি পয়ারের দৃষ্টান্তটি পাওয়া যায়নি। রবীন্দ্রনাথকে লেখা ও দীনেশচন্দ্রের গ্রন্থে প্রকাশিত দৃষ্টান্তটির ছন্দ-বিশ্লেষণে একটু পার্থক্যও লক্ষিত হয়। প্রথমটিতে প্রত্যেক পর্বের প্রথমেই আছে ডবল প্রস্বরচিহ্ন। দ্বিতীয়টিতে কিন্তু প্রথম ও তৃতীয় পর্বের প্রথমে ডবল প্রস্বর এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ পর্বের প্রথমে একক প্রস্বর। এই দ্বিতীয় প্রকার বিশ্লেষণই যুক্তিসংগত মনে করি। আর-এক পার্থক্য এই যে, দীনেশচন্দ্রকে লেখা দৃষ্টান্তের প্রথম শব্দটি This, অপরটিতে Such। তা ছাড়া, আর কোনো পার্থক্য নেই।

ইত্যাদি দুটি দৃষ্টান্ত[১] সম্বন্ধেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "গীতাঞ্জলি হইতে আপনি আমার যে লাইনগুলি তুলিয়া দিয়াছেন তাহা আমাদের চলতি ভাষার হসন্ত স্বরের লাইন"।[২]

২ জুন ১৯১৩ তারিখের পত্রে অধ্যাপক এণ্ডারসন প্রাচীন (old fashioned) অর্থাৎ সাধু পয়ারের ভঙ্গীকে কৃত্রিম (artificial) এবং চলতি বাংলার পয়ারকে your beautiful innovation ও natural বলে বর্ণনা করেছেন। এই প্রসঙ্গেই রবীন্দ্রনাথ সাধু বাংলা ও অসাধু বা চলতি বাংলার প্রকৃতিগত পার্থক্য আলোচনা করেছেন এবং এই উপলক্ষ্যেই বলেছেন, "আমার শেষবয়সের কাব্যরচনায় আমি এই চলতি বাংলার সুরটাকে ব্যবহারে লাগাইবার চেষ্টা করিয়াছি"।[২]

রবীন্দ্রনাথ চলতি ভাষার ছন্দের দৃষ্টান্ত হিসাবে 'আমার সকল কাঁটা ধন্য করে' ইত্যাদি যে পংক্তি-দুটি উদ্‌ধৃত করেছেন তা আছে 'গীতিমাল্য' কাব্যে। 'গীতিমাল্য' প্রকাশিত হয় এই পত্র লিখিত (৬ ফাল্গুন ১৩২০) এবং প্রকাশিত (জ্যৈষ্ঠ ১৩২১) হবার পরে। কেননা, এই কাব্যের শেষ রচনার তারিখ ৩ আষাঢ় ১৩২১। এণ্ডারসনের পক্ষে দৃষ্টান্তটি নূতন।[৩] কিন্তু তিনি 'আমার মিলন লাগি তুমি' ইত্যাদি রচনার ছন্দ সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করেছেন, এই নূতন দৃষ্টান্ত সম্বন্ধেও তা সর্বতোভাবেই প্রযোজ্য, এটুকু লক্ষ্য করবার বিষয়।

১ যথাক্রমে গীতাঞ্জলির ৩৪ ও ৪৭-সংখ্যক কবিতা। দুটিই চলতি বাংলার পয়ার।

২ দ্রষ্টব্য পৃ ৭।

৩ গীতিমাল্যের (৪৯-সংখ্যক) এই গানটি রচিত হয় ১৫ অগ্রহায়ণ ১৩২০ তারিখে এবং সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয় পরের চৈত্রমাসে (প্রবাসী ১৩২০ চৈত্র, পৃ ৫৮২, ১১-সংখ্যক গান)। সুতরাং রবীন্দ্রনাথ যখন এটিকে পত্রভুক্ত করেন তখন এটি পাণ্ডুলিপি-অবস্থাতেই ছিল

রবীন্দ্রনাথের এই পত্র পাবার পরে অধ্যাপক এণ্ডারসন তার কোনো কোনো প্রসঙ্গ সম্বন্ধে যে অভিমত প্রকাশ করেছেন তাও প্রণিধানযোগ্য।

"কোনো কোনো কবি ছন্দের এই দীনতা দূর করিবার জন্য বিশেষ জোর দিবার বেলায় বাংলা শব্দগুলিকে সংস্কৃতের রীতি অনুযায়ী স্বরের হ্রস্বদীর্ঘ রাখিয়া ছন্দে বসাইবার চেষ্টা করিয়াছেন।...বাংলায় এ জিনিস চলিবে না; কারণ বাংলায় হ্রস্বদীর্ঘের পরিমাণভেদ সুব্যক্ত নহে।"—রবীন্দ্রনাথের এই উক্তির প্রসঙ্গ আছে এণ্ডারসনের দুটি পত্রে।

৭ এপ্রিল ১৯১৪ তারিখের পত্রে আছে—

When I was young and had a better ear than I now possess, I used to write stress metres so as to give the *metrical effect* of quantitative metres. My best attempt of this sort was intended to give the *effect* of Latin "hendecasyllables", putting stresses where the *long* syllables occur in Latin. The Latin metre is this :—

—⏓ | —⏑⏑ | —⏑ | —⏑ | —⏓ || [১]

My doggrel (*sic.*) ran as follows :—

Ma″rch, la″d, | ma″rch ; let us |
stri″de a | lo″ng to | ge″ther...

The stresses come where the long syllables come in Latin, and produce something of the same *effect.* [২]

১ এই লাটিন ছন্দটির সঙ্গে সংস্কৃত 'রথোদ্ধতা' ও 'স্বাগতা' ছন্দের আংশিক সাদৃশ্য আছে, বিশেষতঃ প্রথম পাঁচ সিলেবল বা অক্ষরে।

২ অনুরূপভাবে সংস্কৃত (তথা আরবী ফারসী) ছন্দের ভঙ্গীটুকু বাংলায় আনবার প্রথম প্রয়াস করেন কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। 'কুহু ও কেকা' কাব্যের (রাথাপূর্ণিমা ১৩১৯) 'রিক্তা' (মালিনী ছন্দ) ও 'যক্ষের নিবেদন' (মন্দাক্রান্তা) কবিতা তার প্রথম নিদর্শন।

এ বিষয়ে এণ্ডারসনের পরবর্তী পত্রের (৮ মে ১৯১৪) মন্তব্য বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।—

Your statement that quantitative verse is practically impossible in Bengali is very interesting. Our present poet-laureate, Dr. Bridges, has at times written quantitative verse in English, but to most of us it does not sound like verse at all...I think most Englishmen feel that the differences of sound are drowned by the prominence of force of sound. In other words, the metre is exotic, and unsuited to the language.[১] ...One thing I know, and that is that *your* metres are singularly musical and beautiful—even to my barbarian ear.

অধ্যাপক এণ্ডারসনকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের এই প্রথম পত্রখানি সম্বন্ধে আর-একটি জ্ঞাতব্য বিষয় এই যে, অধ্যাপক এণ্ডারসন এটির একটি ইংরেজি অনুবাদ করে রবীন্দ্রনাথকে পাঠিয়েছিলেন।[২] কিন্তু

১ সত্যেন্দ্রপ্রবর্তিত রীতি সম্বন্ধেও এই মন্তব্য অংশতঃ প্রযোজ্য, কিন্তু সর্বতোভাবে নয়। কারণ বাংলায় ইংরেজির মতো সুনির্দিষ্ট বলপ্রস্বর (stress-accent) নেই; ফলে রুদ্ধদল (closed syllable প্রয়োগের দ্বারা দীর্ঘস্বরের অভাবপূরণ ইংরেজির মতো দুঃসাধ্য নয়। কেননা, এসব স্থলে রুদ্ধদলের উচ্চারণ বস্তুতঃই দীর্ঘ এবং এই দীর্ঘতা সংস্কৃত ছন্দেও স্বীকৃত। তবে সংস্কৃতের বিশুদ্ধ দীর্ঘ স্বরের অভাব বাংলায় পূরণ করা সম্ভব নয়। লাটিন ছন্দ ইংরেজি ভাষার পক্ষে যতটা exotic, সংস্কৃত ছন্দ বাংলার পক্ষে ততটা নয়।

২ এণ্ডারসন ৮ মে ১৯১৪ তারিখের পত্রের গোড়াতেই লেখেন—

Herewith I submit an attempt to put your letter on metre into English. I hope I have got the gist of your argument correctly represented.

অনুবাদটি কোথাও প্রকাশিত হয়েছিল কিনা জানা যায় নি; এটির পাণ্ডুলিপি বা তার প্রতিলিপিও পাওয়া যায় নি।

১৯১৪ সালের গোড়া থেকেই অধ্যাপক এণ্ডারসন রবীন্দ্রনাথকে ছন্দ সম্বন্ধে পুনঃপুনঃ চিঠিপত্র লিখছিলেন (১৭ জানুআরি, ১৮ মার্চ, ৭ এপ্রিল, ৮ মে, ২১ ও ২৪ জুলাই)। তারই অন্যতম ফল ৬ ফাল্গুন ১৩২০ তারিখে লেখা রবীন্দ্রনাথের উক্ত পত্র সবুজপত্রে প্রকাশিত হয় ১৩২১ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে। ছন্দের চিন্তা যে এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের মনকে অনেকাংশে অধিকার করেছিল তার নিদর্শন পাওয়া যায় এই সময়ে (৬ জুলাই ১৯১৪ তারিখের পূর্বে) রচিত তাঁর 'আষাঢ়' প্রবন্ধে (সবুজপত্র ১৩২১ আষাঢ়)।[১] তাতে তিনি এক স্থানে প্রসঙ্গক্রমে বলেন—

আমি বৈজ্ঞানিক নহি, কিন্তু অনেক দিন ছন্দ লইয়া ব্যবহার করিয়াছি বলিয়া ছন্দের তত্ত্বটা কিছু কিছু বুঝি বলিয়া মনে হয়। আমি জানি ছন্দের যে অংশটাকে যতি বলে অর্থাৎ যেটা ফাঁকা, অর্থাৎ ছন্দের বস্তু অংশ যেখানে নাই, সেইখানেই ছন্দের প্রাণ— পৃথিবীর প্রাণটা যেমন মাটিতে নহে, তাহার বাতাসেই। ইংরাজিতে যতিকে বলে Pause—কিন্তু Pause শব্দে একটা অভাব সূচনা করে, যতি সেই অভাব নহে। সমস্ত ছন্দের ভাবটাই ঐ যতির মধ্যে— কারণ যতি ছন্দকে নিরস্ত করে না, নিয়মিত করে। ছন্দ যেখানে যেখানে থামে সেইখানেই তাহার ইসারা ফুটিয়া উঠে, সেইখানেই সে নিশ্বাস ছাড়িয়া আপনার পরিচয় দিয়া বাঁচে।[২]

—'আষাঢ়', পরিচয়, রচনাবলী ১৮

১ দ্রষ্টব্য 'চিঠিপত্র' পঞ্চম খণ্ড (১৩৫২ পৌষ), পৃ ১৭৬ : ২৪-সংখ্যক পত্র (৬ জুলাই ১৯১৪)।

২ এই প্রসঙ্গে এণ্ডারসনের ৮ মে ১৯১৪ তারিখের পত্রের একটি অংশ স্মরণীয়।—

Apparently metre consists in the rhythmical recurrence of

দ্বিতীয় পত্র

এই ছন্দ-চিন্তার সময়েই অধ্যাপক এণ্ডারসনকে দ্বিতীয় পত্রখানি লিখিত হয়। লেখার তারিখ ১৮ আষাঢ় ১৩২১। প্রথম পত্রের ন্যায় এটিরও পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় নি। তবে লেখার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সবুজপত্রে প্রকাশের জন্য প্রেরিত হয়[১] এবং পরের মাসেই প্রকাশিত হয়।[২] কিন্তু এটি প্রথম পত্রের ন্যায় খণ্ডিতাকারে প্রকাশিত না হয়ে সমগ্রভাবেই প্রকাশিত হয়। 'ছন্দ' গ্রন্থের প্রথম প্রকাশের সময় এই পত্রখানি বাদ গিয়েছিল। বর্তমান সংস্করণেই এটি প্রথম গ্রন্থভুক্ত হল। তবে গ্রন্থমধ্যে এটির অপ্রাসঙ্গিক অংশ বর্জন করে শুধু ছন্দ-বিষয়ক অংশটুকুই সংকলিত হল। রচনাবলী সংস্করণেও তাই করা হয়েছে, তবে সেখানে এটি মূলবিভাগে স্থাপিত না হয়ে 'চিঠিপত্র' বিভাগে স্থাপিত হয়েছে।

certain fixed audible qualities in a language. For instance, you cannot have *stress* metre in Bengali or French, because in those languages the accent on a word depends (among other things) on the place the word occupies in a phrase, i. e., the accent is not *fixed.* Therefore, in these languages, a verse seems to consist in a fixed *number* of অক্ষর [সিলেব্‌ল্‌ অর্থে প্রযুক্ত] the number being made audible to the ear (in long lines) by *cæsuras*, pauses, ফাঁকs, which seem usually to be marked by some change of voice, a change of pitch, or stress, or both. This kind of verse cannot be written in English, because the strong word-stress "kills" the phrase-accent, which no doubt exists, but is subordinate.

১ 'ছন্দতত্ত্ব পাঠালুম।'—প্রমথ চৌধুরীকে লেখা পত্র [১৩২১ আষাঢ়]। 'চিঠিপত্র' পঞ্চম খণ্ড (১৩৫২ পৌষ), ৩৬-সংখ্যক পত্র।

২ সবুজপত্রে রচনাটির গোড়াতেই পাদটীকায় আছে—"এই পত্র কেম্ব্রিজের বাংলা অধ্যাপক শ্রীযুক্ত এণ্ডারসন সাহেবকে লিখিত।"

এই গ্রন্থে সংকলিত পাঠে মূলপত্রের প্রথম ও শেষ দিক্ থেকে যে-দুটি অংশ খণ্ডিত হয়েছে, সে-দুটি এস্থলে সবুজপত্র থেকে পুনঃপ্রকাশিত হল। প্রথমাংশটি এই—

শান্তিনিকেতন
বোলপুর

প্রিয়বরেষু

এতদিন গ্রীষ্মের ছুটি ছিল; এখন আবার কাজে লাগিয়াছি। বাংলা ছন্দ সম্বন্ধে আপনাকে আরও কিছু লিখিব আশা দিয়াছিলাম।[১] কিন্তু যাহারা খাঁটি কুঁড়ে মানুষ, ফুরসত পাইলেই তাহারা কোনো কাজ করিতে পারে না। সেইজন্য এতদিন ছুটির ভিড়ে আপনাকে লিখিতে পারি নাই। যখন নিয়মিত কাজের তাড়া পড়ে তখন কুঁড়ে মানুষরা একটা অনিয়মিত কাজ পাইলে বাঁচিয়া যায়—তাই আমার ইস্কুল পালাইয়া আপনাকে বাংলা ছন্দসম্বন্ধে চিঠি লিখিতে বসিয়া গেলাম।···

শেষাংশ এই—

···যাহা হউক আমার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিলাম।

চিঠির মধ্যে কাটাকুটি অনেক রহিয়াছে, সেই সমস্ত ক্ষতচিহ্ন-সমেত এটা আপনার কাছে চালান করিয়া দিলাম— এই ক্রটিকে বেয়াদবি বলিয়া গণ্য করিবেন না। চিন্তার সঙ্গে লড়াই করিতে হইয়াছে—তবু রণে ভঙ্গ না দিয়া বক্ষের উপর তলোয়ারের দাগ বহিয়া এই পত্র

১ "ইহার পরেও যদি দেখি আপনার মেজাজ ঠাণ্ডা আছে, তবে বাংলা ছন্দ সম্বন্ধে মোট কথাগুলা আপনাকে বুঝাইয়া বলিবার চেষ্টা করিব।"—রবীন্দ্রনাথের একথার উত্তরে অধ্যাপক এণ্ডারসন লিখেছিলেন, "*Well, my* মেজাজ *is* যারপরনাই ঠাণ্ডা" (দ্রষ্টব্য পৃ ৩২৩)। তাই প্রতিশ্রুতিরক্ষার জন্য এই দ্বিতীয় পত্র লিখিত হয়।

আপনার সভায় হাজির হইয়া আপনাকে সেলাম জানাইতেছে। ইতি
১৮ আষাঢ়, ১৩২১

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এই পত্রখানি পেয়ে অধ্যাপক এণ্ডারসন রবীন্দ্রনাথকে একটি সুদীর্ঘ উত্তর লেখেন। নানা দিক্ থেকে সেটির প্রচুর মূল্যবত্তা আছে। আমরা এস্থলে ওটি থেকে শুধু প্রাসঙ্গিক অংশটুকু উদ্ধৃত করলাম।—

Mostyn House
Brooklands Avenue
Cambridge
21st July 1914

My dear কবিবর,

Your most interesting and delightful letter of the 18th Aṣāḍh reached me yesterday. I have read it with great pleasure, and respect, and sympathy, and shall read it again more than once. But on one point I proceed to enter an immediate, a respectful, but a very strong protest.

You have made a very interesting comparison between the rhythm of certain English verses and that of Bengali metres which give the same kind of musical effect and impression. In so doing, you have, as it seems to me, done an injustice to Bengali verse. In spite of your present impression, I venture to think that I can *prove* to you that the rhythm of the Bengali verse is of a different *kind* to that of the verse of stressed languages...

The delightful approximations you have made between English verse and Bengali verse are approximations only. They are not the *same* thing. All that we can say is that English verse can be read so as to give the *effect* of the long polysyllabic phrases of Bengali and French verse.

The most interesting of these is the trochaic couplet—

O the dreary, dreary moorland,
O the barren, barren shore.

You read it thus :—

O the dreary, | dreary moorland, |
O the barren, | barren shore. |

which make it the equivalent of

রাতটা কেমন | আঁধার আঁধার,
রাত্তির ছায়া | কেমন ঘোর্।

But the lines are really composed of four trochee (—⏑) feet each, thus :—

O the | dreary, | dreary | moorland,
O the | barren, | barren | shore.

It is an interesting fact that all your quotations happen to be examples of 'trochaic' (—⏑) or 'dactylic' (—⏑⏑) verse. Both these are less common in English than 'iambic' (⏑—) verse. But the impor-

tant thing is that we have in English true *padas*, only they are *stress* feet, and not *quantity* feet.

Let me now scan your other quotations. Two are 'trochaic', and go thus :—

(1) Ah, dis | tinctly | I re | member,
It was | in the | bleak De | cember.

(2) (And) are ye | sure the | news is | true,
(And) are ye | sure he's | well ?

The other two are 'dactylic' (—⌣⌣) and may be scanned thus :—

(1) One more un | fortunate
Weary of | breath.

This resembles, but is not the same as, many Bengali metres, because here the word-stresses happen to be initial and fall where the initial phrase-accent falls in Bengali :—

ভারতে | কতদিন
থাকিল | সে ?

(2) When we two | parted
(in) silence and | tears,
Half broken | -hearted,
(to) sever for | years.

Moreover, it happens that all examples you have selected are cases in which the poet has used a fixed number of syllables. But in English, the verse really consists of a fixed number of *stresses*, and the number of syllables is of minor importance. That is why English verse is not what is technically called 'syllabic' verse...

I imagine no Englishman has ever written Bengali verse. The reason is obvious. How few Englishmen catch the tone of spoken Bengali ! The music of verse must needs be the disciplined and rhythmical music of *spoken* language.

মহাশয়, আমি অনেক কথা লিখিয়াছি, অনেক ভ্রমও করিয়াছি, তাহার সন্দেহ নাই। অধীনকে মাপ করিবেন। যদি অপরাধ করিয়াছি, না জানিয়া অপরাধ করিয়াছি। আমায় ক্ষমা করুন। এখন আমি বিদায় লইলাম। পরমেশ্বর আপনাকে দীর্ঘজীবী ও চিরসুখী করুন।

ভবদীয়

J. D. Anderson

উদ্‌ধৃত পত্রের পরিপূরক হিসাবে অধ্যাপক এণ্ডারসন রবীন্দ্রনাথকে ২৪ জুলাই ১৯১৪ তারিখে আর-একখানি পত্র লেখেন। তাতে ইংরেজি ও বাংলা ছন্দের তুলনাপ্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আংশিক সমর্থন পাওয়া যায়। তার থেকে শুধু প্রাসঙ্গিক অংশটুকু উদ্‌ধৃত করা যাচ্ছে।—

English verse is essentially *stress* verse. What we *count* is the number of *stresses*. The number of syllables is theoretically unimportant. Yet much

English verse is, as your trained ear rightly told you, as syllabic as French verse or Bengali verse. There is an historic reason for this...

Now, classical Bengali verse, as you have in effect said somewhere, is true syllabic verse, as in

কাশি রাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান—

since this, transliterated, may be written

Kāsi Rām(a) Dās(a) kahe, śune puṇyavān(a)

which gives 14 syllables.

Your innovation[1]—is it not so?—is to ignore the muted final—a, so as to produce the clash of final and initial syllables, when two words come together.[2] Some French poets seem to have done exactly the same thing...The same thing has really happened in English, but the change is disguised in English by the fact that the final অ is often not even written now...Note that in Bengali, too, it is not written, and only conventionally pronounced in medieval verse. Does your verse wholly omit this final—অ? Not always, e.g.—

তুমি কেমন করে গান কর, হে গুণী,
অবাক্ হয়ে শুনি, কেবল শুনি!

Here the metre seems to go

Ke'man(a) kare | gā'n(a) kara[3], he gu'ṇī,
a'vāk(a) haye | śu'ni, keval(a) śu'ni!—

১ দ্রষ্টব্য 'নূতনপয়ার'-প্রসঙ্গ (পৃ ৩২৯-৩০)। বস্তুতঃ এই 'নূতনপয়ার' রবীন্দ্রনাথের innovation নয়। তাঁর "সে আউলের মুখে, বাউলের মুখে,...ঠুনঠুন শব্দ করিতেছে" এই উক্তি (পৃ ৬-৭) স্মরণীয়।

২ স্মরণীয় "হসন্ত শব্দটা স্বরবর্ণের বাধা...বাজাইয়া তোলে" এই উক্তি (পৃ ৬)।

৩ 'কর' শব্দের শেষ অকারের লোপ স্বাভাবিক উচ্চারণেও প্রত্যাশিত নয়, সুতরাং এটা ব্যতিক্রম বলে স্বীকার্য নয়।

where the rhyme-accent makes the second member of the line di-tonic, carrying two accents.[১]

২৪ জুলাই ১৯১৪ তারিখের এই পত্রের পরে দীর্ঘকালের মধ্যে ছন্দ সম্বন্ধে এণ্ডারসনের লেখা আর কোনো পত্র রবীন্দ্রসদনে নেই। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের এই দ্বিতীয় পত্রখানির প্রসঙ্গে তিনি যে আরও পত্র লিখেছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ১৯১৫ সালের মার্চ মাসে রথীন্দ্রনাথকে লেখা রবীন্দ্রনাথের একটি পত্রে এ-বিষয়ের একটু উল্লেখ আছে। এটুকু উদ্ধৃত করা প্রয়োজন।—

কেম্ব্রিজের প্রোফেসর এণ্ডারসনকে Sylvain Lèvi যে চিঠি লিখেচেন তার থেকে খানিকটা কপি করে দিলুম। প্রমথ ও মণিলালকে দেখতে দিস—

I have not yet, I think, thanked you for your paper translated from Tagore's Bengali. I perused it with great pleasure. I am telling only the plain truth when I say that I have never seen anything about metric that can compare with it. It is full of original and deep thoughts and if ever we enjoy peace[২] again, I shall try to write a note on it, as the subject is peculiarly interesting to me.

—'চিঠিপত্র' দ্বিতীয় খণ্ড (১৩৪৯ আষাঢ়), পৃ ২৫-২৬

১ বস্তুতঃ এই লাইনগুলির দ্বিতীয়াংশকে di-tonic অর্থাৎ দ্বিপ্রস্বরযুক্ত মনে করা নিষ্প্রয়োজন। এই লাইনগুলি আসলে ত্রিপর্বিক এবং প্রতিপর্বে একটি করে প্রস্বর। যেমন—

কেমন করে | গান কর, হে | গুণী।

এই শেষ দুটি পর্বকে দুইপ্রস্বরযুক্ত 'এক' ভাগ বলে গণ্য করা নিষ্প্রয়োজন।

২ তখন ইউরোপে প্রথম মহাযুদ্ধ (১৯১৪-১৮) চলছিল।

মনে হয়, এণ্ডারসন রবীন্দ্রনাথের এই ছন্দ-বিষয়ক পত্রখানির ইংরেজি অনুবাদ করে সিলভ্যাঁ লেভিকে পাঠিয়েছিলেন এবং লেভির উত্তরটি তিনি রবীন্দ্রনাথকে পাঠিয়েছিলেন। এইসব চিঠিপত্র বা অনুবাদ, কোনোটিই পাওয়া যায়নি, উদ্‌ধৃত অংশটুকু বাদে। লেভি এ-বিষয়ে পরে কিছু লিখেছিলেন কি না তাও জানা যায়নি। যা হক, লেভির উক্ত অভিমত সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ প্রমথ চৌধুরীকে লেখেন—

Sylvain Lèvi আমার ছন্দতত্ত্ব সম্বন্ধে কি বলেছে দেখেছ? রথীকে তার Extract পাঠিয়েছি—সে বোধ হয় তোমাকে দেখিয়ে থাকবে। ওর মত পড়ে ও-লেখাটা শেষ করে ফেলবার জন্যে আবার উৎসাহ হচ্চে। দেখি যদি সময় পাই।

—'চিঠিপত্র' পঞ্চম খণ্ড (১৩৫২ পৌষ), ৩৮-সংখ্যক পত্র

ছন্দতত্ত্ব-বিষয়ক এই দ্বিতীয় পত্রখানি নিয়ে কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের সঙ্গেও লেখালেখি হয়েছিল। এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ সত্যেন্দ্রনাথকে যে পত্র[১] লেখেন তা এই—

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

সত্যেন্দ্র, তুমি যদি 'কই' শব্দের শেষ 'ই'-টির মাত্রা বাজেয়াপ্ত করতে চাও তবে অন্যায় হবে না? আমার দৃষ্টান্তে দৈবক্রমে 'কই' কথাটা পদের শেষে পড়ে গেছে। তাই ফাঁক পেয়ে সেই ফাঁকির উপর দিয়ে মাত্রাটা চালিয়েছ কিন্তু যদি "কই শয্যা, কই বস্ত্র" হত তাহলে

১ মূলপত্র আছে শ্রীপুলিনবিহারী সেনের কাছে। রচনাবলী (২১) -সংস্করণের গ্রন্থপরিচয়ে এর সৌজন্যসূচক অংশ বাদে সবটুকুই মুদ্রিত হয়েছে। এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথকে লেখা সত্যেন্দ্রনাথের পত্রের সন্ধান পাওয়া যায়নি।

কী রকম করে এমন অবৈধাচরণ করতে পারতে? বস্তুত ইকারের পরে ফাঁক নেই— ক-এর অ-টাকে দীর্ঘ ক'রে ই-এর হ্রস্বতা পূরণ করা হয়। সে তো সকল হসন্ত বর্ণের সম্বন্ধেই খাটে—"কোথা জল, কোথা স্থল"— এখানে মাত্রার ওজন যদি দেখ তবে দেখবে 'জ' যত বড় 'ল্' তত বড় নয়— সেইজন্যে জ-টাকে দেড়মাত্রা করতে হয়েছে। তোমার বিধি অনুসারে 'জল্'-কে একমাত্রা করে ফাঁকের উপরে আর-এক মাত্রা ফেলতে হয়। কিন্তু সেটা সাধু ছন্দের নিয়মবিরুদ্ধ। "সেইত বহিছে বায়ু", এখানে তুমি 'সেই'-এর 'ই'-টিকে কি বিমাত্র বলে গণ্য করবে?

"When we two parted" কবিতাটির সম্বন্ধে অনেক দ্বিধা আমার মনে উদয় হয়েছিল, কিন্তু শেষকালে অন্য কোনো দৃষ্টান্ত মনে না পড়াতে ওটাকে ত্যাগ করিনি— আমার অভিপ্রায় এই ছিল, যদি কেবলমাত্র প্রথম লাইনটা পড়া যায় তাহলে সম-অসমমাত্রার ছন্দের লয়টা ইংরেজের কানে পরিচিত হতে পারে— মনে কর যদি এমন হত—

When we two parted
Silence and tears

তাহলে তো ছন্দভঙ্গ হত না— এমন অবস্থায় 'In'-টাকে ফালতো বলে ধরবার অধিকার আছে। বস্তুত ছন্দের মধ্যে ফালতো অংশের লক্ষণই এই যে, সেটাকে বাদ দিলে মূল ছন্দের তাল কাটে না— ও-জিনিসটা ফাঁকের মধ্যে ঢুকে পড়ে, আসনে ওর স্থান নেই। তথাপি আমার প্রবন্ধটার মধ্যে একটু বদল করে দেওয়া গেল— কিন্তু আমার বোধ হয় যে সেটা অনাবশ্যক।

স্নেহাসক্ত
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

'তথাপি আমার প্রবন্ধটার মধ্যে একটু বদল করে দেওয়া গেল'— এই উক্তি থেকে মনে হয় 'প্রবন্ধ'টি মুদ্রিত হবার পূর্বেই (পাণ্ডুলিপি অথবা প্রুফ অবস্থায়) এবং অধ্যাপক এণ্ডারসনের উত্তর পাবারও পূর্বেই সত্যেন্দ্রনাথ এটি দেখেছিলেন ও তাঁর অভিমত রবীন্দ্রনাথকে জানিয়েছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ দুটি বিষয়ে মন্তব্য করেছিলেন—(১) 'শয্যা কই বস্ত্র কই' পদের 'কই' শব্দের মাত্রাগণনা এবং (২) When we two parted ইত্যাদি রচনাটির ছন্দোবিশ্লেষণ সম্বন্ধে।

দ্বিতীয়টির কথাই আগে বলা যাক। সত্যেন্দ্রনাথ সম্ভবতঃ বলতে চেয়েছিলেন যে, এই লাইনটিকে ভাগ করা উচিত এভাবে—

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১
When | we | two || part | ed | in || si | lence | and || tears

এবং তাহলেই এটিকে আর বিষমমাত্রার (অর্থাৎ তিন-দুই মাত্রার) উদাহরণ বলা যায় না, এটি বস্তুতঃ One more unfortunate ইত্যাদির ন্যায় অসমমাত্রার অর্থাৎ তিনমাত্রারই দৃষ্টান্ত, 'In'-টুকুকে 'ফালতো' (অর্থাৎ অতিপর্ব) বলে ধরে নিয়ে এটিকে বিষমমাত্রার উদাহরণ বলে গণ্য করা আবশ্যক নয়। রবীন্দ্রনাথ তথাপি 'In'-টুকুর ফালতো রূপ অস্বীকার করতে রাজি হলেন না। কিন্তু তিনি প্রবন্ধটার মধ্যে 'একটু বদল' করে দিলেন, কি বদল করলেন বলা শক্ত। অধ্যাপক এণ্ডারসন যে মূলপত্র পেয়েছিলেন তাতে ওই 'In'-কে ফালতো হিসাবেই ধরা হয়েছিল। অধ্যাপক মহাশয় কিন্তু তাতে আপত্তি করেন নি ; তিনি ওই ইংরেজি লাইনটি যে-ভাবে বিশ্লেষণ করেছেন তাতে 'In'-কে ফালতো বলেই মেনে নিয়েছেন (পৃ ৩৪০)। তবে লক্ষ করা যায় যে, সবুজপত্রে ওই ফালতো শব্দের প্রথম অক্ষরটি মুদ্রিত হয়েছে বড় হাতের লিপিতে (In) আর এণ্ডারসনের পত্রে সেটি লিখিত আছে ছোট

হাতের লিপিতে (in)। এটুকুই কি রবীন্দ্রনাথ 'বদল' করে দিয়েছিলেন সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে আলোচনার ফলে? মূল ইংরেজি রচনায় কিন্তু In-এর প্রথম অক্ষরটি আছে বড় হাতের লিপিতেই।

এবার 'শয্যা কই বস্ত্র কই' পদের 'কই' শব্দের মাত্রাগণনার কথা। রবীন্দ্রনাথ এই পদটিকে বিশ্লেষণ করেছেন এভাবে—

শ। য্যা। ক। ই ॥ বস্। ত্র। ক। ই ॥

তাতে 'কই' শব্দের ই ক-এর মতোই পুরো এক মাত্রার মর্যাদা পায়। তাতে সত্যেন্দ্রনাথের আপত্তি ছিল বলে মনে হয়। তিনি ই-র মাত্রা 'বাজেয়াপ্ত' করতে অর্থাৎ ই-কে 'বিমাত্র' বলে গণ্য করতে চেয়েছিলেন কি না জানা যায় না। মনে হয় তিনি ই-র স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করে এটিকে ক-এর সমান মাত্রামর্যাদা দিতে চাননি। রবীন্দ্রনাথও কিন্তু এই পত্রে পরোক্ষে সে-কথা মেনে নিয়ে ক-এর অ-কে 'দীর্ঘ' ও তার তুলনায় ই-কে 'হ্রস্ব' বলে বর্ণনা করেছেন। শুধু তাই নয়, তিনি প্রকারান্তরে 'কই' শব্দের ই-কে 'হসন্ত' বর্ণের শামিল বলেও গণ্য করেছেন। তাঁর মতে 'জল্' শব্দের[১] 'জ যত বড় ল্ তত বড় নয়', অর্থাৎ জ 'দীর্ঘ' ল্ 'হ্রস্ব' এবং মাত্রার হিসাবে স্বরান্ত জ-র মূল্য 'দেড় মাত্রা' আর স্বরহীন ল্-র মূল্য আধ মাত্রা। অনুরূপভাবে 'কই্' শব্দের ক যত বড়, ই্ তত বড় নয়; ক দীর্ঘ, ই্ হ্রস্ব এবং মাত্রার হিসাবে ক দেড় মাত্রা আর ই্ আধ মাত্রা।

এই বিশ্লেষণে সত্যেন্দ্রনাথ তৃপ্ত হয়েছিলেন কিনা জানি না। তবে এ-বিষয়ে তাঁর অভিমত কি তা তিনি কিছুকাল পরে বোঝাতে চেষ্টা করেন বিচিত্রা ক্লাবে 'বাংলা ছন্দ' সম্বন্ধে একটি রচনা পাঠ করে (১৫ ফাল্গুন ১৩২৪)। বোধ করি এই রচনাটিই ভারতীতে প্রকাশিত হয়

১ 'জল' শব্দের মাত্রানির্ণয়প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য পৃ ৫, ৫৩, ১৮৬।

'ছন্দ-সরস্বতী' নামে (১৩২৫ বৈশাখ)।[১] এটির এক স্থানে তিনি বলেছেন—

'তুই' শব্দের ইকার পূরো উচ্চারণ হচ্ছে না, কাজেই ওটা হসন্তের শামিল; যদি স্বরবর্ণ ব'লে ওকে হসন্ত বলতে ইচ্ছা না হয়, ওকে আধলা বা ভাঙটা বলতে পার, পূরো বা গোটা বলতে পার না। বাংলায় হ্রস্ব-ই দীর্ঘ-ঈ বা হ্রস্ব-উ দীর্ঘ-ঊ নেই; আছে গোটা ই, ভাংটা ই্; গোটা উ, ভাংটা উ্।···

ওজন-বজায় রাখার চেয়ে সংখ্যা-ভরতি করবার দিকে যাঁদের বেশি ঝোঁক তাঁরাই একদিন একে পয়ারের কাঠগড়ায় পূরে এর চেহারা বিগড়ে দিতে গিয়েছিলেন। মধ্যযুগের ফার্শীনবিশ লিখিয়েরা ফার্শীর দেখাদেখি বাংলার 'যাইবে' 'পাইবে' প্রভৃতি শব্দের অনির্দিষ্ট বা ভাংটা ই-কারগুলিকে গোটা বা পূরো করে বাংলা ছন্দের পায়ে অক্ষর-বৃত্তের তুড়ুং ঠুকে দিয়েছিলেন।···বাংলা ছন্দের এই আড়ষ্ট গতিকে কেউ কেউ শালীনতার বা আভিজাত্যের লক্ষণ বলতেও কুণ্ঠিত হন নি, কিন্তু এ যে অস্বাভাবিক[২] তা অস্বীকার করতে পারেন না।

—ভারতী ১৩২৫ বৈশাখ, পৃ ১১ এবং ১২

অর্থাৎ সত্যেন্দ্রনাথের মতে 'তুই্' শব্দের ই্-কে গোটা বলে গণ্য না করে আধলা বা ভাংটা বলে গণ্য করা উচিত; কেন না, ওর পূরো উচ্চারণ হচ্ছে না, ওটা 'হসন্তের শামিল'। একই কারণে 'কই্' শব্দের ই্-কেও গোটা না ধরে আধলা বা ভাংটা বলেই ধরতে হবে। সবুজপত্রের

১ পরবর্তী 'ছন্দের অর্থ' প্রবন্ধের পাঠপরিচয়প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

২ স্মরণীয় "ভাষার উচ্চারণ-অনুসারে···ছন্দ নিয়মিত হয় নাই।"—রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি (পৃ ১৭০)।

বিশ্লেষণে কিন্তু ই গোটা বলেই গণ্য হয়েছিল। বোধ হয় তিনি এর প্রতিই রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। পত্রের উত্তরে রবীন্দ্রনাথ 'কই' শব্দের ই-কে, আধলা বলেই বর্ণনা করেছেন।

এণ্ডারসনকে লিখিত এই দ্বিতীয় পত্রখানি শুধু যে প্রথম পত্রের পরিপূরক তা নয়; প্রথম পত্রের পরে এণ্ডারসন যে-সব জিজ্ঞাসা উপস্থাপন করেছিলেন তার উত্তরও বটে।

অধ্যাপক এণ্ডারসন ৭ এপ্রিল ১৯১৪ তারিখে এক পত্রে লিখেছিলেন—

As it seems to me Bengali differs from other Indian languages in much the same way as French differs from other European languages. The dominant audible quality in both is the phrasal accent (more or less transferable) and not the fixed word-stress which you will hear in such tongues as Hindi, Marāthi, English, German etc. You will easily see the difference by noting the pronunciation of an English, Hindi, or other borrowed word when imbedded in a Bengali sentence...

What I want you to admit is that each type of language must necessarily have its own type of prosody. What it actually *is* in each case, is a matter for careful and disinterested enquiry.

In India, the task is rendered more difficult by two facts: (1) the technical terms of prosody are (as in Europe, for that matter) borrowed from classical, *i.e.*, 'quantitative' prosody[১] ; (2) as you rightly stipulate,

১ এইজাতীয় পারিভাষিক শব্দের মধ্যে অক্ষর, মাত্রা এবং পদ বা চরণ প্রধান।

Indian verse is affected by the fact that it is chanted, not recited.[1]...

It seems to me that in Bengali also there is a phrase-accent, but that it comes at or near the beginning of a phrase, and *follows* a *cæsura* or pause.

এ"খনকার মেয়ে | এ"খনকার মেয়ের মতই | হ"ইবে,
তা | ভা"লই হোক, | আর | ম"ন্দই হোক।

Obviously, this is not a fixed word-stress. The question is whether, in Bengali (as in other languages of the same type) this phrasal accent affects metre, ছন্দ ?...

The difficulty is that the Bengali accent (this is very audible when you read your own verse) is delightfully faint, and again, it is not fixed like the English word-stress. But although it is not fixed in artistic, in delicately varied recitation, may it not be *there*, *sub*audible, to mark the rhythm ? In English blank verse, no one marks the beat in reading. But in "scanning", as it is called, the iambic effect comes out...

May not a *payār*, however delicately transformed by your skill and genius, keep some trace of its normal rhythm which would be something like —"⌣⌣⌣ | —"⌣⌣⌣ || —"⌣⌣⌣ | —"⌣, e.g.—

দ্বি"জগণে | পা"ঠাইয়া || বৈ"দর্ভী আ | নি"ল
দী"র্ঘকাল(a) | ম"হাসুখে || রা"জত্ব ক | রি"ল ?[2]

১ প্রথম পত্র। "একটা কথা মনে রাখিতে হইবে...একমাত্রা বলিয়া গণ্য হইয়াছে" (পৃ ৩), এই অংশটুকু এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

২ তুলনীয় এণ্ডারসনের পূর্ববর্তী পয়ারবিশ্লেষণ (পৃ ৩২৮-২৯)।

এই পত্রে এণ্ডারসন যে-সব প্রশ্নের অবতারণা করেছেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁর দ্বিতীয় পত্রে, বিশেষতঃ তার প্রথমাংশে (পৃ ৮–১০), প্রধানতঃ তারই আলোচনা করেছেন। কোনো কোনো বিষয়ে তিনি এণ্ডারসনের মত পুরোপুরিভাবেই অনুমোদন করেছেন। 'প্রত্যেক ভাষারই একটা স্বাভাবিক চলিবার ভঙ্গি আছে। সেই ভঙ্গিটারই অনুসরণ করিয়া সেই ভাষার নৃত্য বা ছন্দ রচনা করিতে হয়।'—তাঁর এই মন্তব্যে এণ্ডারসনের মূলবক্তব্যেরই পূর্ণ সমর্থন পাওয়া যায়। 'বাংলা ভাষার স্বাভাবিক ছন্দ' প্রবন্ধের মূলকথাও তাই।

উক্ত পত্রের শেষদিকে এণ্ডারসন একটি বিশেষ চিন্তনীয় প্রসঙ্গের উত্থাপন করেছেন। সেটি এই—

There is the interesting question whether blank verse is *possible* in the case of 'syllabic' or অক্ষর verse, verse in which the cæsura or pause is the dominant audible quality.[১] Blank verse has, been written in French, but most French poets doubt whether the final pause, unmarked by rhyme, is sufficiently strong to indicate the end of the line—the metrical unit. I suppose much the same might be said of Bengali blank verse, since Madhu Sudan's experiment has not established itself in modern practice.

এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ কোনো সুস্পষ্ট অভিমত প্রকাশ করেননি।[২]

১ তুলনীয় রবীন্দ্রনাথের অভিমত : "আমি জানি ছন্দের যে অংশটাকে যতি বলে… আপনার পরিচয় দিয়া বাঁচে" (পৃ ৩৩৫)।

২ বাংলায় অমিত্রাক্ষর ছন্দের বিচরণক্ষেত্রের সীমাপ্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অভিমত দ্রষ্টব্য 'গদ্য-ছন্দ' প্রবন্ধে (পৃ ১৫৪-৫৬)। প্রাকৃত-বাংলায় অমিত্রাক্ষের ছন্দপ্রয়োগের সম্ভাব্যতার বিষয় দ্রষ্টব্য ১৩১ পৃষ্ঠায়।

সংগীত ও ছন্দ

১৩২৪ সালের ভাদ্রসংখ্যা সবুজপত্রে 'সংগীতের মুক্তি' নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটি সম্ভবতঃ 'বিচিত্রা' ক্লাবে পঠিত হয়েছিল। বিচিত্রা-প্রসঙ্গে নন্দলাল তাঁর স্মৃতিকথায় এক স্থানে বলেছেন—

কবি নিজে ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণীর ওপর লেকচার দিয়েছিলেন একবার। শুধু বক্তৃতা নয়। প্রত্যেকটি রাগ-রাগিণী নিজেই গেয়ে গেয়ে সেদিন প্রমাণ করে দিয়েছিলেন যে, তাঁর লেখা গান আর তাঁর দেওয়া সুর মার্গসংগীতের অজ্ঞতাপ্রসূত নয়। অজ্ঞ বরং নিন্দুকেরাই। কালোয়াতি গানে কবি দুরস্ত নন বলে কটাক্ষ করতেন যাঁরা, সেদিন সে-সব বিখ্যাত ওস্তাদী গান তাঁর মুখে শুনে তাঁদের মুখ বন্ধ হল।

—'বিচিত্রা-প্রসঙ্গে নন্দলাল',[১] যাত্রী ১৩৬৪ শারদীয়-সংখ্যা, পৃ ৭

নন্দলালের বক্তব্য থেকে মনে হয় এই 'লেকচার'-টাই 'সংগীতের মুক্তি' প্রবন্ধ। কেন না, এই লেকচার ও প্রবন্ধ, দুএরই প্রতিপাদ্য বিষয় এক। রবীন্দ্রনাথ নিজেও এক পত্রে[২] এটিকে লিখিত 'লেকচার' বলেই বর্ণনা করেছেন। এই পত্র থেকেই জানা যায় যে, 'সংগীতের মুক্তি' প্রবন্ধ বা লেকচারটি রচিত হয় ১৯১৭ অগস্ট ২৭ (বাংলা ১৩২৪ ভাদ্র ১১ সোমবার) তারিখের কাছাকাছি সময়ে; আরও জানা যায় যে, তার কিছু পরেই কবি কলকাতা গিয়েছিলেন। সুতরাং অনুমান করা যায়, 'সংগীতের মুক্তি' বিচিত্রায় পঠিত হয়েছিল পরবর্তী ১৩ ভাদ্র

১ শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল-কর্তৃক অনুলিখিত।

২ প্রমথ চৌধুরীকে লেখা ২৭ অগস্ট ১৯১৭ (পোস্টমার্ক) তারিখের পত্র—'গানের লেকচারটা লেখা হয়েচে।...দুই তিন দিনের মধ্যেই যাব।'—'চিঠিপত্র' পঞ্চম খণ্ড, ৫৮-সংখ্যক পত্র, পৃ ২২৪।

(২৯ অগস্ট) বুধবারে, ২০ ভাদ্র (৫ সেপ্‌টেম্‌বর) বুধবারে বা তারই কাছাকাছি সময়ে। কারণ, বিচিত্রার অধিকাংশ অধিবেশন হত বুধবারে, তবে অন্ততঃ দুটি অধিবেশন বৃহস্পতিবারে ও একটি অধিবেশন শুক্রবারে হয়েছিল বলে জানা যায়।[১] এই পত্রের শেষকথা এই— "শ্রাবণের সবুজপত্র কি বেরয়নি? ও-ঋতুটা তো সবুজপত্রের পক্ষে অনুকূল বলেই জানি।" তাতে বোঝা যাচ্ছে, ও-বছরের শ্রাবণসংখ্যা সবুজপত্র বেরিয়েছিল ভাদ্র মাসে। সুতরাং ধরে নেওয়া যায় যে, সবুজপত্রের যে-সংখ্যায় 'সংগীতের মুক্তি' প্রকাশিত হয় সেটি বেরিয়েছিল আশ্বিন মাসে।

প্রবন্ধটি প্রধানতঃ সংগীতবিষয়ক হলেও প্রসঙ্গক্রমে তার শেষের দিকে ছন্দের কথাও আলোচিত হয়েছে। প্রবন্ধটি মূলতঃ সাধু-রীতিতে রচিত ও প্রকাশিত হয়; কিন্তু 'ছন্দ' গ্রন্থে সংকলনকালে (১৩৪৩ আষাঢ়) এটির ভাষা চলতি-রীতিতে রূপান্তরিত হয়। প্রবন্ধটিকে সমগ্রভাবে সংকলন করবার যৌক্তিকতা সম্বন্ধে প্রবন্ধের মুখবন্ধে বন্ধনীচিহ্নের মধ্যে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র অক্ষরে এই মন্তব্যটি সংযুক্ত হয়—

"মুখ্যত এই লেখাটি সংগীতসম্বন্ধীয়। তালের আলোচনাকালে আপনা থেকে এর শেষদিকে ছন্দের কথা এসে পড়েছে। সে কারণেই একে 'ছন্দ' গ্রন্থে গ্রহণ করা গেল।"

বর্তমান সংস্করণে সংগীতবিষয়ক অংশটুকু বাদ দিয়ে শুধু ছন্দপ্রসঙ্গ-টুকুই সংকলিত হল। তাই প্রবন্ধটির নূতন নামকরণের প্রয়োজন হয়েছে। এই সংস্করণের আদর্শ অনুসারে রচনাটির মূল ভাষারীতিই স্বীকৃত হয়েছে।

১ দ্রষ্টব্য পরবর্তী পৃ ৩৫৫ পাদটীকা ১।

রচনাবলী-সংস্করণে বর্তমান সংস্করণের পাঠই গৃহীত হয়েছে; তবে এটিকে মূলগ্রন্থে স্থান না দিয়ে স্থাপন করা হয়েছে 'পরিশিষ্ট' বিভাগে। 'সংগীতের মুক্তি' প্রবন্ধটি অন্যত্র সমগ্রভাবে সংকলিত হবে।

ছন্দের অর্থ

এই প্রবন্ধটি প্রথম প্রকাশিত হয় সবুজপত্রে, ১৩২৪ সালের চৈত্র-সংখ্যায়। তখন এটির নাম ছিল 'ছন্দ'। পরে 'ছন্দ' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হবার সময় এটির নাম হয় 'ছন্দের অর্থ'। বর্তমান সংস্করণে এবং রচনাবলী-সংস্করণে এটি এই নামে ও অপরিবর্তিত রূপেই গৃহীত হয়েছে। বলা প্রয়োজন যে, এই প্রবন্ধটি মূলতঃ চলতি-রীতিতেই রচিত্ ও প্রকাশিত হয়েছিল।

এই প্রবন্ধটির উদ্‌ভব ও প্রকাশ ইত্যাদি সম্বন্ধে যেটুকু ইতিহাস জানা গিয়েছে, তা সংক্ষেপে বিবৃত হল।

পূর্বে বলা হয়েছে যে, ১৯১৪ সালের ১৪ জুলাই-এর পরে দীর্ঘকালের মধ্যে এণ্ডারসন-রবীন্দ্রনাথের ছন্দ-আলোচনার কোনো নিদর্শন রবীন্দ্রসদনে নেই। বস্তুতঃ ১৯১৫ সালের মাঝামাঝি থেকে ১৯১৮ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত তিন বৎসরের (৩ জুন ১৯১৫-২৪ মে ১৯১৮) মধ্যে এণ্ডারসনের লেখা কোনো পত্রই পাওয়া যায়নি। আর, উক্ত ১৪ জুলাই ১৯১৪ সালের পরে ছন্দ-বিষয়ক যে প্রথম পত্রটি পাওয়া যায় তার তারিখ ২৪ মে ১৯১৮। তার পূর্বেই এই প্রবন্ধটি সবুজপত্রে প্রকাশিত হয়ে গিয়েছিল।[১] সুতরাং এই প্রবন্ধ রচনার মূলে

[১] ১৪ এপ্রিল ১৯১৮: "I have asked the editor to send you the Chaitra number of Sabuj Patra which contains my lecture on Bengali prosody."—রবীন্দ্রনাথ

২৪ মে ১৯১৮: "Your kind letter of April 14th reaches me today. From which you may gather how great delays the war interposes in

এণ্ডারসনের ছন্দ-জিজ্ঞাসার প্রেরণা কতখানি ছিল তা প্রত্যক্ষভাবে জানা যায়নি। তবে তার একটু পরোক্ষ প্রমাণ আছে। রবীন্দ্রনাথের 'ছন্দতত্ত্ব'-বিষয়ক একটি পত্রের ইংরেজি অনুবাদ পড়ে ফরাসী মনস্বী Sylvain Lèvi যে অভিমত জানিয়েছিলেন তা পূর্বেই উদ্ধৃত হয়েছে (পৃ ৩৪৩-৪৪)। এই অভিমত জেনে রবীন্দ্রনাথ ছন্দ সম্বন্ধে আরও কিছু লেখার উৎসাহ বোধ করে প্রমথ চৌধুরীকে লেখেন,—"ওর মত পড়ে ও-লেখাটা শেষ করে ফেলবার জন্যে আবার উৎসাহ হচ্চে। দেখি যদি সময় পাই।" মনে হয়, তিনি দীর্ঘকাল সময় পাননি। প্রমথ চৌধুরীকে উক্ত পত্র লেখার (১৯১৫ মার্চ) পরে তিনি বহু বিচিত্র কর্মে ব্যাপৃত ছিলেন, বিদেশভ্রমণেও প্রায় এক বৎসর (১৯১৬ মে থেকে ১৯১৭ মার্চ) কাটিয়েছিলেন। এসব কারণে বহুকাল তাঁর পক্ষে ছন্দ-আলোচনা পুনরারম্ভ করা সম্ভব হয়নি।

অবশেষে ১৯১৮ সালের গোড়ার দিকে পুনরায় ছন্দ-চিন্তার উপলক্ষ্য উপস্থিত হল। এই উপলক্ষ্যের সঙ্গে অধ্যাপক এণ্ডারসনের প্রত্যক্ষ যোগ দেখা যায় না। এই উপলক্ষ্য ঘটে সম্ভবতঃ কবি সত্যেন্দ্রনাথের একটি প্রবন্ধের দ্বারা।

এই সময়ে '৬ নং দ্বারিকানাথ ঠাকুর স্ট্রীটে'র সুবিদিত 'বিচিত্রা' ক্লাবটি সংস্কৃতি- ও সাহিত্য-আলোচনার একটি বড় কেন্দ্র হয়ে ওঠে। এখানে প্রতি সপ্তাহে বা পক্ষে একবার করে নাট্যাভিনয়, গানবাজনা, প্রবন্ধাদি-পাঠ বা বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনার ব্যবস্থা হত।[১] ১৩২৪ সালের

our communications. I have also got the চৈত্র number of সবুজপত্র and shall read your lecture on ছন্দ with care, respect, interest and, I hope, comprehension."—এণ্ডারসন

১ শ্রীযুক্ত সুকুমার বসু মহাশয়ের কাছে বিচিত্রা ক্লাবের এইসব অধিবেশনে যোগদানের সতরখানি মুদ্রিত 'আমন্ত্রণলিপি' আছে। বাংলাসাহিত্যের, বিশেষতঃ রবীন্দ্রসাহিত্যের,

১৫ ফাল্গুন তারিখে এই বিচিত্রা ক্লাবের এক অধিবেশনে সত্যেন্দ্রনাথ 'বাংলা ছন্দ' সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই প্রবন্ধটিই অতঃপর 'ছন্দ-সরস্বতী' নামে 'ভারতী' পত্রিকায় (১৩২৫ বৈশাখ) প্রকাশিত হয়েছিল বলে মনে হয়। 'ছন্দ-সরস্বতী' প্রবন্ধের নীচে লেখা আছে 'ফাল্গুন ১৩২৪'। তাতেই মনে হয় ১৫ ফাল্গুন ১৩২৪ তারিখে 'বিচিত্রা'য় পঠিত উক্ত বাংলাছন্দ-বিষয়ক প্রবন্ধটি ও ভারতীতে

ইতিহাস নির্ণয়ের পক্ষে এগুলির বিশেষ মূল্য আছে। তাই এখানে উক্ত অধিবেশনগুলির ধারাবাহিক পরিচয় দেওয়া গেল। এই অধিবেশনগুলি সবই ১৩২৪ সালের।—

১২ আশ্বিন [শুক্রবার], 'বৈকুণ্ঠের খাতা' অভিনয়; ২৫ আশ্বিন বৃহস্পতিবার, 'ডাকঘর' অভিনয়; ১২ অগ্রহায়ণ বুধবার, গানবাজনা; ২৬ অগ্রহায়ণ বুধবার, 'পাত্র ও পাত্রী'—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; ৪ পৌষ বুধবার, 'বাংলাভাষা আলোচনা'—বিজয়চন্দ্র মজুমদার, প্রমথনাথ চৌধুরী ও সুনীতি চট্টোপাধ্যায়; ২৫ পৌষ বুধবার, 'চিত্রশিল্প আলোচনা' (স্থান—'ভারতীয় চিত্রপ্রদর্শনী', ৭।১ করপোরেশন স্ট্রীট); ৩ মাঘ বুধবার, 'সাহিত্যপাঠ'—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; ২৪ মাঘ বুধবার, 'শিল্প ও শিল্পী'—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর; ১ ফাল্গুন বুধবার, 'সদালাপ'; ৮ ফাল্গুন বুধবার, 'সচিত্র প্রবন্ধ : রূপ ও রেখা'—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর; ১৫ ফাল্গুন বুধবার, 'বাংলা ছন্দ'—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত; ২২ ফাল্গুন বুধবার, 'আয়র্ল্যাণ্ড ও ভারতবর্ষের সমস্যার সাদৃশ্য'—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; ২৯ ফাল্গুন বুধবার, 'ভক্ত দাদূর বাণীশিল্পের রহস্য'—ক্ষিতিমোহন সেন; ৬ চৈত্র বুধবার, 'প্রবন্ধপাঠ'—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; ১৪ চৈত্র বৃহস্পতিবার, 'একটি গল্প'—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়; ২০ চৈত্র বুধবার, 'বাংলা ভাষাতত্ত্বের একাংশ'—বিধুশেখর শাস্ত্রী; ২৭ চৈত্র বুধবার, সংগীত।

মন্তব্য—৮ ফাল্গুনের সচিত্র প্রবন্ধ 'রূপ ও রেখা' এবং ১৫ ফাল্গুনের ছন্দ-প্রবন্ধ 'ছন্দ-সরস্বতী' পরের বৈশাখ মাসে প্রকাশিত হয় 'ভারতী' পত্রিকায়। মনে হয় ১৪ চৈত্র তারিখে বিচিত্রায় পঠিত শরৎচন্দ্রের 'একটি গল্প'ও উক্ত বৈশাখ-সংখ্যা ভারতীতে প্রকাশিত হয়েছিল 'বিলাসী' নামে। বিচিত্রার উদ্ভব ও বিলয়ের বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য নন্দলালের স্মৃতিকথা— শ্রীপ্রকাশন মণ্ডল-কর্তৃক অনুলিখিত 'বিচিত্রা-প্রসঙ্গে নন্দলাল', যাত্রী—১৩৬৪ শারদীয়-সংখ্যা, পৃ ৭-৯।

শ্রীযুক্ত [illegible]

মহাশয়ের নিকট আমন্ত্রণ লিপি।

উপলক্ষ্য "বাংলা ছন্দ" শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

কাল — ১৫ই ফাল্গুন বুধবার — সন্ধ্যা ৬টা

স্থান—৬নং দ্বারিকানাথ ঠাকুর ষ্ট্রীট।

বিচিত্রা

'বিচিত্রা'র আমন্ত্রণলিপি : ১৩২৪ ফাল্গুন ১৫ . ১৯১৮ ফেব্রুআরি ২৭

শ্রীযুক্ত

মহাশয়ের নিকট আমন্ত্রণ লিপি।

উপলক্ষ্য—

কাল—

স্থান—৬নং দ্বারিকানাথ ঠাকুর ষ্ট্রীট।

'বিচিত্রা'র আমন্ত্রণলিপি : ১৩২৪ চৈত্র ৬ · ১৯১৮ মার্চ ২০

প্রকাশিত 'ছন্দ-সরস্বতী' অভিন্ন। যা হক, বিচিত্রায় সত্যেন্দ্রনাথের এই প্রবন্ধ পাঠের সময় রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত ছিলেন কিনা জানা যায়নি। তবে সত্যেন্দ্রনাথের এই প্রবন্ধ রবীন্দ্রনাথের মনে ছন্দ-আলোচনায় নূতন প্রবর্তনা জুগিয়েছিল বলে মনে করা অসংগত নয়। এর অল্পদিন পরেই রবীন্দ্রনাথ ছন্দ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ রচনা করেন। এ বিষয়ে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, "চৈত্র মাসের শেষাশেষি কবি শান্তিনিকেতন হইতে কলিকাতায় আসিলেন ও 'ছন্দ' নামে একটি প্রবন্ধ পাঠ করিলেন"।[১] কিন্তু কোথায় ও কোন্ তারিখে পাঠ করলেন, সে বিষয়ে তিনি কিছুই বলেননি। একটু পূর্বে ১৩২৪ সালের চৈত্র মাসে বিচিত্রা ক্লাবের অধিবেশনগুলির যে বিবরণ দেওয়া হয়েছে, তার থেকে মনে হয় ৬ চৈত্র তারিখে বিচিত্রা ক্লাবে পঠিত প্রবন্ধটিই প্রভাতকুমার-কথিত 'ছন্দ'-নামক প্রবন্ধ।

এস্থলে বিচিত্রায় পঠিত উক্ত প্রবন্ধ সম্বন্ধে একটু ইতিহাস বিবৃত করা প্রয়োজন। তার থেকে নিঃসন্দেহেই প্রমাণিত হবে যে, ৬ চৈত্র ১৩২৪ তারিখে বিচিত্রায় পঠিত 'প্রবন্ধ'টিই উক্ত 'ছন্দ' প্রবন্ধ। এই ইতিহাসটুকু পাওয়া যায় নলিনীকান্ত ভট্টশালীর 'ঢাকায় রবীন্দ্রনাথ'-নামক প্রবন্ধে।—

১৯১৮ খ্রীস্টাব্দের কথা...কলিকাতা পৌঁছিয়া বিকাল বেলার দিকে 'প্রবাসী' অফিসে গিয়া বন্ধুবর চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের শরণাপন্ন হইলাম। চারুবাবু আমাকে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে লইয়া গেলেন। সেই সন্ধ্যায় 'বিচিত্রা'-নাম্নী সাহিত্যসভার এক অধিবেশন ছিল। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং বাংলা ছন্দ সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ পাঠ করিবেন। আমি আর চারুবাবু সভাকক্ষের বারান্দায় অপেক্ষা করিতে লাগিলাম।

১ রবীন্দ্রজীবনী, দ্বিতীয় খণ্ড (তৃতীয় সংস্করণ, ১৩৬৮ আশ্বিন), পৃ ৫০৬।

কতক্ষণ পরে ছন্নছাড়া উদ্‌ভ্রান্ত-চেহারা ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র মোটা চুরুট ফুঁকিতে ফুঁকিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, চারুবাবু আমার সহিত পরিচয় করাইয়া দিলেন। অল্প পরে আরও কয়েকজন সাহিত্যিক আগমন করিলেন, বিস্তর মহিলা আসিয়া সভার একার্ধ ভরিয়া ফেলিলেন। ফরাশ পাতা, সকলে তাহার উপরই বসিতেছিলেন। মেয়েরা এক ধারে, পুরুষেরা অপর ধারে। এইবার রবীন্দ্রনাথ সভাস্থলে আগমন করিলেন তাঁহার সেই দীর্ঘ কালো পোশাক পরিয়া। শরৎবাবু তাঁহার কাছ ঘেঁষিয়া বসিলেন। রবীন্দ্রনাথের অনুরোধে শরৎবাবু পরবর্তী অধিবেশনে স্বরচিত নূতন গল্প পড়িয়া শুনাইতে প্রতিশ্রুত হইলেন। তাহার পরে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার প্রবন্ধ পড়িতে আরম্ভ করিলেন। আমরা বারান্দায় বসিয়াই প্রবন্ধ শুনিতে লাগিলাম।

সে তো প্রবন্ধ নয়,—যেন বিশ্বামিত্রের নূতন সৃষ্টি। এই ছন্দসম্রাটের লেখনীমুখে বাণী যেন নূতন নূতন ছন্দ সৃষ্টি করিয়া নূপুরশিঞ্জিতপদে কঙ্কময় চপলচরণে নৃত্য করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। চৌদ্দ অক্ষরে যে কত রকম ছন্দ হইতে পারে, তাহার দৃষ্টান্তে কবি যে উদাহরণগুলি দিয়াছিলেন, তাহার একটি চমৎকার নমুনা অদ্যাপি মনে আছে—

নয়নের সলিলে, যে কথাটি বলিলে,
রবে তাহা স্মরণে জীবনে ও মরণে।[১]

সভাভঙ্গ হইলে এবং সভাস্থল জনবিরল হইলে পর চারুবাবু আমাকে কবির নিকট লইয়া গেলেন এবং পরিচয় করাইয়া আমার উদ্দেশ্য নিবেদন করিলেন।[২]

—শনিবারের চিঠি, ১৩৪৮ আশ্বিন, পৃ ৮৪২-৪৪

১ দ্রষ্টব্য পৃ ৪২।

২ প্রবন্ধপাঠের পরে সভাস্থলে এ-বিষয়ে কিছু আলোচনাও হয়েছিল। দ্রষ্টব্য— ‘গদ্য-ছন্দ’ প্রবন্ধের পাঠপরিচয়-প্রসঙ্গ।

শ্রীযুক্ত

মহাশয়ের নিকট আমন্ত্রণ লিপি।

উপলক্ষ্য -

কাল -

স্থান—৬নং দ্বারিকানাথ ঠাকুর ষ্ট্রীট।

'বিচিত্রা'র আমন্ত্রণলিপি : ১৩২৪ চৈত্র ১৪ · ১৯১৮ মার্চ ২৮

বিচিত্রার পূর্বোদ্ধৃত অধিবেশন-তালিকায় আছে ৬ চৈত্র রবীন্দ্রনাথের 'প্রবন্ধ' পাঠ এবং ১৪ চৈত্র শরৎচন্দ্রের 'একটি গল্প'। নলিনীকান্তের বিবরণ থেকেও জানা যায়, রবীন্দ্রনাথের ছন্দ-প্রবন্ধ পাঠের পরবর্তী অধিবেশনে শরৎবাবু 'স্বরচিত নূতন গল্প' পড়ে শোনাতে প্রতিশ্রুত হয়েছিলেন। সুতরাং ৬ চৈত্র তারিখে পঠিত প্রবন্ধই যে 'ছন্দ' প্রবন্ধ তাতে সন্দেহ থাকতে পারে না।

'ছন্দ' প্রবন্ধটি যে চৈত্রমাসের 'শেষাশেষি' পঠিত হয়নি, হয়েছিল চৈত্রের প্রথম সপ্তাহেই, তার আরও প্রমাণ আছে। প্রবন্ধটি সবুজপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল ১৩২৪ সালের চৈত্র মাসেই। প্রবন্ধটি যদি চৈত্রের শেষাশেষি পঠিত হত তাহলে ওটি চৈত্রসংখ্যায় প্রকাশ করা সম্ভব হত না। সবুজপত্রের চৈত্রসংখ্যা ওই মাসের শেষ দিকে প্রকাশিত হয়েছিল বলে মনে হয়। কারণ ১৪ এপ্রিল ১৯১৮ (১লা বৈশাখ ১৩২৫) তারিখে রবীন্দ্রনাথ এণ্ডারসনকে এক পত্রে জানিয়েছিলেন যে, তিনি তাঁকে চৈত্রসংখ্যা সবুজপত্র পাঠাতে ওই পত্রের সম্পাদককে অনুরোধ করেছেন।[১]

এণ্ডারসন সবুজপত্রের 'ছন্দ'-প্রবন্ধযুক্ত চৈত্রসংখ্যাটি পেয়েছিলেন ২৪ মে ১৯১৮ তারিখের কাছাকাছি সময়ে।[২] তার পর অনেকগুলি পত্রেই তিনি অল্পাধিক পরিমাণে এই প্রবন্ধটির প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন।

২৪ মে তারিখের পত্রে অধ্যাপক এণ্ডারসন চৈত্রসংখ্যা সবুজপত্রের প্রাপ্তিসংবাদ জানান এবং তার সঙ্গে সঙ্গেই লেখেন—

I am thinking of making a careful translation of your lecture and sending it to Dr. Robert Bridges,

১ দ্রষ্টব্য পৃ ৩৫৪ পাদটীকা ১ প্রথমাংশ।

২ দ্রষ্টব্য পৃ ৩৫৪ পাদটীকা ১ দ্বিতীয়াংশ।

the Poet Laureate, who, as you know, is an enthusiastic student and theorist of metre and rhythm. He will certainly be interested, even if he does not agree with your views ··· I know that whatever you write on such a subject must be worth reading and carefully considering, even by those who do not wholly agree with what you say. As for myself, it does not matter 'tuppence' whether I agree with you or not. I shall take an early opportunity of telling Sir A. Quillar Couch[১] ("Q") about your theories. He is professor of English Literature here, and has written pretty and ingenious verses in his day.

১৫ জুন তারিখে তিনি জানান যে, তিনি 'ছন্দ' প্রবন্ধের ইংরেজি অনুবাদ করছেন এবং এই 'extraordinarily interesting' রচনাটি সম্বন্ধে তিনি তাঁর মত পরে জানাবেন। পরের দিনই তিনি আর-এক পত্র লেখেন। তাতে আছে—

Metre and rhythm have been much discussed in the west. I have recently ploughed my way through three huge books on French metre...These were scientific treatises based on laboratory experiments. Yours is a poet's essay and to read your prose is always as delightful as to read your verse. There is the quality of imagination, of vision which always, somehow, shines through your simplest words. Also there is, what not all poets have, a delightful gift, illuminating and sparkling, of native humour.

১ Quillar Couch রবীন্দ্রনাথের ছন্দ-বিশ্লেষণ সম্বন্ধে কোনো অভিমত প্রকাশ করেছিলেন কিনা জানা যায়নি।

...Dr. Bridges notices in your verses that verbal units coincide with metrical units, that words are 'feet' in your verse. You pause between words (except in your বিষম metre) and the pause induces the প্রসারিত syllable which introduces a new unit.

অতঃপর ২৯ জুন ১৯১৮ তারিখের পত্রে আছে—

I laboriously translated your lecture on ছন্দ and sent it to the Poet Laureate. The specimens of verse you quoted I, of course, merely transliterated so as to preserve the rhythms. Dr. Bridges, it seems, got a young Bengali to read them aloud to them [him ?] and the young Bengali, of course, found my transliteration very difficult to read. This sort of thing—

Cāhicha vāre vāre āpanāre ḍ[h]ākite[1] etc.

Apparently he is busy with a work of his own on English metres. He thinks that quantitative verse, in the old classical sense, can still be written in modern languages, and certainly in English. He has himself written such verse, which most of us can only scan by much effort of good will. However, he said, he had read my attempt to translate your lecture with much interest.

...I suggest that French and Bengali stand in a class by themselves and have probably reached a third[2] and higher development of verse. French possesses the power of *dwellng, lingering* on certain syllables, even if they are 'short' 'by nature'. That prolongation of

১ দ্রষ্টব্য পৃ ৪৩।

২ অন্য দুরকম হচ্ছে quantitative metre ও stress metre।

sound produces the same effect of emphasis that is produced in English by our (fixed) stress.

Now, is there not something of this sort in Bengali verse ? Take one of your own examples.—

বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদেয় এল বান,
শিব ঠাকুরের বিয়ে হবে তিন কন্যে দান,
এক কন্যে রাঁধেন বাড়েন, এক কন্যে খান,
এক কন্যে না পেয়ে, বাপের বাড়ি যান।

Now, are not the syllables over which I have drawn horizontal lines dwelt on, lingered over (and so emphasized) a little more than the others ? But there is another point. Each of these syllables is *initial*, and follows a pause.

১১ সেপ্‌টেম্বর ১৯১৮ তারিখের পত্রে অধ্যাপক এণ্ডারসন অনেক চিন্তনীয় বিষয়ের অবতারণা করেন। তার প্রাসঙ্গিক অংশটুকু এই।—

You have shown that in the dance of Bengali syllables [there] are measures which resemble those of all dances. You have shown that a pause can do the work of missing syllables, especially when the pause is preceded by a যুক্তাক্ষর which gives length and weight to a syllable.[১] Yes, but by what means do you mark off your metrical units, the places where the dance-step pauses

১ দ্রষ্টব্য 'অনুচ্চারিত মাত্রা' বা 'যতির মাত্রা' প্রসঙ্গ পৃ ৪১, ৪৬, ১১৮, ২৫৯।

for a moment? It is obviously not by counting from stress to stress, as in English, German, Italian.…

I venture to suggest that this *initial phrasal* prolongation of syllabic sound is the basis of the units of the dance of Bengali metre. Each unit *begins* with a prolonged syllable (whether naturally long or short). For example—

ফাগুন এল | দ্বারে ‖ কেহ যে ঘরে | নাই,
পরাণ ডাকে | কারে ‖ ভাবিয়া নাহি | পাই।[১]…

Now, it is possible to make similar units of syllable dance with English stresses, if you choose English words that happen to have the fixed English stress at the beginning, e.g.—

Phālgun is coming slowly, no one is at the door, etc.

But the point is that you must choose words that are stressed on the initial syllables or are emphatic monosyllables. Whereas, in Bengali verse, *any* word that comes at the beginning itself assumes a prolonged first syllable which does the work of the fixed, unalterable English stress.

Hence in Bengali as in French verse, *cæsura*, pause, ফাঁক, is the essential quality,[২] since on it depends the prolonged syllable (initial in Bengali, final in French) which is the footfall by which you mark the rhythm of your dance.

•

১ দ্রষ্টব্য পৃ ৪১-৪২।

২ দ্রষ্টব্য যতিপ্রসঙ্গ, পৃ ৩৩৫, ৩৫১, ৩৬৪-৬৫।

That I have got this right, I venture to assume from the fact that in quoting English verses you have so altered them as to give them *initial* stresses to correspond to Bengali initial prolongations. You have written[1]—

(To) night' the | winds' be | gin' to | rise'
(And) roar' from | yon'der | drop'ping | day'.

Whereas an Englishman reads—

Tonight' | the winds' | begin' | to rise'
And roar' | from yon' | der drop' | ping day'.

Still more interesting is your reading of two other verses[2]—

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
(O) Goddess, hear these | tuneless numbers, | wrung
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
(By) sweet enforcement | and remembrance | dear.

But to an Englishman, the syllables (O) and (By) are not extrametrial[3] at all. The scansion is—

O God' | dess hear' | these tune' | less num' | bers wrung'
By sweet' | enforce' | ment and[4] | remem' | brance dear'.

In short in English we need not begin on a strong or long syllable as in Bengali, nor need we end on a strong or long one as in French. And, as your own quotations show, the metrical units can come in the

১ দ্রষ্টব্য পৃ ৩৫। ২ দ্রষ্টব্য পৃ ৩৯।

৩ Extrametrical—অতিপর্বিক।

৪ মূলপত্রে এস্থলে প্রস্বরচিহ্নের পরিবর্তে আছে একটি প্রশ্নচিহ্ন (?)।

middle of words and are independent of pause, cæsura, ফাঁক।[১]

But here is, (I *think*), one quality of Bengali verse that is surprising and unique, because it is, I believe, a quality peculiar to verse, and not a utilisation of something heard in prose. Although the dominant audible quality in Bengali prose and verse alike is an initial prolonged syllable, yet in verse the same prolongation is conferred upon the final rhyming syllable...It seems to me that the final prolongation occurs even in Madhu Sudan's blank or unrhyming verse. But on this point it is probable that my ear and memory misled me. Is his rhythm like this ?

হাসে নিশি | তারাময়ী ‖ ত্রিদশ-আলয়ে

কিন্তু চিন্তা | কুল এবে ‖ বৈজয়ন্ত-ধামে[২] etc.

১৫ সেপ্‌টেম্‌বর ১৯১৮ তারিখের পত্রে অধ্যাপক এণ্ডারসন ছন্দ-বিশ্লেষণের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেননি। ইংরেজ কবি রবার্ট ব্রিজেসএর অবগতির জন্য সবুজপত্রের চৈত্রসংখ্যায় প্রকাশিত 'ছন্দ' প্রবন্ধটির তিনি যে মোটামুটি ধরনের ইংরেজি অনুবাদ করেছিলেন ('a rough and ready version of your ছন্দ lecture for the Poet Laureate'), তার প্রসঙ্গে তিনি বলেন—"My version of it evidently needs to be rewritten more than once. It is not yet good English. It is too literal."। এই অনুবাদটি পুনর্লিখিত হয়ে কোথাও প্রকাশিত হয়েছিল কিনা জানা যায়নি।

১ দ্রষ্টব্য পৃ ৩৬৩ পাদটীকা ২।

২ তুলনীয় এণ্ডারসনের পূর্ববর্তী পয়ারবিশ্লেষণ, পৃ ৩২৮-২৯, ৩৫০।

রবীন্দ্রনাথের ছন্দ-বিশ্লেষণ সম্বন্ধে রবার্ট ব্রিজেস অধ্যাপক এণ্ডার-সনের নিকট কিছু মন্তব্য পাঠিয়েছিলেন। সে মন্তব্যগুলি পাওয়া যায়নি। প্রত্যুত্তরে এণ্ডারসন ব্রিজেসএর নিকট যে পালটা মন্তব্য পাঠিয়েছিলেন তার প্রতিলিপি তিনি ২৭ সেপ্টেম্বর তারিখের পত্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নিকট পাঠিয়েছিলেন।[১] এই প্রতিবাদলিপির প্রসঙ্গ উত্থাপনের পূর্বে ২৭ তারিখের পত্রের বিষয়েই কিছু বলা প্রয়োজন। ওই পত্রে তিনি প্রথমে অন্যান্য ভাষার সঙ্গে বাংলা ছন্দের পার্থক্যের বিষয় সংক্ষেপে বিবৃত করা উপলক্ষে বলেন যে, বাংলা ছন্দে প্রত্যেক বাক্‌পর্বের (phraseএর) আদিতেই প্রস্বর (accent বা stress) স্থাপিত হয়। অতঃপর আবেগময় আবৃত্তি ও আবেগহীন বিশ্লেষণের পার্থক্য-প্রসঙ্গে তিনি বলেন—

Mind, I do not say that you use this accent in *reciting* your verse. For it is one of the qualities of phrasal stress that it is *transferable.*

When an Englishman, a German, an Italian wishes to emphasise a word, he reinforces the fixed stress which already falls on one syllable. For instance, "this is the infor*ma*tion I want to give you." But a Bengali will say, "*in*formationটা এই." Now, when a Frenchman wishes to emphasise, he will throw his accent forward...

So, in reading your verses, in reciting them, you

১ "Here is a typed copy of a note I sent to Dr. Bridges the other day. To save time and space, I have set down things rather too dogmatically and as if they were ascertained facts. They are only my tentative and temporary conclusions which I am quite prepared to abandon, if due cause be shown." এই 'typed copy'তে তারিখ নেই।

will not *scan* them, will not dwell on, but will rather vary the normal dominantly audible phrase stress by which you create your rhythm.

Yet that accent will remain *subaudible*, and will create the *beat* which makes the verse-*motion* which expresses and communicates your *e-motion.*[১]

ইংলণ্ডের রাজকবি ডক্‌টর রবার্ট্‌ ব্রিজেসকে অধ্যাপক এণ্ডারসন রবীন্দ্রনাথের ছন্দ সম্বন্ধে যে পত্রখানি লিখেছিলেন, তার প্রাসঙ্গিক অংশটুকুও উদ্‌ধৃত করা গেল।—

Do you remember commenting on Sir Rabindranath Tagore's quotations in his lecture on Metre, and saying that it was odd that his metrical units "always coincide with his verbal units",[২] *i.e.*, always consist of a whole word, or two or more whole words? May I make a suggestion on that subject, and, while I am about it, go on to say one or two things connected therewith?

First, then, as to the coincidence of word units and metre unit[s]—

I suggest that in some languages (French and Bengali among them) metrical units *must* coincide with verbal units...

In Bengali the phrasal accent of prolongation (it may fall on a syllable which is 'long' or 'short') comes at the *beginning* of the phrase (made of one word or

১ স্মরণীয়: 'আবেগকে প্রকাশ করতে গেলে কথার মধ্যে সেই আবেগের ধর্ম সঞ্চার করতে হয়। আবেগের ধর্ম হচ্ছে বেগ।…কথাকে বেগ দিয়ে আমাদের চিত্তের সামগ্রী করে তোলবার জন্যে ছন্দের দরকার।'—পৃ ২৮-৩৩।

২ দ্রষ্টব্য ১৬ জুন ১৯১৮ তারিখের পত্র, পৃ ৩৬১।

several words rapidly pronounced together). It is a quality which is as audible in prose as in verse. But in verse, it comes at regular, rhythmical intervals.

But in Bengali verse there is an artificial quality not heard in ordinary speech, in prose. The final rhyming syllable *also* carries an accent of prolongation. This gives Bengali verse (to foreign hearers) an odd air of artifice, of effort, which is displeasing to some European readers of Bengali, who generally express their dissatisfaction by saying that Bengali verse is "jingling." (The rhymes are as easy and frequent in Bengali as in late Latin, the language being still largely inflected.)

Now, if I am right so far, it follows that in both French and Bengali, metrical units (being phrasal units) *must* consist of whole words. But there is another consequence.

In Bengali the units *must* consist of *falling* rhythms, since they *must* begin with emphasised (*i.e.*, prolonged) syllables. For instance, dactylic units are common in Bengali...

Finally, as to R.N.T.'s own discovery, the real subject of his lecture (which is outside his ingenious and eloquent suggestions as to how "the motion of metre creates emotion in the hearer"[১] etc.)—

This discovery is this. He believes that all metre in modern languages is either dactylic or trochaic,[২] or a

১ দ্রষ্টব্য পৃ ৩৬৭ পাদটীকা ১।

২ দ্রষ্টব্য পৃ ৩৫-৩৬। অসম ও সম চলনের ছন্দকে যথাক্রমে trimoric ও bimoric অথবা trisyllabic ও dissyllabic বলা যায়; dactylic ও trochaic বলা সংগত নয়।

compound of these, *i.e.*, that it is all 'three time', 'two time' or 'five time'. I venture to think (I may be quite wrong) that that is only his impression of his own personal habits in writing verse. He is fond of (phrasal) rhythms running thus : —⏑⏑ | —⏑ || —⏑ | —⏑[1]...

In Bengali we have 'masculine' and 'feminine' rhymes[2] exactly as in French. (They are not called by that name, of course.) But Bengali has not the queer convention, a pleasant one, which makes a French poet give us 'masculine' and 'feminine' rhymes alternately through hundreds of couplets. Bengali 'heroic' verse is as addicted to rhyming couplets as the verse of Pope himself. Sir Rabindranath's lyrics, on the other hand, are written in a great variety of stanzas. He also uses the recurring refrain as do French writers of *rondels* and *rondeaux*[3], with charming effect. You may catch some echo of this even in the prose version of his *Gitanjali* lyrics.

My main point, however, is that he writes phrasal

১ তৃতীয় পর্বটির সাংকেতিক চিহ্ন —⏑⏑ হওয়াই বোধ করি লেখকের অভিপ্রেত। তিনি 'বিষম' ছন্দের ('যতই চলে চোখের জলে' ইত্যাদি রচনার) সংকেত-রূপেই এই চিহ্নগুলির প্রয়োগ করেছেন।

২ একটি প্রস্বরিত দলের মিলকে বলা হয় masculine; যথা—গা'ন-দা'ন। আর, দুই দলের (প্রথমটি প্রস্বরিত ও দ্বিতীয়টি অপ্রস্বরিত) মিলকে বলা হয় feminine; যথা—হা'সি-বাঁ'শি।

৩ Rondeau (ফরাসি শব্দ)— এক-রকম কবিতা বা সংগীত যার মিল ও ধুয়া ঘুরে ঘুরে আসে : Rondel এরই প্রকারভেদ। Rond (অর্থাৎ round) কথা থেকেই এর প্রকৃতিগত আবর্তনশীলতা স্পষ্ট বোঝা যায়।

verse, not stress verse or quantitative verse. Quantitative verse in Sanskrit metres has been written in Bengali, chiefly by the deliberate use of the numerous pure Sanskrit words recently borrowed into the language.[১] But Sir Rabindranath's metre and manner is that of the 16th century poets of Bengal. He uses the vocabulary of the Bengali equivalents of, say, Spencer or Drummond, and innovates, with wonderful ingenuity and beauty of effect, on their metres.

সবুজপত্রের 'ছন্দ' প্রবন্ধের প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ-এণ্ডারসনের পত্রালাপ ও আলোচনা এইখানেই শেষ হয় বলা চলে। কিন্তু তৎপূর্বেই রবীন্দ্রনাথ ২৭ জুলাই ১৯১৮ তারিখে এণ্ডারসনকে আর-একটি পত্র লেখেন ইংরেজিতে; এণ্ডারসনও তার উত্তরে নিজ বক্তব্য স্পষ্টতর করতে সচেষ্ট হন (২৮ সেপটেম্বর ১৯১৮)। রবীন্দ্রনাথের পত্রের স্বহস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি ও তার টাইপ-করা পাণ্ডুলিপি (ভাষাগত ঈষৎ পরিবর্তন সহ) এবং এণ্ডারসনের টাইপ-করা উত্তর রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত আছে। রবীন্দ্রনাথের এই পত্রখানির স্বাতন্ত্র্য ও গুরুত্ব বিবেচনায় এর প্রাসঙ্গিক অংশটুকু সমগ্রভাবেই 'সম্পূরণ' বিভাগে স্থাপন করা গেল। এটির আসল স্থান 'চিঠিপত্র' বিভাগে। এণ্ডারসনের উত্তরের প্রয়োজনীয় অংশটুকুও তার সঙ্গেই 'সম্পূরণ' বিভাগে স্থাপিত হল।

অতঃপর ১৯১৯ সালে লেখা অধ্যাপক এণ্ডারসনের দুখানি পত্রের একটু পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন। ৮ জানুআরি ১৯১৯ তারিখে তিনি লেখেন—

Your delightful and most interesting letter dated Oct. 27 has only just reached me...Remember that

১ দ্রষ্টব্য বাংলায় সংস্কৃত ছন্দের প্রসঙ্গ: পৃ ৫, ৪৭-৪৮, ১২২-২৩ ২২১।

for the last 20 years I *have not heard Bengali spoken* ! Even when I was in India, I was for many years in Assam, and then in Chittagong, where the local dialect is even more different from Calcutta Bengali than is Assamese...Add to this that I am 66 years old... So much for the *minus* side of the account.

Now for the *plus* side. I have, as you know, a very hearty and sincere admiration for the বাঙ্গালা ভাষা and, in particular, for your own performances in it. I *enjoy* reading Bengali, and would much like to convey some of that enjoyment to others...

I am straying away from your letter, from the most interesting, ingenious, and revealing things you say about ছন্দ। A poet's theories as to his art are always interesting and important, and I were a fool if I were to contest your conclusions or cavil at your arguments. It is sufficient that it should please you to tell us what you are doing and how you do it. It is not for me to question the details, the most interesting details, you set down in your letter.

But, কবিবর, I cling impenitently to my belief that the rhythm of Bengali verse consists in the regular recurrence of *phrasal* accent, and that this accent is one of prolongation and not of stress. You quote instances where this accent falls, not on the *initial* but on the *second* syllable.

But this transferability is always a quality of phrasal accent as distinguished from "word-accent". When a Frenchman wishes to emphasise, he does it by trans-

ferring, not by reinforcing, his accent, as the Germanic languages do...

However, these are matters which can nowadays he settled by actual physical experiment, and we need not argue about them. When you come over here, I will, with your permission, take you to see Daniel Jones's phonetic laboratory at University College in London. He has a machine which registers and measures both force accent and duration accent. He can record the sounds of any language even if he does not understand it, with surprising delicacy and accuracy.

The thing has been done, once for all, in the case of European languages, and French verse has been *measured.* It is as varied, as intangible, as sensitive, as Bengali verse. Yet this general rule emerges, that in every language, the poet makes use of some dominant audible quality *belonging to that language*, and so creates a music which can be reproduced by any one who can speak that language like a native, *and by no one else.* The rhythm may be one that is found in all, or in many languages. But each language will produce it by its own proper means. And I impenitently continue to believe that in Bengali this means is a *phrasal* accent falling on the first or second. syllable after a pause, a cæsura, a ফাঁক, whereas in English, for example, metre & rhythm are independent of pauses, and are simply a matter of putting stresses at regular intervals, separating them from one another by unstressed syllables or equivalent pauses...The thing can now be put to the

test of absolute physical experiment. Let us wait till you cross the seas again. Even if I am wrong, I may do some good by compelling more competent persons to reconsider and re-examine their arguments. Discussion can do no harm, if it is honest and good-natured discussion. Too often, discussion may degenerate into dogmatic assertion and contradiction. Note that I do not contradict a single one of your assertions. I merely suggest that they are not necessarily inconsistent with my theory, which is merely an attempt to account for the fact that anyone who can talk Bengali can catch the rhythm of your verses...Daniel Jones will be charmed and humoured if you will visit his laboratory and test his powers of recording sounds.

উল্লিখিত পত্রখানিতে ছন্দ সম্বন্ধে নূতন কথা বিশেষ কিছুই নেই। অধিকাংশ কথাই এণ্ডারসনের পূর্বোক্ত মতামতেরই পুনরুক্তিমাত্র। কিন্তু প্রসঙ্গক্রমে অন্য যে-সব তথ্য এই পত্রে প্রকাশ পেয়েছে তার গুরুত্ব আছে।

সর্বশেষে উল্লেখযোগ্য অধ্যাপক এণ্ডারসনের ৫ এপ্রিল ১৯১৯ তারিখের পত্রখানি। এটির প্রাসঙ্গিক অংশ এই।—

I am sending you a copy of the Times Literary Supplement for April 3. Please look at my letter headed "Experimental Phonetics" on p. 102[১]. It ends [with] a correspondence on *Metre* which has been going on since the beginning of the year. I hope you will forgive me for dragging in your name, but I should much like to attempt a fairly literal translation of your

১ বস্তুতঃ ১৮২ পৃষ্ঠা। দ্রষ্টব্য পৃ ৩৭৫।

three essays on ছন্দ। *I daresay I could get them* printed.

If I ventured to add any comments of my own, they would be to the effect that *metre* varies from one language to another. The elements of which it is composed are the three accents of force (stress), duration (quantity) and pitch.

এই পত্রে অতঃপর বলা হয়েছে যে, ইংরেজি ও অধিকাংশ ইউরোপীয় ভাষার ছন্দ নিয়ন্ত্রিত হয় বলপ্রস্বরের (accent of force বা stress) দ্বারা। কিন্তু ফরাসি ও বাংলা ছন্দ নিয়ন্ত্রিত হয় বাক্‌পর্বগত ব্যাপ্তি-প্রস্বরের (phrasal accents of duration) দ্বারা। এণ্ডারসনের এই মত নূতন নয়। প্রায় প্রত্যেক পত্রেই তিনি এই একই কথা নানাভাবে ব্যক্ত করেছেন। ফরাসি ছন্দের কথা জানি না। কিন্তু বাংলা ছন্দ যে-প্রস্বরের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় তাকে ব্যাপ্তিপ্রস্বর বলতে পারি না। বস্তুতঃ বলপ্রস্বরই বাংলা ছন্দের নিয়ামক। তবে সে-প্রস্বর যে শব্দগত স্থির প্রস্বর নয়, বাক্‌পর্বগত স্থচালনীয় প্রস্বর, সে কথা সত্য। এই পত্রের অবশিষ্ট উল্লেখযোগ্য কথা এই।—

My Indian (and Anglo-Indian) friends assure me that most Indian languages have a quantitative মাত্রা which corresponds to the metrical foot of Sanskrit, Greek, and Latin. It may be so. The experimental methods now used would settle the question once for all beyond all possibility of argument. If you come over here, I should love to take you to see Daniel Jones at his laboratory. He can make records of your reading of verse on a revolving drum which records syllabic stress and duration. Pitch, so far as I know, cannot as

yet be mechanically recorded and measured, but I doubt if rise and fall of tone (beautifully audible though they be in Bengali verse) are a component and regulary recurrent part of metre. Daniel Jones, however, can take down pitch in musical notation, and I am sure that you would find the Laboratory in Gower Street extraordinarily interesting.

ছন্দ-আলোচনার দিক্ থেকে এই পত্রটির বিশেষ গুরুত্ব নেই। কিন্তু অন্য দিক্ থেকে এটির মূল্য আছে।

Times Literary Supplement পত্রিকায় (১৯১৯ এপ্রিল ৩, পৃ ১৮২-৮৩) প্রকাশিত *Experimental Phonetics*-নামক যে-রচনাটির কথা এই পত্রে উল্লিখিত হয়েছে তার প্রাসঙ্গিক অংশটুকুও এখানে উদ্ধৃত করা গেল।—

May I venture to supplement Dr. Rudmose-Brown's interesting remarks on the Abbe Rousselot's phonetic laboratory in Paris by reminding your readers that we have in London a not less interesting experimental laboratory at University College, in charge of Mr. Daniel Jones? Mr. Jones's skill and patient care in investigation as a phonetician and student of metre are, of course, known to us all. It may not be so well known that he is also a musician and hence is more capable than most of us of hearing and estimating the metrical value of pitch accent as compared with accents of stress and duration...Not only European, but Asiatic and African metres surely need experimental study; and the School of Oriental Studies can easily supply vocal examples when London possesses such a

complete set of instruments as Mr. Daniel Jones, as I understand, would gladly employ in the exact and quantitative determination of the facts of metrical pitch, stress and duration.

To the admirable bibliography which Dr. Rudmose-Brown gives us may I venture to add three essays on metre by Sir Rabindranath Tagore, the last delivered in the form of a lecture[১] to a large audience in Calcutta only last year ? We all know that Sir Rabindranath is a musician as well as a poet, and that many of the most delightful of his lyrics were originally composed as songs without words, to which, as he once told me, the words subsequently fitted themselves with little conscious effort on the poet's part. The other two essays (published in 1913 in the magazine called *Sabuj Patra*) were written as letters in answer to questions addressed by me to the poet. They deal (as does the lecture) with English as well as Bengali metre, and are of singular interest, because the metre of Bengali differs from that of other Indian languages very much as the metre of French differs from that of other Romance languages. (One difference is that the characteristic phrasal accent of prolongation is initial and not final or semi-final.) Sir Rabindranath (by a very excusable and common prejudice of ear or mind) seems to hear a similar phrasal accent in English verse.

১ 'বিচিত্রা' ক্লাবে ১৩২৪ চৈত্র ৬ তারিখে পঠিত এবং 'সবুজ পত্রে'র ১৩২৪ চৈত্র-সংখ্যায় প্রকাশিত 'ছন্দ' ('ছন্দের অর্থ' নামে গ্রন্থভুক্ত) প্রবন্ধ। দ্রষ্টব্য পৃ ৩৫৪ পাদটীকা ১ এবং পৃ ৩৫৭-৫৯।

Sir Rabindranath's essays are still in their native Bengali, and are indeed, not easily put into English, owing to his use of technical terms of metre or music the exact English equivalents of which are not easily found. I hope, however, to make the attempt shortly; and after submitting my translation to the poet for criticism and, if need be, amplification with a view to the needs of English readers, I may perhaps, try to get them into print with such explanations as may be diffidently offered by a foreign admirer of the suggestive charm and beauty of Bengali rhythm. Sir Rabindranath has recently published a little volume of verses, called '*Palataka*', composed wholly in *vers libres*[1] of a sort never before, I think, attempted in Bengali and singularly resembling similar experiments in French verse. The poet has arrived at these not by imitation of French or English verses, but by supplying words to the haunting melodies which come to his mind in surprising profusion and variety. These verses (their rhythm is chiefly a matter of cæsura immediately followed by a prolonged syllable) would form admirable subjects for quantitative study in a phonetic

১ 'পলাতকা'র ছন্দকে অবশ্যই 'দলমাত্রিক মুক্তক' বলা যায়। *Vers libres* বলা যায় কিনা, সে বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ আছে। কিন্তু স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এবং কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত এইজাতীয় ছন্দোবন্ধকে *vers libres* বা *free verse* বলেই মনে করতেন বলে বোধ হয়। দ্রষ্টব্য প্রবোধচন্দ্র সেন-প্রণীত 'ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ' (১৩৫২) পৃ ১৯৭ এবং সত্যেন্দ্রনাথের 'ছন্দ-সরস্বতী' প্রবন্ধ (ভারতী ১৩২৫ বৈশাখ, পৃ ১৪)। এই প্রসঙ্গে ১৩২৫ সালের বৈশাখ-সংখ্যা 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত 'বিজয়ী' কবিতার ছন্দ-সমালোচনা অংশটুকুও (পৃ ৯৪-৯৫) দ্রষ্টব্য।

laboratory and would settle, once for all, the vexed question of the incidence and quality of the phrasal accent in Bengali.

May I, in conclusion, say that many modern languages in India are said to possess quantitative verse, made of patterns of "longs" and "shorts" on the model of the classical verse of Europe and India ? These well deserve experimental analysis in a laboratory. Bengali verse is of a different type altogether. It is a matter of a single prolonged syllable attendant on and emphasizing a pause, cæsura, or (as the Bengalis themselves call it) a *phank* or "gap".

রবীন্দ্রনাথের যে-তিনটি ছন্দ-প্রবন্ধের[১] ইংরেজি অনুবাদের কথা এণ্ডারসন সাহেব উল্লেখ করেছেন, সেগুলি কখনও প্রকাশিত হয়েছিল কিনা জানা যায়নি। এইসব পত্রালাপের পর রবীন্দ্রনাথ যখন আবার ইংলন্ডে গেলেন (১৯২০ সালের জুন মাসে), তখন এণ্ডারসন সাহেবের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছিল কিনা এবং ডেনিএল জোন্‌সের পরীক্ষাগারে তাঁর যাবার উপলক্ষ ঘটেছিল কিনা তাও জানা যায়নি।

এণ্ডারসনের পত্রাবলী কোথাও প্রকাশিত হয়নি। তাই বিস্তৃত উদ্‌ধৃতি সহ তাঁর ছন্দ-বিষয়ক পত্রগুলির পরিচয় দেওয়া গেল। তাতে বাংলা ছন্দের অনুরাগী একজন বিদেশী জ্ঞানী ব্যক্তির অভিমত সম্বন্ধে যেমন একটা ধারণা করা যাবে, তেমনি রবীন্দ্রনাথের তৎকালীন ছন্দ-চিন্তার পরিবেশটা পাঠকের কাছে স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাবে এবং তাঁর তৎকালীন ছন্দ-প্রবন্ধগুলির তাৎপর্য অনুধাবন করার সহায়তাও হবে।

১ বর্তমান সংস্করণের 'বাংলা ছন্দ' প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায় এবং 'ছন্দের অর্থ' তৎকালীন নাম 'ছন্দ'), এই তিনটি প্রবন্ধ।

রবীন্দ্রনাথের ছন্দ-আলোচনার তিন পর্ব। ১২৯০ থেকে ১৩১৯ সাল পর্যন্ত যে সময়, তাকে বলতে পারি রবীন্দ্রনাথের ছন্দ-আলোচনার প্রথম পর্ব। 'ছন্দ' গ্রন্থের বর্তমান সংস্করণে 'পরিশেষ' বিভাগের চারটি, 'বিবিধ' বিভাগের প্রথম তিনটি এবং 'সংযোজন' বিভাগের একটি, মোট এই আটটি রচনা উক্ত প্রথম পর্বের অন্তর্গত। এই পর্বের ছন্দ-আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ কার্যতঃ একা। এই আলোচনায় আর কাউকে প্রত্যক্ষভাবে যোগ দিতে দেখা যায় না।

১৩২১ থেকে ১৩২৪ সাল পর্যন্ত চার বৎসর কালকে বলতে পারি রবীন্দ্রনাথের ছন্দ-আলোচনার দ্বিতীয় পর্ব। বর্তমান সংস্করণ 'ছন্দ' গ্রন্থের 'বাংলা ছন্দ' প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়, 'সংগীত ও ছন্দ' এবং 'ছন্দের অর্থ,' এই চারটি রচনা উক্ত দ্বিতীয় পর্বের অন্তর্গত। কালপরিসরের দিক্ থেকে ক্ষুদ্রতর হলেও এবং এই সময়ের রচনার সংখ্যা স্বল্পতর হলেও প্রথম পর্বের তুলনায় দ্বিতীয় পর্বের গুরুত্ব বেশি। প্রথম পর্বের ছন্দ-আলোচনাগুলি সাধারণতঃ অন্য প্রসঙ্গের আনুষঙ্গিক অবতারণামাত্র। এই রচনাগুলিতে বাংলা ছন্দের সামগ্রিক বা সুশৃঙ্খল পরিচয় দেবার প্রয়াস দেখা যায় না। বাংলা ছন্দের সুসংহত ও সুশৃঙ্খল পরিচয় দেবার প্রথম প্রয়াস দেখা যায় এই দ্বিতীয় পর্বে। রবীন্দ্রনাথের মনে উক্তপ্রকার আলোচনার প্রথম প্রেরণা সঞ্চার করে ক্যাম্‌ব্রিজের অধ্যাপক এণ্ডারসনের ছন্দ-জিজ্ঞাসা। এই পর্বের ছন্দ-আলোচনার সঙ্গে নানা সময়ে বিভিন্ন উপলক্ষে আরও কয়েকজন খ্যাতনামা ব্যক্তি যুক্ত হয়েছিলেন— এদেশে কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, ফ্রান্সের সিলভ্যাঁ লেভি এবং ইংলন্ডের কবি রবার্ট্ ব্রিজেস্ ও কুইলার কাউচ্।

এর প্রায় চোদ্দ বৎসর পরে ১৩৩৮ সালে রবীন্দ্রনাথের ছন্দ-আলোচনার তৃতীয় পর্বের সূত্রপাত হয় প্রবোধচন্দ্র সেনের ছন্দ-জিজ্ঞাসার

প্রেরণায়। এই পর্বের আলোচনার সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে যুক্ত হন কবি দিলীপকুমার রায়, অধ্যাপক অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় এবং আরও কেউ কেউ। এই সময়ে রচিত রবীন্দ্রনাথের ছন্দ-প্রবন্ধাবলীর পরিচয়দানপ্রসঙ্গে এঁদের কথা যথাস্থানে উল্লিখিত হবে।

এই পর্বের স্থায়িত্বকাল আট বৎসর, ১৩৩৮ সাল থেকে ১৩৪৫ সাল পর্যন্ত। এই কালের প্রবন্ধসংখ্যা নয়, বিবিধ রচনাংশ তিন, চিঠিপত্র অন্ততঃ ষোলো এবং ভাষণ তিন। এই পর্বে রবীন্দ্রনাথের ছন্দ-আলোচনা দ্বিতীয় পর্বের চেয়েও সংহততর ও পূর্ণতর রূপ ধারণ করে।

অতঃপর এই তৃতীয় পর্বের প্রবন্ধসমূহের যথানুক্রমিক সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া গেল। এই প্রবন্ধাবলীর প্রথমটির নাম 'বাংলা ছন্দ'। 'ছন্দ' গ্রন্থে এটির স্থান নির্দিষ্ট হয়েছে 'ছন্দের হসন্ত হলন্ত' প্রবন্ধের প্রথম পর্যায়রূপে।

ছন্দের হসন্ত হলন্ত

১

এই প্রবন্ধের প্রথম পর্যায়টি ১৩৩৮ সালের পৌষ মাসের 'বিচিত্রা'য় প্রকাশিত হয় 'বাংলা ছন্দ' নামে এবং দ্বিতীয় পর্যায়টি 'ছন্দের হসন্ত হলন্ত' নামেই প্রকাশিত হয় ওই সালের মাঘ মাসের 'পরিচয়' পত্রিকায়। 'ছন্দ' গ্রন্থে গ্রহণকালে এই দুটি প্রবন্ধ 'ছন্দের হসন্ত হলন্ত' নামে এক প্রবন্ধেরই দুই পর্যায়রূপে স্বীকৃত হয়; তবে তৎকালে প্রথম প্রবন্ধের প্রথম ও শেষ দিক্ থেকে দুটি অংশ অনাবশ্যকবোধে বর্জিত হয়েছিল। বর্তমান সংস্করণে এই দুটি পর্যায় ওই ভাবেই রক্ষিত হল। তৃতীয় পর্যায়টি নূতন যোজনা। ১৩৩৯ সালের কার্তিক মাসের 'পরিচয়ে' প্রকাশিত 'নবছন্দ' প্রবন্ধের দুটি সুস্পষ্ট বিভাগ। প্রসঙ্গসাদৃশ্যহেতু এর প্রথম বিভাগটি 'ছন্দের হসন্ত হলন্ত' প্রবন্ধের তৃতীয় পর্যায়রূপে স্বীকৃত হল।

অপর বিভাগটি যুক্ত হল 'ছন্দের মাত্রা' প্রবন্ধের সঙ্গে। রচনাবলী-সংস্করণে এই তৃতীয় পর্যায়টি 'ছন্দের হসন্ত' নামে পরিশিষ্ট বিভাগে স্থাপিত হয়েছে।

এবার 'ছন্দের হসন্ত হলন্ত' প্রবন্ধের তিনটি পর্যায়ের স্বতন্ত্র পরিচয় দেওয়া গেল।

প্রথম পর্যায়

'বাংলা ছন্দ'

১৩৩৮ সালের অগ্রহায়ণ মাসে 'বিচিত্রা' পত্রিকায় 'বাংলা অক্ষরবৃত্ত ছন্দের স্বরূপ' নামে প্রবোধচন্দ্র সেনের একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল এই।—

শব্দের মধ্যবর্তী হসন্ত বর্ণগুলিকে (বিশেষত সংস্কৃত শব্দে) পরবর্তী বর্ণে যুক্ত করে দেওয়ার প্রথা থাকাতেই অক্ষরবৃত্ত ছন্দের উৎপত্তি হতে পেরেছে এবং যেখানেই শব্দের মধ্যে হসন্তবর্ণ অসংযুক্ত থেকে যায় সেখানেই এ ছন্দকে ইতস্তত করতে এবং বহুস্থানেই পশ্চাৎপদ হতে হয়।···

প্রচলিত প্রণালীতে এ ছন্দের হিসাব রাখা হয় চাক্ষুষভাবে অক্ষরসংখ্যা গুনে, ধ্বনিপরিমাণ নির্ণয়ের দ্বারা নয়।···ধ্বনির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য না রেখে লিপিবদ্ধ অক্ষরসংখ্যার প্রতি নজর রাখাই এ ছন্দের সাধারণ রীতি। সুতরাং এ ছন্দের গোড়ার কথাই হচ্ছে বাংলা লিপিপদ্ধতি।···যদি যুক্তবর্ণগুলিকে বিযুক্ত করে লেখার প্রথাই প্রচলিত থাকত তবে অক্ষর গোনার অন্ধ অভ্যাস হতে পারত না, সুতরাং অক্ষরবৃত্ত ছন্দেরই উৎপত্তি হত না।

—বিচিত্রা ১৩৩৮ অগ্রহায়ণ, পৃ ৫৭৪ এবং ৫৭৯

এই প্রতিপাদ্য বিষয়ের সমর্থনে অক্ষরবৃত্ত রীতির ছন্দের দুর্বলতা কোথায় তা তিনি দেখাতে চেষ্টা করেন যুক্তি ও দৃষ্টান্ত দিয়ে। তার প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথের 'বাংলা ছন্দ' প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় 'বিচিত্রা'র পরবর্তী সংখ্যায়। 'ছন্দ' গ্রন্থে গ্রহণকালে এই প্রবন্ধটি 'ছন্দের হসন্ত হলন্ত' প্রবন্ধের প্রথম পর্যায়রূপে স্বীকৃত হয় এবং এটির একেবারে প্রথম ও শেষ দিক্ থেকে দুটি অংশ বর্জিত হয়। প্রথম দিকের বর্জিত অংশটুকু এই।—

এতদিন নিরুদ্‌বেগে যারা আপন মনে ছন্দ গেঁথে চলেছিল, আজ তাদের জবাবদিহির সময় এল। হঠাৎ দেখি বাংলা কবিতার ছন্দ নিয়ে তর্ক উঠেছে।

এই রকমই ঘটে থাকে। প্রথমে এক দল আসে যারা নিজের গরজে রচনা করে চলে, কিছুদিন বাদে তাদের রাস্তা বেয়ে আসে আর-এক দল, তারা নিয়ম বের করতে লেগে যায়।

আজ সেইদিন এসেছে। অগ্রহায়ণের বিচিত্রা পত্রিকায় তারই লক্ষণ দেখা গেল। বাংলা কবিতার ছন্দের স্বরূপ নির্ণয় উপলক্ষ্যে একজন অধুনাতন ছান্দসিক আধুনিক বাঙালি কবিদের কিছু ভর্ৎসনা করেছেন। তার নালিশ ঠিক স্পষ্ট বুঝতে পারিনি। আইনের জটিল ভাষায় আসামীকে যখন অভিযুক্ত করা হয় তখন ভাবগতিক দেখে হতভাগার মুখ শুকিয়ে যায়, কিন্তু বুঝতে পারে না নালিশের বিষয়টি কি। শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্রের প্রবন্ধটি পড়ে আমার সেইরকম ধাঁধা লেগেছে। ধাঁধা লাগবার কারণ আছে।…

—বিচিত্রা ১৩৩৮ পৌষ, পৃ ৭০৯

'বাংলা ছন্দ' প্রবন্ধের শেষ দিকের বর্জিত অংশটুকুও এস্থলে উদ্‌ধৃত করে দেওয়া গেল।—

প্রবোধচন্দ্র আধুনিক বাঙালি কবিদের আর-একটা চাতুরী ধরেছেন। তিনি বলেন, "আজকাল কবিরা 'হইতে' 'লইয়া' 'যাইবে' প্রভৃতি সাধুশব্দের যুগ্মধ্বনিটাকে বর্জন করার অভিপ্রায়ে 'হতে' 'লয়ে' 'যাবে' প্রভৃতি সংক্ষিপ্ত চলতি রূপের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করে থাকেন"। যাঁরা আজকালকার কবি নন তাঁদের লেখা পরখ করে দেখা যাক।—

এ জনার মুখ আর দেখিতে না হবে।—

—চণ্ডীদাস

দেশে না রব মুঞি যাব বারাইয়া।

—চণ্ডীদাস

কে যাবে মথুরাদিকে যাব তার সনে।

—যদুনাথ দাস

অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোমা হেন।

—চণ্ডীদাস

হিয়ার মাঝারে থুই জুড়াব পরাণী।

—নরোত্তম দাস

অসম্ভব নয় যে, ঐসব হবে, রব, যাব, নিতে, জুড়াব শব্দগুলি কীর্তনীয়াদের মুখে মুখে ক্ষয় পেয়ে এসেছে— গোড়ায় ছিল হৈবে, রৈব, যাইব, লইতে, জুড়াইব। কিন্তু এই পরিবর্তন ষড়্‌যন্ত্রমূলক নয়, ভাষার পরিণতিতে আপনি ঘটেছে। কবিরা যুগ্ম অযুগ্ম কোনো ধ্বনিকেই ভয় করেন না, সকলকে নিয়েই তাঁদের কারবার। অথচ সব আধুনিক কবিই যদি ভাষার কোনো বিশেষ ভঙ্গিকে পক্ষপাত দেখিয়ে থাকেন তাহলে মনে করা চলবে না যে, তাঁরা সকলেই কোনো ফাঁকি চালাবার বা সংকট এড়াবার মতলবে এই উপায় বের করেছেন; ধরে নিতেই হবে, কানের কোনো জরুরি হুকুম অথবা ভাষার কোনো স্বতঃপরিণত

ইঙ্গিত এর মধ্যে আছেই। প্রাচীন পদে একদা দেখেছি 'ভাঙ্গইতে' 'গঢ়ইতে' শব্দ, তারপর দেখলুম 'ভাঙ্গিতে' 'গড়িতে'।

গড়ন ভাঙ্গিতে সখি আছে কত খল,
ভাঙ্গিয়া গড়িতে পারে সে বড় বিরল।

এটা যুগ্মধ্বনির তাড়া খেয়ে নয়। ভাষার অন্তর্নিহিত প্রবর্তনা থেকেই এই ভাঙাগড়া ঘটল। আজো ঘটছে।

অব্যবসায়ী যদি এমন সন্দেহ করেন যে, মাছের ব্যবসায়ী জলে নামবার ভয়েই ডাঙায় বসে ছিপ ফেলে চিতল মাছ ধরে, তবে তাঁকে বুঝিয়ে দেওয়া চাই এ ক্ষেত্রে ডাঙা থেকে মাছ ধরা সম্ভব বলেই এই নিয়মও সম্ভব হয়েছে। অব্যবসায়ী উত্তরে যদি বলেন, "আচ্ছা, তাই যদি হয় তবে ও লোকটা কেন কাদায় নেমে চিংড়ি মাছ ধরে? কখনো জলে কখনো স্থলে এ তার কি রকম বিচার?" তখন আবার বোঝাতে হবে ছিপ ফেলে চিংড়ি মাছ ধরার চেষ্টা না করে জলে নামা সুবিধে বলেই জেলে জলে নামতে ভয় করে না। নইলে তার লোকসান হত। যুগ্ম অযুগ্ম ধ্বনি নিয়েই কবিদের ব্যবসা, তাদের নিয়ে যখন যে ব্যবস্থাটা খাপ খায় কবিরা সেইটের দিকেই লক্ষ্য রাখেন, নইলে তাঁদের ছন্দে লোকসান হয়।

লেখক আধুনিক কবিদের লক্ষ্য করে বলেন, "শব্দের মধ্যবর্তী অসংযুক্ত হসন্তবর্ণকে পরিহার করার চেষ্টায় তাঁরা করব করত প্রভৃতি চলতি রূপের পরিবর্তে করিব ধরিব ইত্যাদি সাধুরূপেরই ব্যবহার করেন"।

লেখক আমার কথা বিশ্বাস না করতে পারেন; কিন্তু আমি সমস্ত আধুনিক বাঙালি কবিকে সাক্ষী মেনে বলতে পারি যে, কোনো বিশেষ চেষ্টা করে আমরা এ কাজ করিনি। সাধুরূপের ছন্দে সাধুরূপের শব্দব্যবহার, ওটা আমাদের পড়ে-পাওয়া সম্পত্তি। হতে, লয়ে, যাবে, হবে,

এগুলোও পূর্ব কবিদের সম্মত সাধুভাষায় কবিতায় চলে গেছে, কোন্ শতাব্দী থেকে সে কথা পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণ আলোচনা করবেন ; কিন্তু আমি জানি আমারও জন্মের অনেক পূর্ব থেকে। অর্থাৎ এক শতাব্দী তো হবেই। অতএব আধুনিক কবিরা 'আলিবাই' প্রমাণ দিতে পারেন। করব, করত, ধরব প্রভৃতি ক্রিয়াপদের নাম পূর্বপ্রথানুসারে সাধুশব্দের তালিকায় ওঠেনি। সেইজন্যেই উভয় পর্যায়ের শব্দ পৃথক্ অধিকারভুক্ত হয়ে পড়েছে। স্বীকার করি আমাদের সাহস নেই মেঘনাদবধের সংস্কার সাধনের উদ্দেশ্যে লিখি

সম্মুখ লড়াইয়ে পড়ে বীরের সেরা বীর
বীরবাহু চলে যখন গেলেন যমের বাড়ি।

এ রকম ভাষায় কোনো দোষ নেই, কিন্তু যথাস্থানে। সাধুভাষার ঠাটের মধ্যে এটা চালানো যায় না।

স্নানের ঘাট থেকে উঠে বধূ এলোচুল পিঠে ছড়িয়ে রোদ পোহায়। সন্ধ্যাবেলায় নিমন্ত্রণে যাবার সময় সেই চুলই খোঁপা করে বাঁধে। একই চুল নিয়ে দুরকম বিপরীত ব্যবহার। এটা সম্ভবই হত না, যদি সর্বসাধারণে এই রকম প্রত্যাশা না করত। সংস্কৃত-বাংলার ছন্দে 'করিব' 'ধরিব' লিখি, প্রাকৃত-বাংলায় লিখি 'করব' 'ধরব' ; তা না করলে পাঠকদের হাতে লেখাগুলোর অপঘাত মৃত্যুর আশঙ্কা থাকত।

তাহলে তর্কটা একেবারে গোড়ায় গিয়ে ঠেকে, সাধুভাষা রাখা কেন। হয়তো একদিন থাকবে না ; কিন্তু যতদিন আছে, ওকে বেশ ভালোমতো কাজে লাগানো চলছে। মেয়েদের সাজসজ্জা অন্তত আমাদের দেশে পুরুষের থেকে তফাত। পুরুষরা সেটা যদি স্বভাবতই পছন্দ না করত, তাহলে সেই তফাতটুকু আপনিই ঘুচে যেত। কিন্তু তাই বলে হঠাৎ শাড়ির উপর চাপকান পরানো চলবে না। মেয়েরা আপত্তি করবে, তার চেয়ে আপত্তি করবে পুরুষেরা। চলতি ভাষায় কবিতা চলতি

ভাষার নিয়মে এখন খুবই চলেছে, গম্ভীর বিষয়েও তার অনধিকার নেই। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অচলতি ভাষাটাও অন্তত কাব্যের এলাকা ত্যাগ করবার কোনো লক্ষণ দেখাচ্ছে না। তার একমাত্র কারণ বাঙালির হৃদয়ের মধ্যে ওর স্বাভাবিক অধিকার এখনো অটুট আছে। যতক্ষণ আছে ততক্ষণ ওর সাজসজ্জারও বিশেষত্ব থাকবে, যুগ্মধ্বনি বা অযুগ্মধ্বনির নিয়মের খাতিরে নয়, বাঙালির আনন্দপিপাসু অন্তরের চিরাভ্যস্ত ফরমাশে— যে ফরমাশে বাঙালির মেয়ে আজও খোঁপা বাঁধে, কাঁকন পরে এবং আচকান পরে বিবাহ করতে যায় না। প্রবোধচন্দ্র বারবার বলেছেন যে, বাংলায় লিপিপদ্ধতি যদি ইংরেজির মতো বা আর-কিছুর মতো হত তাহলে "অক্ষরগোনা ছন্দের যে কি রূপ হত তা সহজেই অনুমেয়"। কবিদের তরফে আমাকে এ কথা বারবারই প্রতিবাদ করে বলতে হবে যে, যতক্ষণ বাংলা ভাষার ধ্বনিপ্রকৃতি ইংরেজি বা আরবি বা চীনভাষার তাড়নায় সম্পূর্ণ বদল হয়ে না যাবে ততক্ষণ যে অক্ষর যেমন ভাবেই সাজাই না কেন বাংলা ছন্দের ধারা আজও যেমন ভাবে চলছে কালও তেমনি ভাবে চলবে। নূতন নূতন ছন্দ উদ্‌ভাবিত হতে পারবে, কিন্তু নাড়ী ছাড়ার আগে ছন্দের ধাত বদল হবে না।

—বিচিত্রা ১৩৩৮ পৌষ, পৃ ৭১৪-১৬

প্রবোধচন্দ্র এই প্রতিবাদের উত্তর দেন 'ছন্দ-জিজ্ঞাসা : প্রথম পর্ব' ও 'ছন্দ-জিজ্ঞাসা : দ্বিতীয় পর্ব' নামে দুই প্রবন্ধে (বিচিত্রা ১৩৩৮ মাঘ ও ফাল্গুন)। এই প্রতিবাদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তিনি বলেন—

আমাকে একথা স্বীকার করতেই হবে যে, অগ্রহায়ণ মাসের বিচিত্রায় আমি যে-সমস্ত কথা বলতে চেয়েছি অথচ সম্ভবত বোঝাতে পারিনি সে সম্বন্ধে আমার মতামত বিন্দুমাত্রও পরিবর্তন করার আবশ্যকতা এখনও বোধ করিনি। কিন্তু আমার কথা আমি তাঁকে বোঝাতে পারিনি সেই অক্ষমতার জন্যই পরম দুঃখের সঙ্গে আমাকে

এই দ্বিতীয় প্রবন্ধের অবতারণা করতে হল।...কেননা অন্যান্য বিদ্বজ্জনের কথা ছেড়ে দিয়ে যতক্ষণ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ পরিতোষ লাভ না করবেন ততক্ষণ পর্যন্ত আমার এই প্রয়োগবিজ্ঞানকে সাধু বলে মনে করব না।...তা ছাড়া এতদিন তাঁর কাছ থেকে ছন্দের যে অজস্র দান গ্রহণ করেছি, যদি আমি তার সে-সব ছন্দের ভিতরকার আসল তত্ত্বগুলিকে আবিষ্কার করতে পেরে থাকি তবে তাই হবে তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধাঞ্জলির প্রতিদান।

—ছন্দ-জিজ্ঞাসা : প্রথম পর্ব, বিচিত্রা ১৩৩৮ মাঘ, পৃ ১০৬-০৭

দ্বিতীয় পর্যায়

'ছন্দের হসন্ত হলন্ত'

ঠিক এই সময়েই 'ছন্দের হসন্ত হলন্ত' নামে রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় 'পরিচয়' পত্রিকায় (১৩৩৮ মাঘ)। এই প্রবন্ধ রচনার উপলক্ষ্য একাধিক। প্রবন্ধের প্রথমেই আছে—

"দিলীপকুমার আশ্বিনের উত্তরায় ছন্দ সম্বন্ধে আমার দুই একটি চিঠির খণ্ড ছাপিয়েছেন। সর্বশেষে যে নোটটুকু দিয়েছেন তার থেকে বোঝা গেল আমি যে কথা বলতে চেয়েছি এখনো সেটা তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়নি।"

উত্তরায় যে 'দুই একটি চিঠির খণ্ড' প্রকাশিত হয়েছিল, তা নিম্নে সমগ্রভাবেই পুনর্মুদ্রিত হল।—

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

তোমার "একটি...বাজে" ছন্দে 'একটি' ও 'দুইটি' উভয় শব্দই তিনমাত্রার। কারণ এ ছন্দ পয়ারের মতো নয়; তবে যুক্ত অক্ষরের মাত্রা দুই।—

একটি গান সকল গান মাঝে
সবার চেয়ে ধন্য হয়ে বাজে—

‘ধ্বনিত হয়ে বাজে’ বললেও চলত— কিন্তু ‘ধন্য হইয়া বাজে’ চলত না।

কিন্তু তাই বলে পয়ারে ‘একটি’ শব্দকে তিনমাত্রার মর্যাদা যদি দাও তবে ওর হসন্ত হরণ করে অত্যাচারের দ্বারাই সেটা সম্ভব হয়। অর্থাৎ যদি ‘এক্‌টি’র ‘ক’য়ে হসন্ত রাখ তবে দ্বৈমাত্রিক বলে ওকে ধরতেই হবে। যদি মাছের ওপর কবিতা লেখার প্রয়োজন হয় তবে কাৎলা মাছকে কা-ত-লা উচ্চারণের জোরে সাধুত্বে উত্তীর্ণ করা আর্যসমাজী শুদ্ধিতেও বাধবে। তুমি কি লিখতে চাও

পা ত লা ক | রি য়া কা টো | কা ত লা মা | ছে রে
উ ত স্থ ক | না ত নী যে | চা হি য়া আ | ছে রে ?

আর আমি যদি লিখি

পাৎলা করি কাটো প্রিয়ে কাৎলা মাছটিরে
টাট্‌কা তেলে ফেলে দাও সর্ষে আর জিরে—
ভেট্‌কি যদি জোটে তাহে মাখো লঙ্কা বাঁটা—
যত্ন করে বেছে ফেলো টুক্‌রো যত কাঁটা

আপত্তি করবে কি ?

[কিন্তু কবির ‘সোনার তরী’তে ‘বর্ষাযাপন’ কবিতায় যেখানে যুক্ত অক্ষরের মাত্রা এক, দুই নয়, সেখানে কবি লিখেছেন ‘ইচ্ছা করে অবিরত আপনার মনোমত গল্প লিখি একেকটি করে’। এখানে ‘একেকটি’কে কবির নির্দেশমত তিনমাত্রা ধরা উচিত, কিন্তু কবি ধরেছেন চারমাত্রা। ছন্দোনিপুণদের রায় জানার ইচ্ছা।—শ্রীদিলীপ-কুমার রায়]

—উত্তরা ১৩৩৮ আশ্বিন, পৃ ৩১৭

বন্ধনীবদ্ধ শেষ নোটটুকুর কথাই উল্লিখিত হয়েছে 'ছন্দের হসন্ত হলন্ত' প্রবন্ধের মুখবন্ধে। শুধু এই নোটটুকু নয়, দিলীপকুমার উত্তরায় এই পত্রের নীচে একটি পাদটীকাও যোজনা করেছিলেন। সেটি এই।—

"আমার প্রশ্ন ছিল 'একটি' দুইমাত্রার না তিনমাত্রার। আমি লিখেছিলাম, ধরুন—

'একটি গান সকল গান মাঝে
দুইটি সুরে আজিও যে গো বাজে।'

যদি লিখি, তবে 'একটি' ও 'দুইটি' উভয়েই ত্রিমাত্রিক কি না। আর সাধুভাষায় পয়ারে 'একটি'র ওজন কি ?"

এই নোট ও পাদটীকায় উত্থাপিত প্রশ্নের উত্তর দেওয়া 'ছন্দের হসন্ত হলন্ত' প্রবন্ধ রচনার অন্যতম উপলক্ষ্য।

এস্থলে প্রসঙ্গক্রমে বলা উচিত যে, দিলীপকুমারকে লেখা পত্রের (তারিখ ১৩৩৮ ভাদ্র ৭) যে-প্রতিলিপি রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত আছে তার সঙ্গে উত্তরায় প্রকাশিত এই পত্রাংশের কিছু পার্থক্য লক্ষিত হয়। 'চিঠিপত্র' বিভাগে প্রকাশিত দিলীপকুমারকে লেখা চতুর্থ পত্রের (পৃ ১৯৮–৯৯) সঙ্গে মিলিয়ে দেখলেই তা বোঝা যাবে। উত্তরায় এই পত্রের কোনো তারিখও দেওয়া হয়নি। উক্ত চতুর্থ পত্রের প্রথমাংশ ও উত্তরায় প্রকাশিত এই পত্রের প্রথমাংশ সম্পূর্ণ পৃথক্। তা ছাড়া উক্ত চতুর্থ পত্রের শেষ দুটি বাক্য 'উত্তরা'য় বর্জিত হয়েছে।

দিলীপকুমারের মন্তব্যের প্রসঙ্গেই রবীন্দ্রনাথ নীরেন্দ্রনাথ রায়ের একটি রচনার কথাও উল্লেখ করেছেন (পৃ ৬০)। রচনাটি শেলির 'One word is too often profaned'-শীর্ষক কবিতার বাংলা পদ্যানুবাদ। অনুবাদটির প্রথম দুই লাইন এই।—

একটি কথা লোকে এত করে কলুষিত,
আমি তাহা করিব না আর।

এখানে 'একটি' শব্দে দুই মাত্রা ধরা হয়েছে। তাতে রবীন্দ্রনাথের আপত্তি ছিল না। বলা প্রয়োজন যে, এই অনুবাদটি 'অক্ষরবৃত্ত' অর্থাৎ সাধুবাংলার ছন্দে রচিত। রবীন্দ্রনাথের অভিমতে এই রীতির ছন্দে একটি, টোটকা, ঝগড়া প্রভৃতি হস্‌মধ্য শব্দকে দুইমাত্রা বলেও ধরা যায়, তিনমাত্রা বলেও ধরা যায়। অর্থাৎ এই রীতির ছন্দে শব্দের আদি- বা মধ্য-স্থিত এক্, টোট্, ঝগ্ ইত্যাদি রুদ্ধদলের সংকোচন-প্রসারণ রচয়িতার ইচ্ছাধীন। কিন্তু মাত্রাবৃত্ত রীতির ছন্দে রুদ্ধদলের প্রসারণ সার্বত্রিক ; এই রীতিতে রুদ্ধদলের সংকোচন চলে না।

নীরেন্দ্রনাথের উক্ত অনুবাদটি রবীন্দ্রনাথের কাছে পাঠানো হয়েছিল সংশোধনের জন্য। রবীন্দ্রনাথ সংশোধনের পরিবর্তে এটিকে একেবারে নূতন করে লিখে দেন নূতন ছন্দে, 'অক্ষরবৃত্ত' রীতির পরিবর্তে 'মাত্রাবৃত্ত' রীতিতে। তার প্রথম দুই লাইন এই।—

একটি কথা বারেবারেই পেয়েছে লাঘবতা,
তাহারে লঘু করিব নাকো আর।

এটি মাত্রাবৃত্ত রীতিতে রচিত। তাই এখানে 'একটি' শব্দে তিন মাত্রা। নীরেন্দ্রনাথের অনুবাদ এবং তার রবীন্দ্রকৃত রূপান্তর, দুই-ই প্রকাশিত হয় 'পরিচয়' পত্রিকায় (১৩৩৮ কার্তিক, পৃ ৩০৮-০৯)।

এই প্রবন্ধ রচনার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য প্রবোধচন্দ্রের পূর্বোক্ত 'বাংলা অক্ষরবৃত্ত ছন্দের স্বরূপ' প্রবন্ধের পুনরালোচনা, অর্থাৎ 'অক্ষরের দাসত্বে বন্দী বলে প্রবোধচন্দ্র বাঙালি কবিদেরকে যে দোষ দিয়েছেন' তার পুনর্বিচার। বস্তুতঃ দিলীপকুমারের উত্থাপিত প্রশ্ন এবং 'বাংলা অক্ষরবৃত্ত ছন্দের স্বরূপ' প্রবন্ধের বক্তব্য বিষয় মোটামুটি একবর্গীয়। তাই

রবীন্দ্রনাথ দুইজনের বক্তব্যকেই এক প্রবন্ধের বিষয়ীভূত করেছেন। সাধুভাষার ছন্দে শব্দমধ্যবর্তী বা শব্দান্তবর্তী হস্ (অর্থাৎ ব্যঞ্জন) বর্ণের মাত্রানির্ণয় করার উপায় কি, এই ছিল বিচার্য বিষয়। এই বিষয়টিকে উপলক্ষ্য করে রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধে বহু চিন্তনীয় বিষয়ের অবতারণা করেন। বাংলা ছন্দ-আলোচনার ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথের এই প্রবন্ধটি বিশেষভাবে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। বস্তুতঃ গুরুত্বের বিচারে 'ছন্দের হসন্ত হলন্ত' প্রবন্ধের স্থান 'ছন্দের অর্থ' প্রবন্ধের পাশেই।

গ্রন্থভুক্ত হবার সময়ে এই রচনাটি সমগ্রভাবেই 'ছন্দের হসন্ত হলন্ত' প্রবন্ধের দ্বিতীয় পর্যায়রূপে স্বীকৃত হয়। কেবল একটি স্থলে কয়েকটি লাইন সংশোধিত ও পুনর্লিখিত হয়। 'পরিচয়' পত্রিকায় এই লাইনগুলি ছিল নিম্নলিখিতরূপ।—

অন্ধরাতে যবে বন্ধ হল দ্বার,
ঝঞ্চাবাতে উঠে বিপুল হাহাকার।

মনে রাখা দরকার এই ছন্দের প্রত্যেক ভাগে আরম্ভে ঝোঁক না দিয়ে যদি শেষে ঝোঁক দেওয়া হয়, অর্থাৎ 'অন্ধ' ও 'বন্ধ' শব্দের উপর ঝোঁক না পড়ে যদি সেটা পড়ে 'যবে' ও 'দ্বার' -এর উপর, তাহলে এটা আর-এক ছন্দ হয়ে যাবে। একে নিম্নলিখিত রকম ভাগ করে পড়তে হবে।

অন্ধ | রাতে যবে ‖ বন্ধ | হল দ্বার ‖
ঝঞ্চা | বাতে উঠে ‖ বিপুল | হাহাকার ‖

—পরিচয় ১৩৩৮ মাঘ, পৃ ৩৮৬

প্রবন্ধটি গ্রন্থভুক্ত হবার সময়ে এই অংশটা বহুলপরিমাণে সংশোধিত হয়। বর্তমান সংস্করণেও ওই সংশোধিত রূপটিই রক্ষিত হয়েছে (পৃ ৭২)। এই অংশটুকু ছাড়া বাকি সব অংশই অপরিবর্তিত আছে।

এই 'ছন্দের হসন্ত হলন্ত' প্রবন্ধটিকে উপলক্ষ্য করে প্রবোধচন্দ্র 'ছন্দ-জিজ্ঞাসা : তৃতীয় পর্ব' নামে আর-একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন 'বিচিত্রা' পত্রিকায়। তাতে তিনি বলেন—

'অক্ষরবৃত্ত' ছন্দ সম্বন্ধে আমার প্রবন্ধের সমালোচনা করে রবীন্দ্রনাথ পৌষের 'বিচিত্রা'য় যে-প্রবন্ধটি লিখেছেন তাতে আমি সন্তুষ্ট হতে পারিনি; কারণ 'অক্ষরবৃত্ত' ছন্দে যুগ্মধ্বনির ব্যবহার সম্বন্ধে আমি যে-প্রশ্ন তুলেছি, ওই প্রবন্ধে সে-প্রশ্নের যথোচিত উত্তর পাইনি। কিন্তু মাঘের 'পরিচয়ে' তাঁর 'ছন্দের হসন্ত হলন্ত' পড়ে খুশি হয়েছি, কারণ তাতে আমার প্রশ্নের আংশিক উত্তর পেয়েছি।...তা-ছাড়াও, 'ছন্দের হসন্ত হলন্ত' প্রবন্ধটিতে তিনি বাংলা ছন্দের প্রকৃতি সম্বন্ধে এমন কতকগুলি বিষয়ের উত্থাপন করেছেন, ছন্দের আলোচনায় যার মূল্য খুবই বেশি। তাঁর এ প্রবন্ধটির দ্বারা বাংলা ছন্দের আসল প্রকৃতিটি বোঝবার বিশেষ সহায়তা হয়েছে। যা হক, যে-প্রশ্ন উপলক্ষ্য করে তিনি এই প্রবন্ধটি লিখেছেন সে প্রশ্ন সম্বন্ধে আমার আরও কয়েকটি জিজ্ঞাস্য বিষয় আছে। আমি এ প্রবন্ধে ওই জিজ্ঞাস্য বিষয়-ক'টির আলোচনা করব।

—বিচিত্রা ১৩৩৯ বৈশাখ, পৃ ৫০১

অতঃপর প্রবোধচন্দ্র ছন্দ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথকে একখানি পত্র লেখেন এবং পত্রোত্তরে সাক্ষাতে আলোচনার জন্য আমন্ত্রিত হয়ে শান্তিনিকেতনে যান। সেখানে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কয়েক কিস্তিতে তাঁর যে আলোচনা হয় তা তিনি সংলাপের আকারে লিপিবদ্ধ করেন। কবির অনুমোদন-লাভান্তে এটিও বিচিত্রায় (১৩৩৯ জ্যৈষ্ঠ) প্রকাশিত হয় 'ছন্দ-বিচার' নামে। পত্রিকায় প্রকাশের পূর্বেই কবির সঙ্গে তাঁর আবার ছন্দের আলোচনা হয়। এবার আলোচনা হয় কলকাতায় মহর্ষিভবনে। এই আলোচনায় বিচিত্রা-সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ও উপস্থিত

ছিলেন। এই আলোচনার ফলে কবি উক্ত 'ছন্দ-বিচার' রচনাটির শেষে কিছু মন্তব্য যোগ করে দেন। এই মন্তব্যটুকুও 'ছন্দ-বিচার' প্রবন্ধের সঙ্গেই বিচিত্রায় প্রকাশিত হয় 'কবির পুনশ্চ বক্তব্য' নামে।[১] এই মন্তব্যটুকু এস্থলে সমগ্রভাবেই উদ্‌ধৃত হল।—

কবির পুনশ্চ বক্তব্য

সেদিনকার আলোচনায় প্রসঙ্গক্রমে এই প্রশ্ন উঠেছিল যে, ছন্দে সিলেব্‌ল্‌ প্রধান অথবা মাত্রা প্রধান। এ সম্বন্ধে আমার মত এই যে, মাত্রা নিয়েই ছন্দের স্বরূপ। কিঙ্কিণীতে ঘুণ্টি কি ভাবে ও কত সংখ্যায় সাজানো সে কথাটা গৌণ, তার ঝংকারের লয়টাই আসল কথা। যাণ্মাত্রিক ছন্দের প্রত্যেক পর্বে উর্ধ্বসংখ্যা কয় সিলেব্‌ল্‌-এর স্থান আছে তা আমি পূর্বে বিচার করে দেখিনি। 'বিচিত্রা'-সম্পাদক বলেন ছয় বা পাঁচ বা চার সবই চলে। আমি তাঁকে দৃষ্টান্তদ্বারা প্রমাণ করতে অনুরোধ করেছিলুম। তিনি সেই অনুরোধ রক্ষা করে দৃষ্টান্ত স্বয়ং রচনা করেছেন, পাঠকদের গোচর করা গেল।—

আজিকে তোমারে ডাক দিয়ে বলি, শুন গো সখী,
তোমার বীণায় বাজে অপরূপ ছন্দ ও কি?
কোনো পদ তার চার সিলেবিলে কোনোটা পাঁচে,
এ যেন মিতালি ঝাঁপতালে আর কাবালি নাচে!
এ যেন আঠারো বরষের পাশে ষোড়শী নারী,
যে বলে ইহারে অমিল, তাহার সঙ্গ ছাড়ি।

১ 'ছন্দ-বিচার' এবং 'কবির পুনশ্চ বক্তব্য' পুনর্মুদ্রিত হয় প্রবোধচন্দ্রের 'ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে (১৩৫২), পৃ ১৮১-১৯৯। এই গ্রন্থে 'ছন্দ-বিচার' গৃহীত হয়েছে 'ছন্দ-সংলাপ : পদ্যকবিতার ছন্দ' এই নামে।

চারে পাঁচে মিল হয় না, এ কোন্ দেশের কথা ?
চারে পাঁচে নয়, তার অভিনয় যথা ও তথা।
চারের সহিত পাঁচের প্রণয় রসিকে জানে,
অরসিক জনে শাস্ত্রই মানে, মানে না কানে।
কানের মাঝারে ছন্দের বাসা, নিয়মে নহে ;
কানে মানে না যে, সুধীজন তারে বে-কানা কহে।
অসমে অসমে কত অপরূপ সাম্য আছে !
কত মধুভরা ফুল ফুটে, জানো, কাঁটার গাছে ?

রিম ঝিম ঝিম বরষা ঝরে,-বরষা ঝরে তরুর দেহে,
লতা দুলে দুলে পরশে তারে, পরশে তারে সজল স্নেহে
ঘন তমসার সজল মায়া বিছালো ছায়া নেত্রে তব,
স্নিগ্ধ তোমার ওষ্ঠাধরে হাস্য ঝরে কি অভিনব !

না জানি আজি গাহ চুপি চুপি কি গান সখী,
এ কি এ আলো নয়নে তোমার আজি নিরখি !
বুঝি না কি যে আছে তব মনে সঙ্গোপনে,
প্রণয়ী জনে কেন অকরুণ বিদায়-খনে।

আর কত বল মিলাইব মিল চারে ও পাঁচে।
এখনো কাহারো মনে সন্দেহ কিছু কি আছে ?
সেদিন সন্ধ্যা, গুরুদেবগৃহে উঠিল কথা,
চার পাঁচ দিয়ে ছন্দ করার নাহিক প্রথা।
গুরুর আদেশে ত্রিবিধ প্রমাণ দিলাম এনে,
দেখিব এখন কি বিধি করেন প্রবোধ সেনে।

দেখা যাচ্ছে, 'আজিকে তোমারে' ছয় সিলেব্‌ল্‌, তার পরেই 'ডাক দিয়ে বলি' পাঁচ সিলেব্‌ল্‌। পরবর্তী ছত্রে 'তোমার বীণায়' চার সিলেব্‌ল্‌, আবার 'বাজে অপরূপ' পাঁচ। প্রাকৃত-বাংলা ছন্দেও এরকম দৃষ্টান্ত আছে। যথা—

৫ ৪ ৩ ১
শিবুঠাকুরের | বিয়ে হবে | তিন কন্যে | দান।

এই একটা লাইনেই দেখা যাচ্ছে চার অসমান-সংখ্যক সিলেব্‌ল্‌-পিণ্ড নিয়ে একই ষাণ্মাত্রিক ছন্দ রচিত।

—বিচিত্রা ১৩৩৯ জ্যৈষ্ঠ, পৃ ৫৮২

অতঃপর কবির এই 'পুনশ্চ বক্তব্য'-কে উপলক্ষ্য করে প্রবোধচন্দ্র 'বাংলা স্বরবৃত্ত ছন্দের স্বরূপ' নামে আর-একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন 'বিচিত্রা' পত্রিকায়। এই প্রবন্ধের মুখবন্ধে তিনি বলেন—

জ্যৈষ্ঠের 'বিচিত্রা'য় 'ছন্দ-বিচার'-নামক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার ছন্দ-বিষয়ক যে আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে, নানা দিক্ থেকে তার বিশেষ মূল্য আছে বলে মনে করি। ওই প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথের কাছে পাঠানো হয়েছিল এবং তিনি সেটিকে আনুপূর্বিক দেখে অনুমোদন করেছেন। শুধু 'স্বরবৃত্ত' ছন্দের প্রকৃতি সম্বন্ধে একটি নূতন মন্তব্য যোগ করে দিয়েছেন। কাজেই মনে হচ্ছে, বাংলা ছন্দের পরিভাষা, বিশ্লেষণ, শ্রেণীবিভাগ ও নামকরণ প্রভৃতি বিষয়ে তিনি আমার মত সমর্থন করেছেন। একমাত্র 'স্বরবৃত্ত' ছন্দের প্রকৃতি সম্বন্ধে তাঁর মত ও আমার মতে খুবই পার্থক্য রয়েছে। সুতরাং এ বিষয়ে আরও আলোচনা হওয়া বাঞ্ছনীয়।

—বিচিত্রা ১৩৩৯ ভাদ্র, পৃ ১৯৬

'ছন্দের হসন্ত হলন্ত,' 'ছন্দ-বিচার' এবং 'কবির পুনশ্চ বক্তব্য,' এই তিনটি রচনা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা ছন্দের, বিশেষতঃ 'স্বরবৃত্ত' অর্থাৎ বাংলা-প্রাকৃত ছন্দের প্রকৃতি নিয়ে একটা প্রবল আন্দোলন দেখা দেয়।

১৩৩৮ সালের ফাল্গুন-সংখ্যা 'শনিবারের চিঠি'তে 'বাংলা ছন্দে প্রবোধচন্দ্রোদয়' নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধের অপ্রকাশিতনামা লেখক (সম্ভবতঃ মোহিতলাল মজুমদার) বাংলা-প্রাকৃত ছন্দের প্রবোধচন্দ্রকৃত বিশ্লেষণপদ্ধতি অগ্রাহ্য করেন এবং 'ছন্দের হসন্ত হলন্ত' প্রবন্ধে প্রকাশিত রবীন্দ্রকৃত বিশ্লেষণপদ্ধতির সমর্থন করেন।

পক্ষান্তরে দিলীপকুমার রায় 'পরিচয়' পত্রিকায় (১৩৩৯ বৈশাখ, পৃ ৭১৮-২০) রবীন্দ্রস্বীকৃত পদ্ধতি সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ করে ছন্দোবিৎদের অভিমত আহ্বান করেন। আর এই বৈশাখ মাসেই বিচিত্রা-সম্পাদক 'ছন্দের দ্বন্দ্ব' নামে একটি নিবন্ধে পূর্বোক্ত 'ছন্দ-বিচার' রচনাটির পূর্বাভাস দিয়ে এ বিষয়ে পাঠকসমাজের কৌতূহল ও আগ্রহ জাগ্রত করে রাখেন। জ্যৈষ্ঠ মাসের 'বিচিত্রা'য় 'ছন্দ-বিচার' ও 'কবির পুনশ্চ বক্তব্য' প্রকাশিত হয়। পরের আষাঢ় মাস থেকে এই বিতর্ক আরও প্রবল হয়ে ওঠে। ওই আষাঢ় মাসের 'বিচিত্রা'য় অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় 'ছন্দের দ্বন্দ্ব (?)' নামে এক প্রবন্ধে বাংলা-প্রাকৃত ছন্দের বিশ্লেষণপদ্ধতি সম্বন্ধে যে অভিমত ব্যক্ত করেন তা স্পষ্টতঃই রবীন্দ্রনাথের পদ্ধতি থেকে সম্পূর্ণ পৃথক্, অথচ প্রবোধচন্দ্রের পদ্ধতির সঙ্গেও সর্বতোভাবে অভিন্ন নয়। 'বিচিত্রা' পত্রিকার ওই সংখ্যাতেই (১৩৩৯ আষাঢ়) শৈলেন্দ্রকুমার মল্লিক দিলীপকুমারের মতোই বাংলা-প্রাকৃত ছন্দের রবীন্দ্রস্বীকৃত বিশ্লেষণ মেনে নিতে স্পষ্ট অসম্মতি প্রকাশ করেন এবং প্রবোধচন্দ্রের বিশ্লেষণের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করেন। অতঃপর রবীন্দ্রনাথ প্রাকৃত-বাংলার ছন্দের

প্রকৃতি সম্বন্ধে তাঁর যা বক্তব্য তা আর-একবার স্পষ্টতর করে বোঝাতে সচেষ্ট হন 'ছন্দ-বিতর্ক' নামে এক প্রবন্ধে (পরিচয়, ১৩৩৯ শ্রাবণ)। বাংলা-প্রাকৃত বা স্বরবৃত্ত ছন্দ নিয়ে এই আলোচনার শেষপর্বে প্রকাশিত হয় প্রবোধচন্দ্রের পূর্বোক্ত 'বাংলা স্বরবৃত্ত ছন্দের স্বরূপ' প্রবন্ধটি। এই প্রবন্ধে উপেন্দ্রনাথ, অমূল্যধন এবং শৈলেন্দ্রকুমারের অভিমতও প্রসঙ্গক্রমে আলোচিত হয়, আর সর্বশেষে রবীন্দ্রনাথের 'ছন্দবিতর্ক' প্রবন্ধটি সম্বন্ধে বলা হয়—

'পরিচয়'এর 'ছন্দ-বিতর্ক' প্রবন্ধটি থেকে একথা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হল যে, আমি স্বরবৃত্ত বা প্রাকৃত ছন্দের ধ্বনিবিশ্লেষণ যে-ভাবে করি তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বিশ্লেষণপ্রণালীর যথার্থ পার্থক্য কিছুই নেই।

—বিচিত্রা ১৩৩৯ ভাদ্র, পৃ ২০৮

স্বরবৃত্ত বা প্রাকৃত-বাংলার ছন্দ নিয়ে বিতর্কধারার পরিসমাপ্তি এখানেই ঘটে বলা যেতে পারে।[১] 'সংস্কৃত-বাংলা ও প্রাকৃত-বাংলার ছন্দ' প্রবন্ধের পরিচয়দানপ্রসঙ্গে এই 'ছন্দ-বিতর্ক' প্রবন্ধের কথা পুনরুত্থাপন করা যাবে।

তৃতীয় পর্যায়

'নবছন্দ' (প্রথমাংশ)

স্বরবৃত্ত বা প্রাকৃতবাংলার ছন্দের বিশ্লেষণ নিয়ে বাদপ্রতিবাদের পালা শেষ হল বটে, কিন্তু অক্ষরবৃত্ত বা সাধুবাংলা ছন্দের তর্কটা তখনও শেষ হল না। সে তর্ক পুনরুত্থাপিত হয় 'উত্তরা'য় প্রকাশিত (১৩৩৯ শ্রাবণ) 'বাংলা ছন্দে হসন্ত' নামে অনিলবরণ রায়ের

১ এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য উপেন্দ্রনাথের 'বিগত দিন' গ্রন্থের (১৩৬৪) সপ্তম ও অষ্টম পরিচ্ছেদ (পৃ ৩০-৪০)।

এক প্রবন্ধে। তাঁর প্রশ্ন ছিল, দিক্‌প্রান্ত, হৃৎপিণ্ড প্রভৃতি সমাসবদ্ধ শব্দের পূর্বাংশস্থিত হস্‌বর্ণের (স্‌, ৎ ইত্যাদি) মাত্রাগণনা হবে কিভাবে? রবীন্দ্রনাথ এই প্রশ্নের উত্তর দেন ১৩৩৯ সালের কার্তিক-সংখ্যা 'পরিচয়' পত্রিকায় প্রকাশিত 'নবছন্দ'-নামক প্রবন্ধের প্রথমাংশে। দ্বিতীয়াংশে অন্য প্রসঙ্গের অবতারণা করেন; সে-কথা পরে 'ছন্দের মাত্রা' প্রবন্ধের প্রসঙ্গে যথাস্থানে উত্থাপন করা যাবে।

উক্ত 'নবছন্দ' প্রবন্ধের প্রথমাংশ প্রসঙ্গসাদৃশ্যহেতু 'ছন্দের হসন্ত হলন্ত' প্রবন্ধের তৃতীয় পর্যায়রূপে গৃহীত হল। 'ছন্দ' গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে এটি সমগ্রভাবে স্থান পায়নি। মুখবন্ধের পরবর্তী এর প্রথম দিকের দুটিমাত্র অনুচ্ছেদ ('তব চিত্তগগনের দূর দিক্‌সীমা' থেকে 'সে যে দাবি করতে পারে না তাও নয়' পর্যন্ত; পৃ ৮০) ওই সংস্করণে স্থান পেয়েছিল, তাও 'ছন্দের হসন্ত হলন্ত' প্রথম পর্যায়ের অংশবিশেষরূপে। এই অনুচ্ছেদ-দুটিকে স্থাপন করা হয়েছিল উক্ত প্রথম পর্যায়ের শেষদিকে 'এখনই আসিলাম দ্বারে' ইত্যাদি দৃষ্টান্তটির (পৃ ৫৮) পুরোভাগে, 'অপর পক্ষে দেখা যাক' ইত্যাদি বাক্যটির স্থলে। এই বাক্যটি প্রথম সংস্করণে স্থান পায়নি। উক্ত প্রথম দুটি অনুচ্ছেদ বাদে এই তৃতীয় পর্যায়ের বাকি সবটুকু অংশই প্রথম সংস্করণে বর্জিত হয়েছিল। ঐতিহাসিক পৌর্বাপর্য তথা বিষয়বস্তুর সম্পূর্ণতার খাতিরে বর্তমান সংস্করণে এই তৃতীয় পর্যায়টির স্বাতন্ত্র্য ও সমগ্রতা স্বীকৃত হল। রচনাবলী-সংস্করণেও তাই হয়েছে; তবে সেখানে এটিকে মূলগ্রন্থ থেকে সরিয়ে 'ছন্দে হসন্ত' নামে স্থান দেওয়া হয়েছে 'পরিশিষ্ট' বিভাগে।

'নবছন্দ' প্রবন্ধের মুখবন্ধটুকু এই সংস্করণের মূলপাঠ থেকে বর্জিত হয়েছে আলোচনার ধারাবাহিকতারক্ষার প্রয়োজনে। রচনাবলী-সংস্করণেও এই নীতিই অনুসৃত হয়েছে। 'নবছন্দ' প্রবন্ধ রচনার

ঐতিহাসিক উপলক্ষ্যটুকু প্রচ্ছন্ন আছে এই মুখবন্ধের মধ্যেই। তাই এই মুখবন্ধটুকুও এখানে উদ্‌ধৃত হল।—

ছন্দের আলোচনাটা প্রথম যেদিন যাত্রা করে বেরল সেদিন কোন্ গ্রহ তার উপর দৃষ্টি দিয়েছিল জানিনে, আজো তার ছুটি মিলল না। ভেবেছিলেম কথাটা চলছে তো চলুক, আমি ওর থেকে সরে পড়ব। কেননা ছন্দ-জ্ঞান যদি বা কমবেশি পরিমাণে আমার থাকে ছন্দ-বিজ্ঞান আমার মগজে নেই, এই কথাটা ধরা পড়বার আশঙ্কা ক্রমে বেড়ে উঠছে। অতএব ছন্দ নিয়ে যদি বা দুই-একটা কথা সাহস করে আজো বলি বৈজ্ঞানিক ফাঁদে পা দেব না, বিশ্লেষণের রাস্তা এড়িয়ে চলব। তা ছাড়া তর্কের কথাটাকে যথাসাধ্য ছোটো করে বলব। লাঠিয়াল যখন একা, আর তার প্রতিপক্ষ যখন অনেক, তখন সে গুটিসুটি হয়ে বসে বসে লাঠি চালায়— কেননা দেহটাকে সংক্ষিপ্ত করলে মারটা কম লাগবার কথা।

দেখলুম হতভাগ্য ৎ-এর মামলা সম্পূর্ণ চোকেনি। যে-কথাটা উঠেছে, মাপকাঠি দিয়ে তার বিচার করব না, তা হলে বৈজ্ঞানিক হয়ে উঠবে; কানের দোহাই দেব। বুদ্ধিতে না কুলোতে পারে, কিন্তু বোধের উপর আমার ভরসা আছে।

—পরিচয় ১৩৩৯ কার্তিক, পৃ ১৭৫

'প্রতিপক্ষ অনেক' কথাটার লক্ষ্য তখনকার দিনে ছন্দ-আলোচনায় অনেকের যোগদানের প্রতি। 'ৎ-এর মামলা' কথাটার লক্ষ্য প্রধানতঃ পূর্বোক্ত অনিলবরণ রায়ের 'বাংলা ছন্দে হসন্ত' প্রবন্ধ। বস্তুতঃ মামলাটা শুধু ৎ-এর নয়। সমস্যা আসলে অক্ষরবৃত্ত বা সাধুবাংলার ছন্দে সমাসবদ্ধ শব্দের পূর্বভাগস্থিত দিক্, হৃৎ প্রভৃতি হসন্ত অংশের মাত্রাপরিমাণ-নিরূপণ নিয়ে।

'নবছন্দ' প্রবন্ধের প্রথমাংশে এই হসন্তসমস্যার প্রসঙ্গটা সমাপ্ত করে

রবীন্দ্রনাথ লেখেন, 'এ তর্কটি এখানেই শেষ করে দেওয়া যাক'। বস্তুতঃ তৎকালে প্রবোধচন্দ্রের 'বাংলা অক্ষরবৃত্ত ছন্দের স্বরূপ' প্রবন্ধে (১৩৩৮ অগ্রহায়ণ) যে হসন্তসমস্যার উদ্‌ভব, রবীন্দ্রনাথের এই উক্তিতেই তার সমাপ্তি, একথা বললে অন্যায় হয় না।

সংস্কৃত-বাংলা ও প্রাকৃত-বাংলার ছন্দ

১৩৩৯ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে 'বিচিত্রা'য় প্রকাশিত 'ছন্দ-বিচার' ও 'কবির পুনশ্চ বক্তব্য' প্রকাশের পরে স্বরবৃত্ত বা প্রাকৃত-বাংলার ছন্দ নিয়ে যে বিতর্কের ঝড় ওঠে, সে কথা পূর্বেই বলা হয়েছে (পৃ ৩৯৬)। সে সময়ে প্রাকৃত-বাংলা ছন্দের রবীন্দ্রকৃত বিশ্লেষণপদ্ধতি সম্বন্ধে প্রতিকূল মত প্রকাশ পায় একাধিক সমালোচকের লেখাতেই। তাই রবীন্দ্রনাথ এ সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্যকে স্পষ্টতর করতে প্রয়াসী হন 'ছন্দ-বিতর্ক'-নামক প্রবন্ধে (পরিচয় ১৩৩৯ শ্রাবণ)। এই প্রবন্ধে তিনি প্রধানতঃ সাধুবাংলার ছন্দের সঙ্গে প্রাকৃতবাংলার ছন্দের পার্থক্যের কথাটাই আলোচনা করেন। এই দিকে নজর রেখেই এটির নূতন নামকরণ হল। 'ছন্দ' গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে এটি গৃহীত হয়নি। বর্তমান সংস্করণেই এটি প্রথম স্থান পেল। রচনাবলী-সংস্করণেও এটি গৃহীত হয়েছে এই নূতন নামেই।

গ্রন্থভুক্তির সময়ে প্রবন্ধটির মুখবন্ধটুকু বর্জিত হয়েছে আলোচ্য বিষয়ের সংহতিরক্ষার প্রয়োজনে। 'ছন্দ-বিতর্ক' নামটির মধ্যে যে ঐতিহাসিক উপলক্ষ্যের ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন আছে, উক্ত মুখবন্ধটুকুর মধ্যেও তাই প্রকাশ পেয়েছে স্পষ্টতর ভাষায়। তাই সেটুকুও এখানে উদ্‌ধৃত হল।—

"ছন্দ নিয়ে তর্ক যতই বেড়ে চলেছে ততই ওটা দুর্বোধ হয়ে উঠছে।

অন্তত আমার কথাটা যে বোঝাতে পারিনি তার প্রমাণের অভাব রইল না। বোধ হয় পারিভাষিকের ভিড়ের মধ্যে পড়ে আমার মাথার এবং কথার ঠিক ছিল না। ভেবেছিলেম হাল ছেড়ে দিয়ে চুপ করে থাকব। অভ্যাসদোষে পারলুম না। আর-একবার চেষ্টা করে দেখি।

আমার বলবার বিষয় প্রধানত এই ছিল যে, সংস্কৃত-বাংলা এবং প্রাকৃত-বাংলার গতিভঙ্গিতে একটা লয়ের তফাত আছে।"

এই প্রবন্ধপ্রকাশের পরের মাসেই 'বিচিত্রা'য় 'বাংলা স্বরবৃত্ত ছন্দের স্বরূপ' নামে এক প্রবন্ধে প্রবোধচন্দ্র প্রাকৃতবাংলার ছন্দ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের এই শেষ অভিমতের সঙ্গে মতৈক্য প্রকাশ করেন। সে-কথা 'কবির পুনশ্চ বক্তব্য' নিবন্ধটুকুর প্রসঙ্গে পূর্বেই যথাস্থানে বলা হয়েছে (পৃ ৩৯৭)।

ছন্দের মাত্রা

১৩৩৯ সালের বৈশাখ মাসে 'বিচিত্রা' পত্রিকায় সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় 'ছন্দের দ্বন্দ্ব'-নামক নিবন্ধে একটি বিতর্কের পূর্বাভাস দিয়ে বলেন, 'অদূর ভবিষ্যতে ছন্দের যে দ্বন্দ্বটি অনিবার্য মনে হচ্ছে তদ্‌বিষয়ে পাঠকচিত্তকে অবহিত রাখবার উদ্দেশ্যে এই ঘটনাটি প্রকাশ করলাম'। এ বিতর্কের সূত্রপাত হয় পরের মাসের বিচিত্রায় প্রবোধচন্দ্রের 'ছন্দ-বিচার' এবং রবীন্দ্রনাথের 'পুনশ্চ বক্তব্য' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে। তখন তর্কটা ছিল প্রধানতঃ স্বরবৃত্ত বা প্রাকৃতবাংলার ছন্দের প্রকৃতি নিয়ে। আষাঢ় মাসের বিচিত্রায় 'ছন্দের দ্বন্দ্ব (?)' নামে এক নিবন্ধে অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় প্রাকৃতবাংলার ছন্দ সম্বন্ধে নিজের বক্তব্য শেষ করে ছন্দ-বিতর্কটাকে প্রসঙ্গান্তরে পরিচালিত করেন। তিনি বলেন—

প্রসঙ্গক্রমে একটি প্রশ্ন উত্থাপন করিতে চাই। বাংলায় পাঁচ মাত্রা

ও চার মাত্রা মিলাইয়া অর্থাৎ নয় মাত্রা লইয়া পর্ব রচনা করা যায় কি ? সে বিষয়ে কেহ পরীক্ষা করিতে পারেন। নয় মাত্রার পর্বের ব্যবহার বাংলায় দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, অনেক সময় যাহাকে নয় মাত্রার পর্ব বলিয়া মনে হয় তাহা বাস্তবিক অন্য জিনিস। ছয় মাত্রার পর্বের সহিত একটি অপূর্ণ ছয় মাত্রার অর্থাৎ তিন মাত্রার একটি পর্ব যোগ করিয়া একটি চরণ রচিত হইতে পারে, কিন্তু তাহাকে নয় মাত্রার পর্ব বলা যাইবে না।...বাংলায় চার, পাঁচ, ছয়, সাত, আট ও দশ মাত্রার পর্ব আছে, নয় মাত্রার পর্বের ব্যবহার চলে কিনা পরীক্ষা করা উচিত।

—বিচিত্রা ১৩৩৯ আষাঢ়, পৃ ৭২৯

এই প্রশ্নের উত্তর দেন শৈলেন্দ্রকুমার মল্লিক 'বিচিত্রা' পত্রিকাতেই 'ছন্দ-রণ' নামে এক প্রবন্ধে। তিনি বলেন—

আমার মতে নয় মাত্রার কোনো পর্বই হইতে পারে না। একত্র নয় মাত্রা উচ্চারণ আমাদের জিহ্বাসঞ্চালন ও কণ্ঠধ্বনির প্রকৃতিবিরুদ্ধ। মাত্রাবৃত্ত ছন্দের দীর্ঘতম পর্বে সাত মাত্রা[১] পাওয়া যায়, যথা ৩ + ৪, তবে ছয় মাত্রাই বেশি দেখা যায়। নয় মাত্রার পর্ব রচনা করিতে গেলেই ছয় মাত্রার পর্বের দেড় পর্ব হইয়া পড়ে। অতএব মাত্রাবৃত্তে নয় মাত্রার পর্ব রচনা করিতে যাওয়া বিড়ম্বনামাত্র।...তথাপি নিরুৎসাহ না হইয়া আমি অমূল্যবাবুর নির্দেশ-অনুসারে একবার মাত্রাবৃত্ত পদ্ধতিতে যথাবুদ্ধি নয় মাত্রার পর্ব রচনা করিতে চেষ্টা করিলাম।—

ঝরিছে বরষা অঝোরে ×গুরু ছন্দ-গর্জন ;
কামিনীর দল লুটিল ×করি বৃন্ত বর্জন।

১ দীর্ঘতম পর্বের আয়তন-সম্পর্কে শৈলেন্দ্রকুমার ও অমূল্যধনের মতপার্থক্য লক্ষণীয়। দ্রষ্টব্য পৃ ৪০৫।

যূথী চঞ্চলা শিহরে, ×কাঁদে কেতকী কণ্টকে ;
বাদলের মেঘ-ছন্দে ×হায় তৃষিত মন ঠকে।...
×এ কবিতা-পর্বে আজি রাখিলাম নয় মাত্রা,
×নবতর ছন্দ-লোকে করিলাম মহাযাত্রা।

ঢেড়াচিহ্নিত পর্বগুলিতে অমূল্যবাবুর নির্দিষ্ট ২+৩+৪ এবং ৪+৩+২ সংকেত অনুসৃত হইয়াছে। ছন্দ কিছু হইয়াছে কিনা ছন্দরসিকই বলিতে পারেন।

—বিচিত্রা ১৩৩৯ শ্রাবণ, পৃ ১০৭

এই নয় মাত্রার পর্বরচনার প্রসঙ্গ থেকেই তৎকালীন ছন্দ-বিতর্কের দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয়। শৈলেন্দ্রকুমারের মন্তব্য প্রকাশের পরে রবীন্দ্রনাথও এই আলোচনায় যোগ দেন। ছন্দ-বিতর্কের এই দ্বিতীয় পর্বে রবীন্দ্রনাথের দুটি রচনা প্রকাশিত হয়। 'ছন্দ' গ্রন্থে এই দুটিই স্থান পায় 'ছন্দের মাত্রা' প্রবন্ধের দুই পর্যায়-রূপে। বর্তমান সংস্করণেও এই ব্যবস্থাই রক্ষিত হল।

অতঃপর এই 'ছন্দের মাত্রা' প্রবন্ধের দুই পর্যায়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া গেল যথাক্রমে।

প্রথম পর্যায়

'নবছন্দ' (দ্বিতীয়াংশ)

পূর্বে দেখেছি 'নবছন্দ' প্রবন্ধের প্রথমাংশে রবীন্দ্রনাথ 'উত্তরা'য় উত্থাপিত সাধুবাংলার ছন্দ সম্বন্ধে অনিলবরণ রায়ের প্রশ্নের উত্তর দেন। অতঃপর তিনি ওই প্রবন্ধেরই দ্বিতীয়াংশে অমূল্যধনের উত্থাপিত ও শৈলেন্দ্রকুমারের আলোচিত নয় মাত্রার পর্ব-সমস্যার মীমাংসায় অগ্রসর হন।

'নবছন্দ' প্রবন্ধের প্রথমাংশের ন্যায় তার দ্বিতীয়াংশেরও একটি মুখবন্ধ ছিল। 'ছন্দের মাত্রা' প্রবন্ধের প্রথম পর্যায়-রূপে গ্রন্থভুক্ত করার সময়ে ওই মুখবন্ধটুকু বর্জিত হয়। বর্তমান সংস্করণেও তাই করা হয়েছে। কিন্তু ওই মুখবন্ধটুকুর মধ্যেই এই প্রবন্ধাংশের উৎপত্তির ইতিহাস নিহিত রয়েছে। তাই ওই বর্জিত মুখবন্ধটুকু এখানে পাঠকের গোচর করা গেল।—

দেখলেম এ তর্কের প্রসঙ্গে বিচিত্রায় কোনো লেখক আভাস দিয়েছেন নয় মাত্রার ছন্দ বাংলাভাষায় অভূতপূর্ব এবং এই উপলক্ষ্যে তিনিই এই অভাব সদ্য পূরণ করলেন।

এ সম্বন্ধে আমার প্রথম বক্তব্য এই যে, ১৩২৪ সালের ভাদ্রমাসে সবুজপত্রে 'সংগীতের মুক্তি' এবং ঐ সালের চৈত্র মাসে 'ছন্দ' নাম দিয়ে আমি দুটি প্রবন্ধ লিখেছিলেম। যিনি নয় মাত্রার ছন্দে বিচিত্রায় শ্লোক পাঠিয়েছেন তিনি বোধ হয় সে দুটো লেখা পড়েননি কিংবা ভুলে গিয়েছেন।

—পরিচয় ১৩৩৯ কার্তিক, পৃ ১৭৭

বলা বাহুল্য, শৈলেন্দ্রকুমার মল্লিক এবং 'ছন্দ-রণ' প্রবন্ধে প্রকাশিত তাঁর পূর্বোদ্ধৃত নয়মাত্রা পর্বের শ্লোকগুলি এই মুখবন্ধটুকুর লক্ষ্য। বলা প্রয়োজন যে, বাংলায় নয়মাত্রা পর্বের অভাব পূরণ করা শৈলেন্দ্র-কুমারের অভিপ্রায় ছিল না। বস্তুতঃ, অমূল্যধনের নির্দেশমতে রচনা করলেও নয় মাত্রার পর্ব বাংলায় চলবে না, ছন্দরসিকদের কানের সায় পাবে না, একথা প্রমাণ করাই ছিল শৈলেন্দ্রকুমারের মনোগত অভিপ্রায়। আর, একথাও বলা প্রয়োজন যে, এই মুখবন্ধের দ্বিতীয়াংশটুকু শুধু শৈলেন্দ্রকুমার নয়, অমূল্যধনের প্রতিও সমভাবেই প্রযোজ্য।

প্রসঙ্গক্রমে বলা উচিত যে, শৈলেন্দ্রকুমারের মতে বাংলায় দীর্ঘতম

পর্বের মাত্রাসংখ্যা সাত, কিন্তু অমূল্যধনের মতে বাংলায় আট এবং দশ মাত্রার পর্বও আছে। এ ক্ষেত্রে শৈলেন্দ্রকুমারের মতই সমীচীন বলে মনে করি। অমূল্যধন আট ও দশ মাত্রার বিভাগকে 'পর্ব' বলেই মনে করেন। বস্তুতঃ আট ও দশ মাত্রার বিভাগ 'পর্ব' নয়, চার-চার ও চার-চার-দুই পর্বের সমাবেশে গঠিত 'পদ' মাত্র। অনেক স্থলে পর্বযতি লুপ্ত হয় বলে দুই বা আড়াই পর্বের যুক্ত রূপকেই দীর্ঘ পর্ব বলে মনে হয়। যেমন—

হে মোর দুর্ × । ভাগা দেশ ‖ যাদের ক × । রেছ অপ × । মান,

অপমানে | হতে হবে ‖ তাহাদের | সবার স × । মান।

এখানে প্রতিপংক্তিতেই আছে আট ও দশ মাত্রার দুই 'পদ'। অর্থাৎ পংক্তিগুলি দ্বিপদী। প্রথম পদে দুই 'পর্ব', দ্বিতীয় পদে আড়াই পর্ব। কিন্তু প্রথম পংক্তিতে তিনটি পর্বযতিই লুপ্ত, দ্বিতীয় পংক্তিতে শুধু শেষটি।

এ বিষয়ে মতপার্থক্য থাকলেও বাংলায় নয় মাত্রার পর্ব দেখা যায় না এবং ছয় মাত্রার দেড় পর্বকে নয় মাত্রার পর্ব বলা চলে না, এ বিষয়ে দুই জনই একমত। আর, এই দেড় পর্বের বিষয়ে উভয়ের মত রবীন্দ্রনাথের মত থেকে পৃথক্। 'আঁধার রজনী পোহাল'-কে গীতছন্দে কি মনে করা হয় জানি না, পঠিতছন্দে এটা যে অনেকের কণ্ঠেই দেড় পর্বের রূপ নেয় একথা স্বীকার্য। অমূল্যধন এবং শৈলেন্দ্রকুমারের বিশ্লেষণ তারই পরিচায়ক।

নয়মাত্রা পর্বের নানারকম দৃষ্টান্ত রচনা করে রবীন্দ্রনাথ যে-ভাবে সেগুলির বিশ্লেষণ করেছেন তা সব ক্ষেত্রেই ছান্দসিকদের সমর্থন লাভ করবে কিনা সন্দেহ। কেননা, ও-সব দৃষ্টান্তের অন্যরকম বিশ্লেষণ সম্ভব, হয়তো সমীচীনও। এগারো থেকে একুশ মাত্রা পর্যন্ত দীর্ঘতর ছন্দো-

বিভাগের যে-সব দৃষ্টান্ত তিনি দিয়েছেন, সে সম্বন্ধে একথা আরও বেশি প্রযোজ্য। এ স্থলে দৃষ্টান্তগুলির বিশ্লেষণ নিষ্প্রয়োজন।

এখানে শুধু এটুকু বলাই যথেষ্ট যে, অমূল্যধন ও শৈলেন্দ্রকুমারের বক্তব্য বিষয় ছিল নয় মাত্রার 'পর্ব', আর রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য বিষয় ছিল নয় মাত্রার 'চাল' (দ্রষ্টব্য 'চাল', পৃ ২৩৭-৩৮)। 'চাল' মানে পংক্তি। নয় মাত্রার চালের প্রসঙ্গ শেষ করে রবীন্দ্রনাথ 'এগারো মাত্রার ছন্দ' থেকে 'একুশ মাত্রার ছন্দ' পর্যন্ত বিভিন্ন আয়তনের পংক্তির দৃষ্টান্ত দিয়েছেন, পর্বের নয়। দুই পক্ষ দুই পরিভাষায় অর্থাৎ দুই ভাষায় কথা বলেছেন। ফলে, মূলপ্রশ্নের সদুত্তর পাওয়া সম্ভব হয়নি।

দ্বিতীয় পর্যায়

'ছন্দের মাত্রা'

'নবছন্দ' প্রবন্ধের দ্বিতীয়াংশে রবীন্দ্রনাথ নয়মাত্রা চালের ছন্দ সম্বন্ধে যে অভিমত প্রকাশ করেন, অমূল্যধন স্বভাবতঃই তাতে সন্তুষ্ট হতে পারেননি। কেননা, অমূল্যধনের প্রশ্ন ছিল নয় মাত্রার 'পর্ব' বাংলায় হতে পারে কিনা। রবীন্দ্রনাথের আলোচনায় সে প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়নি। তাই অমূল্যধন 'পরিচয়' পত্রিকায় (১৩৪০ কার্তিক) 'নয় মাত্রার ছন্দ' নামে একটি প্রবন্ধ লিখে নিজের প্রশ্নটাকে স্পষ্টতর করতে প্রয়াসী হন। তিনি প্রবন্ধের সূত্রপাত করেন রবীন্দ্রনাথের 'নবছন্দ' প্রবন্ধের দ্বিতীয়াংশ সম্পর্কে নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশ করে।—

তাঁহার প্রবন্ধটি পড়িয়া মনে হইল তিনি ঠিক আমার প্রশ্নটির উত্তর দিবার চেষ্টা করেন নাই। নয় মাত্রার 'চরণ' লইয়া যে ছন্দোবদ্ধ হয়, তিনি তাহারই উদাহরণ দিয়াছেন, কিন্তু নয় মাত্রার 'পর্ব' লইয়া

ছন্দোবদ্ধ হয় কিনা তাহা বুঝাইবার বা দেখাইবার চেষ্টা করেন নাই। তিনি যে পর্বের কথা চিন্তা না করিয়া চরণের কথাই চিন্তা করিতেছিলেন তাহা ঐ প্রবন্ধের শেষ অংশ হইতেই বেশ বোঝা যায়।

—পরিচয় ১৩৪০ কার্তিক, পৃ ১৭৩-৭৪

অতঃপর অমূল্যধন 'আঁধার রজনী পোহাল' ইত্যাদি রচনাটির বিশ্লেষণ যে-ভাবে করেন, তারই প্রত্যুত্তরে 'উদয়ন' পত্রিকায় (১৩৪১ জ্যৈষ্ঠ) প্রকাশিত হয় রবীন্দ্রনাথের 'ছন্দের মাত্রা' প্রবন্ধ। 'ছন্দ' গ্রন্থে গ্রহণের সময় এর মুখবন্ধটুকু বর্জিত হয়। বর্তমান সংস্করণেও তাই হয়েছে। বর্জিত মুখবন্ধটুকু এই।—

বেশি দিনের কথা নয় তখন বাংলাদেশে শব্দতত্ত্ব, ছন্দতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে কেউ দৃষ্টিক্ষেপ বা হস্তক্ষেপ আরম্ভ করেননি। সেদিনকার সেই শাসনশঙ্কাহীন প্রশ্রয়ের দিনে এইসকল তত্ত্ববিচারে সতর্কতার তাগিদ ছিল না। যদৃচ্ছাক্রমে ভুল কথা ও কাঁচা কথা বলবার সেই ছিল সত্যযুগ। হঠাৎ দেখি রচনালীলার আরামের দিন গেছে। এখন নিজের খেয়ালে কোনো একটা মত যদি খাড়া করি, সেই মুহূর্তে লেখনীদণ্ড চালনায় তাকে ভূমিসাৎ করবার মতো নির্মম লোকের অভাব আজ আর নেই। ইতিমধ্যে শৈথিল্যের অভ্যাস পাকা হয়ে গেছে। তাই হয়তো তত্ত্বালোচনার আসরে নিজের অগোচরেই কোনো ফাঁক দিয়ে ভুল বেরিয়ে পড়ে।

অল্প কয়েক দিন আগে নয় মাত্রার ছন্দ বানিয়েছি বলে দর্প করেছিলুম। আমার বহু পূর্বের একটা লেখা ছিল—

আঁধার রজনী পোহাল
জগৎ পূরিল পুলকে।
বিমল প্রভাত-কিরণে
মিলিল দ্যুলোক ভূলোকে।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল গানটি নয় মাত্রার ছন্দে রচিত। আমার এই নিঃসংশয় স্পর্ধাটা হঠাৎ গেল যেন চড়ায় ঠেকে।

—উদয়ন ১৩৪১, জ্যৈষ্ঠ, পৃ ১৪১

'ছন্দ' গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে এই মুখবন্ধটুকু বর্জন করে তৎপরিবর্তে একটি নূতন বাক্য রচনা করে তার দ্বারাই 'ছন্দের মাত্রা' প্রবন্ধের প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করা হয়েছিল।

এই দীর্ঘ প্রবন্ধেও অমূল্যধনের প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়নি। তার কারণ একাধিক। বোধ করি অনেক স্থলেই রবীন্দ্রনাথের শ্রুতি নিয়ন্ত্রিত হয়েছে গীতছন্দের তালের দ্বারা, পঠিতছন্দের যতি ও প্রস্বরের দ্বারা নয়। 'আঁধার রজনী পোহাল', এই গানের লাইনটার ছন্দ-বিশ্লেষণ তার অন্যতম প্রমাণ। দ্বিতীয়তঃ 'পর্ব' শব্দের বিশিষ্ট পারিভাষিক অর্থ রবীন্দ্রনাথের কাছে স্পষ্ট হয়নি। এটাও উভয়ের মতপার্থক্যের একটা কারণ। তৃতীয়তঃ, রবীন্দ্রনাথ নিজে যে পরিভাষা ব্যবহার করেছেন তাও স্থিরার্থক নয়। তার একটি দৃষ্টান্ত 'কলা'। আঁধার রজনী পোহাল, মাথা তুলে তুমি, সকল বেলা কাটিয়া গেল, অন্তর তার কী বলিতে চায়, বারে বারে যায়— এই দৃষ্টান্তগুলির বিশ্লেষণের প্রতি মনোযোগ করলেই দেখা যাবে 'কলা' শব্দটা কখনও ব্যবহৃত হয়েছে পর্ব অর্থে, কখনও উপপর্ব অর্থে (পৃ ২৩৫-৩৬)। রবীন্দ্রনাথের মতে 'বারে বারে যায় | চলিয়া' ইত্যাদি শ্লোকটির প্রত্যেক পদে 'দুই কলা এবং কলাগুলি ত্রৈমাত্রিক'। এই উক্তিটা বিভ্রান্তিকর। 'দুই কলা' কথায় মনে হয় প্রথম কলা ছয়মাত্রার, দ্বিতীয় কলা তিনমাত্রার। 'কলাগুলি ত্রৈমাত্রিক' কথায় মনে হয় প্রত্যেক কলায় তিন মাত্রা। তা হলে তো এই পদটাকে তিন কলায় ভাগ করতে হয়, দুই কলায় নয়। যদি মানে হয় ছয় মাত্রার প্রথম কলাটি তিন মাত্রার

দুই ভাগে বিভাজ্য, তা হলে প্রশ্ন ওঠে ওই ত্রৈমাত্রিক বিভাগগুলির নাম কি ?

এরকম আরও একটা প্রশ্ন এই। 'মেঘ ডাকে গম্ভীর গরজনে' ইত্যাদি বারমাত্রার শ্লোকটি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেন—"আবৃত্তিকালে পদান্তের পূর্বে কোনো যতিই দিইনি, অর্থাৎ বারমাত্রা একটি ঘনিষ্ঠ গুচ্ছের মতোই হয়েছে। এই পদগুলিকে বারমাত্রার পদ বলবার কোনো বাধা আছে বলে আমি কল্পনা করতে পারিনে।...প্রত্যেক পদে তিন কলা, প্রত্যেক কলায় চার মাত্রা।" এই প্রবন্ধে 'পদ' শব্দটি অনেক স্থলেই ব্যবহৃত হয়েছে পংক্তি অর্থাৎ পূর্ণযতির বিভাগ অর্থে। এখানে 'পদ' কথার মানে পংক্তির বিভাগ। এই শ্লোকটিতে আছে দুই পংক্তি এবং প্রত্যেকটি পংক্তিই ত্রিপদী। তাঁর মতে এর প্রত্যেক পদে আছে তিনটি করে চারমাত্রার 'কলা' অর্থাৎ পর্ব। কিন্তু তিনি এই পদগুলিকে তিনটি কলায় বিচ্ছিন্ন করলেন কি উপায়ে, যদি পদান্তের পূর্বে কোথাও 'কোনো যতিই' না থাকে ? 'যতির্বিচ্ছেদঃ'। আমাদের উচ্চারণ তো একটানা স্রোতের মতো চলে না। তার মাঝে মাঝেই ছেদ পড়ে। এই ছেদেরই নাম যতি। এই পদগুলিতেও ছেদ বা যতি আছেই। নতুবা উক্ত 'কলা'-বিভাগই সম্ভব হত না। আসল কথা এই যে, রবীন্দ্রনাথ পদান্তযতিকেই যতি বলে স্বীকার করেছেন, কলান্তযতিকে করেননি ; কারণ এই কলাযতি অতি ক্ষীণ প্রকৃতির, পদযতির মতো সহজগ্রাহ্য নয়।

'আঁধার রজনী পোহাল' ইত্যাদি শ্লোকটির রবীন্দ্রস্বীকৃত বিশ্লেষণও অনুরূপভাবেই গ্রহণীয়। তাঁর মতে এই নয় মাত্রা একটি যতিহীন 'ঘনিষ্ঠ গুচ্ছের মতোই' উচ্চার্য। রবীন্দ্রনাথের উচ্চারণপদ্ধতি অনুসরণ করলে বলতে হয়, এই গুচ্ছটি হচ্ছে আসলে একটি নয়মাত্রার পর্ব, তিনটি তিনমাত্রার উপপর্ব নিয়ে গঠিত। নয়মাত্রার পরে একটি পর্বযতি এবং

প্রত্যেক তিনমাত্রার পরে একটি করে অতিক্ষীণ উপপর্বযতি বা উপযতি। পক্ষান্তরে 'মেঘ ডাকে গম্ভীর গরজনে' ইত্যাদি শ্লোকে বারমাত্রার পরে পদযতি, প্রত্যেক চারমাত্রার পরে অতিক্ষীণ পর্বযতি এবং দুইমাত্রার পরে ক্ষীণতর উপপর্বযতি বা উপযতি। দুটি দৃষ্টান্তের ছন্দে এই পার্থক্য।

অমূল্যধন কিন্তু 'আঁধার রজনী পোহাল' ইত্যাদিকে অন্যভাবে বিশ্লেষণের পক্ষপাতী। তাঁর মতে এই শ্লোকটিতে ছয়মাত্রার পর্বই মূলপর্ব। তিনি বলেন—

৩+৩+৩ এই সংকেতে নয় মাত্রার ছন্দ রচনা করিতে গেলে সাধারণতঃ তাহা (৩+৩)+৩ হইয়া দাঁড়ায়; অর্থাৎ যাহা নয়মাত্রার পর্ব বলিতে চাই তাহা ছয়মাত্রার একটি মূলপর্ব এবং তিনমাত্রার একটি অপূর্ণপর্বের সমষ্টি হইয়া দাঁড়ায়।

—পরিচয় ১৩৪০ কার্তিক

শৈলেন্দ্রকুমারের ভাষায় এরকম নয়মাত্রার গুচ্ছ আসলে ছয়মাত্রা পর্বের দেড় পর্ব মাত্র। রবীন্দ্রনাথ বলেন কেউ যদি ইচ্ছা করেন তবে এরকম নয়মাত্রাকে ছয়মাত্রার দেড় পর্ব-রূপে পড়তে পারেন, তাকে বাধা দেওয়া যায় না; কিন্তু এক্ষেত্রে সেটা কবির অভিপ্রেত নয়, কবি এই শ্লোকের নয়মাত্রার বিভাগকে তিনটি ত্রৈমাত্রিক 'কলা' বা উপপর্ব নিয়ে গঠিত 'একটি ঘনিষ্ঠ গুচ্ছের মতোই' পড়ে থাকেন। এ বিষয়ে তাঁর শেষ কথা এই (পৃ ৯৯)।—

কোন্ ছত্র কী রকম ভাগ করে পড়তে হবে, এ নিয়ে মতান্তর হওয়া অসম্ভব নয়।...কবির কল্পনা এবং পাঠকের রুচিতে যদি অনৈক্য হয় তবে কোনো আইন নেই যা নিয়ে নালিশ চলতে পারে। বর্তমান প্রসঙ্গে আমার বক্তব্য এই যে, আমি যখন স্পষ্টতই আমার কোনো কাব্যের

ছন্দকে নয়মাত্রার বলছি তখন সেটা অনুসরণ করাই বিহিত। হতে পারে তাতে কানের তৃপ্তি হবে না। না যদি হয় তবে সে দায় কবির।

—উদয়ন ১৩৪১ জ্যৈষ্ঠ, পৃ ১৪৪

এ সম্বন্ধে মতভেদের কোনো অবকাশ আছে বলে মনে করি না। কবির পঠনপদ্ধতি স্বীকার করে নিলে নয়মাত্রার পর্বও স্বীকার্য এবং 'আঁধার রজনী পোহাল' ইত্যাদি রচনাটিও নয়মাত্রা পর্বের ভঙ্গিতেই পঠনীয়।

তবে একথাও মানতে হবে যে, নয়মাত্রার পর্ব সাধারণতঃ দেখা যায় না, বিশেষতঃ পঠনীয় অর্থাৎ অ-গেয় কবিতায়। এসব স্থলে সাধারণতঃ ছয় মাত্রার পরে একটু হাঁফ ছাড়ার অর্থাৎ পর্বযতিস্থাপনের প্রবণতা দেখা যায়।

'ছন্দের মাত্রা' প্রবন্ধের শেষ দিকে তর্কটা পরিচালিত হয় আর-এক প্রশ্নের দিকে। ছন্দে পদ (পূর্ণযতির বিভাগ) প্রধান, না কলা (অর্থাৎ পর্ব বা লঘুযতির বিভাগ) প্রধান? এ সমস্যা অবশ্য কঠিন নয়। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের শেষ কথাও সর্বতোভাবেই স্বীকার্য। কথাটা এই।—"ছন্দের স্বরূপনির্ণয় করতে হলে সমগ্রের মাত্রাসংখ্যা, তার কলাসংখ্যা ও কলাগুলির মাত্রাসংখ্যা জানা আবশ্যক।" এখানে 'সমগ্র' মানে পূর্ণযতির বিভাগ বা পংক্তি এবং 'কলা' মানে পর্ব।

সর্বশেষে বলা প্রয়োজন যে, ১০৩ পৃষ্ঠায় 'অন্তর তার কী বলিতে চায়' ইত্যাদি শ্লোকটির মাত্রাগণনায় একটু ভুল হয়েছে। এর সমগ্র পদের (অর্থাৎ পংক্তির) মাত্রাসংখ্যা 'সতর' নয়, 'উনিশ'। 'উদয়ন' পত্রিকায় প্রথমপ্রকাশ-কালে এবং 'ছন্দ' গ্রন্থে গ্রহণকালেও এই ভুলটি ছিল। বর্তমান সংস্করণে এই ভুলটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করার যথার্থ স্থান ১০৩ পৃষ্ঠার পাদটীকা।

ছন্দ-বিতর্কের পালাটা এখানেই শেষ হল বলা চলে। তার আরম্ভ ১৩৩৮ সালের অগ্রহায়ণ মাসে 'বিচিত্রা' পত্রিকায়, আর তার সমাপ্তি ১৩৪১ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে 'উদয়ন' পত্রিকায়। বিতর্কটা অবশ্য আরও দীর্ঘকাল চলেছিল নানা পত্রপত্রিকাকে আশ্রয় করে। কিন্তু 'ছন্দের মাত্রা' প্রবন্ধ প্রকাশের পরে রবীন্দ্রনাথ আর এই বিতর্কের সঙ্গে যুক্ত থাকেননি।

এই বিতর্কের ইতিহাস অনুসরণের সৌকর্যার্থে নীচে তালিকা-আকারে এই বিতর্কযুগের প্রবন্ধাবলীর কালানুক্রমিক পরিচয় দেওয়া গেল। এটি অবশ্য তৎকালপ্রকাশিত সমস্ত ছন্দপ্রবন্ধের সম্পূর্ণ তালিকা নয়; 'ছন্দ' গ্রন্থ অনুসরণের পক্ষে অনাবশ্যক অনেক প্রবন্ধের নামই এই তালিকা থেকে বর্জিত হয়েছে। তবে এই বিতর্ক-ইতিহাসের সম্পূর্ণতার খাতিরে এই তালিকায় এমন কিছু-কিছু প্রবন্ধের নাম গৃহীত হল যা তৎকালীন বিতর্কিত বিষয়ের অনুধাবনের পক্ষে বিশেষ আবশ্যক এবং 'ছন্দ' গ্রন্থের বিষয়বস্তুর পূর্ণপরিচয়লাভের পক্ষেও কিছু পরিমাণে সহায়ক।—

প্রবোধচন্দ্র	বাংলা অক্ষরবৃত্ত ছন্দের স্বরূপ	বিচিত্রা ১৩৩৮ অগ্রহায়ণ
রবীন্দ্রনাথ	বাংলা ছন্দ	বিচিত্রা ১৩৩৮ পৌষ
প্রবোধচন্দ্র	ছন্দ-জিজ্ঞাসা : প্রথম পর্ব	বিচিত্রা ১৩৩৮ মাঘ
রবীন্দ্রনাথ	ছন্দের হসন্ত হলন্ত	পরিচয় ১৩৩৮ মাঘ
প্রবোধচন্দ্র	ছন্দ-জিজ্ঞাসা : দ্বিতীয় পর্ব	বিচিত্রা ১৩৩৮ ফাল্গুন
মোহিতলাল	বাংলা ছন্দে প্রবোধচন্দ্রোদয়	শনিবারের চিঠি ১৩৩৮ ফাল্গুন
প্রবোধচন্দ্র	ছন্দ-জিজ্ঞাসা : তৃতীয় পর্ব	বিচিত্রা ১৩৩৯ বৈশাখ
উপেন্দ্রনাথ	ছন্দের দ্বন্দ্ব	বিচিত্রা ১৩৩৯ বৈশাখ

দিলীপকুমার	পাঠকগোষ্ঠী[১]	পরিচয় ১৩৩৯ বৈশাখ
প্রবোধচন্দ্র	ছন্দ-বিচার	বিচিত্রা ১৩৩৯ জ্যৈষ্ঠ
রবীন্দ্রনাথ	কবির পুনশ্চ বক্তব্য	বিচিত্রা ১৩৩৯ জ্যৈষ্ঠ
অমূল্যধন	ছন্দের দ্বন্দ্ব (?)	বিচিত্রা ১৩৩৯ আষাঢ়
শৈলেন্দ্রকুমার	ছন্দ-ধন্ধ	বিচিত্রা ১৩৩৯ আষাঢ়
শৈলেন্দ্রকুমার	ছন্দ-রণ	বিচিত্রা ১৩৩৯ শ্রাবণ
রবীন্দ্রনাথ	ছন্দ-বিতর্ক	পরিচয় ১৩৩৯ শ্রাবণ
অনিলবরণ	বাংলা ছন্দে হসন্ত	উত্তরা ১৩৩৯ শ্রাবণ
প্রবোধচন্দ্র	বাংলা স্বরবৃত্ত ছন্দের স্বরূপ	বিচিত্রা ১৩৩৯ ভাদ্র
অমূল্যধন	ছন্দ-ধন্ধের নিরসন	বিচিত্রা ১৩৩৯ আশ্বিন
রবীন্দ্রনাথ	নবছন্দ	পরিচয় ১৩৩৯ কার্তিক
দিলীপকুমার	বাংলা ছন্দ ও প্রবোধচন্দ্র	বিচিত্রা ১৩৩৯ পৌষ
শৈলেন্দ্রকুমার	ছন্দস্‌সূত্রগ্রন্থি	বিচিত্রা ১৩৩৯ মাঘ
অমূল্যধন	বাংলা ছন্দ ও দিলীপকুমার	বিচিত্রা ১৩৩৯ ফাল্গুন
রবীন্দ্রনাথ	সংস্কৃত কাব্যের অনুবাদ	উদয়ন ১৩৪০ জ্যৈষ্ঠ
অমূল্যধন	নয় মাত্রার ছন্দ	পরিচয় ১৩৪০ কার্তিক
রবীন্দ্রনাথ	ছন্দ	উদয়ন ১৩৪১ বৈশাখ
রবীন্দ্রনাথ	গদ্যছন্দ	বঙ্গশ্রী ১৩৪১ বৈশাখ
রবীন্দ্রনাথ	ছন্দের মাত্রা	উদয়ন ১৩৪১ জ্যৈষ্ঠ
প্রবোধচন্দ্র	বাংলা কবিতায় সংস্কৃত ছন্দ	ভারতবর্ষ ১৩৪১ অগ্রহায়ণ

১৩৪১ সালের বৈশাখ মাসে প্রকাশিত 'ছন্দ' ও 'গদ্যছন্দ' -নামক প্রবন্ধ-দুটি এই বিতর্কযুগের অন্তর্ভুক্ত হলেও কোনো বিতর্কের সঙ্গে যুক্ত নয়।

১ 'পাঠকগোষ্ঠী' বিভাগে রবীন্দ্রনাথের 'ছন্দের হসন্ত হলন্ত' সম্বন্ধে সম্পাদকসমীপে দিলীপকুমারের পত্র।

'ছন্দ' গ্রন্থের প্রথম মুদ্রণ, রচনাবলী-সংস্করণ ও বর্তমান সংস্করণে 'ছন্দের মাত্রা' প্রবন্ধের দুই পর্যায়েরই পাঠে কোনো প্রভেদ নেই।

রবীন্দ্রসদনে 'নবছন্দ' (অর্থাৎ 'ছন্দের হসন্ত হলন্ত' তৃতীয় পর্যায় ও 'ছন্দের মাত্রা' প্রথম পর্যায়) প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপি আছে। ৩২-সংখ্যক পাণ্ডুলিপি, পৃ ১-১২। পাণ্ডুলিপিতে প্রবন্ধের নাম নেই, রচনার তারিখ ১৯৩২ জুলাই ৩০। 'ছন্দের মাত্রা' প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপিও আছে রবীন্দ্রসদনে। ৩-সংখ্যক পাণ্ডুলিপি, পৃ ১-২৬ এবং ৩৬-৩৭। পাণ্ডুলিপিতে প্রবন্ধের নাম আছে 'ছন্দের মাত্রা', কিন্তু রচনার তারিখ নেই।

ছন্দের প্রকৃতি

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠিত

১৩৩৯ সালের কার্তিক মাসে 'নবছন্দ' প্রকাশের পরে প্রায় দেড় বৎসর কাল রবীন্দ্রনাথের ছন্দ-বিষয়ক আর কোনো প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়নি। কিন্তু বাংলা সাহিত্যে তখনও ছন্দের আলোচনা চলছে প্রবলভাবেই। এই আলোচনায় যোগ না দিলেও রবীন্দ্রনাথ তখনও এ বিষয়ে উদাসীন ছিলেন না। তার কিছু প্রমাণ আছে তাঁর তৎকালীন ছন্দ-পরীক্ষণের মধ্যে। এই পরীক্ষণের পরিচয় পাওয়া যায় 'পরিশেষ' (১৩৩৯ ভাদ্র) এবং 'পুনশ্চ' (১৩৩৯ আশ্বিন) কাব্যের অনেকগুলি রচনায়। শুধু পরীক্ষণ নয়, ছন্দ-বিশ্লেষণের প্রতিও যে তিনি উদাসীন ছিলেন না, তার প্রমাণ আছে সেই সময়কার ইতিহাসে। তৎকালীন 'বিশ্বভারতী নিউজ' পত্রিকার একটি সংবাদ এই।—

Gurudev is speaking on Bengali Prosody on Thursday evenings. The first two lectures took place on the 20th and 27th July last.

—*Visva-Bharati News, 1933 August, p. 10*

বিশ্বভারতীতে কথিত এই যে ছন্দ-বক্তৃতামালা[১], তার পরিণতি ঘটে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠিত ছন্দপ্রবন্ধ-রচনায়। প্রবন্ধটি পঠিত হয় ১৯৩৩ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর তারিখে।[২]—

Dr. Rabindranath Tagore will deliver his next lecture as the University Professor of Bengali, in the Senate Hall, College Square today at 5 P. M. The lecture will deal with Bengali Prosody.

—*The Statesman, 1933 September 16*

এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে, রবীন্দ্রনাথ ১৯৩২ সালের পয়লা অগস্ট থেকে দুই বৎসরের জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা-সাহিত্যের অধ্যাপক-রূপে কাজ করেছিলেন।[৩] বাংলার অধ্যাপক-রূপে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে-কয়টি প্রবন্ধ[৪] পাঠ করেছিলেন,

১ দ্রষ্টব্য প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়-প্রণীত 'রবীন্দ্রজীবনী' তৃতীয় খণ্ড (১৩৬৮ অগ্রহায়ণ), পৃ ৪৮২।

২ দ্রষ্টব্য *Visva-Bharati News*, 1933 October-November, p 26; পূর্বোক্ত 'রবীন্দ্রজীবনী' তৃতীয় খণ্ড (১৩৬৮), পৃ ৪৮৭ এবং প্রমথ চৌধুরীকে লিখিত ১১৩-সংখ্যক পত্র—'চিঠিপত্র' পঞ্চম খণ্ড (১৩৫২ পৌষ), পৃ ২৯৮।

৩ দ্রষ্টব্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেট সভার ১৯৩২ জুলাই ১৫ তারিখের অধিবেশনের কার্যবিবরণ, বিষয়সংখ্যা ৭০ ও সেনেট-সভার ১৯৩২ জুলাই ২৩ তারিখের অধিবেশনের কার্যবিবরণ, বিষয়সংখ্যা ১; এবং পূর্বোক্ত রবীন্দ্রজীবনী তৃতীয় খণ্ড (১৩৬৮); পৃ ৪৩৮।

৪ বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক-রূপে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই কয়টি প্রবন্ধ পাঠ করেন— বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ (১৯৩২ ডিসেম্বর), শিক্ষার বিকিরণ (১৯৩৩ ফেব্রুআরি), ছন্দ (১৯৩৩ সেপ্টেম্বর ১৬), গদ্য-ছন্দ (তারিখ অজ্ঞাত), সাহিত্যতত্ত্ব (১৯৩৪ ফেব্রুআরি ৮) এবং সাহিত্যের তাৎপর্য (১৯৩৪ জুলাই ১৬)। 'মানুষের ধর্ম' নামে তাঁর কমলা-বক্তৃতামালাও পঠিত হয় এই সময়েই— ১৯৩৩ জানুআরি ১৬, ১৮ ও ২০ তারিখে।

১৯৩৩ সালের ১৬ সেপ্‌টেম্বর তারিখে পঠিত এই ছন্দের প্রবন্ধটি তারই অন্যতম।

অতঃপর এই প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় 'উদয়ন' পত্রিকায় ১৩৪১ সালের বৈশাখ-সংখ্যায়। পত্রিকায় প্রকাশকালে প্রবন্ধটির নাম ছিল 'ছন্দ'। 'ছন্দ' গ্রন্থে গ্রহণকালে প্রবন্ধটির নূতন নামকরণ প্রয়োজন হয়। তখন এটিকে নাম দেওয়া হয় 'বাংলা ছন্দের প্রকৃতি'। বাহুল্যবোধে বর্তমান সংস্করণে 'বাংলা' বিশেষণটি বর্জিত হয়েছে।

'উদয়ন' পত্রিকায় তথা প্রথম সংস্করণে এই প্রবন্ধটি বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত-করা ছিল না। অর্থগ্রহণের সৌকর্যার্থে বর্তমান সংস্করণে এটিকে চারটি বিভাগে বিভক্ত করা হল। প্রথম সংস্করণে এর বিভিন্ন বিভাগে যে-সব পরিবর্তন করা হয়েছিল, নীচে যথাক্রমে তার পরিচয় দেওয়া গেল।

অন্যান্য কোনো কোনো প্রবন্ধের ন্যায় এই প্রবন্ধেরও মুখবন্ধটি গ্রন্থভুক্তিকালে বর্জিত হয়। এই সংস্করণেও তাই হয়েছে। সম্পূর্ণতা রক্ষার প্রয়োজনে 'উদয়ন' থেকে মুখবন্ধটি এখানে তুলে দেওয়া গেল।—

"শিব ছিলেন নিশ্চেষ্ট নিষ্ক্রিয়, উমা তাঁর স্তব্ধতাকে দিলেন নাড়িয়ে, সেই মিলন থেকে জন্মালেন স্বর্গজয়ী কুমার।

'বিশ্বে আছে ভার পদার্থ, সেটা স্তব্ধ; আর আছে বেগ, সেটা চলিষ্ণু। এদের শুভপরিণয় থেকে জন্মায় ছন্দ; এই ছন্দ রূপবান্, গতিশীল।"

এই মুখবন্ধবর্জন ছাড়া প্রথম সংস্করণে এই প্রথম বিভাগে আর কোনো পরিবর্তন করা হয়নি।

দ্বিতীয় বিভাগটিকে প্রথম সংস্করণে মূলপ্রবন্ধ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ও কিছু পরিবর্তিত করে 'পদ্যছন্দ' নামে সংকলন করা হয়েছিল গ্রন্থশেষের 'মোটকথা' অধ্যায়ে। রচনাবলী-সংস্করণেও তাই করা

হয়েছে। বর্তমান সংস্করণে এই বিভাগটিকে 'উদয়নে' প্রকাশিত প্রবন্ধের অনুসরণে যথাস্থানেই স্থাপন করা গেল। প্রথম সংস্করণে এই বিভাগটিতে যে-সব পরিবর্তন করা হয়েছিল, নীচে তার নির্দেশ দেওয়া গেল।

প্রথম সংস্করণে এই দ্বিতীয় বিভাগের মুখবন্ধ (বর্তমান সংস্করণে বন্ধনীবদ্ধ) -অংশটুকু বর্জিত হয়েছিল।

'সুনিবিড় শ্যামলতা উঠিয়াছে জেগে' ইত্যাদি দৃষ্টান্তটির (পৃ ১১৯) পরবর্তী অনুচ্ছেদের প্রথম তিনটি বাক্য ('ছন্দের দুটি জিনিস…অংশ-যোজনায়') প্রথম সংস্করণে বর্জিত হয়েছিল এবং তার স্থলে নূতন যোজনা করা হয়েছিল নিম্নলিখিত অংশটি।—

"অনেকগুলি ছন্দ আছে যাতে খানিকটা করে বড়ো মাত্রাকে একটি করে ছোটো মাত্রা দিয়ে বাধা দেবার কায়দা দেখা যায়। দশমাত্রার ছন্দ তার দৃষ্টান্ত। এর ভাগ— আট+দুই, অথবা, চার+চার+দুই।

মোর পানে | চাহ মুখ | তুলি |
পরশিব | চরণের | ধূলি |

ছয়মাত্রার ছন্দেও এরূপ বড়ো-ছোটোর ভাগ চলে। সে ভাগ— ছয়+দুই, অথবা, তিন+তিন+দুই। যেমন—

আঁখিতে | মিলিল | আঁখি |
হাসিল | বদন | ঢাকি |
মরম-বারতা শরমে মরিল
কিছু না রহিল বাকি।"

১২০-২১ এবং ১২২-২৪ পৃষ্ঠার বন্ধনীবদ্ধ দুটি অংশও প্রথম সংস্করণে বর্জিত হয়েছিল। কিন্তু এই দুটি অংশের ছন্দোগত তথা ঐতিহাসিক তথ্যগত গুরুত্ব কম নয়।

'ছন্দের প্রকৃতি' প্রবন্ধের এই দ্বিতীয় বিভাগে 'দুইমাত্রামূলক' ও

'তিনমাত্রামূলক' ছন্দের পার্থক্য সম্বন্ধে আলোচনা আছে দুই জায়গায়—১২১ পৃষ্ঠার একটি অংশে ('তিন-তিন মাত্রায় যার গ্রন্থিযোজনা··· কারণ পয়ার স্থিতিস্থাপক') এবং ১২৪-২৫ পৃষ্ঠার একটি অংশে ('যেমন দুইমাত্রামূলক পয়ার··· কারুণ্যে উঠে ভরিয়া')। প্রথম সংস্করণে এই দুই অংশের মধ্যবর্তী বক্তব্যটুকু বর্জিত এবং উক্ত দ্বিতীয় অংশটুকু প্রথম অংশের পূর্বে স্থাপিত হয়েছিল। বর্তমান সংস্করণে উদয়নের পাঠক্রমই রক্ষিত হল। এ ক্ষেত্রে রচনাবলী-সংস্করণে প্রথম সংস্করণের পাঠক্রম অনুসৃত হয়েছে।

তৃতীয় বিভাগের তৃতীয় অনুচ্ছেদের পরে ও চতুর্থ অনুচ্ছেদের পূর্বে প্রাকৃতবাংলার গদ্য সম্বন্ধে কিছু দীর্ঘ একটা মন্তব্য ছিল। 'ছন্দ' গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে এই অংশটা বর্জিত হয়। বিষয়টা প্রত্যক্ষতঃ ছন্দ-বিষয়ক নয় বলে বর্তমান সংস্করণেও সেটা গৃহীত হয়নি। বক্তব্যটা ছন্দোগত না হলেও ভাষারীতি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের অভিমতের গুরুত্ব-বিবেচনায় ওই বর্জিত অংশটুকু এখানে তুলে দেওয়া গেল।—

প্রাকৃতবাংলার গদ্যের প্রতি বিশেষভাবে কান দিয়ে দেখলে বুঝব সাধুরীতির বাংলার থেকে তার সুরের তফাত কতখানি। একটা ঝড়ের বর্ণনা করা যাক,—একটু কলাও জায়গা দেব, যাতে সে খেলতে পারে। শ্রোতার ধৈর্যচ্যুতি না হয় এই কামনা করি।

মেঘে মেঘে লাগল ঠেলাঠেলি, সূর্যাস্ত-আকাশের সোনার পাঁচিল ডিঙিয়ে ব্যস্তবেগে বেরিয়ে পড়ল মেঘের ভিড়,—যেন ইন্দ্রলোকের আগুন-লাগা হাতিশালা থেকে ঐরাবতের কালো কালো বাচ্ছাগুলো ছুটছে গাঁগাঃ শব্দে শুঁড় আছড়িয়ে। ছেঁড়া-ছেঁড়া মেঘের গায়ে গায়ে দগ্‌দগ্‌ করছে লাল আলো, যেন ছিটকে-পড়া রক্ত। বিদ্যুৎ লাফ মারছে মেঘের থেকে মেঘে, চালাচ্ছে তার ঝকঝকে খাঁড়া, বজ্রশব্দে গর্জে উঠছে দিগন্ত ডাক-ছাড়া জন্তুর মতো। উত্তর-পশ্চিমের আমবাগানে শোনা গেল

সোঁ সোঁ করে হাঁপিয়ে-ওঠা একটা আওয়াজ, এসে পড়ল পাটকিলে রঙের অন্ধকার, শুকনো ধুলোর দম-আটকানো তুফান। বাতাসের ঝটকা আসে, ছুঁড়ে ছুঁড়ে ছড়ায় ডালের টুকরো, শুকনো পাতা, চোখে মুখে ছিটোতে থাকে কাঁকরগুলো; আকাশটা যেন ভূতে-পাওয়া। পথিক উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ছে মাটিতে, ঘন আঁধির ভিতর থেকে উঠছে ঘরহারা গোরুর উতরোল ডাক, দূরে নদীর ঘাটে হৈ হৈ রব। বোঝা গেল না কোন্ দিকে হুড়মুড় দুড়দাড় করে কী একটা ভেঙে-চুরে পড়ল; বুক দুরদুর করছে, ভাবনা উঠছে— কী হল, কী হল। কাকগুলো মাটির উপর মুখ থুবড়িয়ে ঠোঁট দিয়ে ঘাস ধরছে কামড়িয়ে, ধাক্কা খেয়ে যাচ্ছে সরে সরে, ঝটপট করছে পাখা-দুটো। নদীপথের বাঁশঝাড় ঝড়ের রাস্তায় লুটিয়ে লুটিয়ে মরিয়া হয়ে ডাল আছড়িয়ে দোহাই পাড়তে লাগল। তীক্ষ্ণ হাওয়া অন্ধকারের পাঁজরের ভিতর দিয়ে সাঁই সাঁই চালাচ্ছে শব্দের ছুরি। জলে স্থলে শূন্যে উঠেছে একটা ঘুরপাক-খাওয়া আতঙ্ক। হঠাৎ সোঁদা গন্ধের দীর্ঘনিশ্বাস উঠল মাটি থেকে, মুহূর্তে এসে পড়ল বৃষ্টি প্রবল ঝাপটায়, হাওয়ার চোটে জলের ফোঁটা গুঁড়িয়ে গিয়ে পাতলা পর্দায় ঢেকে ফেললে সমস্ত বন, আড়াল করলে মন্দিরের চুড়ো, কাঁসরঘণ্টার ঢং ঢং শব্দের দিল মুখচাপা। রাত তিন পহরে থেমে এল ঝড়বৃষ্টি, কালো হয়ে এল অন্ধকার নিকষপাথরের মতো; কেবলি চলল ব্যাঙের ডাক, ঝিঁঝিঁ পোকার শব্দ, আর যেন স্বপ্নে আঁতকে-ওঠা দমকা হাওয়ায় থেকে থেকে জল-ঝরানো ঝাউএর ঝরঝরানি।

এই বর্ণনার ভাষাকে তার স্বভাব থেকে ছিনিয়ে নিয়ে সাধুশ্রেণীতে শুদ্ধ করে নেওয়া যেতে পারে, যে-প্রণালীতে দোর্দণ্ডপ্রতাপ শাশুড়ি শোধন করেন ভিন্নদেশী বধূর রীতি। পরীক্ষায় ফুল মার্ক পাবার প্রলোভনেও এ নিষ্ঠুর কাজে অগ্রসর হতে পারব না।

—উদয়ন ১৩৪১ বৈশাখ, পৃ ৯-১০

চতুর্থ বিভাগে কোনো পরিবর্তন করা হয় নি। 'উদয়ন' এবং প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণের পাঠ অভিন্ন।

বিষয়বস্তুর দিক্ থেকে বর্তমান সংস্করণে উদয়নে প্রকাশিত মূলপাঠই যথাসম্ভব অনুসৃত হয়েছে। কিন্তু ভাষার দিক্ থেকে অনুসৃত হয়েছে প্রথম সংস্করণের পাঠ। কেননা, প্রথম সংস্করণে গ্রহণকালে কোনো কোনো স্থলে 'উদয়ন'এর ভাষাকে কিছু পরিমাণে মার্জিত ও পরিবর্তিত করা হয়েছে। এসব ছোটখাট পরিবর্তনের পরিচয় দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। কেবল একটি শব্দ উল্লেখযোগ্য। উদয়নে ইংরেজি symmetry শব্দের বাংলা করা হয়েছিল 'সংসাম্য'। প্রথম সংস্করণে এটাকে বদলে করা হয়েছিল 'সম্মিতি'। বর্তমান সংস্করণেও তাই রাখা হয়েছে (পৃ ১২৬, ১৩৩)।

রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস ছিল আঠার মাত্রার 'মহাপয়ার' তাঁর 'অগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথের সৃষ্টি' (পৃ ১২০) এবং 'এর প্রথম প্রবর্তন' তাঁর 'স্বপ্নপ্রয়াণ' কাব্যে (পৃ ৪৬)। বস্তুতঃ মহাপয়ার সৃষ্টির কৃতিত্ব দ্বিজেন্দ্রনাথের প্রাপ্য নয়, রঙ্গলালের পদ্মিনী-উপাখ্যান কাব্যে (১৮৫৮) এর প্রয়োগ দেখা যায় (দ্রষ্টব্য পৃ ২৫৪)।—

যথা শেফালিকা ফুল বিতরিয়া গন্ধ মনোহর।
প্রভাতে নিস্তেজ হয়ে ঝরি পড়ে ধরণী-উপর॥
সেইরূপ অরিসিংহ যুদ্ধে যুদ্ধে হয়ে বলহত।
অস্ত্রাঘাতে রক্তপাতে অবশেষে জীবন-বিগত॥

—পদ্মিনী-উপাখ্যান, অরিসিংহের যুদ্ধ

একথা অবশ্য স্বীকার করতে হবে যে, দ্বিজেন্দ্রনাথ মহাপয়ারের স্রষ্টা না হলেও মহাপয়ারের প্রয়োগবৈচিত্র্যসৃষ্টিতে তাঁর কৃতিত্ব আছে। প্রথমতঃ, মহাপয়ারে প্রবহমানতা-প্রবর্তনের কৃতিত্ব সম্ভবতঃ তাঁরই প্রাপ্য। 'স্বপ্নপ্রয়াণ' কাব্য (১৮৭৫) থেকে রবীন্দ্রনাথ 'গম্ভীর

পাতাল' ইত্যাদি যে দৃষ্টান্তটি (পঞ্চম সর্গ) উদ্‌ধৃত করেছেন (পৃ ৪৬, ১২০–২১), তার প্রবহমান গতিটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। মহাপয়ার দ্বিজেন্দ্রনাথের সৃষ্টি বা প্রথম প্রবর্তন, রবীন্দ্রনাথ একথা বলেছিলেন সম্ভবতঃ এই প্রবহমানতার কথা মনে রেখেই। বোধ করি সেইজন্যই তিনি দুই বারই ওই একই দৃষ্টান্ত উদ্‌ধৃত করেছেন। অপ্রবহমান মহাপয়ারের দৃষ্টান্ত আছে 'স্বপ্নপ্রয়াণ'এর অনেক স্থলেই। এস্থলে বলা সংগত যে, উক্ত দৃষ্টান্তটি শুধু প্রবহমান নয়, অনেকাংশে সমিলও বটে, কয়েক পংক্তি অমিলও আছে। দ্বিতীয়তঃ বিভিন্ন আয়তনের পংক্তির সঙ্গে আঠার মাত্রার মহাপয়ার পংক্তি যুক্ত করে বৈচিত্র্যসৃষ্টিরও অনেক নিদর্শন আছে 'স্বপ্নপ্রয়াণ' কাব্যে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ এই কাব্যের প্রথম শ্লোকটিই উদ্‌ধৃত হতে পারে।—

সুপ্তিতে ডুবিয়া গেল জাগরণ,
সাগরসীমায় যথা অস্ত যায় জলন্ত তপন।

রবীন্দ্রনাথের সংগৃহীত লালন ফকিরের কতকগুলি গান প্রকাশিত হয় ১৩২২ সালে প্রবাসী পত্রিকার 'হারামণি' বিভাগে। 'ছন্দের প্রকৃতি' প্রবন্ধে উদ্‌ধৃত দুটি গানও প্রবাসীতে প্রকাশিত উক্ত গানগুলির মধ্যে স্থান পেয়েছিল। কিন্তু এই প্রবন্ধে ধৃত পাঠে এবং প্রবাসীর পাঠে কিছু পার্থক্য দেখা যায়।[1] নীচে প্রবাসীর পাঠ উদ্‌ধৃত হল। এর সঙ্গে আলোচ্যমান প্রবন্ধের পাঠ মিলিয়ে দেখলেই দুই পাঠের পার্থক্য বোঝা যাবে।—

১ দ্রষ্টব্য পৃ ১৩০, পাদটীকা ২। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-প্রকাশিত 'লালন-গীতিকা' গ্রন্থেও (১৯৫৮) এই দুটি গান আছে— যথাক্রমে ৭-সংখ্যক ও ৪১৪-সংখ্যক গান। এই গ্রন্থের পাঠও 'প্রবাসী' তথা 'ছন্দ' পুস্তকের পাঠ থেকে কতকাংশে পৃথক্।

আছে যার মনের মানুষ মনে সে কি জপে মালা।
অতি নির্জনে বসে বসে দেখছে খেলা।
কাছে রয়ে, ডাকে তারে, উচ্চস্বরে কোন্ পাগলা;
ওরে যে যা বোঝে, তাই সে বুঝে থাক্ রে ভোলা।
যথা যার ব্যথা নেহাত, সেইখানে হাত, ডলামলা;
ওরে তেমনি জেনো মনের মানুষ মনে তোলা।
যে জন দেখে সে রূপ, করিয়ে চুপ রয় নিরালা,
ও সে লালন ভেঁড়োর লোকজানান হরি বলা,
মুখে হরি হরি বলা॥
—প্রবাসী ১৩২২ আশ্বিন, পৃ ৬৯৭

এমন মানব-জনম আর কি হবে।
মন, যা কর্ ত্বরায় কর্ রে ত্বরায় কর্ এই ভবে॥
অনন্ত রূপ সৃষ্টি করলেন সাঁই,
শুনি, মানবের তুলনা কিছুই নাই,
দেবদানবগণ করে আরাধন
জনম নিতে মানবে॥…
মানুষে হবে মাধুর্যভজন,
তাইতে, মানস রূপ এই গঠিল নিরঞ্জন,
এবার, ঠেকিলে আর
না দেখি কিনার,
লালন কয় কাতরভাবে॥
—প্রবাসী ১৩২২ পৌষ, পৃ ২৯৩

দুই পাঠে ভাষাগত পার্থক্য থাকলেও প্রাকৃতবাংলা ছন্দের যে-বৈশিষ্ট্যের জন্য লালনের গান উদ্ধৃত হয়েছে তা আছে উভয় পাঠেই।

রবীন্দ্রনাথের ছন্দ-চিন্তার প্রকৃষ্টতম নিদর্শন এই 'ছন্দের প্রকৃতি'

প্রবন্ধটি। বাংলা ছন্দের প্রকৃতি ও তার বিশ্লেষণ সম্বন্ধে তাঁর সুচিন্তিততম অভিমত প্রকাশ পেয়েছে এই প্রবন্ধটিতেই। প্রাকৃতবাংলার ছন্দ সম্বন্ধে একথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। প্রবন্ধটির এই গুরুত্বের কথা বিবেচনা করেই রবীন্দ্রনাথ 'ছন্দ' গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে এটিকে দ্বিতীয় স্থান দিয়েছিলেন 'ছন্দের অর্থ' প্রবন্ধের পরেই। রবীন্দ্রনাথের ছন্দ-চিন্তার বিবর্তনধারা অনুধাবন করবার অভিপ্রায়ে বর্তমান সংস্করণে প্রবন্ধগুলি সাজানো হয়েছে যথাসম্ভব কালক্রম-অনুসারে। তাই এই প্রবন্ধটি স্থান পেয়েছে মূলগ্রন্থের শেষ ভাগে।

'ছন্দের প্রকৃতি' প্রবন্ধের পরিশেষে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "ছন্দ সম্বন্ধে আরো কিছু বলা বাকি রইল, আর কোনো সময়ে বলবার ইচ্ছা আছে"। তাঁর এই ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছে অংশতঃ 'গদ্যছন্দ' প্রবন্ধে (১৩৪১) এবং অংশতঃ 'চলতি ভাষার ছন্দ' (১৩৪৫) প্রবন্ধে। তৎকালে বাংলা-সাহিত্যে পদ্য ও গদ্য ছন্দ নিয়ে যে-সব আলোচনা চলছিল, সে সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের সর্বশেষ অভিমত প্রকাশ পেয়েছে এই তিনটি প্রবন্ধে।

চলতি ভাষার ছন্দ

প্রথম সংস্করণে ও রচনাবলী-সংস্করণে এই প্রবন্ধটি নেই। বর্তমান সংস্করণে এটি প্রথম সংকলিত হল 'বাংলাভাষা-পরিচয়' গ্রন্থের একাদশ অধ্যায় থেকে। এর নামকরণ হয়েছে প্রবন্ধে ব্যবহৃত একটি বাক্যাংশ থেকে।

'ছন্দ' গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৩৪৩ সালে। এই গ্রন্থের নানা প্রবন্ধে সাধুবাংলা ও চলতিবাংলা ছন্দের পার্থক্য নিয়ে যে-সব আলোচনা করা হয়েছে, রবীন্দ্রনাথের মন তাতে সম্পূর্ণ তৃপ্ত হতে পারেনি বলে মনে হয়। তাই তিনি সে বিষয়টা আরও ভালো করে পরিস্ফুট করতে প্রবৃত্ত হন 'বাংলাভাষা-পরিচয়' গ্রন্থের (১৩৪৫) একাদশ অধ্যায়ে। এই হিসাবে

এ আলোচনাটি 'ছন্দের প্রকৃতি' প্রবন্ধের প্রাকৃতবাংলাছন্দ-বিষয়ক আলোচনা-অংশের পরিপূরক বলে গৃহীত হতে পারে।

'বাংলাভাষা-পরিচয়' গ্রন্থের একাদশ অধ্যায়ে বাংলা ছন্দের সর্বাঙ্গীণ পরিচয় দেবার প্রয়াস নেই। আছে শুধু চলতিবাংলা ছন্দের স্বরূপ এবং সাধুবাংলা ছন্দের সঙ্গে এর পার্থক্য নির্ণয়ের চেষ্টা। চলতি-বাংলার ছন্দ বা ছড়ার ছন্দ সম্বন্ধে তাঁর শেষ বক্তব্য (পৃ ১৪২) এই।—"সেটা পয়ার হলেও অক্ষরগোনা পয়ার হবে না, সে হবে মাত্রাগোনা পয়ার। কিন্তু কথাটা ঠিক হল না, বস্তুতঃ সাধুভাষার পয়ারও মাত্রাগোনা"। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ বলতে চান যে, সাধুবাংলার পয়ার ও চলতিবাংলার পয়ার দুই-ই চোদ্দমাত্রা-পরিমিত বটে, কিন্তু এই দুইএর মাত্রাগণনার প্রণালীতে পার্থক্য আছে। পার্থক্যটা এই যে, সাধুবাংলার ছন্দে শব্দের অন্তস্থিত 'হসন্ত' বর্ণগুলির বাঁধন থাকে 'আলগা', তাই এগুলি পরবর্তী শব্দের প্রথম বর্ণের সঙ্গে 'লেগে যায়' না, অর্থাৎ উক্ত প্রথম বর্ণের সঙ্গে যুক্তরূপ ধারণ করে না। পক্ষান্তরে চলতিবাংলার ছন্দে শব্দের অন্তস্থিত 'হসন্ত' বর্ণের বাঁধন আলগা থাকে না, পরবর্তী শব্দের প্রথম বর্ণের সঙ্গে লেগে গিয়ে যুক্তরূপ ধারণ করে। এ স্থলে তিনি বিনা বাক্যে ধরে নিয়েছেন যে, উভয় রীতির ছন্দেই শব্দমধ্যবর্তী 'হসন্ত' বর্ণ আলগা না থেকে পরবর্তী বর্ণের সঙ্গে লগ্ন বলেই গণ্য হয়। রবীন্দ্রনাথ বোঝাতে চান যে, 'সতত হে নদ তুমি পড় মোর মনে'— এই লাইনটার 'নদ তুমি' ও 'মোর মনে' এই দুটি অংশের দ্ এবং র্ পরবর্তী তু এবং ম-র সঙ্গে লেগে গিয়ে দ্তু ও র্ম এরকম যুক্তরূপ নেয়নি। চলতিবাংলার ছন্দে আমাদের উচ্চারণ এই যুক্তরূপকেই স্বীকার করে নেয়। সাধু ছন্দের উচ্চারণরীতি 'মোর মনে' অংশটাকে 'মোর্মনে' রূপে 'জোড় বাঁধতে বাধা' দেয়, অথচ চলতি ছন্দের উচ্চারণ 'এপার গঙ্গা'-কে 'এপার্গঙ্গা'-রূপে জোড় বাঁধতেই সহায়তা করে।

পারিভাষিক পদ্ধতিতে বললে বলতে হয়— 'ন-দ্ তুমি' ও 'মো-র্ মনে' অংশদুটিতে 'নদ' ও 'মোর' এই দুটি দলের উচ্চারণ প্রসারিত, পক্ষান্তরে 'এপার গঙ্গা' ও 'ওপার গঙ্গা' অংশ-দুটির 'পার্' দলটির উচ্চারণ অপ্রসারিত। তাই এক রীতিতে 'মোর' এবং 'মনে' বিযুক্ত থাকে এবং অপর রীতিতে 'এপার' ও 'গঙ্গা' যুক্ত হয়ে যায়। প্রসারিত দলে দুই মাত্রা এবং অপ্রসারিত দলে এক মাত্রা হিসাবে গণনা করলে 'মো-র মনে' অংশেও চার মাত্রা, 'এপার গঙ্গা'-তেও চার মাত্রা। সাধু ও চলতি ছন্দের উচ্চারণগত এই পার্থক্য ও মাত্রাগণনার এই নীতি মেনে নিলে উভয়বিধ পয়ারেই প্রতিপংক্তিতে চোদ্দ মাত্রা পাওয়া যাবে।

বিশেষভাবে স্মরণীয় বিষয় এই যে, চলতি বাংলা ছন্দের রবীন্দ্রকৃত এই শেষ বিশ্লেষণ ও পঞ্চান্ন বৎসর পূর্বে কৃত তাঁর প্রথম বিশ্লেষণ (পৃ ১৭০-৭১) অবিকল এক। এই অভিন্নতা শুধু বিস্ময়ের বিষয় নয়, বিশেষভাবে চিন্তনীয়ও বটে।

এই প্রবন্ধটির কবির স্বহস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি রক্ষিত আছে রবীন্দ্র-সদনে। ১৭৬-সংখ্যক পাণ্ডুলিপি। এটি বস্তুতঃ 'বাংলাভাষা-পরিচয়' গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি। এই পাণ্ডুলিপির দ্বিতীয় খণ্ডে আছে এই গ্রন্থের একাদশ অধ্যায়। 'চলতি ভাষার ছন্দ' এই অধ্যায়েরই অংশবিশেষ (পাণ্ডুলিপি পৃ ৮২-৮৮)।

গদ্য-ছন্দ

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠিত

বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপকরূপে রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ করেন সম্ভবতঃ 'ছন্দ' প্রবন্ধপাঠের (১৯৩৩, সেপ্টেম্বর ১৬) পরবর্তী কয়েক মাসের মধ্যে। প্রবন্ধপাঠের ঠিক তারিখটি

জানা যায়নি।[১] প্রবন্ধটি পরে প্রকাশিত হয় 'বঙ্গশ্রী' পত্রিকায় ১৩৪১ সালের বৈশাখ-সংখ্যায়। উক্ত 'ছন্দ' প্রবন্ধটিও (প্রথম সংস্করণের নাম 'বাংলা ছন্দের প্রকৃতি') প্রকাশিত হয় ওই মাসেই 'উদয়ন' পত্রিকায়।

'বঙ্গশ্রী' পত্রিকা থেকে 'ছন্দ' গ্রন্থে গ্রহণকালে প্রবন্ধটির ভাষা অতি সামান্যপরিমাণে পরিমার্জিত হয় এবং প্রবন্ধের আরম্ভাংশ ও মধ্যভাগ থেকে একটি অংশ বর্জিত হয়। বর্তমান সংস্করণে উক্ত পরিমার্জিত ভাষাই গৃহীত হয়েছে এবং বর্জিত অংশ-দুটির মধ্যে প্রথমটি গৃহীত হয়েছে, কিন্তু দ্বিতীয়টি হয়নি। প্রথম সংস্করণে 'ছন্দের সঙ্গে অছন্দর তফাত এই যে' ইত্যাদি অনুচ্ছেদের (বর্তমান সংস্করণ, পৃ ১৪৭) পূর্ববর্তী সবটুকুই বর্জিত হয়েছিল। রবীন্দ্রদৃষ্টিতে ছন্দ-তত্ত্বের স্বরূপ উপলব্ধির পক্ষে এই অংশটুকু গুরুত্বহীন নয়, এই বোধে বর্তমান সংস্করণে এই অংশটুকু যথাস্থানেই রক্ষিত হল।

দ্বিতীয় বর্জিত অংশটুকুর স্থান ছিল 'পদ্যছন্দের প্রধান লক্ষণ' ইত্যাদি অনুচ্ছেদটির (পৃ ১৫৩) অব্যবহিত পরেই। এই বর্জনের কারণ এই যে, এই অংশটা ছিল 'ছন্দের অর্থ' প্রবন্ধের একটা অংশের প্রায় অপরিবর্তিত পুনঃপ্রয়োগ মাত্র।[২]

গদ্য-কবিতা তথা গদ্য-ছন্দের ইতিহাস আলোচনা করা যায় দুদিক্ থেকে। এক, কোনো কোনো পদ্যবন্ধের প্রবণতা দেখা যায় পরিমিত মাত্রার বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে গদ্যের পৌরুষশক্তি ও মুক্তগতি অর্জনের দিকে। আবার, এক শ্রেণীর গদ্যরচনার প্রবণতা দেখা যায় পদ্যসুলভ তরঙ্গভঙ্গি ও ধ্বনিসুষমা লাভের দিকে। এই দুই প্রবণতারই শেষ পরিণতি গদ্যকবিতায়।

১ দ্রষ্টব্য পৃ ৪১৫ পাদটীকা ৪।

২ দ্রষ্টব্য পৃ ১৫৩ পাদটীকা ১।

অধুনাপূর্ব যুগে, যখন পদ্যরচনার আশ্রয় ছিল একদিকে মানুষের কণ্ঠ ও অপরদিকে তার শ্রুতি ও স্মৃতি, তখন পদ্যছন্দের নির্ভর ছিল গানের সুর-তাল বা আবৃত্তির টানের উপরে। পদাবলী-সাহিত্য, পাঁচালি কাব্য বা ছেলেভুলানো ছড়া প্রভৃতি লোকসাহিত্য, সবই নির্ভর করত ওই সুর বা টানের উপরে। তখনকার দিনে ছন্দের সমস্ত ত্রুটি সেরে নেওয়া হত গানের সুরে বা আবৃত্তির টানে। অবশেষে যখন মানুষের কণ্ঠের স্থান অধিকার করল ছাপাখানা, তখন পদ্যছন্দও গান বা আবৃত্তির সুরের আশ্রয় হারাল। পদ্যরচনা আর গেয় রইল না, সে হল পঠনীয়। এতদিন যা ছিল গীতছন্দের অনুবর্তী, এখন তাকে হতে হল বাক্‌ছন্দের অনুবর্তী। এতদিন পদ্যছন্দের যে অভাব বা ত্রুটি-পূরণের দায়িত্ব ছিল গানের সুর-তালের উপরে, এখন সে দায়িত্ব গ্রহণ করতে হল তার নিজেকেই। এভাবে ত্রুটিপূরণের চিরকালীন সুযোগ হারাবার ফলে পদ্যছন্দকে হতে হল আত্মনির্ভর ও সুগঠিত। প্রাচীন কাব্যছন্দের সঙ্গে ঈশ্বর গুপ্তের রচনার ছন্দের তুলনা করলেই একথার প্রমাণ পাওয়া যাবে। গান বা আবৃত্তির আনুগত্য ছেড়ে পঠনীয়তার উপরে নির্ভর করার ফলে ঈশ্বর গুপ্তের রচনাকে অনেক পরিমাণেই হতে হয়েছে বাক্‌ছন্দের অনুবর্তী। আর বাক্‌ছন্দের অনুবর্তন মানেই অন্ততঃ কতকাংশে গদ্যরীতির আশ্রয়গ্রহণ। এভাবে পদ্যরচনা গানের এলাকা ছেড়ে ক্রমে অগ্রসর হল গদ্যের এলাকার দিকে। এই প্রবণতার পরিচয় আছে ঈশ্বর গুপ্ত-রঙ্গলালের রচনায়। এই প্রবণতার ফলেই মধুসূদনের পক্ষে অমিত্রাক্ষররীতি প্রবর্তন করা সম্ভব হয়েছিল। এই অমিত্রাক্ষরই হল গদ্যবন্ধের অভিমুখে পদ্যবন্ধের প্রথম ও সুস্পষ্ট পদক্ষেপ। একথার উল্লেখ আছে 'গদ্য-ছন্দ' প্রবন্ধেই (পৃ ১৫৩)। দ্বিতীয় পদক্ষেপ দেখা গেল পরবর্তী কালে নাটকীয় সংলাপে গদ্যসুলভ বাক্‌ভঙ্গির

অনুসরণে ভাঙা অমিত্রাক্ষর-প্রবর্তনের মধ্যে।[১] কাব্যের ক্ষেত্রে 'সন্ধ্যাসংগীত' ও 'প্রভাতসংগীত'-এর অসমপংক্তিক পদ্যবন্ধ-রচনার মধ্যেও এই গদ্যানুসৃতির প্রভাব দেখা যায়। অতঃপর 'মানসী'র 'নিষ্ফলকামনা' কবিতাটির (১৮৮৭) চোদ্দমাত্রার গণ্ডিভাঙা মুক্তক বন্ধের মধ্যে পদ্য-রচনার ভাবিকালীন গদ্যপরিণতির প্রথম নিদর্শন পাওয়া যায়। 'নিষ্ফলকামনা'য় যে মুক্তক বন্ধের আরম্ভ, তার ব্যাপক প্রয়োগ দেখা দিল 'বলাকা' (১৯১৬) ও 'পলাতকা' (১৯১৮) কাব্যে (পৃ ১৫৭)। এই মুক্তক বন্ধেরও দুই রূপ— সাধুবাংলার মুক্তক ও চলতিবাংলার মুক্তক। 'বলাকা'য় সাধু ও চলতি, উভয়প্রকার মুক্তক বন্ধেরই প্রয়োগ দেখা যায়। 'পলাতকা'য় চলতিবাংলার মুক্তকেরই একাধিপত্য। এই চলতিবাংলার মুক্তক থেকেই গদ্যছন্দের উদ্ভব। মুক্তক বন্ধের পর্বগঠনে মাত্রা-পরিমাপের যে ক্ষীণ বন্ধনটি অবশিষ্ট ছিল, সেটি ছিন্ন করে দেবার সঙ্গে সঙ্গেই দেখা দিল গদ্যকবিতার ছন্দ অর্থাৎ মাত্রাপরিমাপহীন বিশুদ্ধ বাক্‌ছন্দ। আর, এই বাক্‌ছন্দ (speech rhythm) যেহেতু সর্বতো-ভাবেই রচয়িতার ভাবের অনুবর্তী, সেইজন্যই রবীন্দ্রনাথ তাকে বলেছেন 'ভাবের ছন্দ' (sense rhythm)। এই বাক্‌ছন্দ বা ভাবের ছন্দই গদ্যছন্দের মূলনীতি। এই সর্ববন্ধনহীন গদ্যছন্দের প্রথম প্রকাশ 'লিপিকা'র (১৯২২) কয়েকটি লেখায় এবং তার পরে তার পূর্ণশক্তির বিকাশ 'পুনশ্চ' কাব্যে (১৯৩২)।

১ রাজকৃষ্ণ রায়ের 'নিভৃতনিবাস' কাব্যে (১৮৭৮) ভাঙা অমিত্রাক্ষরের প্রয়োগ আছে। অতঃপর তাঁর 'হরধনুর্ভঙ্গ' নাটকে (১৮৮১ জুলাই) এই ভাঙা অমিত্রাক্ষর বা আভিনয়িক অমিত্রাক্ষরের বেশ সুষ্ঠু ও ব্যাপক প্রয়োগ দেখা যায়। রাজকৃষ্ণের মতে এ ছন্দকে 'পদ্যাকার গদ্য'ও বলা যেতে পারে। 'হরধনুর্ভঙ্গ' নাটকের অল্পকাল পরে গিরিশচন্দ্রের 'রাবণবধ' নাটকেও (১৮৮১ নবেম্বর) এই ছন্দ প্রযুক্ত হয়। গিরিশচন্দ্রের প্রভাব ব্যাপকতর ও জনপ্রিয়তর হবার ফলে এই ছন্দ 'গৈরিশ ছন্দ' নামে পরিচিত হয়।— দ্রষ্টব্য সাহিত্যসাধক-চরিতমালা ৫০ (রাজকৃষ্ণ রায়), পৃ ৪০-৪৬।

গদ্যরচনার ছন্দোমুখী প্রবণতা দেখা দেয় উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে বিদ্যাসাগরের শিল্পপ্রতিভার স্পর্শে। এই সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের নিজের উক্তি এই।[১]—"গদ্যের পদগুলির মধ্যে একটা ধ্বনিসামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া তাহার গতির মধ্যে একটি অনতিলক্ষ্য ছন্দঃস্রোত[২] রক্ষা করিয়া…বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যকে সৌন্দর্য ও পরিপূর্ণতা দান করিয়াছেন।" গদ্যের 'পদ'-রচনার এই 'অনতিলক্ষ্য ছন্দঃস্রোত' আরও বৈচিত্র্য লাভ করে বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে। সঞ্জীবচন্দ্রের রচনারও এই গুণ। 'পালামৌ' গ্রন্থে কোল নারীদের নাচবর্ণনা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেন (পৃ ১৫২-৫৩)—"এ লেখায় ছন্দের ভঙ্গি এসে পৌঁছেছে অথচ কোনো বিশেষ ছন্দের কাঠামো নেই। এর গদ্য সমমাত্রায় বিভক্ত নয়, কিন্তু শিল্পপ্রচেষ্টা আছে এর গতির মধ্যে।" গদ্যের এই ছন্দসৌন্দর্য সবচেয়ে উৎকর্ষ লাভ করে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের রচনায়। এই উৎকর্ষের কথা বোধ করি সর্বাগ্রে উপলব্ধি করেন ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় (১৮৫১-১৯০৩)। এ সম্বন্ধে তাঁর অভিমতের পরিচয় পাই রবীন্দ্রনাথেরই একখানি পত্রে।—

তাঁর [ঠাকুরদাসের] মতে ভবিষ্যতে গদ্য এতদূর পর্যন্ত সুন্দর হয়ে উঠবে যে, পদ্যর বিশেষ প্রয়োজনীয়তা দূর হয়ে যাবে।… তাঁর বিশ্বাস, আমার গদ্যে আমার পদ্যের চেয়ে ঢের বেশি কবিত্ব পরিস্ফুটভাবে প্রকাশ পায় এবং সেইটেই তাঁর মতে স্বাভাবিক। তিনি আমার শেষ দিক্‌কার লেখা কতকগুলি কবিতার বই চেয়েছেন—

১ 'বিদ্যাসাগরচরিত' প্রবন্ধ (১৩০২)।

২ তুলনীয় সাহিত্যে ছন্দের কাজ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের পরবর্তিকালীন উক্তি।—'সেটা গদ্যে চলে অলক্ষ্যে, পদ্যে চলে প্রত্যক্ষে।'—বাংলাভাষা-পরিচয় (১৯৩৮), একাদশ অধ্যায়।

বোধ হয় কোনো প্রবন্ধে প্রমাণ করবেন যে আমার পদ্যই গদ্য এবং গদ্যই পদ্য।[১]

—ছিন্নপত্রাবলী, ১৭৬-সংখ্যক পত্র

পদ্যের প্রয়োজনীয়তা একদিন ফুরিয়ে যাবে, ঠাকুরদাসের এই উক্তি (১৮৯৪ সালের শেষাংশ) সত্য না হতে পারে। কিন্তু গদ্যও যে একদিন কবিতার বাহন হয়ে ওঠবার যোগ্যতা অর্জন করবে এবং রবীন্দ্রনাথের গদ্য যে কবিতার বাহন হবার যোগ্য, তাঁর এই অভিমতের সত্যতা অস্বীকার করা যায় না এবং তখনকার দিনের পক্ষে এই উক্তি বিস্ময়কর সন্দেহ নেই।

অতঃপর গীতাঞ্জলির ইংরেজি অনুবাদের সময় থেকে গদ্যকবিতা রচনার অভিপ্রায় কিভাবে কার্যে রূপগ্রহণ করে সে ইতিহাস বিবৃত হয়েছে 'পুনশ্চ' কাব্যের ভূমিকায় (পৃ ১৮৬-৮৭)। ওই ভূমিকা থেকে জানা যায় যে, গদ্যকবিতা-রচনার প্রথম পরীক্ষা হয় 'লিপিকা'র (১৯২২) কয়েকটি লেখায়। কিন্তু "ছাপবার সময় বাক্যগুলিকে পদ্যের মতো খণ্ডিত করা হয়নি, বোধ করি ভীরুতাই তার কারণ"। লিপিকার প্রথম ভাগের অধিকাংশ রচনাই এই মন্তব্যের লক্ষ্য বলে মনে হয়। লিপিকার প্রথম মুদ্রণকালে ঐরূপ রচনায় বাক্যের মাঝে মাঝে ছন্দের বিরামস্থলগুলিতে বেশি ফাঁক দেখানো হয়েছিল।[২] উক্ত প্রথম ভাগের লেখাগুলি সবই প্রকাশিত হয় ১৩২৬ সালের আষাঢ় থেকে অগ্রহায়ণ, এই ছয় মাসে। তারও কিছুকাল পূর্বে রবীন্দ্রনাথের কাছে

১ ঠাকুরদাসের কবিতা ও সাহিত্য-বিষয়ক প্রবন্ধের গ্রন্থ 'সাহিত্যমঙ্গল' প্রকাশিত হয় ১২৯৫ সালে।

২ দ্রষ্টব্য 'লিপিকা'র (১৩৫২ সংস্করণ) গ্রন্থপরিচয়। 'ভারতী'তে প্রকাশকালে (১৩২৬ আশ্বিন) 'প্রশ্ন' রচনাটির বাক্যগুলিকে আবৃত্তির ছন্দ-অনুসারে ভেঙে ভেঙেই সাজানো হয়েছিল।

গদ্য-ছন্দের প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছিল একটা বিশেষ প্রসঙ্গে। 'ছন্দের অর্থ' প্রবন্ধটি 'বিচিত্রা' ক্লাবে পঠিত হয় ১৩২৪ সালের ৬ চৈত্র তারিখে। এ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত সুকুমার বসু মহাশয়ের উক্তি এই।—

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত যেদিন তাঁর ছন্দ-বিষয়ক প্রবন্ধ পড়েছিলেন সেদিন আমি বিচিত্রায় ছিলাম না। কিন্তু ছন্দ সম্বন্ধে প্রচুর সুন্দর সুন্দর উদাহরণ-সমেত রবীন্দ্রনাথ তাঁর মনোজ্ঞ প্রবন্ধটি যেদিন পড়েন সেদিন উপস্থিত ছিলাম। সেদিনকার আলোচনার উল্লেখযোগ্য প্রসঙ্গ এই যে, প্রবন্ধপাঠের পর সুকুমার রায় জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "গদ্যে কি ছন্দ আছে?" একথা শুনে সকলেই মৃদু হেসেছিলেন। কবি একটু চুপ করে থেকে বললেন, "সাধারণ গদ্যের কথা যদি ছেড়ে দাও তো, যাকে বলে impassioned prose তার মধ্যে একটা ছন্দ পাওয়া যায়"।

—বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৬৯ বৈশাখ-আষাঢ়, পৃ ৪৪৫

এই যে ভাবাবেগময় গদ্য, তাই হচ্ছে গদ্যকবিতার যথার্থ বাহন। আর, ভাবাবেগের ছন্দকেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'ভাবের ছন্দ'। রবীন্দ্রসাহিত্যে আবেগকম্পিত গদ্য যে 'লিপিকা'য় বা 'পুনশ্চ' কাব্যেই প্রথম দেখা দিয়েছিল তা নয়। দেখা দিয়েছিল বহু পূর্বেই তাঁর গল্প-উপন্যাস ও প্রবন্ধের বহু বিভিন্ন অংশে। বোধ করি তাঁর গদ্যের এই বিশিষ্টতার প্রতি লক্ষ্য রেখেই ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় ভবিষ্যদ্‌বাণী উচ্চারণ করেছিলেন যে, একদিন তাঁর এই গদ্যই তাঁর কবিতার বাহন-রূপে দেখা দেবে।

গদ্যকবিতা-রচনার নীতি যে রবীন্দ্রসাহিত্যেই প্রথম স্বীকৃত হল তা নয়। এ নীতির প্রথম স্বীকৃতি আসে বোধ করি বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনী থেকে। তাঁর 'কবিতাপুস্তক' প্রকাশিত হয় ১৮৭৮ সালে। এই পুস্তকে 'মেঘ', 'বৃষ্টি' ও 'খদ্যোত', এই তিনটি গদ্যকবিতা আছে।

গদ্যকবিতার সার্থকতা সম্বন্ধে গ্রন্থের 'বিজ্ঞাপনে' বঙ্কিমচন্দ্র যে অভিমত প্রকাশ করেন, বর্তমান প্রসঙ্গে তা বিশেষভাবে স্মরণীয়।—

কবিতাপুস্তকের ভিতর তিনটি গদ্যপ্রবন্ধ সন্নিবেশিত হইয়াছে। কেন হইল, আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে আমি ভাল করিয়া বুঝাইতে পারিব না। তবে, এক্ষণে যে রীতি প্রচলিত আছে যে, কবিতা পদ্যেই লিখিতে হইবে, তাহা সংগত কি না, আমার সন্দেহ আছে। ভরসা করি, অনেকেই জানেন যে, কেবল পদ্যই কাব্য নহে। আমার বিশ্বাস আছে যে, অনেক স্থানে পদ্যের অপেক্ষা গদ্য কাব্যের উপযোগী। বিষয়-বিশেষে পদ্য কাব্যের উপযোগী হইতে পারে, কিন্তু অনেক স্থানে গদ্যের ব্যবহারই ভাল। যে স্থানে ভাষা ভাবের গৌরবে আপনা-আপনি ছন্দে বিন্যস্ত হইতে চাহে, কেবল সেই স্থানেই পদ্য ব্যবহার্য।… কাব্যে গদ্যের উপযোগিতার উদাহরণস্বরূপ তিনটি গদ্যকবিতা এই পুস্তকে সন্নিবেশিত করিলাম।

—কবিতাপুস্তক (১৮৭৮), বিজ্ঞাপন

বাংলাসাহিত্যের সেই অপরিণতির যুগে গদ্যকবিতার এরকম সুস্পষ্ট স্বীকৃতি সত্যই বিস্ময়কর।

গদ্যকবিতা রচনার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন বঙ্কিমচন্দ্র। কিন্তু গদ্যকবিতার ভাষাকে বাক্‌ছন্দের বিভাগ-অনুসারে ভেঙে ভেঙে স্তরে স্তরে বিন্যস্ত করার চিন্তা তাঁর মনে দেখা দেয়নি। সে চিন্তা দেখা দিয়েছিল রাজকৃষ্ণ রায়ের (১৮৪৯-৯৪) মনে। পদ্যের বিন্যাসপ্রণালীতে পদে পদে ভেঙে ভেঙে সাজানো গদ্যকে তিনি নাম দিয়েছিলেন 'পদ্য-পঙ্‌ক্তিক গদ্য'। 'বর্ষার মেঘ' নামে তাঁর একটি পদ্যপঙ্‌ক্তিক গদ্যকবিতা প্রকাশিত হয় 'আর্যদর্শন' পত্রিকায় ১২৯১ সালের শ্রাবণ (ইংরেজি ১৮৮৪ জুলাই) মাসে। এই কবিতাটির শেষে একটি পাদটীকায় তিনি বলেন, "যে-সকল গদ্যে পদ্যের কাব্যাত্মক ভাব থাকে,

সেইসকল গদ্যের কোন কোন বিষয় এইরূপ পদ্যপৌঙ্‌ক্তিক প্রণালীতে সাজাইয়া লেখা আমার বিবেচনায় ভাষার একটি নূতন অঙ্গ"। এর অত্যল্পকাল পরে প্রকাশিত তাঁর 'রাজা বিক্রমাদিত্য' নাটকে (১৮৮৪ অগস্ট) এই পদ্যপঙ্‌ক্তিক গদ্যের বহুল প্রয়োগ দেখা যায়।[১]

দেখা যাচ্ছে, 'লিপিকা'র গদ্যকবিতাগুলি প্রকাশের সময়ে রবীন্দ্রনাথের মনে যে 'ভীরুতা' দেখা দিয়েছিল, রাজকৃষ্ণ রায়ের মন সে ভীরুতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল।

একথা অবশ্য স্মরণীয় যে, বঙ্কিমচন্দ্র বা রাজকৃষ্ণ গদ্যকবিতা রচনা করলেও তাঁরা গদ্যকবিতা-রচনার ধারা প্রবর্তন করতে পারেননি। সে ধারা প্রবর্তিত হয় রবীন্দ্রপ্রতিভার জাদুস্পর্শে। রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্র বা রাজকৃষ্ণের অনুবর্তন করেননি; তাঁর হাতে গদ্যকবিতা দেখা দেয় তাঁর স্বকীয় উদ্‌ভাবনা ও অন্তরের প্রেরণার ফলেই।

কাব্য ও ছন্দ

এই প্রবন্ধটি 'ছন্দ' গ্রন্থের প্রথম প্রকাশের পরে লেখা (১৯৩৬ নভেম্বর ১২) এবং ১৩৪৩ সালের পৌষ-সংখ্যা 'কবিতা' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত। অতঃপর এটি স্থান পায় 'সাহিত্যের স্বরূপ' গ্রন্থে (১৩৫০) 'কাব্য ও ছন্দ' নামে। প্রবন্ধটিতে পদ্য ও গদ্য উভয়বিধ ছন্দ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের যে অভিমত ব্যক্ত হয়েছে, তার বিশেষ গুরুত্ব আছে। তাই এটিকে বর্তমান সংস্করণে গ্রহণ করা হল। রচনাবলী-সংস্করণে এটি নেই।

এই প্রসঙ্গে শান্তিনিকেতনে কথিত (১৯৩৯ অগস্ট ২৯) ও 'প্রবাসী'তে (১৩৪৬ মাঘ) প্রকাশিত এবং তৎপরে 'সাহিত্যের স্বরূপ'

১ দ্রষ্টব্য: সাহিত্যসাধক-চরিতমালা ৫০ (রাজকৃষ্ণ রায়), পৃ ৪৬-৫১।

গ্রন্থে সংকলিত 'গদ্যকাব্য'-নামক ভাষণপ্রবন্ধটিও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। এটির প্রাসঙ্গিক অংশটুকু সংকলিত হয়েছে 'ভাষণ' বিভাগে।

পরিশেষ

আয়তনে ছোটো অথচ বিষয়বস্তুর বিচারে স্বাতন্ত্র্যের মর্যাদা পেতে পারে, এমন কতকগুলি রচনা এই অংশে সংকলন করা হয়েছে। কয়েকটি বড়ো প্রবন্ধের ছন্দ-বিষয়ক অংশও এই বিভাগে স্থান পেয়েছে।

বাংলাভাষার স্বাভাবিক ছন্দ— এটি 'ভুবনমোহিনীপ্রতিভা'র (১৮৭৫) কবি নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়-প্রণীত 'সিন্ধুদূত'-নামক কাব্যের (১৮৮৩) সমালোচনার অংশ। প্রথম প্রকাশিত হয় 'ভারতী' পত্রিকায় ১২৯০ সালের শ্রাবণ-সংখ্যায়। প্রবন্ধটিতে লেখকের নাম নেই। কিন্তু লেখক যে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তার নিঃসন্দেহ প্রমাণ আছে। এই প্রবন্ধে বাংলা লৌকিক ছন্দের বিশ্লেষণ যে-ভাবে করা হয়েছে, রবীন্দ্রনাথের উত্তরকালীন বিশ্লেষণপ্রণালীর সঙ্গে তার হুবহু মিল আছে, এবং রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কারও বিশ্লেষণের সঙ্গেই তার সাদৃশ্য দেখা যায় না।[১] মূলগ্রন্থে যথাস্থানে পাদটীকায় এসব সাদৃশ্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে সংক্ষেপে।

প্রথম প্রকাশকালে 'ছন্দ' গ্রন্থে এটি ছিল না। এই সংস্করণেই প্রথম গৃহীত হল। মূলরচনার একটি বাক্যাংশ থেকে প্রবন্ধটির নূতন নামকরণ করা হল। রচনাবলীতে এই সংস্করণের নীতিই অনুসৃত হয়েছে।

বাংলা শব্দ ও ছন্দ— এটিই স্বনামে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের প্রথম ছন্দপ্রবন্ধ। প্রথম প্রকাশ 'সাধনা'য় ১২৯৯ সালের শ্রাবণ-সংখ্যায়।

১ দ্রষ্টব্য: প্রবোধচন্দ্র সেন-লিখিত 'রবীন্দ্রনাথ ও লৌকিক ছন্দ' প্রবন্ধ— বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৫১ শ্রাবণ, এবং 'চলতি ভাষার ছন্দ' প্রবন্ধের পাঠপরিচয়, পৃ ৪২৪-২৫।

'ছন্দ' গ্রন্থের প্রথম মুদ্রণে এটিকেও ধরা হয়নি। রচনাবলীতে বর্তমান সংস্করণের আদর্শে এটিকে 'পরিশিষ্টে' স্থান দেওয়া হয়েছে।

প্রবন্ধটি 'মানসী' কাব্য প্রকাশের পরে রচিত। 'মানসী' রচনার সময়েই (১৮৮৭-৯০) কবির মনে 'ছন্দের নানা খেয়াল' দেখা দিতে আরম্ভ করে এবং 'কবির সঙ্গে একজন শিল্পী এসে যোগ' দেয়। কবির এই সময়কার ছন্দচিন্তা প্রকাশ পেয়েছে এই প্রবন্ধটিতে। রবীন্দ্রনাথের পরবর্তিকালীন বহু ধারণার প্রথম আভাস পাওয়া যায় এটিতে। এটাই এর প্রধান গুরুত্ব।

'সাধনা' পত্রিকায় প্রকাশিত (১৩০১ মাঘ) 'সাধনসপ্তকম্' নামে একখানি সংস্কৃত গ্রন্থের বাংলা পদ্যানুবাদের সমালোচনা এই প্রবন্ধের প্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। পত্রিকায় এই সমালোচনার লেখকের নাম নেই। কিন্তু লেখক যে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ, তাতে বোধ করি সন্দেহের অবকাশ নেই। এই অংশটুকুতে যে অভিমত প্রকাশ পেয়েছে, রবীন্দ্রসাহিত্যের (বিশেষতঃ এই 'ছন্দ' গ্রন্থের) নানা স্থানেই তা ছড়িয়ে আছে। স্মরণীয় : 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থের 'পিতৃদেব' অধ্যায়ে গীতগোবিন্দ কাব্যের 'নিভৃতনিকুঞ্জগৃহং' এবং কুমারসম্ভব কাব্যের 'মন্দাকিনীনির্ঝর' প্রভৃতি অংশের প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের উক্তি। তুলনীয় : 'পয়ার ও দ্বাদশাক্ষর' প্রবন্ধের প্রথম দুটি বাক্যে প্রকাশিত সংস্কৃত কাব্যের বাংলা অনুবাদ সম্বন্ধে তাঁর অভিমত (পৃ ২২৬) এবং প্যারীমোহন সেনগুপ্তকে লেখা পত্রে (পৃ ১৮৯-৯০) সংস্কৃত কাব্যের ধ্বনিসংগীত সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য।

'সাধনা' পত্রিকার উক্ত সমালোচনা-অংশে প্রযুক্ত 'শব্দ ও ছন্দ' শব্দ-দুটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। বস্তুতঃ এই অংশটুকু 'সংস্কৃত শব্দ ও ছন্দ' নামে অভিহিত হবার এবং 'বাংলা শব্দ ও ছন্দ' প্রবন্ধের পরিপূরক বলে গণ্য হবার যোগ্য। কালক্রমের বিচারে এটির স্থান

'বিহারীলালের ছন্দ' নিবন্ধের পরে অথবা 'পয়ার ও দ্বাদশাক্ষর ছন্দ' নিবন্ধের অব্যবহিত পূর্বে। এই সমালোচনা-অংশটুকু 'সম্পূরণ' বিভাগে সংকলিত হল 'সংস্কৃত শব্দ ও ছন্দ' নামে।

বিহারীলালের ছন্দ— এটি ১৩০১ সালের আষাঢ়-সংখ্যা 'সাধনা' পত্রিকায় প্রকাশিত 'বিহারীলাল' প্রবন্ধের প্রাসঙ্গিক অংশ। পরবর্তী কালে প্রবন্ধটি 'আধুনিক সাহিত্য' গ্রন্থে (১৯০৭) সংকলিত হয়। 'ছন্দ' গ্রন্থের প্রথম মুদ্রণে বা রচনাবলী-সংস্করণে এটি গৃহীত হয়নি।

সন্ধ্যাসংগীতের ছন্দ— এটি 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থের 'সন্ধ্যাসংগীত'-শীর্ষক অধ্যায়ের অংশবিশেষ। এই অংশটি প্রথম মুদ্রিত হয় 'প্রবাসী' পত্রিকায় ১৩১৯ সালের বৈশাখ মাসে। 'ছন্দ' গ্রন্থের পূর্ববর্তী কোনো সংস্করণেই এটি স্থান পায়নি।

বিবিধ

এই বিভাগে মুদ্রিত ছন্দপ্রসঙ্গগুলি নানা কাব্যের ভূমিকা বা বিবিধ-বিষয়ক প্রবন্ধ থেকে সংকলিত। এগুলি আয়তনে এত ক্ষুদ্র যে, এগুলিকে স্বতন্ত্র প্রবন্ধের মর্যাদা দেওয়া চলে না; অথচ নানা দিক্ থেকে ছন্দ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের স্বতঃপ্রকাশিত মতামতের পরিচায়ক হিসাবে এগুলির প্রচুর মূল্য আছে। প্রসঙ্গ-অনুসারে এই অংশগুলির নূতন নামকরণ করা হল। অনেক ক্ষেত্রেই নামগুলি রবীন্দ্রনাথের ব্যবহৃত কোনো বাক্যাংশ থেকে নেওয়া। এই সংস্করণেই এগুলি প্রথম স্থান পেল।

'বাংলা ছন্দে যুক্তাক্ষর', 'ছড়ার ছন্দ' এবং 'গদ্যকবিতার ছন্দ', এই তিনটি অংশ যথাক্রমে মানসী (১২৯৭ পৌষ), ছড়ার ছবি (১৩৪৪ আশ্বিন) এবং পুনশ্চ (১৩৩৯ আশ্বিন) কাব্যের প্রথম সংস্করণের ভূমিকা থেকে সংকলিত। 'বাংলা ছন্দে স্বরবর্ণ' অংশটি 'বাংলাভাষা-পরিচয়'

গ্রন্থের (১৩৫০ কার্তিক) দ্বাদশ অধ্যায় থেকে গৃহীত। 'বাংলা ছন্দে অনুপ্রাস' ১৩০২ সালের জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যা 'সাধনা'য় প্রকাশিত 'গুপ্তরত্নোদ্ধার'-শীর্ষক সমালোচনা-প্রবন্ধের অংশবিশেষ। পরে 'লোকসাহিত্য' গ্রন্থে (১৯০৭) 'কবিসংগীত' নামে সংকলিত। 'কৌতুককাব্যের ছন্দ' ১৩০৫ সালের 'ভারতী' পত্রিকায় অগ্রহায়ণ-সংখ্যায় প্রকাশিত কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'আষাঢ়ে' কাব্যের সমালোচনা থেকে সংকলিত। মূলপ্রবন্ধটির নাম 'আষাঢ়ে'। এটি পরে ওই নামেই 'আধুনিক সাহিত্য' গ্রন্থের (১৯০৭) অন্তর্ভুক্ত হয়।

চিঠিপত্র

'ছন্দ' গ্রন্থের প্রথম মুদ্রণকালে অধ্যাপক জে. ডি. এণ্ডারসনকে লেখা প্রথম পত্রটি এবং ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে লেখা তিনটি চিঠি (বর্তমান সংস্করণের ৩, ৪ ও ৫-সংখ্যক পত্র) প্রকাশিত হয়েছিল। এই সংস্করণে বিভিন্ন ব্যক্তিকে লেখা আরও অনেকগুলি চিঠি সংকলিত হল। প্রথম মুদ্রণে সঞ্জয় ভট্টাচার্যকে লেখা একটি চিঠি 'মোটকথা' বিভাগে 'গদ্যছন্দ' নামে প্রকাশিত হয়েছিল। বর্তমান সংস্করণে এটিও 'চিঠিপত্র' বিভাগে মুদ্রিত হল। এই সংস্করণে মুদ্রিত ধূর্জটিপ্রসাদকে লেখা প্রথম পত্রটি 'পুনশ্চ' কাব্যের উপহৃত কপিতে লেখা ছিল।

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে লেখা একটি পত্র অধ্যাপক এণ্ডারসনকে লেখা দ্বিতীয় পত্রের পাঠপরিচয়-প্রসঙ্গে যথাস্থানেই মুদ্রিত হয়েছে (পৃ ৩৪৪-৪৫)। এই পত্রখানির প্রসঙ্গনিরপেক্ষ স্বতন্ত্র মূল্য নেই। অধ্যাপক এণ্ডারসনকে লেখা একখানি ইংরেজি পত্র স্থাপিত হল 'সম্পূরণ' বিভাগে (দ্রষ্টব্য পৃ ৩৭০)।

প্যারীমোহন সেনগুপ্তকে লেখা পত্রখানির অংশবিশেষ 'উদয়ন'

পত্রিকায় (১৩৪০ জ্যৈষ্ঠ) প্রকাশিত হয় 'সংস্কৃত কাব্যের অনুবাদ' নামে। বর্তমান সংস্করণে রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত পত্রের প্রতিলিপি থেকে পূর্ণতর পাঠ গৃহীত হল। পত্রখানি মূলতঃ লিখিত হয় প্যারীমোহন সেনগুপ্তের 'মেঘদূত' গ্রন্থের (১৩৩৭) প্রবোধচন্দ্র সেন -লিখিত ভূমিকায় 'মেঘদূতের অনুবাদ' অংশে উত্থাপিত বিষয়ের পুনর্বিচার উপলক্ষে।[১] সংস্কৃত কাব্যের বাংলা অনুবাদে ছন্দপ্রয়োগ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের অভিমত ব্যক্ত হয়েছে নানা স্থানেই। এই সম্পর্কে বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য 'পয়ার ও দ্বাদশাক্ষর ছন্দ' প্রসঙ্গ (পৃ ২২৬-২৭) এবং 'সাধনসপ্তকম্'-নামক সংস্কৃত গ্রন্থের বাংলা অনুবাদপ্রসঙ্গ (পৃ ৪৩৫-৩৬)।

ছন্দ-বিষয়ক চিঠিপত্রসংকলন-ব্যাপারে রচনাবলীতে বর্তমান সংস্করণের নীতিই অনুসৃত হয়েছে। তবে অধ্যাপক এণ্ডারসনকে লেখা পত্র-দুখানি রচনাবলীতে স্থাপিত হয়েছে 'চিঠিপত্র' বিভাগে। আলোচিত বিষয়ের গুরুত্ববিবেচনায় বর্তমান সংস্করণে এ-দুটিকে মূলগ্রন্থেই স্থাপন করা হল এবং কালক্রমের বিচারে এ-দুটির স্থান হয়েছে সর্বপ্রথমে। বস্তুতঃ এ-দুটি পত্রমাত্র নয়, পত্রাকারে প্রবন্ধ। আর এই পত্রপ্রবন্ধ-দুটিই রবীন্দ্রনাথের পরবর্তিকালীন সমস্ত ছন্দ-আলোচনার ভূমিকা বা প্রবেশক।

পক্ষান্তরে সঞ্জয় ভট্টাচার্যকে লেখা একখানি পত্র রচনাবলীতে স্থাপিত হয়েছে 'মোটকথা' বিভাগের দ্বিতীয় অংশে এবং বর্তমান সংস্করণে স্থাপিত হয়েছে 'চিঠিপত্র' বিভাগে। 'মোটকথা'র প্রথম অংশ মূলতঃ 'ছন্দের প্রকৃতি' প্রবন্ধেরই একটি বিভাগ (দ্রষ্টব্য পৃ ৪১৬-১৭); বর্তমান সংস্করণে এটিকে স্বস্থানেই পুনঃস্থাপন করা হয়েছে। ফলে বর্তমান সংস্করণে 'মোটকথা' নামে কোনো বিভাগ রইল না।

১ এই সম্পর্কে দ্রষ্টব্য প্রবোধচন্দ্র সেন -লিখিত 'বাংলা কবিতায় সংস্কৃত ছন্দ'-নামক প্রবন্ধ— ভারতবর্ষ ১৩৪১ অগ্রহায়ণ।

অধ্যাপক এণ্ডারসন ও সঞ্জয় ভট্টাচার্যকে লিখিত পত্র-সম্পর্কে রচনাবলীতে প্রথম সংস্করণের বিন্যাসব্যবস্থাই অনুসৃত হয়েছে। বর্তমান সংস্করণের প্রধানতম নীতি হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের ছন্দচিন্তার পৌর্বাপর্য রক্ষা করে তার ঐতিহাসিক বিবর্তনধারাকে প্রকট করা। তাই অনেক ক্ষেত্রেই প্রথম সংস্করণ ও রচনাবলী-সংস্করণের বিন্যাসপদ্ধতির সঙ্গে এই সংস্করণের পার্থক্য ঘটেছে।

ভাষণ

এই বিভাগে যে তিনটি নিবন্ধ সংগৃহীত হল, সে তিনটিই বিভিন্ন উপলক্ষে কথিত রবীন্দ্রনাথের ভাষণের অনুলিখিত রূপ। এগুলির বিশদ বিবরণ পাঠপরিচয়ের প্রথমাংশেই দেওয়া হয়েছে (পৃ ৩১৬-১৭)। 'ছন্দ' গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে এগুলি ছিল না। বস্তুতঃ, দ্বিতীয় ভাষণটি প্রকাশিত হয় 'ছন্দ' গ্রন্থ প্রকাশের সমকালেই (১৩৪৩ আষাঢ়) এবং তৃতীয়টি প্রকাশিত হয় তার পরে (১৩৪৬ মাঘ)। রচনাবলী-সংস্করণেও এই ভাষণগুলি স্থান পায়নি।

সংযোজন

পয়ার ও দ্বাদশাক্ষর ছন্দ

এটি কবি নবীনচন্দ্র দাস (১৮৫৩-১৯১৪)-কৃত রঘুবংশ কাব্যের পদ্যানুবাদ দ্বিতীয় ভাগের (৯ম-১৫শ সর্গ) সমালোচনা। সমালোচনাটি প্রকাশিত হয় ১৩০২ সালের বৈশাখ-সংখ্যা 'সাধনা' পত্রিকায়। 'সাধনা'য় সমালোচকের নাম ছিল না। কিন্তু সমালোচক যে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাতে সন্দেহ নেই। এই নিবন্ধের ভাষা ও অভিমত সর্বতোভাবেই রবীন্দ্রনাথের ভাষা ও অভিমতের অনুরূপ। গ্রন্থমধ্যে

যথাস্থানে পাদটীকায় এইসব ভাষা- ও মত -সাদৃশ্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে 'সাধনসপ্তকম্'-নামক গ্রন্থের পদ্যানুবাদ-বিষয়ক সমালোচনার (পৃ ৪৩৫-৩৬) ভাষা ও অভিমতের কথা স্মরণীয়। সমালোচনাটুকু 'সম্পূরণ' বিভাগে সংকলিত হয়েছে 'সংস্কৃত শব্দ ও ছন্দ' নামে।

কালক্রমের বিচারে 'সাধনসপ্তকম্'-এর সমালোচনাপ্রসঙ্গ এবং 'পয়ার ও দ্বাদশাক্ষর ছন্দ', এই দুটি নিবন্ধেরই প্রকৃত স্থান 'বিহারীলালের ছন্দ' প্রবন্ধের (১৩০১ আষাঢ়) পরে এবং 'বাংলা ছন্দে অনুপ্রাস' নিবন্ধের (১৩০২ জ্যৈষ্ঠ) অব্যবহিত পূর্বে।

'ছন্দ' গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে বা রচনাবলী-সংস্করণে এটি ছিল না। এই সংস্করণেই প্রথম গৃহীত হল।

পাণ্ডুলিপি-পরিচয়

প্রথম ও দ্বিতীয় পর্বের ছন্দপ্রবন্ধগুলির পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়নি। তৃতীয় পর্বের প্রবন্ধগুলির পাণ্ডুলিপি রক্ষিত আছে রবীন্দ্রসদনে। কোনো কোনো প্রবন্ধের প্রাথমিক খসড়া ও তার পুনর্লিখিত এক বা একাধিক সংস্করণও আছে। শুধু রবীন্দ্রনাথের স্বহস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি নয়, কোনো কোনো প্রবন্ধের অন্যের হাতে লেখা এবং কবিকর্তৃক স্বহস্তে সংশোধিত প্রতিলিপিও আছে। নীচে রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত পাণ্ডুলিপিগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া গেল। সব পাণ্ডুলিপিতে এখনও সংখ্যা বসানো হয়নি। যে-সব পাণ্ডুলিপির সংখ্যাপরিচয় আছে সেগুলির বিবরণপ্রসঙ্গে পরিচায়ক সংখ্যাগুলিও যথাস্থানে উল্লিখিত হল।

ছন্দের হসন্ত-হলন্ত

প্রথম পর্যায়— ১৩৩৮ সালের পৌষ-সংখ্যা 'বিচিত্রা'য় প্রকাশিত 'বাংলা ছন্দ' নামে। কবির স্বহস্তলিখিত সম্পূর্ণ প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপি (পৃ ১-৮) আছে রবীন্দ্রসদনে। পাণ্ডুলিপিতে প্রবন্ধের নাম নেই। রচনার তারিখও নেই।

দ্বিতীয় পর্যায়— এটির পাণ্ডুলিপি আছে তিনটি।—

এক। প্রবন্ধের প্রথম অংশের খসড়া (পৃষ্ঠাসংখ্যা ৫)। শুধু 'উত্তরা'য় প্রকাশিত দিলীপকুমারের নোটের (পৃ ৫৯, ৩৮৭-৮৯) উত্তর। কবির স্বহস্তলিখিত। সমগ্র ও স্বয়ংসম্পূর্ণ; কিন্তু অপ্রকাশিত। নাম ও তারিখ -হীন।

দুই। ১৩৩৮ সালের মাঘ-সংখ্যা 'পরিচয়ে' প্রকাশিত প্রবন্ধের প্রথম খসড়া। প্রথমাংশ (পৃ ১-১০) কবির স্বহস্তলিখিত। শেষাংশ (পৃ ১১-১৬) অন্যের হাতে লেখা ও কবিকর্তৃক সংশোধিত। নাম ও তারিখ -হীন।

তিন। উক্ত প্রবন্ধের খসড়া প্রেসকপি (পৃ ১-২০)। অন্যের হাতে লেখা এবং কবিকর্তৃক সংশোধিত ও স্বাক্ষরিত।

তৃতীয় পর্যায় ('নবছন্দ' প্রবন্ধের প্রথমাংশ)— ১৩৩৯ সালের কার্তিক-সংখ্যা 'পরিচয়ে' প্রকাশিত। 'নবছন্দ' প্রবন্ধের দ্বিতীয়াংশ 'ছন্দ' গ্রন্থে স্থান পেয়েছে 'ছন্দের মাত্রা' প্রবন্ধের প্রথম পর্যায়রূপে (পৃ ৪০৩)। উক্ত 'নবছন্দ' প্রবন্ধের সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি (৩২-সংখ্যক) রক্ষিত আছে রবীন্দ্রসদনে। সমগ্র 'নবছন্দ' প্রবন্ধটি (পৃ ১-১২) কবির স্বহস্তলিখিত ; কিন্তু নামহীন। রচনার তারিখ আছে ৩০ জুলাই ১৯৩২।

এই 'নবছন্দ' প্রবন্ধটির অন্যের হাতে লেখা ও কবিকর্তৃক সংশোধিত আরও একটি প্রতিলিপি আছে। প্রতিলিপিটি খণ্ডিত। প্রথমাংশের একটি পূর্ণপৃষ্ঠা ও দ্বিতীয়াংশের দুটি ছিন্ন পাতা মাত্র পাওয়া গিয়েছে। এটিতে রচনার তারিখ নেই, প্রবন্ধের নামও নেই।

সংস্কৃত বাংলা ও প্রাকৃত-বাংলার ছন্দ

১৩৩৯ সালের শ্রাবণ-সংখ্যা 'পরিচয়ে' প্রকাশিত 'ছন্দ-বিতর্ক' নামে। পাণ্ডুলিপি কবির স্বহস্তলিখিত। পৃষ্ঠাসংখ্যা ১-৫। প্রবন্ধের নামও নেই, তারিখও নেই।

ছন্দের মাত্রা

প্রথম পর্যায় ('নবছন্দ' প্রবন্ধের শেষাংশ)— এটির পাণ্ডুলিপি-পরিচয় পূর্বেই দেওয়া হয়েছে 'ছন্দের হসন্ত-হলন্ত : তৃতীয় পর্যায়'-এর প্রসঙ্গে (পৃ ৪১৪)।

দ্বিতীয় পর্যায়— ১৩৪১ সালের জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যা 'উদয়ন' পত্রিকায় প্রকাশিত 'ছন্দের মাত্রা' নামে। এই প্রবন্ধের দুটি পাণ্ডুলিপি আছে। দুটিই কবির স্বহস্তলিখিত। দুটিই তারিখহীন। একটি প্রবন্ধের প্রাথমিক খসড়া (পৃ ১-২০)। এটিতে প্রবন্ধের নাম দেওয়া আছে 'ছন্দের

রূপ'। দ্বিতীয়টি এরই পূর্ণতর ও উন্নততর রূপ (৩-সংখ্যক পাণ্ডুলিপি, পৃ ১-২৬ এবং ৩৬-৩৭)। এটিতে আছে প্রবন্ধের নূতন নাম 'ছন্দের মাত্রা'।

ছন্দের প্রকৃতি

১৯৩৩ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর তারিখে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠিত ও ১৩৪১ সালের বৈশাখ-সংখ্যা 'উদয়ন' পত্রিকায় প্রকাশিত 'ছন্দ' নামে। রবীন্দ্রনাথ যে নিজ রচনার উৎকর্ষবিধানের জন্য অসীম শ্রমস্বীকারেও কুণ্ঠিত হতেন না, তার প্রকৃষ্টতম নিদর্শন এই প্রবন্ধটি। কত যে নিষ্ঠা ও যত্ন-সহকারে তিনি রচনার উন্নতিসাধনে ব্রতী হতেন, তার পরিচয় পাওয়া যায় এই প্রবন্ধের প্রতি ছত্রেই। এই দীর্ঘ প্রবন্ধটির নয়টি খসড়া আছে রবীন্দ্রসদনে— পাঁচটি সম্পূর্ণ ও চারটি আংশিক। পাঁচটি সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপির মধ্যে চারটিই তাঁর স্বহস্তলিখিত ও পুনঃপুনঃ পরিমার্জিত, এবং একটি অন্যের হাতে লেখা প্রতিলিপি ও কবিকর্তৃক বহুলপরিমাণে সংশোধিত। চারটি আংশিক পাণ্ডুলিপির মধ্যে তিনটি অন্যের হাতে লেখা প্রতিলিপি ও কবিকর্তৃক পরিমার্জিত, এবং একটি তাঁর নিজের হাতে লেখা। প্রত্যেকটি খসড়াই পূর্ববর্তী খসড়ার উন্নততর সংস্করণ। সর্বশেষ সংস্করণটি কবির স্বহস্তে লিখিত। এই শেষ সংস্করণে প্রবন্ধের নাম দেওয়া আছে 'ছন্দ', কিন্তু কোনো তারিখ নেই। পূর্ববর্তী সংস্করণগুলির মধ্যে কোনোটিতেই নাম নেই, তারিখ আছে মাত্র একটিতে। প্রবন্ধের ভাষা ও বিষয়বস্তুর উপস্থাপনা নিয়ে রবীন্দ্রনাথের এই যে অতৃপ্তি ও সংস্কারসাধনের অশ্রান্ত প্রয়াস, তা বিশেষভাবে লক্ষিত হয় প্রবন্ধের আরম্ভাংশেই। প্রবন্ধের এই ভূমিকাংশের পুনঃপুনঃ পরিবর্তনের প্রতি দৃষ্টি রেখেই পাণ্ডুলিপিগুলির বিবর্তনক্রম অনুসরণ করা যায়। প্রবন্ধের আরম্ভ ও শেষ অংশ নির্দেশ

করে নীচে এই প্রবন্ধটির ক্রমিক বিবর্তনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া গেল। রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত পাণ্ডুলিপিগুলির মধ্যে শুধু বাঁধানো খাতাগুলিকেই সংখ্যানির্দিষ্ট করা হয়েছে; অগ্রথিত খণ্ড কাগজে লেখা পাণ্ডুলিপিগুলিতে এখনও সংখ্যা বসানো হয়নি। নিম্নোক্ত নয়টি পাণ্ডুলিপির মধ্যে শুধু প্রথম ও শেষটি আছে বাঁধানো খাতায়, তাই এ-দুটির সংখ্যাপরিচয়ও পাওয়া যায়। অন্যগুলি আছে খুচরো কাগজে, এগুলির কোনো সংখ্যানির্দেশও নেই।

প্রথম পাণ্ডুলিপি (১৯৭-সংখ্যক)—বাঁধানো লিলি এক্‌সারসাইজ বুক। এই বাঁধানো খাতাটির প্রথমাংশে (পৃ ১-১৮) আছে এই প্রবন্ধটির একটি প্রাথমিক খসড়া এবং দ্বিতীয়াংশে (পৃ ১৮-৪৬) আছে 'গদ্যছন্দ' প্রবন্ধের প্রাথমিক খসড়া। দুটিই কবির নিজের হাতে লেখা। দুটি প্রবন্ধের একটিরও নাম দেওয়া নেই, রচনার তারিখও নেই। তবে দ্বিতীয় প্রবন্ধটি যে প্রথমটির প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই লিখিত হয়েছিল তাতেও বোধ করি সন্দেহের অবকাশ নেই।

এই পাণ্ডুলিপিতে প্রথম প্রবন্ধটির ('ছন্দের প্রকৃতি'র) প্রথমাংশের কবিকৃত ইংরেজি অনুবাদও আছে বাংলা লেখার পাশে পাশে। কিন্তু এই অনুবাদ তিন পৃষ্ঠার বেশি অগ্রসর হয়নি। সম্ভবতঃ কবির অভিপ্রায় ছিল সমগ্র প্রবন্ধটির ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করার, কিন্তু পরে সে ইচ্ছা পরিত্যক্ত হয়।

পাণ্ডুলিপিটি সম্পূর্ণ। এটির আরম্ভ ও শেষ নিম্নলিখিতরূপ।—

আরম্ভ—'ভিন্নপ্রদেশী আমার এক বন্ধু বাংলা ছন্দ সম্বন্ধে আমাকে কিছু বল্‌তে অনুরোধ করেচেন।'

এই পাণ্ডুলিপির উপসংহার-অংশটুকুর স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য আছে তার শেষ বক্তব্যটুকু এস্থলে উদ্‌ধৃতিযোগ্য।—

"সমস্ত প্রবন্ধে যত দৃষ্টান্ত দিয়েছি সবই লৈখিক ভাষায়। লৈখিক[১] ভাষাতেও ছন্দের মূলতত্ত্ব একই। তার একটি প্রমাণ দিয়ে উপসংহার করি।—

বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদেয় এলো বান—
শিব ঠাকুরের বিয়ে হবে তিন কন্যে দান ॥

এও পয়ার। হসন্তের জালে বাঁধা এর শব্দপুঞ্জের চেহারাটাকে বড়ো দেখাচ্চে। এ'কেই সাধুভাষার কাঠামোয় ভরলে ছন্দটার শ্রেণী-নির্ণয় সহজ হবে। যথা—

বৃষ্টি ঝরে ঝরো ঝরো ডেকে এলো বান,
শিবঠাকুরের বিয়ে তিন কন্যে দান ॥"

দ্বিতীয় পাণ্ডুলিপি— স্বহস্তলিখিত, সম্পূর্ণ (পৃ ১-১২ এবং ১৩-৩০)। প্রথম খসড়াটির পূর্ণতর সংস্করণ। এটিতে রচনার তারিখ আছে ৮ অগস্ট ১৯৩৩। সুতরাং ১৯৭-সংখ্যক পাণ্ডুলিপিটি এটির অল্পকাল-পূর্ববর্তী বলে অনুমান করা যায়।

আরম্ভ—'ভিন্নপ্রদেশী আমার এক বন্ধু বাংলা ছন্দ সম্বন্ধে আমাকে কিছু বল্‌তে অনুরোধ করেচেন।'

শেষ—'আরো কিছু বলা বাকি আছে আর একদিন বলবার ইচ্ছা রইল।'

তৃতীয় পাণ্ডুলিপি— স্বহস্তলিখিত, সম্পূর্ণ (পৃষ্ঠাসংখ্যা ২৩)। দ্বিতীয় পাণ্ডুলিপির পুনঃসংস্করণ।

আরম্ভ—'ভিন্নপ্রদেশী আমার কোনো বন্ধু বাংলা ছন্দ সম্বন্ধে আমাকে কিছু বল্‌তে বলেচেন।'

১ ভ্রমক্রমে লেখা হয়েছে 'লৈখিক'। রবীন্দ্রনাথের অভিপ্রেত শব্দটি বোধ হয় 'মৌখিক'।

শেষ— 'আরো কিছু বলা বাকি আছে, আর একদিন বলবার ইচ্ছা রইল ॥'

চতুর্থ পাণ্ডুলিপি—দ্বিতীয় পাণ্ডুলিপির অসম্পূর্ণ প্রতিলিপি (পৃ ১-১০)। অন্যের হাতে লেখা ও কবিকর্তৃক স্বহস্তে সংশোধিত। প্রবন্ধের প্রথমাংশ মাত্র।

আরম্ভ— 'ভিন্নপ্রদেশী আমার এক বন্ধু বাংলা ছন্দ সম্বন্ধে আমাকে কিছু বলতে অনুরোধ করেছেন।'

শেষ— 'চক্ষুর পল্লবে নিবিড় কজ্জল
গলিছে অশ্রুর নির্ঝরে।'

কিন্তু এই বোঝা পয়ারজাতীয় পালোয়ানের স্কন্ধে যদি চাপাই তাতে দুর্ঘটনার শঙ্কা থাকবে না। প্রথমে বিনা বোঝার চালটা দেখানো যাক,—'

—দ্রষ্টব্য পৃ ১২১, বর্তমান সংস্করণ

এই পাণ্ডুলিপিটির পেছনের পৃষ্ঠায় কবি স্বহস্তে মন্দাক্রান্তা ছন্দের বাংলা প্রতিরূপের একটি খসড়া করেছেন মেঘদূতের প্রথম শ্লোকের অনুবাদ হিসাবে। এর প্রথমাংশটুকু এই।—

"কোনো এক যক্ষ সে
প্রভুর সেবা কাজে
প্রমাদ ঘটাইল
উন্মনা"।

পঞ্চম পাণ্ডুলিপি— তৃতীয় পাণ্ডুলিপির অসম্পূর্ণ প্রতিলিপি ; অন্যের হাতে লেখা চার পৃষ্ঠা এবং পরিবর্তিত পাঠ হিসাবে কবির হাতে লেখা তিন পৃষ্ঠা। প্রবন্ধের প্রথমাংশ মাত্র।

আরম্ভ— 'ভিন্নপ্রদেশী আমার কোনো বন্ধু বাংলা ছন্দ সম্বন্ধে আমাকে কিছু বলতে বলেছেন।' ইত্যাদি মুখবন্ধটা কেটে কবি তাঁর

বক্তব্য বিষয়কে উপস্থাপন করেছেন নূতন মুখবন্ধ দিয়ে। এই মুখবন্ধের আরম্ভাংশ এই।— 'নাচের দুটি অঙ্গ প্রধান। এক, দেহের ভার, আর, দেহের গতি।'

শেষাংশ অপরিবর্তিত। তার শেষ লাইনটা এই।—

'অস্থিবিদ্ধ গলে করে ঘোর গর্জন।'

—দ্রষ্টব্য পৃ ১১৭, বর্তমান সংস্করণ

ষষ্ঠ পাণ্ডুলিপি— অন্যের হাতে লেখা অসম্পূর্ণ প্রতিলিপি— চারটি পূর্ণায়তন কাগজ ও ছয়টি খণ্ডিত কাগজ। শুধু প্রথম কয়েক পৃষ্ঠার প্রতিলিপি এবং কবিকর্তৃক বহুলাংশে পুনর্লিখিত।

'নাচের দুটি অঙ্গ প্রধান। এক, দেহের ভার, আর, দেহের গতি।'— প্রতিলিপির এই মুখবন্ধটাকে কেটে বাদ দিয়ে কবি প্রবন্ধ আরম্ভ করেছেন আর-একটি নূতন মুখবন্ধ দিয়ে। সেটি এই।— 'ভার এবং গতি এই দুই বৈপরীত্যের সামঞ্জস্যেই ছন্দ। নৃত্যে একদিকে দেহের ভার আর একদিকে দেহের গতি, দুইয়ের সুসম্পূর্ণ মিলনে তার উৎকর্ষ।'

শেষাংশ অপরিবর্তিত। শেষাংশের প্রথম বাক্যটি এই।— 'জাপানে ফুলদানিতে ফুল সাজাবার একটি কলাবিদ্যা আছে।'

—দ্রষ্টব্য পৃ ১১৬, বর্তমান সংস্করণ

সপ্তম পাণ্ডুলিপি— অন্যের হাতে লেখা সমগ্র প্রবন্ধের সম্পূর্ণ প্রতিলিপি (পৃষ্ঠাসংখ্যা ২৯) এবং কবিকর্তৃক পরিমার্জিত।

'ভার এবং গতি এই দুই বৈপরীত্যের সামঞ্জস্যেই ছন্দ। নৃত্যে একদিকে দেহের ভার আর একদিকে দেহের গতি, দুইয়ের সুসম্পূর্ণ মিলনে তার উৎকর্ষ।' ইত্যাদি মুখবন্ধটাকে কেটে বাদ দিয়ে কবি আর-একটা নূতন মুখবন্ধ দিয়ে প্রবন্ধের সূত্রপাত করেছেন। নূতন মুখবন্ধের আরম্ভটুকু এই।— 'শিব ছিলেন উদাসীন, উমা তাঁর চিত্ত

আকর্ষণ করলেন, যিনি ছিলেন স্তব্ধ তাঁকে করলেন বিচলিত, তাঁদের মিলন থেকে জন্ম নিলেন স্বর্গজয়ী কুমার।'

'আরো কিছু বলা বাকি আছে, আর একদিন বলবার ইচ্ছা রইল॥'— এই শেষবাক্যটি অপরিবর্তিতই আছে।

অষ্টম পাণ্ডুলিপি— সপ্তম পাণ্ডুলিপির মুখবন্ধটুকুর পুনর্লিখিত রূপ (দুই পৃষ্ঠা)। কবির নিজ হাতে লেখা। এই মুখবন্ধের আরম্ভ ও শেষ অংশ নিম্নলিখিতরূপ।

আরম্ভ—'শিব ছিলেন নিশ্চেষ্ট নিষ্ক্রিয়, উমা তাঁর স্তব্ধতাকে ভাঙিয়ে দিলেন, তাঁদের মিলন থেকে জন্মালেন স্বর্গজয়ী কুমার।'

শেষ— 'অন্য জন্তুর দেহেও ভাবের ভাষা আছে কিন্তু মানুষের দেহভঙ্গীর মতো সে ভাষা সংস্কৃতি লাভ করে নি, এত শক্তি নেই তার।'

—দ্রষ্টব্য পৃ ১১৩, বর্তমান সংস্করণ

নবম পাণ্ডুলিপি (৪-সংখ্যক)— সমগ্র প্রবন্ধের কবির স্বহস্তলিখিত পরিমার্জিত রূপ (পৃ ১-৪৬)। 'কাজল কালি' চিঠির কাগজের প্যাডে লেখা। এই পাণ্ডুলিপির পাতাগুলিকে পরে স্বচ্ছ আবরণবদ্ধ (laminate) করে খাতার আকারে বাঁধিয়ে নেওয়া হয়েছে। এই শেষ সংস্করণে প্রবন্ধের নাম দেওয়া আছে 'ছন্দ', কিন্তু কোনো তারিখ নেই। এই সংস্করণের আরম্ভ ও শেষ অংশ এ-রকম।

আরম্ভ— 'শিব ছিলেন নিশ্চেষ্ট নিষ্ক্রিয়, উমা তাঁর স্তব্ধতাকে দিলেন নাড়িয়ে, সেই মিলন থেকে জন্মালেন স্বর্গজয়ী কুমার।'

শেষ— 'ছন্দ সম্বন্ধে আরো কিছু বলা বাকি রইল আর কোনো সময়ে পরে বলবার ইচ্ছা আছে।' তার পরেও আছে একটি 'উপসংহার'। 'উদয়ন' পত্রিকায় প্রকাশের সময়ে এই উপসংহারের বক্তব্য বিষয় অব্যাহত থাকে, কিন্তু তার ভাষা কিছু পরিমাণে মার্জিত ও পরিবর্তিত হয়।

৪-সংখ্যক পাণ্ডুলিপিতে প্রাপ্ত এই শেষ সংস্করণটিই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠিত ও 'উদয়ন' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় 'ছন্দ' নামে। পত্রিকা থেকে গ্রন্থে গ্রহণকালে প্রবন্ধটির ভাষায় ও বিষয়বস্তুর সংস্থাপনায় বহুবিধ সংস্কার ও পরিবর্তন করা হয়। যথাস্থানে তার পরিচয় দেওয়া হয়েছে। এই একটিমাত্র প্রবন্ধের পরিমার্জনায় ও উৎকর্ষবিধানে রবীন্দ্রনাথ যে অসীম নিষ্ঠা ও ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছেন তা শুধু বিস্ময়কর নয়, আদর্শস্থানীয়। মনে রাখতে হবে তখন তাঁর বয়স বাহাত্তর বৎসর অতিক্রম করে গিয়েছে।

এই প্রবন্ধের বিভিন্ন সংস্করণে গদ্যাংশ ও দৃষ্টান্তের পাঠে অনেক স্থলেই পার্থক্য দেখা যায় এবং এই পার্থক্যের পরিমাণও কম নয়। নয়টি পাণ্ডুলিপি ও দুটি মুদ্রিত সংস্করণের পাঠভেদ অবলম্বনে স্বতন্ত্র ও সুবিস্তৃত আলোচনার অবকাশ আছে এবং তার প্রয়োজনীয়তাও আছে। অতিবিস্তারভয়ে এই বিভাগে পাণ্ডুলিপিগুলির পাঠভেদ দেখানো হল না।

চলতি ভাষার ছন্দ

'বাংলাভাষা-পরিচয়' গ্রন্থের (১৯৩৮) একাদশ অধ্যায়ের প্রাসঙ্গিক অংশ। এর সংক্ষিপ্ত পাণ্ডুলিপি-বিবরণ দেওয়া হয়েছে প্রবন্ধের পাঠপরিচয়-প্রসঙ্গে (পৃ ৪২৫)। এই পাণ্ডুলিপির (১৭৬-সংখ্যক) উল্লেখযোগ্য বৈচিত্র্যও বিশেষ কিছু নেই।

গদ্য-ছন্দ

১৩৪১ সালের বৈশাখ-সংখ্যা 'বঙ্গশ্রী' পত্রিকায় প্রকাশিত 'গদ্য-ছন্দ' নামেই। এই প্রবন্ধটির কবির স্বহস্তলিখিত দুটি পাণ্ডুলিপি আছে রবীন্দ্রসদনে। এর প্রাথমিক খসড়াটি আছে ১৯৭-সংখ্যক পাণ্ডুলিপিতে (পৃ ১৮-৪৬)। এই নাম-তারিখ-হীন খসড়াটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ

দেওয়া হয়েছে 'ছন্দের প্রকৃতি' প্রবন্ধের প্রথম পাণ্ডুলিপির পরিচয়-প্রসঙ্গে। ১৩-সংখ্যক পাণ্ডুলিপিতে (পৃ ১-২৪) আছে উক্ত প্রাথমিক খসড়ার মার্জিত রূপ। সম্ভবতঃ এই সংস্করণটিই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠিত এবং তৎপরে 'বঙ্গশ্রী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। কিন্তু পত্রিকায় প্রকাশকালে প্রবন্ধটি পুনর্বার সংস্কৃত হয় এবং কোনো কোনো অংশ বর্জিতও হয়। এস্থলে পাণ্ডুলিপির বিভিন্ন সংস্করণ ও মুদ্রিত প্রবন্ধের পার্থক্য নির্দেশ করা নিষ্প্রয়োজন।

কাব্য ও ছন্দ

এটি ১৩৪৩ সালের পৌষ-সংখ্যা 'কবিতা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় 'গদ্যকাব্য' নামে এবং 'সাহিত্যের স্বরূপ' গ্রন্থে (১৩৫০ বৈশাখ) সংকলিত হয় 'কাব্য ও ছন্দ' নামে। কবির স্বহস্তলিখিত পাণ্ডুলিপিতে (পৃ ১-১০) প্রবন্ধের নাম আছে 'গদ্যকাব্য'; কবির হাতে লেখা কোনো তারিখ নেই— অন্যের হাতে তারিখ লেখা আছে 'অগ্রহায়ণ ১৩৪৩'। 'কবিতা' পত্রিকায় তথা 'সাহিত্যের স্বরূপ' গ্রন্থে রচনার তারিখ আছে ১২ নভেম্বর ১৯৩৬। পাণ্ডুলিপিটি দশটি বিচ্ছিন্ন ও অগ্রথিত ক্ষুদ্র আকারের কাগজে লিখিত। এটি এখনও সংখ্যানির্দিষ্ট হয়নি। পত্রিকায় প্রকাশকালে প্রবন্ধের ভাষা কবিকর্তৃক পরিমার্জিত হয়।

তৃতীয় পর্বের (পৃ ৩৭৯-৮০) মুখ্যপ্রবন্ধাবলীর পাণ্ডুলিপি-পরিচয় দেওয়া গেল সংক্ষেপে। এইসব পাণ্ডুলিপি ও মুদ্রিত প্রবন্ধের মূলরচনায় ও দৃষ্টান্তে অনেক পাঠভেদ ও অন্যবিধ পার্থক্য লক্ষিত হয়। এইসব পাঠান্তরের সংখ্যা কম নয় এবং তার বিষয়গত গুরুত্বও কম নয়। এইসব পাণ্ডুলিপি ও তার পাঠভেদগুলির স্বতন্ত্র ও বিশদ পরিচয় দেবার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। তাতে শুধু যে রবীন্দ্রনাথের ছন্দচিন্তার কোনো কোনো দিকে নূতন আলোকপাতের সম্ভাবনা আছে তা

নয়, তার সাহিত্যিক এবং অন্যবিধ সার্থকতাও আছে। কিন্তু বাহুল্যবোধে এস্থলে সে আলোচনা থেকে বিরত থাকা গেল।

নিম্নে উক্ত পাণ্ডুলিপিগুলির একটি প্রবন্ধানুক্রমিক তালিকা দেওয়া গেল। তাতে এই পর্বের (১৩৩৮-৪৫) প্রবন্ধাবলীর পাণ্ডুলিপি-বিবরণ এক দৃষ্টিক্ষেপেই অবগত হওয়া যাবে।

১। ছন্দের হসন্ত-হলন্ত

প্রথম পর্যায় : 'বাংলা ছন্দ'— অসংখ্যাত পাণ্ডুলিপি (পৃ ১-৮)।

দ্বিতীয় পর্যায় : 'ছন্দের হসন্ত-হলন্ত'— তিনটি অসংখ্যাত পাণ্ডুলিপি। পৃষ্ঠাসংখ্যা যথাক্রমে ৫, ১০ এবং ২০।

তৃতীয় পর্যায় : 'নব ছন্দ' (প্রথমাংশ)— ৩২-সংখ্যক পাণ্ডুলিপি (পৃ ১-৩)। এই তিন পৃষ্ঠায় আছে প্রবন্ধটির প্রথমার্ধ মাত্র ('আজ এটার চল নেই' পর্যন্ত, পৃ ৮১)। অপরার্ধ পরবর্তী যোজনা।

২। সংস্কৃত-বাংলা ও প্রাকৃত-বাংলার ছন্দ : 'ছন্দবিতর্ক'— অসংখ্যাত পাণ্ডুলিপি ; পৃষ্ঠাসংখ্যা ৫।

৩। ছন্দের মাত্রা

প্রথম পর্যায় : 'নব ছন্দ' (শেষাংশ)— ৩২-সংখ্যক পাণ্ডুলিপি (পৃ ৩-১২)।

দ্বিতীয় পর্যায় : 'ছন্দের মাত্রা'—(১) অসংখ্যাত প্রাথমিক খসড়া (পৃ ১-২০) ; প্রবন্ধের নাম 'ছন্দের রূপ'। (২) ৩-সংখ্যক পাণ্ডুলিপি (পৃ ১-২৬ এবং ৩৬-৩৭) ; প্রবন্ধের নাম 'ছন্দের মাত্রা'।

৪। ছন্দের প্রকৃতি : 'ছন্দ'— নয়টি পাণ্ডুলিপি। এগুলির মধ্যে প্রথম (১৯৭-সংখ্যক), দ্বিতীয়, তৃতীয় ও নবম (৪-সংখ্যক) পাণ্ডুলিপি কবির স্বহস্তলিখিত ও সম্পূর্ণ। এগুলির পৃষ্ঠাসংখ্যা যথাক্রমে ১৮, ৩০, ২৩ এবং ৪৬। চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ পাণ্ডুলিপি অন্যের হাতে লেখা আংশিক প্রতিলিপি। সপ্তম পাণ্ডুলিপিও অন্যের হাতে লেখা, কিন্তু সম্পূর্ণ।

এই চারটিই কবিকর্তৃক সংশোধিত। অষ্টম পাণ্ডুলিপি স্বয়ং কবির লেখা; কিন্তু আংশিক, প্রথম দুই পৃষ্ঠা মাত্র।

৫। চলতি ভাষার ছন্দ: ১৭৬-সংখ্যক পাণ্ডুলিপি, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ ৮২-৮৮।

৬। গদ্য-ছন্দ: দুটি পাণ্ডুলিপি। (১) প্রাথমিক খসড়া (১৯৭-সংখ্যক, পৃ ১৮-৪৬)। (২) খসড়াটির পরিমার্জিত সংস্করণ (১৩-সংখ্যক, পৃ ১-২৪)।

৭। কাব্য ও ছন্দ: 'গদ্যকাব্য'— অসংখ্যাত পাণ্ডুলিপি (পৃ ১-১০)। কবির নিজ হাতে লেখা। তারিখ ১২ নভেম্বর ১৯৩৬।

অনাবশ্যকবোধে অপেক্ষাকৃত গৌণরচনাগুলির পাণ্ডুলিপি-বিবরণ দেওয়া হল না। 'চিঠিপত্র' ও 'ভাষণ' বিভাগের কোনো কোনো রচনার পাণ্ডুলিপিগুলির কিছু-কিছু পরিচয় দেওয়া হয়েছে পাঠপরিচয়ের প্রথমাংশে (পৃ ৩১৫-১৬)।

দৃষ্টান্তপরিচয়

'ছন্দ' গ্রন্থের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য তার দৃষ্টান্তগুলি। শুধু বৈশিষ্ট্য নয়, সম্পদ্। ছন্দোবৈচিত্র্যে, ধ্বনিসৌন্দর্যে এবং কাব্যসৌন্দর্যে এই দৃষ্টান্তগুলি গ্রন্থখানিকে সাহিত্যিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছে। ছন্দোবৈচিত্র্যের দৃষ্টান্ত হিসাবে রচিত হলেও রবীন্দ্রনাথের উদ্দীপ্ত কবিকল্পনার উৎস থেকে এগুলি নির্গত হয়েছে জলন্ত স্ফুলিঙ্গের মতো। তাই এই গ্রন্থের অনেকগুলি (অন্ততঃ একুশটি) দৃষ্টান্তই পরবর্তী কালে উৎকৃষ্ট কবিতা হিসাবে স্থান পেয়েছে 'স্ফুলিঙ্গ' কাব্যে।

অধিকাংশ দৃষ্টান্তই ছন্দোবিশ্লেষণ উপলক্ষে সদ্যোরচিত। কিন্তু সবগুলি নয়। অনেকগুলিই সংস্কৃত, প্রাকৃত, প্রাচীন ও আধুনিক বাংলা, ইংরেজি প্রভৃতি নানা ক্ষেত্র থেকে সংকলিত। এগুলি শুধু যে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যদৃষ্টির বিচিত্র ক্ষেত্র ও বিস্তৃত পরিসরেরই পরিচায়ক তা নয়, তাঁর আগ্রহের বিশিষ্টতারও পরিচায়ক। নীচে এই গ্রন্থে প্রযুক্ত দৃষ্টান্তগুলিকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করে তালিকা-আকারে সাজিয়ে দেওয়া গেল। তার থেকেই এগুলির অজস্রতা, বিচিত্রতা ও বিশিষ্টতার পরিচয় পাওয়া যাবে।

প্রত্যেক বিভাগে দৃষ্টান্তগুলিকে সাজানো হল বর্ণানুক্রমে। দৃষ্টান্তের পার্শ্ববর্তী সংখ্যাগুলি গ্রন্থের পৃষ্ঠাসংখ্যাসূচক। দণ্ডচিহ্নের পরবর্তী পৃষ্ঠাসংখ্যা 'গ্রন্থপরিচয়' বিভাগের অন্তর্গত। সংখ্যার ঊর্ধ্বকোণস্থিত বিন্দুটি পাদটীকাজ্ঞাপক। যে-সব দৃষ্টান্ত 'স্ফুলিঙ্গ' কাব্যে (১৩৬৭ সংস্করণ) সংকলিত হয়েছে, সেগুলিকে নির্দিষ্ট করা হল তারকাচিহ্নের দ্বারা।

অনেক স্থলেই একটি দৃষ্টান্তকে এক রূপ থেকে অন্য রূপে পরিবর্তিত করা হয়েছে। এই রূপান্তরিত দৃষ্টান্ত আবার দ্বিবিধ। কতকগুলি (স্বকীয়

বা পরকীয়) পূর্বরচিত দৃষ্টান্তের সদ্যঃকৃত রূপান্তর, আর কতকগুলি সদ্যোরচিত দৃষ্টান্তেরই নবরূপ। প্রথম শ্রেণীর দৃষ্টান্তগুলি 'রূপান্তরিত' নামে একটি স্বতন্ত্র বিভাগে স্থাপিত হল। আর, দ্বিতীয় শ্রেণীর দৃষ্টান্তগুলিকে প্রকৃতিভেদে বিভিন্ন বিভাগে স্থান দেওয়া গেল। তবে এগুলিও যে রূপান্তর, তা সূচিত হল 'রূ' বর্ণের দ্বারা। দৃষ্টান্তের পার্শ্ববর্তী 'রূ' বর্ণটি এই রূপান্তরণের পরিচায়ক।

দৃষ্টান্তগুলির ছন্দপ্রকৃতির পরিচয় পাওয়া যাবে মূলগ্রন্থের আলোচনা থেকে কিংবা পাদটীকা ও 'সংজ্ঞাপরিচয়' বিভাগের মন্তব্যাদি থেকে। তাই এ-স্থলে দৃষ্টান্তগুলির ছন্দোগত রীতি বা বন্ধের পরিচয় দেওয়া গেল না।

সংকলিত (কবির স্বরচিত বা অন্যকৃত) দৃষ্টান্তগুলিকে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মূলের সঙ্গে মিলিয়ে দেখে এগুলির পাশে পাশে উৎসস্থলের পরিচয় দেওয়া গেল। তাতে জিজ্ঞাসুর সুবিধা হবে। তবে সর্বক্ষেত্রে এ নীতি প্রয়োগ করা হয়নি; কোনো কোনো স্থলে উৎসের সন্ধান পাওয়া যায়নি বলে, আর কোনো কোনো স্থলে অনাবশ্যকবোধে। তবে একথাও বলা প্রয়োজন যে, সবগুলি দৃষ্টান্তকে নিশ্চিতরূপে সনাক্ত করা যায়নি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে কিছুপরিমাণে সংশয়ের অবকাশ থেকে গেছে। সংশয়নিরসনের ভার ন্যস্ত রইল ভবিষ্যতের উপরে।

বৈষ্ণব পদাবলী থেকে উদ্‌ধৃত দৃষ্টান্তগুলির মধ্যে যেগুলি রবীন্দ্র-সম্পাদিত 'পদরত্নাবলী' গ্রন্থে (১২৯২ বৈশাখ) পাওয়া যায়, সেগুলির উৎস হিসাবে পদরত্নাবলীর নামই দেওয়া গেল। অন্যত্র আছে 'পদকল্পতরু'র উল্লেখ। এড্‌গার অ্যালান পো-র সম্পর্কে ইন্দিরা দেবী চৌধুরানীর স্মৃতিকথা স্মরণীয়। তিনি বলেন— 'এড্‌গার এলেন পো-র সঙ্গে রবিকাকাই আমাদের প্রথম পরিচয় করিয়ে দেন' (রবীন্দ্রস্মৃতি ১৩৬৭, পৃ ৪৬)। অতঃপর তিনি অ্যালান পো-র '*The Raven* নামের

অপূর্ব কবিতাটি'-র অজস্র মিল সুর ও ছন্দের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। এই উপলক্ষে তিনি কবিতাটির যে অংশ স্মৃতি থেকে উদ্ধৃত করেছেন তার মধ্যেও আছে 'Ah, distinctly I remember' ইত্যাদি দৃষ্টান্তটি। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের পক্ষেও এই লাইনগুলি অবিস্মরণীয় হয়ে থাকা কিছুমাত্র বিচিত্র নয়।

পরিশেষে বলা প্রয়োজন যে, নিম্নপ্রদত্ত তালিকায় শুধু যে রবীন্দ্র-প্রযুক্ত দৃষ্টান্ত সংকলিত হয়েছে তা নয়, তালিকার সম্পূর্ণতার প্রয়োজনে অন্যের প্রযুক্ত দৃষ্টান্তও গৃহীত হল।

ক. স্বরচিত

১. নবরচিত

২. রূপান্তরিত

৩. অনূদিত

৪. পূর্বরচিত

১ এই কবিতাটি পরবর্তী কালে সংকলিত হয়েছে 'চিত্রবিচিত্র' কাব্যে (১৩৬১) 'তপস্যা' নামেই।

খ. সংকলিত

১ এই কবিতাটি ‘চিত্রবিচিত্র’ কাব্যে সংকলিত হয়েছে ‘ফুল’ নামে।

সম্পূরণ

সম্পূরণ

যে-সব রচনাকে বিভিন্ন কারণে মূলগ্রন্থে স্থান দেওয়া সম্ভব হয়নি কিংবা সমীচীন বলে বোধ হয়নি, সে-সব রচনা সংকলিত হল এই বিভাগে। এ-সব রচনার মধ্যে কতকগুলির গুরুত্ব অপেক্ষাকৃত অধিক, আর কতকগুলি চিন্তামূল্যে বিশেষ সমৃদ্ধ না হলেও অন্যবিধ বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর রচনাগুলিরই যথার্থ স্থান এই 'সম্পূরণ' বিভাগে এবং অন্যগুলির স্থান গ্রন্থমধ্যে। ভবিষ্যৎ সংস্করণে রচনাগুলি এইভাবেই যথাযোগ্য স্থানে স্থাপিত হবে, আর 'সম্পূরণ' বিভাগটি স্থাপিত হবে 'গ্রন্থপরিচয়'-এর অব্যবহিত পূর্বে।

রচনাগুলিকে যথাসম্ভব কালক্রম-অনুসারে সাজানো হল। আর, ব্যবহারের সুবিধা ও রচনাগুলির বিষয়বস্তুর প্রতি লক্ষ রেখে এগুলিকে প্রয়োজনমতো এক-একটি করে নাম দেওয়া গেল এবং প্রয়োজনমতো স্থানে স্থানে পাদটীকাও যোজনা করা হল।

সংস্কৃত শব্দ ও ছন্দ

সংস্কৃত ভাষায় এমন অনেক শ্লোক পাওয়া যায়, যাহা কেবলমাত্র উপদেশ অথবা নীতিকথা, যাহাকে কাব্যশ্রেণীভুক্ত করা যাইতে পারে না। কিন্তু সংস্কৃত ভাষার সংহতিগুণে[১] এবং সংস্কৃত শ্লোকের ধ্বনিমাধুর্যে তাহা পাঠকের চিত্তে সহজে মুদ্রিত হইয়া যায় এবং সেই শব্দ ও ছন্দের ঔদার্য শুষ্ক বিষয়ের প্রতিও সৌন্দর্য ও গাম্ভীর্য অর্পণ করিয়া থাকে।[২] কিন্তু বাংলায় তাহাকে ব্যাখ্যা করিয়া অনুবাদ করিতে গেলে তাহা

১ তুলনীয়: 'সংস্কৃত কবিতার শ্লোকগুলি ধাতুময় কারুকার্যের ন্যায় অত্যন্ত সংহতভাবে গঠিত' (পৃ ২২৬)।

২ তুলনীয়: 'সংস্কৃত শব্দ ও ছন্দ ধ্বনিগৌরবে পরিপূর্ণ' (পৃ ১৭৫)।

নির্জীব হইয়া পড়ে। বাংলা উচ্চারণে যুক্ত অক্ষরের ঝংকার, হ্রস্বদীর্ঘ-স্বরের তরঙ্গলীলা,[১] এবং বাংলা পদে ঘনসন্নিবিষ্ট বিশেষণবিন্যাসের প্রথা না থাকাতে সংস্কৃত কাব্য বাংলা অনুবাদে অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর শুনিতে হয়।[২] যতিপঞ্চকের[৩] নিম্নলিখিত শ্লোকে বিশেষ কোনো কাব্যরস আছে তাহা বলিতে পারি না।—

পঞ্চাক্ষরং পাবনমুচ্চরন্তঃ
পতিং পশূনাং হৃদি ভাবয়ন্তঃ।
ভিক্ষাশিনো দিক্ষু পরিভ্রমন্তঃ
কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ ॥[৪]

তথাপি ইহাতে যে শব্দযোজনার নিবিড়তা ও ছন্দের উত্থানপতন আছে তাহাতে আমাদের চিত্ত গুণী-হস্তের মৃদঙ্গের ন্যায় প্রহৃত হইতে থাকে। কিন্তু ইহার বাংলা অনুবাদে তাহার বিপরীত ফল হয়।… একে ত, আমরা পাঠকদিগকে ভিক্ষাশী ও কৌপীনধারী হইতে উপদেশ দিই না, দ্বিতীয়তঃ বাংলার নিস্তেজ পয়ার ছন্দে সে উপদেশ শুনিতেও শ্রুতিমধুর হয় না।[৫]

সাধনা— ১৩০১ মাঘ

১ তুলনীয়: 'সংস্কৃত ছন্দে যে বিচিত্র সংগীত… যুক্ত-অক্ষরের বাহুল্য' (পৃ ১৭৮) এবং 'তাতে ধ্বনিসংগীত মারা যায়… বেশি কম নয়' (পৃ ১৮৯-৯০)।

২ তুলনীয়: 'সংস্কৃত উচ্চারণে যে দীর্ঘহ্রস্বের নিয়ম আছে… তাহা সাধারণত বাংলা ভাষায় অসম্ভব' (পৃ ১৭২), এবং 'একে বাংলা ছন্দে স্বরের দীর্ঘহ্রস্বতা নাই…হৃদয়কে আঘাতপূর্বক ক্ষুব্ধ করিয়া তুলিতে পারে না' (পৃ ১৭৮)।

৩ 'যতিপঞ্চক' শংকরাচার্যের রচনা বলে পরিচিত।

৪ শ্লোকটি 'উপজাতি' ছন্দে রচিত। উপজাতির ধ্বনিবিন্যাস এ-রকম: ⏑— ⏑ — —⏑⏑—⏑—— —। প্রথম ধ্বনিটি যদৃচ্ছাক্রমে লঘু বা গুরু হতে পারে।

৫ এই নিবন্ধের পরিচয় দেওয়া হয়েছে 'বাংলা শব্দ ও ছন্দ' প্রবন্ধের পাঠপরিচয়-প্রসঙ্গে (পৃ ৪৩৫-৩৬)।

জাপানী ছন্দ

জাপানী কবিতার ও ছন্দের অনুকরণে নিম্নের কবিতা তিনটি রচিত হইয়াছে। জাপানী কবিতা সাধারণত অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। তাহাতে মিলেরও কোনো লক্ষণ দেখি না, কেবল অত্যন্ত সরল মাত্রার নিয়ম আছে। এই কারণে কাব্যরচনার চর্চা জাপানের আপামর-সাধারণের মধ্যে প্রচলিত হইতে পারিয়াছে এবং এই কারণেই জাপানী কবিতার বিষয় ও ভাব অনেক সময় আমাদের কাছে অতিরিক্ত মাত্রায় সাদাসিধা ঠেকে। কিন্তু বিদেশী কাব্যের রস ঠিকভাবে গ্রহণ করা সহজ নহে— দু-চারটে তরজমা পড়িয়া কোনো কথাই বলা চলে না। তবে ইহা নিশ্চয় যে, এরূপ সংক্ষিপ্ত ও সরল কাব্যরচনার রীতি অন্যত্র দেখা যায় না। ইহাদের অসমান মাত্রার তিন লাইনের কবিতাকণাগুলি দেখিলে বেদের ত্রিষ্টুভ্ ছন্দের শ্লোক মনে পড়ে।

বাঙালি পাঠকের অভ্যাসের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া নিজের অনুকৃতি-গুলির মধ্যে একটু মিলের আভাস রাখা গেছে।

১

সেদোকা ছন্দ

সাগরতীরে
শোণিত-মেঘে হল
নিশীথ অবসান
পুবের পাখি
পূরব মহিমারে
শুনায় জয়গান।

২

চোকা ছন্দ

সাহসী বীর
দেখেছি কত অরি
করেছে জয়।
দেখিনি তোমা সম
এমন ধীর—
জয়ের ধ্বজা ধরি
স্তবধ হয়ে রয় ॥

৩

ইমায়ো ছন্দ

গেরুয়া বাস পরি
ধর্মগুরু
শিখাতে গিয়েছিল
তোমার দেশে।
আজি সে শিখিবারে
কর্মনীতি
তোমার দ্বারে ধায়
শিষ্যবেশে ॥

ভাণ্ডার —১৩১২ আষাঢ়

চিঠিপত্র

অধ্যাপক এণ্ডারসনকে লেখা রবীন্দ্রনাথের পত্র

১

Calcutta
April 14, 1918

Dear Mr. Anderson,

I have greatly enjoyed reading two of my *Gitanjali* poems done into verse by your friend and thank you for sending them to me. It was the want of mastery in your language which originally prevented me from trying English metres in my translation.[১] But now I have grown reconciled to my limitations through which I have come to know the wonderful power of English prose. The clearness, strength and the suggestive music of well-balanced English sentences make it a delightful task for me to mould my Bengali poems into English prose form.[২] I think one should frankly give up the attempt at reproducing in a translation the lyrical suggestions of the original verse and substitute in their place some new quality inherent in the new vehicle of expression. In English prose there is a magic which seems to transmute my Bengali verses into something which is original again in a different manner. Therefore, it not only satisfies but gives me

১ রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি ছন্দে রচিত কবিতার দৃষ্টান্তও কিছু আছে। দ্রষ্টব্য এড্‌ওয়ার্ড্‌ টম্‌সন-প্রণীত *Rabindranath Tagore* গ্রন্থ (১৯২৬), পৃ ২৮২-৮৩।

২ স্মরণীয় 'গীতাঞ্জলি'র ইংরেজি অনুবাদ-প্রসঙ্গ, পৃ ১৮৬।

delight to assist my poems in their English rebirth, though I am far from being confident in the success of my task.

I have asked the editor to send you the *Chaitra* number of *Sabuj Patra* which contains my lecture on Bengali prosody.[১]

With kindest regards,
I am
Yours very sincerely,
Rabindranath Tagore

Shantiniketan
Bolpur, Bengal
July 27, 1918

প্রিয়বরেষু

...When I had written thus far your delightfully suggestive letter on ছন্দ[২] reached me. What you say of the accent stress in Bengali poems is quite true and the marks you put over the lines you quoted are correct. But I believe these stresses, like dance steps, are induced by the rhythm of the metre itself and they are not inherent in the words. When said in a prose form, these words at once lose their swing.— টাপুর টুপুর করে বৃষ্টি পড়ছে— In this sentence there is hardly any stress anywhere. We introduce stress in Bengali

১ দ্রষ্টব্য পৃ ৩৫৪, পাদটীকা ১।

২ ২৯ জুন ১৯১৮ তারিখের পত্র (পৃ ৩৬১-৬২)।

words only where some special emphasis is needed for the sake of the meaning. When we say,

"যাও, আর ভাল্ লাগে না"

then accents are used only to express disgust,— in another context these accents would be out of place. When an Englishman speaks Bengali, it sounds to us so strange, often having a comic effect, simply because he cannot pronounce a word without putting some accent somewhere, — it is his life-long habit. The undulation which we have in our voice in uttering prose is merely that of emotion. Therefore, the stress about which you speak in Bengali verses is imposed by the metre.

In my paper[১] I have discussed about the short divisions and long divisions of a metre.[২] The long divisions are the divisions generally represented by lines in the printed form. But the shorter divisions within those lines are more important for the rhythm.[৩] They are what the bars[৪] are in music, and can be measured

১ ১৩২৪ সালের ৬ চৈত্র তারিখে বিচিত্রা ক্লাবে পঠিত এবং ওই সালের চৈত্র-সংখ্যা সবুজপত্রে প্রকাশিত 'ছন্দ' ('ছন্দের অর্থ' নামে গ্রন্থভুক্ত) প্রবন্ধ।

২ Long division = চাল বা প্রদক্ষিণ; short division = চলন বা পদক্ষেপ। দ্রষ্টব্য পৃ ৩৪। ছন্দ-পরিভাষায় চাল = পংক্তি, চলন = পর্ব।

৩ তুলনীয়: 'প্রদক্ষিণের মাত্রার চেয়ে পদক্ষেপের মাত্রার পরেই ছন্দের বিশেষত্ব বেশি নির্ভর করছে' (পৃ ৩৫) এবং 'প্রদক্ষিণের মাত্রায় ছন্দকে চেনা যায় না, চলন অর্থাৎ পদক্ষেপের মাত্রায় তার পরিচয়' (পৃ ৪১)। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় 'ছন্দের মাত্রা' প্রবন্ধের উক্তি—'মনে নেই আমার কোনো পূর্বতম প্রবন্ধে···ক্ষমা প্রার্থনা করি' (পৃ ১১০)।

৪ Bar = তালবিভাগ; ছন্দ-পরিভাষায় 'পর্ব' (পৃ ২৫৬)।

by beats[১]— the beats which, according to the rhythm of the particular metre, contain a particular quantity of sound-units. These beats, in the language of prosody, are stresses.[২] They set the impulse which carries with it a certain volume of sound. For instance, the metre in—

1 2 3 4   1 2 3 4   1 2 3 4   1 2 3 4
অধরে ম | ধুর হাসি | বাঁশিটি বা | জাও · · | [৩]

has the division of four units of sound (মাত্রা) in a bar. Naturally the beat comes at the beginning of the bar,[৪] remaining suspended till the next beat comes. I want to know from you whether it is not the same in English metres also. The verse, which you give me in your letter,[৫] I divide in the following manner, apportioning to each division an equal quantity of sound-units (মাত্রা)—

M″arch, lads, | m″arch, let us |
s″tride along to | g″ether.. | [৬]

The difference between the Bengali and English metres in the above example is this, that in the Bengali our vowels are all uniformly short, or nearly so, whereas in the English the 'a' in 'march' and

১ Beat=তালি (পৃ ৪২) ; ছন্দ-পরিভাষায় 'প্রস্বর' (পৃ ২৫৭)।

২ Stress মানে accent of force বা বলপ্রস্বর (পৃ ৩৭৪)।

৩ ভারতচন্দ্র— অন্নদামঙ্গল, দ্বিতীয় খণ্ড : পুরবর্ণন।

৪ তুলনীয় : 'ইংরেজি ছন্দে ঝোঁক পদের [অর্থাৎ পর্বের] আরম্ভেও পড়িতে পারে, পদের শেষেও পড়িতে পারে।··· বাংলায় আরম্ভে ছাড়া পদের আর কোথাও ঝোঁক পড়িতে পারে না' (পৃ ১৯)।

৫ ১৬ জুন ১৯১৮ তারিখের পত্র।

৬ অধ্যাপক এণ্ডারসনের বিশ্লেষণ দ্রষ্টব্য ৭ এপ্রিল ১৯১৪ তারিখের পত্রে (পৃ ৩৩৩)।

in 'lads' is appreciably longer than the 'e and 'u' in 'let us'. If you count these long vowels as consisting of two *matras* (sound units) and short ones as one *matra,* then you will find in the above English metre four sound units in a bar,[১]— just as in the Bengali verse. But the inequality in your vowel lengths gives your metres a richness which is wanting in the সাধু Bengali metres. We also have this inequality of quantity in sound groups in metres used in colloquial Bengali poems. You will find in the nursery rhyme, 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর্ টুপুর্', the alternation of long and short sounds in the arrangement of metre. It is a ছন্দ which has three units in a bar,[২]— with one short sound and one long sound which represents two units.

বৃষ্ টি | পড়ে | টাপুর্ | টুপুর | নদেয় | এলো | বান |

শিব ঠা | কুরের্ | বিয়ে ! হবে | তিন্ ক- | ন্নে | দান |

এক্ ক- | ন্নে | রাঁধেন্ | বাড়েন | এক্ ক- | ন্নে | খান |

এক ক- | ন্নে | না পেয়ে | বাপের | বাড়ি | যান |[৩]

১ March এবং lads-এর 'a'-কে দীর্ঘ বলে ধরলে প্রথম দুই পর্বে চার মাত্রা পাওয়া যায়। কিন্তু stride-এর 'i' এবং long-এর 'o' দীর্ঘ না হ্রস্ব? দুটোকেই হ্রস্ব বলে না ধরলে তৃতীয় পর্বে চার মাত্রা পাওয়া যাবে না। এণ্ডারসনের মতে long-এর উপরে ঝোঁক বা প্রস্বর আছে, রবীন্দ্রনাথের মতে নেই। 'প্রস্বরিত' (stressed) এবং 'দীর্ঘ' (long) সমার্থক শব্দ নয়। Together শব্দের 'ge' প্রস্বরিত না দীর্ঘ? মনে হয় রবীন্দ্রনাথ এটিকে দীর্ঘ বলেই গণ্য করেছেন।

২ এখানে bar মানে 'পর্ব' নয়, 'উপপর্ব'।

৩ এই অংশটুকু রবীন্দ্রনাথের স্বহস্তলিখিত বিশ্লেষণের অবিকল প্রতিরূপ। দেখা যাচ্ছে সর্বত্র উচ্চারণ-অনুসারে হস্-চিহ্ন দেওয়া হয়নি। 'বান' শব্দের ধ্বনিবিন্যাস

In the above you will see that though each bar contains one long and one short sound, they are not absolutely regular in their alternations, sometimes the short following the long and sometimes the contrary. But, unlike the সাধু Bengali verses, the undulation of short and long sounds is there. One thing you must notice in this verse, it is the lengthening of some vowels which the metre requires, and yet which is against the ordinary custom of the language. The 'এ' in 'পড়ে' in the second bar is lengthened and also the 'উ' in 'টাপুর' and 'টুপুর' in the third and the fourth. And this taking liberty with the vowel sounds goes on to the end.[১] It offers no difficulty to the Bengali mothers or to their children to recite it properly, the swing of the metre itself guiding them.[২]

However, what I tried to show in my paper is this, that by changing the quantity of sound units in a bar the rhythm of a metre is fundamentally changed. But as you suggest in your letter, there is, in the English as in the Sanskrit, an additional element contributing to the musical effect,— it is the arrangement of short

— ⌣ এ-রকম, কিন্তু 'দান' প্রভৃতি অনুরূপ শব্দের ধ্বনিবিন্যাস ⌣ — এ-রকম। চতুর্থ লাইনের 'না পেয়ে' অংশের বিশ্লেষণ ত্রুটিহীন নয়। ফলে এই লাইনে এক bar বা উপপর্ব কম হয়েছে। সম্ভবতঃ রবীন্দ্রনাথের অভিপ্রেত বিশ্লেষণ এ-রকম—

না̄ পে̄ | য়ে ·· |

১ এই ছড়াটির প্রথম দুই লাইনের অনুরূপ বিশ্লেষণ দ্রষ্টব্য ৬২ পৃষ্ঠায়।

২ তুলনীয়: 'হাজার হাজার ছেলেমেয়ে এই ছড়া আওড়েছে, তবু ছন্দের কোনো গর্তে তাদের কারো কণ্ঠ স্খলিত হয়নি' (পৃ ৬২)।

and long sounds within the bars. You may call them accent stress, but accent stress means lengthening of vowels in certain parts of a word.[১]

I must thank you for your delightful letter and for reminding me of the necessity of a supplementary paper. But happily I was made lazy by my Creator with only impulse enough to start an idea, and no responsibility to carry it on to a finish.

I am having this typed in order to be able to send you a copy by the following mail.

রবীন্দ্রনাথকে লেখা অধ্যাপক এণ্ডারসনের পত্র

Mostyn House,
Brooklands Avenue, Cambridge
28th September, 1918

My dear কবিবর,

I am no fighting man ; no controversialist ; and when your letter dated July 27, reached me to-day, I was very much inclined to yield to so much eloquence, such unquestioned competence, and to a belief so earnestly held. After all, I thought, what does it

১ **Accent stress** মানে বলপ্রস্বর। রবীন্দ্রনাথের ধারণা ধ্বনি প্রস্বরিত (**stresssd**) হলেই দীর্ঘ (**long**) হয়। **March, lads, march** ইত্যাদি লাইনটির মাত্রাপরিমাণ-নিরূপণও তিনি করেছেন এই ধারণাবশেই। বস্তুতঃ এই ধারণা অভ্রান্ত নয়। ধ্বনি প্রস্বরিত হলেই দীর্ঘ হয় না। **Stress accent** বা বলপ্রস্বর ধ্বনির খরতাজ্ঞাপক, দীর্ঘতাজ্ঞাপক নয়। এই পত্রের উত্তরে (২৮ সেপ্‌টেম্বর ১৯১৮) অধ্যাপক এণ্ডারসন **accent**-এর যে শ্রেণীবিভাগ করেছেন তা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

matter, so long as our national poet (আমিও একরকম বাঙ্গালী হইতেছি !) goes on writing verses that are lovely, and consoling, and full of a music unheard in English or any other 'stress' verse. I am an older man than you, and you yourself, dear কবিবর, are no longer young. We live in sad, troubled, anxious times...What does a mere question of ছন্দ matter at a time like this ? And who am I that I should dare to question your conclusion, or ask you to reconsider your theories ?

And yet to hold my tongue were to pay you a poor compliment, for I make bold to believe that you, more gifted in this and other matters than all but the merest handful in all the world, are too big a man not to desire the truth above all things, even in things that, from one point of view, are not great things. And if I am to be loyal to fact, I must beg you to reconsider your decision and your theory.

You say that Englishmen are wont to read Bengali verses with their own characteristic 'stress' accents, and so ruin, or at best pervert, their music. True. But the next moment, you mark a poor Phalaecean hendecasyllabic line[১] I quoted in the way you would pronounce it, and, behold, you have made of it—a Bengali verse ! You read it thus :—

Mārch, lăds, | mārch, lĕt ŭs·| strīde ălŏng tŏ | gēthĕr.···

Note that your accents, (whether they be accents

১ মানে 'একাদশাক্ষরা পংক্তি'। সংস্কৃত ছন্দ-পরিভাষায় একাদশাক্ষরপাদ ছন্দোবর্গের সাধারণ নাম 'ত্রিষ্টুপ্'। দ্রষ্টব্য পৃ ৩৩৩।

of length or of strength)[১] fall at the *beginning* of each of unit. And so the accents *must* fall in all Bengali verse, just as in all French verse, they *must* fall on the final syllable of each unit. (I will come to that presently.)

. You will have some difficulty in accepting this doctrine, since it is natural to us all to transfer (as you justly say Englishmen do) the qualities of our own speech to any other speech we use, and so to alter the music of a foreign verse.

But all verse is the rhythmical use of the dominantly audible quality of any given language. You say, very justly, that the speakers of any language will correctly recite or chant the poet's rhythm, even if these speakers be ignorant women or children. That is so. But you go on to say that these accents, whether stresses or long syllables, "are induced by the rhythm of the metre itself and are not inherent in the words." Ah, but in that case how is it that the native (whether English or Bengali) reads his native verse correctly, and misreads the foreign verse ? Surely because in his native verse he fulfils the poet's conviction that he will hear the inherent accents of his own language ; and puts his native accents into the foreign verse, and so creates a rhythm, indeed, but not one natural to the foreign language, or intended by the foreign poet.

Before we go further, dear কবিবর, let us make one

১ বাংলা পরিভাষায় **accent of length**=ব্যাপ্তিপ্রস্বর, এবং **accent of strength**=বলপ্রস্বর।

trifling point of detail clear. There are *three* kinds of accent.— (1) Accent of pitch or tone (dominantly audible in Vedic verse, I am told, and in the more ancient poems of Greece). (2) Accent of stress, of force, which is the dominantly audible quality of most modern European languages and the basis of the rhythm of their verse. You get it in English, German, and (less forcibly) in Italian, Spanish, Portuguese, Provençal. (Perhaps, too, in some Indo-Aryan languages ?) (3) Accent of duration (or quantity), which was the dominantly audible quality of Sanskrit and classical Latin.[১]

I say nothing about pitch accent, because it is, so far as I know, not dominantly audible in any living tongue. But the accents of duration in Sanskrit and Latin *were*, and the accents of stress (in those languages that have them) *are* still, *fixed* in *each word.* In any given word they may fall at the beginning, middle, or end. The Sanskrit or Roman poet would, and the English or German poet still does, select his words so as to make them dance in the measure he is using.

Metres in classical Sanskrit and classical Latin are the same as metres in the stressed languages, with this sole difference that the prominent syllables, which create the metre, are *strong* syllables and not necessarily *long* ones. Consequently the pattern of any Sanskrit

১ বাংলা পরিভাষায় accent of pitch = গীতিপ্রস্বর, accent of stress = বলপ্রস্বর, এবং accent of duration = ব্যাপ্তিপ্রস্বর ।

or Latin verse can be reproduced in English or German by substituting words carrying *strong* accents in the places where the *long* accents came in Latin and Sanskrit.[১] See for example the hexameters of Goethe in German, of Kingsley and Clough and Longfellow in English. They dance to the hexametric "three time" measure, but where the model glides, dwells, *prolongs* a step, the imitation makes a strong 'stamp', as it were. The dance is the same, but it is danced in a different way.[২] The verse you have quoted from my last letter[৩] is a case in point. It was a reproduction in stressed

১ কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কয়েকটি সংস্কৃত ছন্দকে বাংলায় রূপান্তরিত করেছেন। কিন্তু গ্রীক বা লাটিন ছন্দকে যে পদ্ধতিতে জর্মান বা ইংরেজিতে রূপান্তরিত করা হয়, সত্যেন্দ্রনাথের পদ্ধতি তার থেকে পৃথক্। বাংলা উচ্চারণে যেমন সংস্কৃতের ন্যায় সুনির্দিষ্ট দীর্ঘস্বর নেই, তেমনি জর্মান বা ইংরেজির মতো শব্দগত স্থির প্রস্বরও নেই। পক্ষান্তরে সংস্কৃতের তুলনায় বাংলায় রুদ্ধদলের (closed syllable-এর) প্রয়োগ বহুলতর। তাই সত্যেন্দ্রনাথ দীর্ঘস্বরের স্থলে রুদ্ধদল প্রয়োগের দ্বারাই সংস্কৃত ছন্দকে বাংলায় রূপান্তরিত করেছেন। এই পদ্ধতি অন্যের দ্বারাও অনুসৃত হয়েছে।

২ সংস্কৃত ছন্দের বাংলা রূপ সম্বন্ধেও এই মন্তব্য প্রয়োজন। মন্দাক্রান্তাদি ছন্দের বাংলা প্রতিরূপে সংস্কৃত দীর্ঘস্বরের উদার গাম্ভীর্যের অভাব অনুভূত হয়।

৩ অধ্যাপক এণ্ডারসন লাটিন একাদশাক্ষরা ছন্দের এই স্বকৃত ইংরেজি প্রতিরূপটি প্রথম উদ্ধৃত করেন ৭ এপ্রিল ১৯১৪ তারিখের পত্রে (পৃ ৩৩৩)। এটি আবার উদ্ধৃত হয় ১৬ জুন ১৯১৮ তারিখের পত্রে। রবীন্দ্রনাথ ১৯১৮ সালের ১৬ জুন এবং ২৯ জুন তারিখে লিখিত দুখানি পত্রের উত্তর দেন এক সঙ্গে ১৯১৮ জুলাই ২৭ তারিখে (পৃ ৪৮২-৮৬)। সম্ভবতঃ এইজন্যই এণ্ডারসন এই ইংরেজি দৃষ্টান্তটিকে তাঁর 'শেষ পত্রে'র অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করেছিলেন, যদিও বস্তুতঃ তখনকার 'শেষ' পত্রে (২৯ জুন তারিখে লেখা) তিনি এটি উদ্ধৃত করেননি।

syllables of a quantitative metre in Latin. Its true rhythm was on this wise :—

Latin accents ;—

March, lads, | march, let us | stride a | long to | gether ||

English accents :—

Ma″rch, la″ds, | ma″rch, let us |
stri″de a | lo″ng to | ge″ther ||

It is true that "lads" is not *so* strong as "March"—but it is a *strong* syllable, and not a *weak* one, like the syllables "let us" etc.

All this, so far, is familiar enough.

But I am raising a claim for French and Bengali verse which I shall have much difficulty in getting you or anyone else to accept, just because of the natural human belief that the metre of our own language is the same as that of any other language. Most people hold this belief unquestioningly. How can I persuade our কবিবর (who is not as ordinary people) to change his mind ? Can I be sure that you will listen to me with patience ?

Try, please, for my claim on behalf of French and Bengali verse is that—verse in these languages is the greatest and finest and most supple invention in the way of metre yet accomplished by man !

For, look you, the metre of the stressed languages, English, German etc., is merely imitative, a mere substitution of fixed word-*stresses* for fixed word-*quantities.* The evolution in Bengali and French is

due to the fact that in these two languages, ***phrasal*** accent has become the dominant audible quality, initial in Bengali, ultimate or penultimate in French.

In French this phrasal accent of prolongation (or *dilatation*, as the French metrologists call it) *precedes* and announces a *phãk*, pause, *cæsura*.

In Bengali it follows a ফাঁক, pause, cæsura, e.g.—

দয়ার সাগর সর্ব্বগুণাকর

যিনি অখিলের স্বামী।

Hence there is this result (you mar: it yourself in everyone of the quotations in your lecture) that the units in Bengali verse *must* be of the type — ⌣, or — ⌣ ⌣, or — ⌣ ⌣ ⌣ etc, whereas, in French, they *must* be of the type ⌣ —, or ⌣ ⌣ —, or ⌣ ⌣ ⌣ — etc.

You will object that that is not progress, since stressed verse can do *both* kinds of dance, both — ⌣ and ⌣ —. Yes, but only by piecing together words and fitting them (or rather the fixed accents they carry) into a verse pattern. Whereas in French and Bengali verse, your sole problem is to create phrases of a fixed rhythmical length. Once you have done so, the first syllable in Bengali will of its own accord (whether it be 'long' or 'short') become "প্রসারিত" and in French the last syllable in the phrase, the metrical unit (whether it be 'long' or 'short'), will become "dilated".

Now, I have not seen or heard this anywhere and have puzzled it out for myself. The suggestion is new,

and must necessarily be received with suspicion and caution. Be as suspicious and careful as you please! But you have, more than most men in any country, an open and unprejudiced mind. I feel pretty sure that the more you examine my idea, the more you will see that there is something in it. Bengali rhythm is a different *kind* of rhythm from that of all other languages, so far as I know, except French.

কাব্যে গদ্যরীতি

সম্প্রতি বাংলা সাহিত্যে গদ্যরীতির কাব্য দেখা দিয়েছে। এটাকে অনধিকার প্রবেশ বলে রুখে দাঁড়াবার কোনো আইন নেই। যেমনি প্রাণের রাজ্যে তেমনি সাহিত্য ও কলাসৃষ্টিতে টিঁকে থাকার দ্বারাই তার অধিকার সপ্রমাণ হয়— পুরাতন ও নূতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা নয়, অভ্যাস দিয়ে ঘেরা স্বাদবোধের দ্বারাও নয়। অমিতাক্ষর ছন্দ যেমন তার যতিভাগের অমিতি এবং মিলের অভাব সত্ত্বেও কাব্যের পংক্তিতে চলে গেছে গদ্যকাব্যও যে তেমন চলবে না, কারও মুখের কথায় তার স্থির সিদ্ধান্ত হবে না। চিরাচরিত মিতাক্ষর রীতির বহুদূর বাইরে গেছে অমিতাক্ষর, আরো বাইরে পদক্ষেপে যে তার চিরনিষেধ, অন্তঃপুরচারিণী কবিতা অন্দর থেকে সদরে এলেই যে সে হবে স্বধর্মচ্যুত, সাহিত্যের ঐতিহাসিক নজির দেখলে বোঝা যায় এ কথা আজ যাঁরা বলছেন হয়তো কাল তাঁরা বলবেন না। বস্তুত নৈবচ বলবার শেষ অধিকার আজ তাঁদের নেই, হয়তো আছে কালকের লোকের।

…ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার প্রমাণে বলতে পারি যে, ছন্দে-বাঁধা কবিতা যে আগ্রহে লিখেছি, আবাঁধা কবিতাও লিখেছি সেই আগ্রহেই, এবং ব্যক্তিগত রুচির দিক্ থেকে বলতে পারি ভালো গদ্যকাব্য আমার

তেমনি ভালো লাগে যেমন ভালো লাগে ভালো পদ্যকাব্য। অবশ্য সকল ক্ষেত্রেই ভালো লাগার রসভেদ আছে, যেমন আম ভালো লাগা আর জাম ভালো লাগা।

বাংলাকাব্য-পরিচয় (১৩৪৫) : ভূমিকা

ছন্দোহার

১

ভাবি নব নব বাণী
যতনে গেঁথে আনি
ছন্দোহারখানি
দিব গলে।
ভয়ে ভয়ে অবশেষে
তোমার কাছে এসে
কথা যে যায় ভেসে
আঁখিজলে ॥

২

কোনো এক যক্ষ সে
প্রভুর সেবাকাজে
প্রমাদ ঘটাইল
উন্মনা,
তাই দেবতার শাপে
অস্তগত হল
মহিমা-সম্পদ্
যত কিছু।

কান্তাবিরহগুরু
দুঃখদিনগুলি
বর্ষকাল তরে
যাপে একা,
স্নিগ্ধপাদপছায়া
সীতার স্নানজলে
পুণ্য রামগিরি-
আশ্রমে ॥

৩

ডাকিল কি তবে
মধু বাঁশরী-রবে
একেলা যবে
বিজন নদী-পুলিনে
ছিনু বসে।
কেন এত ত্বরা,—
হল না ঘটভরা,
মনভ্রমরা
অজানা দূর-বিপিনে
উড়িল সে ॥

৪

ভেঙে ভেঙে পড়িছে পা চলে যেতে
নবদল ধানক্ষেতে,
বসন শিশিরে ভিজিল।

নবারুণ-রাগ গিরিশিখরে
ঘনছায়াময় বনের 'পরে
কি শোভা স্বজিল ॥

৫

নয়ন-অতিথিরে
শিমুল দিল ডালি ;—
নাসিকা-প্রতিবেশী
তা নিয়ে দেয় গালি।
সে জানে গুণ শুধু
প্রমাণ হয় ঘ্রাণে,—
রং যে লাগে রূপে
সে কথা নাহি জানে ॥[১]

৬

বিশ্বের স্বষ্টিতে
যে বিধাতা শিল্পী ও কবি,
রসিকের দৃষ্টিতে
গাঁথিছেন কাব্য ও ছবি।
তোমাদের সংসারখানি
যুগলের চিত্তের
সংগীত-নৃত্যের
রচি দিক শিল্প ও বাণী ॥

১ এই দৃষ্টান্তটির পরিমার্জিত রূপ ('শিমুল রাঙা রঙে' ইত্যাদি) দ্রষ্টব্য ১৩৩ পৃষ্ঠায়।

৭

মোহন কণ্ঠ সুরের ধারায় যখন বাজে
বাহির-ভুবন তখন হারায় গহন-মাঝে।
বিশ্ব তখন নিজেরে ভুলায়,[১]
আকাশের বাণী ধরার ধুলায়
ধরে অপরূপ নব নব কায়
নবীন সাজে॥

৮

পৌর্ণমাসী উচ্চ হাসি
কয় তারাকে,
আজকে কেন আর দেখিনে
পথহারাকে।
আপন দীপে অন্ধকারে
পাও না বাধা,
আমার দীপে চক্ষে লাগে
আলোর ধাঁধা॥

৯

দূরের মানুষ কাছের হলেই
নতুন প্রাণের খেলা।
নতুন হাওয়ায় নতুন ঋতুর
ফুলের বসায় মেলা॥

১ বর্তমান পাঠ রবীন্দ্রনাথের স্বহস্তলিখিত পাঠের (১৯৭-সংখ্যক পাণ্ডুলিপি) অনুরূপ। বিশ্বভারতী পত্রিকায় (১৩৬৯ শ্রাবণ-আশ্বিন, পৃ ৪) প্রকাশকালে এই লাইনটা অনবধানতাবশতঃ স্থাপিত হয়েছে পরবর্তী লাইনের নীচে।

১০

প্রাণধারণের প্রবল ইচ্ছা থেকে
আমার বাঁধন ছাড়িয়ে থাকো যদি
গেলেম আমি রেখে
পায়ে তোমার প্রণাম নিরবধি।
বাঁচবে না কেউ নিত্যকালের তরে,
মরল যে জন ফিরবে না আর ঘরে,
যাত্রা-অন্তে মিলবে সাগর 'পরে
যতই দীর্ঘ হোক না ক্লান্ত নদী ॥

তখন সূর্য কিংবা রাতের তারা
ভাঙিয়ে স্বপন চাইবে না আর ফিরে—
মত্তমুখর ঝরনাজলের ধারা
গর্জনে আর চেতন করবে কি রে?
শীতের কিংবা চৈত্রেরি পল্লবে
নতুন ঋতুর বার্তা কি আর কবে,
অন্তবিহীন নিদ্রা কেবল রবে
অনন্ত রাত্তিরে ॥

১১

সকল প্রাণীর মধ্যে মানুষকেই মনে হত সকলের সেরা।
ভাষার মুখরতায় তার নৈপুণ্য। সেই ভাষা
চিহ্ন ও সংকেতের এমন যোগাযোগ যাতে বাঁচিয়ে রাখে
তার ভাবনা তার বাক্য।
তারি পরে আপন বুদ্ধিকে সে লাগিয়ে রেখেছে,
আপন প্রাণবায়ু খরচ করছে তাই নিয়ে।

কেউ বা গুঞ্জরিত করছে দুঃখের নিবিড়তা,
কেউ বা বিশ্বসংসারে প্রচার করছে হৃদয়ের মহত্ত্ব।
তার আয়ুর মেয়াদ অন্য প্রাণীর মতোই পরিমিত,
তবু তার বাণী হাজার হাজার বছর প্রতিধ্বনিত হয়।
কিন্তু হে ঝিল্লি, এর কিছুই তোমার নেই জানা।
তোমার সুর তুমি রচনা কর প্রতিক্ষণে নিজের জন্যেই।
বসে বসে ভাবছিলেম এই-সব কথা,
তুলনা করছিলেম একের সঙ্গে আর, ক্ষতির সঙ্গে লাভ।
এমন সময় হঠাৎ ঘনিয়ে এল কালো মেঘ,
মাথার উপরে ঝলসে উঠল [বিদ্যুৎ], গর্জে উঠল ঝড়,
মেঘ-ডাকা আকাশ থেকে ঝরতে লাগল
মোটা মোটা বৃষ্টির ফোঁটা।
চুপ করে গেল ঝিল্লির ধ্বনি।

১২

সত্যকাম জাবাল মাতা জবালাকে বললে,[১]
"ব্রহ্মচর্য গ্রহণ করব, কী গোত্র আমার?"
তিনি বললেন, "জানিনে তাত, কী গোত্র তুমি।
যৌবনে বহুপরিচর্যাকালে তোমাকে পেয়েছি,
তাই জানিনে তোমার গোত্র।
জবালা আমার নাম, তোমার নাম সত্যকাম,
তাই বোলো তুমি সত্যকাম জাবাল।"

১ এই আখ্যান-কবিতাটির প্রাথমিক খসড়ায় (১৯৭-সংখ্যক পাণ্ডুলিপি) দুই স্থলেই 'সত্যকাম বললেন' লিখে পরে 'ন' কেটে দেওয়া হয়েছে। তার পরে আছে 'সে বললে'। এটির পরিমার্জিত পাঠে (১৩-সংখ্যক পাণ্ডুলিপি) প্রথম স্থলে আছে 'বললেন,' অন্যত্র আছে 'বললে'। বর্তমান পাঠে কবির অভিপ্রায় অনুসারে প্রথম ক্ষেত্রেও 'বললে' করে দেওয়া হল।

সত্যকাম বললে হারিদ্রুমত গৌতমকে,
"ভগবন্, আমাকে ব্রহ্মচর্যে উপনীত করুন।"
তিনি বললেন, "সৌম্য, কী গোত্র তুমি?"
সে বললে, "আমি তা জানিনে।
মাকে জিজ্ঞাসা করেছি আমার গোত্র কী।
তিনি বলেছেন, যৌবনে যখন বহুপরিচারিণী ছিলেম
তোমাকে পেয়েছি।
আমার নাম জবালা, তোমার নাম সত্যকাম,
বোলো আমি সত্যকাম জাবাল।"
তিনি তখন বললেন, "এমন কথা অব্রাহ্মণ বলতে পারে না।
সত্য থেকে নেমে যাওনি তুমি।
সমিধ্ আহরণ করো সৌম্য, তোমাকে উপনীত করি।"[১]

১৩

আমার বাণীকে দিলেম সাজ পরিয়ে
তোমাদের বাণীর অলংকারে।
তাকে রেখে দিয়ে গেলেম পথের ধারে পান্থশালায়,
নবীন পথিক, তোমারি কথা মনে করে।
যেন সময় হলে একদিন বলতে পারো
মিটল তোমাদেরও প্রয়োজন,
লাগল তোমাদেরও মনে॥

১ ছান্দোগ্য উপনিষদ্, চতুর্থ অধ্যায়ের চতুর্থ খণ্ড। এই রচনাটির পদ্যরূপ আছে 'চিত্রা' কাব্যের 'ব্রাহ্মণ'-নামক কবিতাটিতে।

ছন্দ-ধাঁধা

প্রথম পর্যায়

কবি-কাহিনী

When the evening steals on western waters,
Thrills the air with wings of homeless shadows ;
When the sky is crowned with star-gemmed silence,
And the dreams dance on the deep of slumber ;
When the lilies lose their faith in morning
And in panic close their hopeless petals,
There's a bird which leaves its nest in secret,
Seeks its song in trackless path of heaven.

কি ছন্দ বল্ দেখি ? একটা বাংলা ছন্দে লিখেছিলুম কিন্তু ইংরেজি ছন্দেও পড়া যায়।

দ্বিতীয় পর্যায়

ক

১ ভোর হোলো
কুসুমগুলি তোলো।
আনো ফুলের ডালা
গাঁথো মালা।

২ আকাশ ঢেকেছে মেঘে
বাতাস বহিতেছে বেগে।

৩ মুখে কিছু নাহি বলে
নয়ন দুটি ভরিল জলে।

কবি-কাহিনী (২)

"PHOSTINT"

POST CARD

PLACE STAMP HERE
UNITED STATES AND CANADA ONE CENT
FOREIGN TWO CENTS

When the evening steals on western waters,
~~Hths~~ Thrills the air with wings of homeless shadows;
When the sky is crowned with star-gemmed silence,
And the dreams dance on the deep of slumber;
When the lilies lose their faith in morning
And in panic close their hopeless petals,
There's a bird which leaves its nest in secret,
Seeks its song in trackless path of heaven.

— x —

কি ছন্দ বল দেখি? [illegible] ছন্দ বাংলায় নয়
কিন্তু ইংরেজি ছন্দেও পড়ে না।

...THE ADDRESS

*৪ শোনো না তবুও আপনার মনে
কথা বলে যাই কত,
বধির তীরের নিকটে রাত্রিদিবস
নদীর ধ্বনির মত।

*৫ সারা রাত তারা যতই জলে
রেখা না রাখে আকাশের তলে ॥২৪০

*৬ চাষের সময় কিছু করি নাই হেলা,
ভুলে ছিলাম ফসল কাটিবার বেলা।[১]

*৭ রাতের বাদল মাতে তমালের শাখে,
পাখিদের বাসায় আসিয়া 'জাগো জাগো' ডাকে ॥২১৯

খ

১ সকালে অধীর বাতাস এল
বৃথাই শুধু বনেরে বকালে।
চেয়ে দেখি দিনশেষে
মাটি ঝরা ফুলে ছেয়ে
লতারে ঠকালে কাঙাল করে ॥ পৃ ৭৩

আদর্শ

তৃতীয়ার চাঁদখানি বাঁকা সে,
আপনারে চেয়ে দেখে ফাঁকা সে।

১ 'ছন্দ' গ্রন্থ (পৃ ৭৩) এবং 'স্ফুলিঙ্গ' কাব্য (৮৩-সংখ্যক কবিতা), উভয়ত্রই পাঠ আছে— 'যদিও করিনি হেলা'।

তারাদের পানে চায়
বিদেশী জনের প্রায়
জুড়ি না খুঁজিয়া পায় আকাশে।[১]

*২ শিশির-বাতাস লেগে শরতে
উদাসী মেঘে জল ভ'রে আসে।
তবু কেন বরষণ হয় না,
যেন চেয়ে রয়েছে ব্যথা নিয়ে ॥ পৃ ৭৩

আদর্শ

*ভেসে-যাওয়া ফুল ধরিতে নারে,
ধরিবারে ঢেউ ছুটায় তারে।[২]

*৩ যে দুর্ভাগার মাটিতে বাসা ভেঙেছে,
উচ্চ করি সে আকাশে আশা গাঁথিছে।[৩]

আদর্শ

*বর্ষণগৌরব তার গিয়েছে চুকি,
রিক্ত মেঘ দিকপ্রান্তে মারিছে উঁকি।[৪]

১ এই রচনাটির পাঠ এবং 'ছন্দের মাত্রা : প্রথম পর্যায়' প্রবন্ধে প্রদত্ত দৃষ্টান্তটির পাঠ (পৃ ৯১). এই দুই পাঠে ভাবগত সম্পূর্ণ ঐক্য থাকা সত্ত্বেও ভাষাগত পার্থক্য প্রচুর। তার চেয়েও বেশি লক্ষণীয় এ-দুটি রচনার ছন্দোগত পার্থক্য। 'ছন্দ-ধাঁধা'র রচনাটিতে প্রতি পূর্ণপর্বে আছে চার মাত্রা, আর 'ছন্দের মাত্রা' প্রবন্ধের দৃষ্টান্তটিতে প্রতি পূর্ণপর্বে আছে ছয় মাত্রা।

২ 'স্ফুলিঙ্গ' কাব্যে (১৮৩-সংখ্যক কবিতা) আছে— 'ধরিবারই ঢেউ'।

৩ 'স্ফুলিঙ্গ' কাব্যের (১৮৭-সংখ্যক কবিতা) পাঠ— 'আকাশে সমুচ্চ করি'।

৪ 'স্ফুলিঙ্গ' কাব্যে (১৫৬-সংখ্যক কবিতা) আছে—'ভয়ে দেয় উঁকি'। কিন্তু এই পাঠে এক মাত্রা বেশি হয়। 'মারিছে উঁকি' পাঠই ছন্দের বিচারে অধিকতর সংগত। তাতে পূর্ববর্তী পংক্তির সঙ্গে মাত্রাগত সমতা রক্ষিত হয়।

*৪ অপরাজিতা ফুটিল, লতিকার গর্ব নাহি ধরে—
যেন আকাশের আপন অক্ষরে লিপিকা পেয়েছে।[১]

আদর্শ

*যখন গগনতলে আঁধারের দ্বার গেল খুলি
সোনার সংগীতে উষা চয়ন করিল ফুলগুলি ॥১৯

৫ রংমশালীর দলে ভিড় করেছে
তারা কেউ বা জলে, কেউ বা স্থলে।
অজানা দেশ, রাত্রিদিনে
পায়ের কাছের পথটি চিনে } (ভুল নয়)
তারা দুঃসাহসে এগিয়ে চলে।

গ

১ ঢাক বাজনা গোড়াতেই,
তার কাজ না কাজ করা।

আদর্শ

শকতিহীনের দাপনি
আপনারে মারে আপনি।[২]

১ 'স্ফুলিঙ্গ' কাব্যে এই রচনাটি যে রূপে (১০-সংখ্যক) মুদ্রিত হয়েছে সেটিও এ ছন্দের আদর্শরূপ নয়। 'ছন্দ-ধাঁধা'য় এটির যে 'আদর্শ' দেওয়া আছে, এটিকে সে-ভাবে সাজালে দাঁড়াবে এ-রকম—

ফুটিল অপরাজিতা, লতিকার গর্ব নাহি ধরে—
লিপিকা পেয়েছে যেন আকাশের আপন অক্ষরে।

২ এই দুটি দৃষ্টান্তই আছে ৮৭ পৃষ্ঠায়। অনবধানতাবশে এ-দুটিকে 'দৃষ্টান্তপরিচয়'এর তালিকায় ধরা হয়নি।

২ তোমার হাসিতে আমারে আপনমাঝে জাগালো,
মোর স্বপনের সুরেতে পায়ের নূপুর বাজে।

৩ যাহা কিছু কাঙালের মতো পাস
তাহারে পেয়ে হারাস।
যাহা সব চেয়ে চাবার তাহারে
চেয়ে চেয়ে ফিরিস না।

৪ যে কথা কোনোদিন আর আমার
বলা হয়নি
তাই কারে বলিবারে নাহি জানে
উতলা করে।

*৫ মোর কুঞ্জতলে অনেক মালা গেঁথেছি,
সকাল বেলার অতিথিরা গলে পরল।
কে আজ ঐ সন্ধ্যেবেলায় ডালা আনলো গো
হায় জীর্ণ পাতায় কি শুকনো মালা গাঁথব।[১]

ঘ

১ কুসুম ফুটেছে নিশীথে শেফালি-বনে,
গন্ধে কখন ভরিল বাতাসের ঘুম।

২ উন্মত্ত প্লাবনে ছুটিয়া চলে তটিনী।
ঝরে অজস্র বর্ষণ অশ্রান্ত শ্রাবণে॥

১ 'স্ফুলিঙ্গ' কাব্যে (৬-সংখ্যক কবিতা) আছে— 'সন্ধেবেলা কে এল আজ নিয়ে ডালা' এবং 'ঝরা পাতায়'।

আদর্শ

তব কাছে এই মোর শেষ নিবেদন—
সকল ক্ষীণতা মোর করহ ছেদন।[১]

৩ দুটি কিশোরী বালিকা ফুল নিয়ে
সুখে বকুলতলে মালা গাঁথে।

আদর্শ

অপরূপ এক কুমারীরতন
খেলা করে নীল নলিনীদলে।[২]

৪ আকাশতলে চলে ভাসিয়া
তপন তারকা শশী।

আদর্শ

নীরবে কেন আঁচলে হেন
নয়ন আছে আবরি।

৫ শতদল দুলিছে সুনীল সরোবরে
নিষেধে পলে পলে মধুকরে ক্ষোভিছে।

আদর্শ

হৃদয় আজি মম কেমনে গেল খুলি
জগৎ আসি সেথা করিছে কোলাকুলি।[৩]

১ নৈবেদ্য : ৯৯-সংখ্যক কবিতা। 'নৈবেদ্য' কাব্যে আছে— সকল ক্ষীণতা 'মম'।
২ বিহারীলাল : বঙ্গসুন্দরী ৩।১ ; দ্রষ্টব্য পৃ ১৭৭, ১৮০, ২১৬।
৩ প্রভাতসংগীত : প্রভাত-উৎসব। 'প্রভাতসংগীতে' আছে— হৃদয় আজি 'মোর'।

৬ মোর জীবন-অঙ্গনে একা
একদা দাঁড়াইল অতিথি।
আমার বাতায়নে চাহিয়া
বাহু শূন্য পানে বাড়াইল।

আদর্শ

তুমি মোর জীবনের মাঝে
মিশায়েছ মৃত্যুর মাধুরী।[১]

৭ হয়েছে মোদের ঘরে দীপজ্বালা
হৃদয়ে বাঁশির ধ্বনি এসে লাগে।

আদর্শ

বিদায়পথে কে দেয় মোরে বাধা
পিছন হতে করুণ অনুনয়ে।

৮ মুখের পানে যেমনি তার চাওয়া
উতলা হাওয়া প্রদীপ নিবাইল।

আদর্শ

বলিতে গিয়ে কথা নীরবে কাঁদে
চলিতে পায়ে পায়ে চরণ বাধে।

৯ নবীন ফুলে আজি ঐ কে
সাজি সকালবেলা সাজায়
পেতে আঁচলখানি বনের ছায়ে।

১ স্মরণ : ১৩-সংখ্যক কবিতা।

আদর্শ

গাছের পাতা যেমন কাঁপে
দখিন বায়ে মধুর তাপে
তেমনি মম কাঁপিছে সারা প্রাণ।

১০ তুমি আঁধারে প্রদীপ জেলে
আজি দেখিতে এলে কাহারে,
সে তার ভাবনা মেলে আছে
সুদূর গগনে।

আদর্শ

বিহানবেলা আঙিনাতলে
এসেছ তুমি কি খেলাছলে,
চরণ-দুটি চলিতে ছুটি'
পড়িছে ভাঙিয়া।[১]

ঙ. সহজ

১ জলে নয়ন ভাসিয়া যায়
পলে পলে ফিরিয়া তাকায়।

আদর্শ

কাননপথের পাশে পাশে
শিশির ঝলিছে ঘাসে ঘাসে।

২ দেবালয়ে সাঁঝবেলা
সে ভয়ে ভয়ে চলিছে।

১ শিশু : খেলা।

আদর্শ

মেয়েরা নাহিছে ঘাটে
ছেলেরা সাঁতার কাটে।

৩ কেহ মা-হারা ছেলেকে
যদিবা স্নেহ না করে
আনন্দমনে তবু সে খেলে।

আদর্শ

হই দুঃখী হই দীন
কাহারো রাখি না ঋণ,
কারো কাছে পাতি নাই হাত

১ শিশু : পূজার সাজ।

পাঠপরিচয়

'সম্পূরণ' বিভাগের প্রথম রচনা 'সংস্কৃত শব্দ ও ছন্দ' নিবন্ধের পরিচয় দেওয়া হয়েছে 'বাংলা শব্দ ও ছন্দ' প্রবন্ধের পাঠপরিচয়-প্রসঙ্গে (পৃ ৪৩৫-৩৬)। অন্যান্য রচনার পাঠপরিচয় নীচে দেওয়া গেল আনুক্রমিকভাবে।

জাপানী ছন্দ

'ভাণ্ডার' পত্রিকায় (১৩১২ আষাঢ়) এই রচনাটির নাম ছিল 'জাপানের প্রতি'। কবিতা-তিনটি জাপানকে লক্ষ্য করেই রচিত। ভূমিকাংশে আছে জাপানী কবিতার ছন্দ-পরিচয়। ভূমিকাংশ বা কবিতা-তিনটি থেকে জাপানী ছন্দের মূলনীতির পরিচয় পাওয়া যায় না, পাওয়া যায় শুধু তার বহিরঙ্গগঠনের পরিচয়। বস্তুতঃ এই তিনটি কবিতাই বাংলা 'মাত্রাবৃত্ত' বা সরল কলামাত্রিক রীতিতে রচিত। তিনটিরই পূর্ণ পর্বে আছে সাত কলামাত্রা, আর অপূর্ণ পর্বে আছে পাঁচ কলামাত্রা। এই কবিতা-তিনটির ছন্দে মূলনীতিগত কোনো পার্থক্য বা বৈচিত্র্য নেই, আছে শুধু পর্ববিন্যাসগত পার্থক্য ও বৈচিত্র্য। সাধারণ পাঠকের কানে শুধু এই পার্থক্যটাই অনুভূত হয়।

বলা বাহুল্য, দৃষ্টান্ত-তিনটি রবীন্দ্রনাথের স্বরচিত। এই উপলক্ষে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, 'জাপানযাত্রী' গ্রন্থের ত্রয়োদশ অধ্যায়ে (১৩২৩ জ্যৈষ্ঠ) রবীন্দ্রনাথ তিনটি জাপানী কবিতার বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু সে সূত্রে তিনি জাপানী কবিতার ছন্দ-পরিচয় দেননি, দিয়েছেন শুধু তার ভাবাদর্শের পরিচয়।

'জাপানের প্রতি'-শীর্ষক এই কবিতা-তিনটির প্রসঙ্গে 'স্ফুলিঙ্গ' কাব্যের (১৩৬৭ সংস্করণ) ৯০-সংখ্যক কবিতাটিও স্মরণীয়।—

জাপান, তোমার সিন্ধু অধীর,
প্রান্তর তব শান্ত,
পর্বত তব কঠিন নিবিড়,
কানন কোমল কান্ত।

'জাপানের প্রতি' গুচ্ছের দ্বিতীয় কবিতাটির সঙ্গে এটির ভাবগত সাদৃশ্য লক্ষণীয়।

রবীন্দ্রনাথের ছন্দচিন্তার স্বরূপ উপলব্ধির পক্ষে এই পত্রগুচ্ছের গুরুত্ব কম নয়। আর, তিনটি পত্রের গুরুত্বও তিন রকম। একে একে তিনটি পত্রেরই পরিচয় দেওয়া গেল সংক্ষেপে।

অধ্যাপক এণ্ডারসনকে লেখা প্রথম পত্রটি সম্পর্কে প্রধান বক্তব্য এই যে, সম্ভবতঃ এটিই গদ্যছন্দের প্রতি আকর্ষণ-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের প্রথম সুস্পষ্ট উক্তি। গীতাঞ্জলির ইংরেজি গদ্যানুবাদ করবার সময়ে সুসম্মিত ইংরেজি বাক্যের ব্যঞ্জনাময় ধ্বনিসংগীত ("the suggestive music of well-balanced English sentences") কিভাবে তাঁর মনে 'ইংরেজিরই মতো বাংলা গদ্যে কবিতার রস দেওয়া'-র প্রবর্তনা সঞ্চার করেছিল, পরবর্তী কালে তিনি সে কথার উল্লেখ করেছেন 'পুনশ্চ' কাব্যের (১৩৩৯ আশ্বিন) ভূমিকায় (পৃ ১৮৬)। এই পত্রখানি লেখার অল্পকাল পরেই তিনি গদ্যে কবিতার রসসঞ্চারে প্রবৃত্ত হন 'লিপিকা'র কয়েকটি রচনায় (১৩২৬ আষাঢ়-অগ্রহায়ণ)। সে কথা 'গদ্য-ছন্দ' প্রবন্ধের পাঠপরিচয়-প্রসঙ্গে যথাস্থানে উল্লিখিত হয়েছে (পৃ ৪৩০)। 'ছন্দের অর্থ' প্রবন্ধ পাঠকালে (১৩২৪ চৈত্র ৬) সুকুমার রায় যে গদ্যছন্দের প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন সে কথাও বলা হয়েছে ওই প্রসঙ্গেই। এ-স্থলে আরও একটি কথা বলা অসংগত হবে না।

রবীন্দ্রনাথের গদ্যরচনাতেও যে প্রচুরপরিমাণেই কাব্যরসের স্বাদ পাওয়া যায়, সে কথা প্রথম উপলব্ধি করেছিলেন ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় (পৃ ৪২৯)। অতঃপর সে কথার স্পষ্টতর প্রকাশ ঘটে অধ্যাপক এণ্ডারসনের ১৯১৮ সেপ্‌টেম্বর ১৫ তারিখে লেখা একখানি পত্রে। নৌকাডুবি ও গল্পগুচ্ছের গদ্যরচনার প্রসঙ্গে ওই পত্রে তিনি বলেন—

Prose has its own subtle rhythm too, and even in writing prose you choose your words and their arrangement in a phrase, not only for their expression of your meaning, but for their *sound.* That is, you are at least as much an artist in your prose as in your verse, though perhaps less consciously so. The rhythm of verse, as you say in your delightful lecture, expresses by its motion that mental motion, stirring, thrill, which we call emotion.[১] But so does prose,[২] in its way, not only by what it says but by the way in which it is said.

আশা করি এই উক্তির তাৎপর্যগত সত্যতা তথা ঐতিহাসিক গুরুত্ব কেউ অস্বীকার করবেন না। অধ্যাপক এণ্ডারসন শুধু যে বাংলা পদ্যছন্দের নিষ্ঠাবান্ গবেষক ও তত্ত্বজিজ্ঞাসু ছিলেন তা নয়, তিনি বাংলা গদ্যছন্দেরও নিপুণ রসবোদ্ধা ছিলেন। যা হক, গদ্যের ছন্দকে কাব্যরচনার বাহনরূপে প্রয়োগ করার ব্যাপারে যাঁরা রবীন্দ্রনাথের অন্তরে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ -ভাবে প্রেরণা জুগিয়েছিলেন,

১ স্মরণীয়: 'আবেগকে প্রকাশ করতে গেলে··· তখনই আমাদের হৃদয়ভাবের সঙ্গে তার মিল ঘটে' (পৃ ২৮-২৯)।

২ স্মরণীয়: 'সাধারণ গদ্যের কথা যদি ছেড়ে দাও তো, যাকে বলে impassioned prose তার মধ্যে একটা ছন্দ পাওয়া যায়' (পৃ ৪৩১)।

অধ্যাপক এণ্ডারসন তাঁদের মধ্যে একজন, এ-কথা মনে করা অসমীচীন নয়। তাঁর উল্লিখিত উক্তিটিই এই অভিমতের অন্যতম প্রমাণ বলে স্বীকৃত হতে পারে।

রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় পত্রটি বস্তুতঃ পত্রপ্রবন্ধ বলে গণ্য হবার যোগ্য। এই হিসাবে এটি ১৩২৪ সালে সবুজপত্রে প্রকাশিত এবং বর্তমান সংস্করণে প্রথম প্রবন্ধ-রূপে গৃহীত 'বাংলা ছন্দ' (প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়) -নামক রচনা-দুটির সমশ্রেণীভুক্ত বলে স্বীকৃতি পেতে পারে। অন্য হিসাবে এটি 'ছন্দের অর্থ' প্রবন্ধের পরিপূরকরূপে বিশেষ মর্যাদা পাবার অধিকারী। 'ছন্দের অর্থ' প্রবন্ধে সবিস্তারে উপস্থাপিত ছন্দের মূলনীতিগুলি এই পত্রপ্রবন্ধে ব্যাখ্যাত হয়েছে স্বল্প পরিসরে, সরল ভাষায় ও সহজবোধ্য উপায়ে। সংক্ষিপ্ত হলেও এই পত্রপ্রবন্ধটিতে একপ্রকার সর্বাঙ্গীণতা আছে। বাংলা ছন্দ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের প্রায় সব প্রধান বক্তব্যই এটিতে স্থান পেয়েছে মোটামুটিভাবে।

তা ছাড়া, এই পত্রখানিই বোধ করি রবীন্দ্রনাথের ছন্দ-বিষয়ক একমাত্র ইংরেজি প্রবন্ধ। এটাও এই রচনাটির একটি লক্ষণীয় বিশিষ্টতা।

এই রচনাটির বিষয়বস্তু সম্পর্কে কিছু কিছু মন্তব্য করা হয়েছে মূলপাঠের পাদটীকায়। এ-স্থলে আরও দু-একটি কথা বলা প্রয়োজন।

বাংলা এবং ইংরেজি ভাষার তথা ছন্দের প্রস্বর ও তার প্রয়োগ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ ও এণ্ডারসনের মতের মধ্যে সমতা দেখা যায় না। বস্তুতঃ প্রস্বর ও তার ছন্দোগত প্রয়োগ সম্বন্ধে এণ্ডারসনের বক্তব্য রবীন্দ্রনাথের কাছে কখনোই স্পষ্টরূপে প্রকাশ পায়নি। এণ্ডারসন সাহেব stress শব্দটিকে ঠিক যে পারিভাষিক অর্থে প্রয়োগ করেছেন, রবীন্দ্রনাথ ঠিক সে অর্থে গ্রহণ করেননি। ফলে এণ্ডারসন্ সাহেবের বক্তব্যও তাঁর কাছে স্পষ্ট হতে পারেনি। সেইজন্যই অধ্যাপক মহাশয়

একই বিষয় (বিশেষতঃ একৃসেণ্ট বা প্রস্বরের ত্রিবিধ প্রকারভেদের বিষয়) পরিষ্কার করে বোঝাবার জন্য বারবার চেষ্টিত হয়েছেন। তথাপি শেষ পর্যন্ত এ বিষয়ে উভয়ের মধ্যে মতসামঞ্জস্য স্থাপিত হতে পারেনি। প্রসঙ্গক্রমে বলা প্রয়োজন যে, পারিভাষিক প্রয়োগে stress ও emphasis সমার্থক নয়। পরিভাষার ক্ষেত্রে stress হচ্ছে শব্দের কোনো বিশেষ দলের (সিলেব্‌ল্‌-এর) স্বাভাবিক উচ্চারণপ্রাধান্য-সূচক স্বরবৈশিষ্ট্য, আর emphasis হচ্ছে বক্তার অভিপ্রায়ভেদে ভাববিশেষের প্রাধান্যসূচক স্বরবৈশিষ্ট্য।

এই আলোচনার beat-ও-bar প্রসঙ্গটাও বিশেষভাবে লক্ষণীয়। কেউ কেউ মনে করেন beat-ও-bar তত্ত্বই বাংলা ছন্দের মূলতত্ত্ব। এই পত্রেই বোধ করি উক্ত তত্ত্বের প্রথম স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে। রবীন্দ্রনাথের পূর্বে আর কেউ স্পষ্ট ভাষায় beat ও bar শব্দের যোগে বাংলা ছন্দের নীতি বোঝাতে প্রয়াসী হয়েছেন কিনা জানি না। এ প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে, beat ও bar -এর নীতিকেই বাংলা ছন্দের একমাত্র বা প্রধানতম নীতি বলে স্বীকার করা যায় না। রবীন্দ্রনাথও তা করেননি। 'ছন্দ' গ্রন্থের কোনো প্রবন্ধেই এই নীতিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়নি। তা ছাড়া bar, চলন বা পদক্ষেপ— এই শব্দগুলিও সর্বত্র একার্থে প্রযুক্ত হয়নি। এই শব্দগুলি কোথাও প্রযুক্ত হয়েছে 'পর্ব' অর্থে, আবার অন্যত্র প্রযুক্ত হয়েছে 'উপপর্ব' অর্থে। তাতেও এই তত্ত্বের দুর্বলতা সূচিত হয়।

এই পত্রে রবীন্দ্রনাথ চলতি বাংলার ছন্দকে যে-ভাবে বিশ্লেষণ করেছেন তারও বিশেষ গুরুত্ব আছে। 'ছন্দের অর্থ' প্রবন্ধে 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর' ছড়াটাকে তিনি এমনভাবে বিশ্লেষণ করেছেন যাতে মনে হয় এটাকে তিনি চারমাত্রাপর্বের ছন্দ বলেই গণ্য করেন (পৃ ৫০)। কিন্তু এই পত্রে এর প্রত্যেক উপপর্বে ধরা হয়েছে তিন মাত্রা, অর্থাৎ

এটা ছয়মাত্রাপর্বের ছন্দ বলেই গণ্য হয়েছে (পৃ ৪৮৫)। অতঃপর 'ছন্দের হসন্ত হলন্ত' প্রবন্ধেও দেখা যায়, এই ছড়াটার প্রতি-উপপর্বে তিনি তিন মাত্রাই গণনা করেছেন। বস্তুতঃ চলতি বাংলার ছন্দে প্রতিপর্বের মাত্রাসংখ্যা সম্বন্ধে তাঁর ধারণা কি ছিল, তা নিঃসংশয়ে নিরূপণ করা কঠিন। এ বিষয়ে তাঁর অভিমত প্রথম প্রকাশিত হয় 'ভারতী' পত্রিকার একটি সমালোচনাপ্রবন্ধে (১২৯০ শ্রাবণ)। ওই প্রবন্ধে দেখা যায়, 'মন বেচারির কি দোষ আছে' এই লাইনটাতে তিনি আট 'অক্ষর' অর্থাৎ আটমাত্রা ধরেছেন (পৃ ১৭১)। তার পরেই দেখি এণ্ডারসন সাহেবকে লেখা এক পত্রে (১৩২১ জ্যৈষ্ঠ) তিনি 'সকল কাঁটা ধন্য ক'রে' লাইনটাকে বারো মাত্রার লাইন বলে মনে করছেন (পৃ ৭)। এই অনিশ্চয়তার পরিচয় আছে তাঁর শেষ বয়সের বিশ্লেষণেও। যেমন, 'চলতি ভাষার ছন্দ' প্রবন্ধে (১৩৪৫ কার্তিক) দেখি, তাঁর মতে 'অচিন ডাকে নদীর বাঁকে' লাইনটার সাধুরূপ হচ্ছে এ-রকম—

অচিনের ডাকে নদীটির বাঁকে।

তাতে ওই প্রাকৃত লাইনটার মাত্রাসংখ্যা দাঁড়ায় বারো (পৃ১৩৯)। পক্ষান্তরে, তাঁর মতে এই লাইনটার উচ্চারণসম্মত আসলরূপ হচ্ছে এই—

অচিণ্ডাকে নদীর্বাঁকে।

তাতে ওই প্রাকৃত লাইনটার মাত্রাসংখ্যা দাঁড়ায় আট (পৃ ১৩৯)।

দেখা যাচ্ছে, প্রাকৃত বাংলার ছন্দের প্রতিপর্বে রবীন্দ্রনাথের মতে কয় মাত্রা গণনা করা সংগত সে বিষয়ে অনিশ্চয়তা থেকেই যাচ্ছে। এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ রইল।

রবীন্দ্রনাথকে লেখা অধ্যাপক এণ্ডারসনের ১৯১৮ সেপ্‌টেম্বর ২৮ তারিখের পত্রখানির স্বাভাবিক স্থান 'ছন্দ' গ্রন্থের 'পরিশিষ্ট' বা 'গ্রন্থপরিচয়' বিভাগে। কিন্তু পত্রখানি বাংলা ছন্দের নীতিনির্ণয়ের

ক্ষেত্রে শুধু যে স্বকীয় বিশিষ্টতায় সমুজ্জ্বল তা নয়, রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি পত্রপ্রবন্ধটির সঙ্গেও অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে যুক্ত। তাই 'সম্পূরণ' বিভাগে এটিকে উক্ত পত্রটির পরেই স্থান দেওয়া গেল।

এণ্ডারসন-রচিত একাদশাক্ষরা পংক্তির লাটিন ছন্দকে রবীন্দ্রনাথ কিভাবে গানের রীতি-অনুসারে বাংলা মাত্রাবৃত্ত হিসাবে বিশ্লেষণ করেছেন এবং এণ্ডারসন সাহেব সে সম্বন্ধে যে অভিমত প্রকাশ করেছেন, এ-স্থলে তার পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন। তবে ছন্দোনীতি-সম্পর্কে অধ্যাপক মহাশয়ের কোনো কোনো অভিমতের প্রসঙ্গে দু-একটি কথা বলা আবশ্যক।

এক্‌সেণ্ট্‌ বা প্রস্বরের ত্রিবিধ রূপ সম্বন্ধে তাঁর অভিমত বিশেষ প্রণিধানযোগ্য সন্দেহ নেই। বাংলায় শব্দগত স্থির প্রস্বর নেই, আছে পর্বপ্রস্বর ('phrasal accent') এবং সে প্রস্বর সর্বদাই স্থাপিত হয় পর্বের আদিতে, তাঁর এই অভিমত অবশ্যস্বীকার্য। এ-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর মতপার্থক্য নেই। স্মরণীয় রবীন্দ্রনাথের উক্তি—'বাংলায় আরম্ভে ছাড়া পদের [অর্থাৎ পর্বের] আর কোথাও ঝোঁক পড়িতে পারে না' (পৃ ১৯) এবং 'naturally the beat comes at the beginning of the bar' (পৃ ৪৮৪)। কিন্তু বাংলা প্রস্বর কোন্ প্রকৃতির প্রস্বর, সে বিষয়ে তিনি কোনো স্পষ্ট মত প্রকাশ করেননি। সে প্রস্বর যে গীতিপ্রস্বর নয় তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ব্যাপ্তিপ্রস্বরও হতে পারে না, কারণ প্রস্বরিত দলটি দ্বিমাত্রক হয় না। বস্তুতঃ বাংলা ছন্দে পর্বের আদিস্থিত প্রস্বরটি বলপ্রস্বর বলেই স্বীকার্য, যদিও এই প্রস্বরটি ইংরেজি শব্দের স্থির প্রস্বরের ন্যায় প্রবল নয়। অতএব স্বীকার করতে হবে যে, পর্বের প্রথম দলটি সম্পর্কে 'প্রসারিত' বিশেষণটি সুপ্রযুক্ত হয়নি (পৃ ৪৯৩)। 'প্রসারণ' বলতে বোঝায় ব্যাপ্তি বা দৈর্ঘ্য। পর্বের প্রথম দলটি 'হ্রস্ব' (short) থেকেও 'প্রসারিত' হয়,

এই উক্তি স্ববিরোধী। যদি বলা হত, "The first syllable in Bengali will of its own accord...become প্রস্বরিত", তাহলে সংশয়ের কোনো অবকাশ থাকত না।

"All verse is the rhythmical use of the dominantly audible quality of any given language",—অধ্যাপক এণ্ডারসনের এই উক্তিটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। এই উক্তির মধ্যেই প্রকাশ পেয়েছে সব ভাষার সব ছন্দের অন্তর্নিহিত মূলনীতি। প্রত্যেক ভাষার ছন্দই নিয়ন্ত্রিত হয় সে ভাষার প্রধানতম শ্রুতিবৈশিষ্ট্য ('dominantly audible quality') অর্থাৎ সে ভাষার বিশিষ্টতম প্রাস্বরিক বিধানের দ্বারা।[১] এই মূলনীতির কথা স্মরণে রেখেই অধ্যাপক এণ্ডারসন বাংলাভাষার স্বকীয় প্রাস্বরিক বিধানের বিশিষ্টতা ও স্বাতন্ত্র্যের ভিত্তিতে বাংলাছন্দের স্বরূপ নির্ণয়ে প্রয়াসী হয়েছিলেন। তাঁর সে প্রয়াস যে অনেকাংশেই সফল হয়েছে তাও অস্বীকার করা যায় না। এখানেই তাঁর কৃতিত্ব। এই পত্রখানিতে শুধু যে বাংলা ভাষার স্বকীয় প্রাস্বরিক বিধান সম্বন্ধে তাঁর অভিমত সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে তা নয়, বাংলা ছন্দের বিশিষ্টতম প্রকৃতিটি সম্বন্ধে তাঁর প্রায় সব প্রধান বক্তব্যই স্থান পেয়েছে এটিতে। সে হিসাবে এই পত্রখানিতে একপ্রকার স্বয়ংসম্পূর্ণতা আছে বলা যায়। তা ছাড়া, এটি রবীন্দ্রনাথের পূর্বোক্ত ইংরেজি পত্রপ্রবন্ধটির পরিপূরকরূপেও গ্রহণীয়। এসব কারণে বাংলা

১ তুলনীয়: (১) "প্রত্যেক ভাষারই একটা স্বাভাবিক চলিবার ভঙ্গি আছে। সেই ভঙ্গিটারই অনুসরণ করিয়া সেই ভাষার নৃত্য অর্থাৎ তাহার ছন্দ রচনা করিতে হয়।"—পৃ ৯

(২) "প্রত্যেক ভাষার একটি স্বকীয় ধ্বনি-উদ্ভাবনা আছে। তার থেকে তার স্বরূপ চেনা যায়।... বাংলা ভাষারও নিজের একটা বিশেষ ধ্বনিস্বরূপ আছে।"—পৃ ১২৮

ছন্দের আলোচনায়, বিশেষতঃ রবীন্দ্রনাথের ছন্দতত্ত্ববিচারের প্রসঙ্গে এই পত্রখানির গুরুত্ব উপেক্ষণীয় নয়।

আধুনিক ভাষানীতিসম্মত পদ্ধতিতে যাঁরা বাংলা ছন্দের প্রকৃতি-নির্ণয়ে প্রয়াসী হয়েছেন, অধ্যাপক এণ্ডারসনই বোধ করি তাঁদের সকলের পুরোবর্তী। তাঁরই প্রবর্তনায় রবীন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথ বাংলা ছন্দের সর্বাঙ্গীণ আলোচনায় প্রয়াসী হন। সে হিসাবে অধ্যাপক এণ্ডারসন বাংলার প্রথম ছান্দসিক বলে স্বীকার্য। বাংলা ছন্দের নীতিনিয়ামক প্রস্বরপদ্ধতির স্বরূপনির্ণয়ই তাঁর প্রধান কৃতিত্ব।

কিন্তু বাংলা ছন্দের তিনটি প্রধান রীতির পার্থক্য তাঁর কানে ধরা পড়েনি। সে পার্থক্য ধরা তাঁর পক্ষে হয়তো সম্ভবও ছিল না। যে রবীন্দ্রনাথের হাতে বাংলা ছন্দের এই তিন ধারা সুস্পষ্ট রূপ নিয়েছে, সেই রবীন্দ্রনাথের ছন্দ-বিশ্লেষণেও দীর্ঘকাল এই রীতিভেদের স্বীকৃতি বা উল্লেখ দেখা যায় না। অর্থাৎ বাংলা ছন্দের এই রীতিভেদ রবীন্দ্রনাথের কানে ধরা পড়লেও দীর্ঘকাল তাঁর ছন্দ-আলোচনায় স্পষ্টরূপে ধরা দেয়নি। এই রীতিভেদের প্রথম পরোক্ষ আভাস পাওয়া যায় বোধ করি সত্যেন্দ্রনাথের 'ছন্দ-সরস্বতী' প্রবন্ধে (ভারতী ১৩২৫ বৈশাখ)। 'বাংলা ছন্দের তিনটি শাখা' (পৃ ১৩২) রবীন্দ্রনাথের কাছে প্রথম স্বীকৃতি পায় তাঁর শেষ-বয়সে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠিত 'ছন্দের প্রকৃতি' প্রবন্ধে (১৩৪১ বৈশাখ)।

এই পত্রে প্রকাশিত অধ্যাপক এণ্ডারসনের অন্যান্য প্রাসঙ্গিক উক্তি সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত মন্তব্য দ্রষ্টব্য যথাস্থানে পাদটীকায়।

কাব্যে গদ্যরীতি

এই রচনাংশটি সম্বন্ধে বিশেষ মন্তব্য অনাবশ্যক। কেবল 'অমিতাক্ষর' নামটি সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলা প্রয়োজন। 'অমিত্রাক্ষর'

নামটি একটি বিশিষ্টার্থক পারিভাষিক শব্দ। এই শব্দটির 'আক্ষরিক' (অর্থাৎ ব্যুৎপত্তিগত) অর্থ যাই হক, দীর্ঘকালের ব্যবহারের ফলে এটি এখন একটি বিশিষ্ট রূঢ়ার্থেই প্রযুক্ত হয় (দ্রষ্টব্য 'সংজ্ঞাপরিচয়', পৃ ২৩৩)। এই রূঢ়ার্থের ব্যাখ্যা করা যেতে পারে; কিন্তু 'অমিত্রাক্ষর' নামটিকে বর্জন করে তার স্থলে 'অমিতাক্ষর' চালাবার প্রয়োজনীয়তা দেখি না। বিশেষতঃ অমিত্রাক্ষর বন্ধের যতিভাগ অসমান হলেও 'অমিত' নয়, আর পংক্তিভাগ তো 'অমিত' নয়ই, অসমানও নয়, বরং পরিকল্পিতভাবেই সুমিত এবং সমায়তন।

ছন্দোহার

বিভিন্ন ছন্দের বিশ্লেষণ উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ যে-সব দৃষ্টান্ত রচনা করেন তার অনেকগুলিই কাব্যসৌন্দর্যে দীপ্তিমান্। এই কাব্যসৌন্দর্যের স্বীকৃতি হিসাবে অনেকগুলি দৃষ্টান্তই 'স্ফুলিঙ্গ' কাব্যে স্থান পেয়েছে। অপরদিকে দৃষ্টান্তগুলির ছন্দসৌন্দর্য এবং অভিনবত্বও উপেক্ষণীয় নয়। এ বিষয়ে স্বতন্ত্র ও বিশদ আলোচনার অবকাশ এখনও রইল। 'ছন্দ' গ্রন্থের বর্তমান সংস্করণে দৃষ্টান্তগুলির ছন্দপ্রকৃতি বিশ্লেষণের স্বতন্ত্র প্রয়াস করা হয়নি। পাদটীকায় ও বিভিন্ন প্রসঙ্গে এগুলির ছন্দস্বরূপের সংক্ষিপ্ত পরিচয় বা পরোক্ষ আভাসমাত্র দেওয়া হয়েছে। 'দৃষ্টান্তপরিচয়' বিভাগের মুখবন্ধে এ-কথা উল্লিখিত হয়েছে।

রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত পাণ্ডুলিপিগুলিতে এমন অনেকগুলি দৃষ্টান্তকবিতা রয়েছে যা কাব্যোৎকর্ষ বা ছন্দোবৈচিত্র্যের বিচারে সমাদরণীয় হলেও এখন পর্যন্ত প্রকাশলাভের সুযোগ পায়নি। পাণ্ডুলিপিগুলির স্বতন্ত্র ও বিস্তৃত বিবরণ দেবার সময়ে দৃষ্টান্তগুলিরও স্বরূপনির্দেশের অবকাশ পাওয়া যাবে। বর্তমান সংস্করণে নমুনা-হিসাবে কয়েকটিমাত্র বাছাই-

করা দৃষ্টান্তকবিতা প্রকাশিত হল 'ছন্দোহার' নামে।[1] প্রয়োজনমতো এই রচনাগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া গেল নীচে।

প্রথম দুটি দৃষ্টান্ত রবীন্দ্রস্বীকৃত পদ্ধতিতে রচিত সংস্কৃত 'মন্দাক্রান্তা' ছন্দের বাংলা প্রতিরূপ। বলা প্রয়োজন যে, এই পদ্ধতি দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্‌ভাবিত পদ্ধতির ঈষৎ-পরিবর্তিত অনুবৃত্তি।[2] রবীন্দ্রনাথ মন্দাক্রান্তা ছন্দকে বাংলায় রূপান্তরিত করেছেন অন্ততঃ পাঁচবার। তার মধ্যে দুটি স্বাধীন রচনা। অন্য তিনটি মেঘদূতের প্রথম একটি বা দুটি শ্লোকের বাংলা অনুবাদ। এই পাঁচটির কালানুক্রমিক সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নলিখিতরূপ।—

১। প্রথম দৃষ্টান্তটি (পৃ ১৯০) আছে প্যারীমোহন সেনগুপ্তকে লিখিত পত্রে (১৯৩১ মার্চ)। এটি স্বাধীন রচনা। প্রথম তিন যতিবিভাগে ও পংক্তিতে-পংক্তিতে মিলরক্ষা এই রচনাটির অন্যতম বিশিষ্টতা। শেষ যতিবিভাগে আছে পাঁচ মাত্রা, এটাও লক্ষিতব্য।

২। দ্বিতীয় দৃষ্টান্তটিও (পৃ ১৯০) উক্ত পত্রেরই অন্তর্গত। এটি

১ পাঠকসাধারণের গোচরার্থে এগুলি সম্প্রতি 'বিশ্বভারতী পত্রিকা'তেও (১৩৬৯ শ্রাবণ-আশ্বিন) প্রকাশিত হয়েছে 'ছন্দ-কণিকা' নামে। গ্রন্থে গ্রহণকালে দৃষ্টান্তগুলির ছন্দোবৈশিষ্ট্যের প্রতি দৃষ্টি রেখে এগুলির পর্যায়ক্রমে কিছু পরিবর্তন করা গেল। এগুলির পাঠশুদ্ধি এবং ছন্দসংগত বিন্যাসের প্রতিও যথোচিত দৃষ্টি রাখা গেল।

একথাও মনে রাখা প্রয়োজন যে, ছন্দের পাণ্ডুলিপিতে পাওয়া গেলেও প্রত্যেকটি কবিতাই যে ছন্দের দৃষ্টান্ত হিসাবে রচিত তা নিঃসন্দেহে বলা যায় না। কারণ সবগুলি কবিতাই প্রবন্ধের অন্তর্ভুক্ত নয়। কতকগুলি রচনা বিচ্ছিন্নভাবে পাণ্ডুলিপির নানাস্থানে ছড়ানো রয়েছে।

২ স্মরণীয়: 'সংস্কৃত ছন্দের দীর্ঘহ্রস্ব স্বরকে সমান করে নিয়ে কেবলমাত্র মাত্রা মিলিয়ে ছন্দ রচনা বাংলায় দেখেছি, সে বহুকাল পূর্বে স্বপ্নপ্রয়াণে' (পৃ ১৩৩)। দ্রষ্টব্য পৃ ১৩৫ পাদটীকা-১ এবং মন্দাক্রান্তা ছন্দের সংজ্ঞাপরিচয় (পৃ ২৬৬-৬৯)।

মেঘদূতের প্রথম শ্লোকের অনুবাদ। এরও শেষভাগে আছে পাঁচ মাত্রা, কিন্তু কোথাও মিল নেই।

৩। তৃতীয় দৃষ্টান্ত (পৃ ৯৩) 'ছন্দের মাত্রা : প্রথম পর্যায়' প্রবন্ধের (১৩৩৯ কার্তিক) অন্তর্গত। এটিতে আছে মেঘদূতের প্রথম দুই শ্লোকের অনুবাদ। এই অনুবাদ পাওয়া যায় দুটি পাণ্ডুলিপিতে।— এক, ৫৫-সংখ্যক পাণ্ডুলিপি (পৃ ৬০)। আভ্যন্তরীণ পৌর্বাপর্য দেখে মনে হয়, বাংলা মন্দাক্রান্তার এই 'নমুনা'টি রচিত হয়েছিল ১৯৩২ সালের ১৬ জুলাই থেকে ১৯ জুলাই[1] তারিখের মধ্যে। দুই, ৩২-সংখ্যক পাণ্ডুলিপি (পৃ ১১-১২)। এটিতে আছে 'নবছন্দ' প্রবন্ধের খসড়া। রচনার তারিখ ১৯৩২ জুলাই ৩০ (দ্রষ্টব্য পৃ ৪১৪)।

এই রচনাটির প্রথম দুই যতিবিভাগে মিল আছে, তৃতীয় বিভাগটি মিলহীন, আর শেষভাগে আছে চার[2] মাত্রা। এদিক্ থেকে প্রথম দুটি দৃষ্টান্তের সঙ্গে এটির পার্থক্য লক্ষণীয়।

৪। অতঃপর উল্লেখ্য 'ছন্দের প্রকৃতি' প্রবন্ধের (১৩৪১ বৈশাখ) জন্য রচিত মাত্রাগোনা বাংলা মন্দাক্রান্তার নমুনাটি (পৃ ১৩৪)। এটি প্রায় সর্বাংশেই প্রথম দৃষ্টান্তটির অনুরূপ। সেটির মতো এটিতেও প্রথম তিন যতিবিভাগে ও পংক্তিতে-পংক্তিতে মিল আছে, কিন্তু শেষভাগে আছে চার মাত্রা। এটিও স্বাধীন রচনা, অনুবাদ নয়। সেদিক্ থেকেও এটি প্রথমটির অনুরূপ।

'ছন্দোহার'-এর প্রথম দৃষ্টান্তটি এই রচনাটিরই গোড়ার দিকের দুই পংক্তির প্রাথমিক রূপ। পাওয়া গিয়েছে ১৯৭-সংখ্যক পাণ্ডুলিপির মলাটের ভিতরের দিকের পৃষ্ঠায়। এই পাণ্ডুলিপিতেই আছে 'ছন্দের প্রকৃতি' প্রবন্ধের প্রথম খসড়া (দ্রষ্টব্য পৃ ৪৪৪)।

১ ১৯৩২ জুলাই ১৯ = বাংলা ১৩৩৯ শ্রাবণ ৩।

২ দ্রষ্টব্য পৃ ৪৭ পাদটীকা ১, পৃ ১৯০ পাদটীকা ৩, এবং সংজ্ঞাপরিচয় পৃ ২৬৬-৬৭।

৫। উক্ত 'ছন্দের প্রকৃতি' প্রবন্ধেরই চতুর্থ পাণ্ডুলিপির পেছনের পৃষ্ঠায় আছে মন্দাক্রান্তা ছন্দের আর-একটি বাংলা প্রতিরূপ। এটিও মেঘদূতের প্রথম শ্লোকের অনুবাদ (দ্রষ্টব্য পৃ ৪৪৬)। এই অনুবাদ-দৃষ্টান্তটি কোনো প্রবন্ধে স্থান পায়নি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের নিজের পদ্ধতিতে রচিত বাংলা মন্দাক্রান্তার দৃষ্টান্ত হিসাবেই এর একটা মূল্য আছে। তাই এটিকে প্রকাশ করা গেল 'ছন্দোহার'-এর দ্বিতীয় রচনা-রূপে।

এটির সঙ্গে তুলনীয় প্যারীমোহন সেনগুপ্তকে লেখা পত্রে প্রদত্ত দ্বিতীয় দৃষ্টান্তটি। দুটিই মেঘদূতের প্রথম শ্লোকের অনুবাদ। দুটিই সংস্কৃত অমিত্রাক্ষর রীতির অনুবর্তনে রচিত। পার্থক্য শুধু এই যে, একটির শেষভাগে পাঁচ মাত্রা, অপরটির চার মাত্রা।

বাংলা মাত্রাবৃত্ত পদ্ধতিতে মন্দাক্রান্তাকে বাংলায় রূপান্তরিত করার প্রথম প্রয়াস দেখা যায় প্যারীমোহন সেনগুপ্তের মেঘদূত কাব্যের পদ্যানুবাদে (১৩৩৭ মাঘ)। এই অনুবাদে প্রতিপংক্তিতে আট-সাত-সাত-পাঁচ হিসাবে যতিভাগ না করে সাত-সাত-সাত-পাঁচ হিসাবে যতিভাগ করা হয়েছে। এই হিসাবের যৌক্তিকতা দেখাতে চেষ্টা করেছেন প্রবোধচন্দ্র সেন উক্ত গ্রন্থের ভূমিকায়। এই ভূমিকার সমালোচনা-প্রসঙ্গেই রবীন্দ্রনাথ সর্বপ্রথম মন্দাক্রান্তাকে বাংলায় মাত্রাবৃত্ত রূপ দেন আট-সাত-সাত-চার বা পাঁচ হিসাবে (পৃ ১৯০)।

অতঃপর কান্তিচন্দ্র ঘোষ মেঘদূতের পদ্যানুবাদ করেন প্রবোধচন্দ্র-সমর্থিত পদ্ধতিতে সাত-সাত-সাত-পাঁচ হিসাবে (বিচিত্রা ১৩৩৯ শ্রাবণ)। প্যারীমোহন যতিভাগে মিল না রেখে শুধু পংক্তিমিলই রক্ষা করেছেন। কান্তিচন্দ্রের অনুবাদে প্রথম দুই যতিভাগেও মিল আছে। কান্তিচন্দ্রের এই অনুবাদ প্রকাশের কাছাকাছি সময়েই (১৩৩৯ শ্রাবণ) রবীন্দ্রনাথ আবার মন্দাক্রান্তাকে বাংলায় রূপান্তরিত

করেন তাঁর নিজের পূর্বোক্ত পদ্ধতিতে। এই রূপান্তরটি স্থান পেয়েছে 'ছন্দের মাত্রা : প্রথম পর্যায়' প্রবন্ধে (পৃ ৯৩)। এটিতেও কান্তিচন্দ্রের অনুবাদের মত প্রথম দুই যতিভাগের মধ্যে মিল দেখা যায়। কান্তিচন্দ্রের অনুবাদ ও রবীন্দ্রনাথের এবারের রূপান্তরণের মধ্যে কালগত সান্নিধ্য ও আদর্শগত সাদৃশ্য দেখা যায়। এই দুইএর মধ্যে কোনোপ্রকার কার্যকারণ-সম্বন্ধ আছে কিনা অনুসন্ধানের বিষয়।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের উদ্‌ভাবিত পদ্ধতি দ্বিজেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের পদ্ধতি থেকে সম্পূর্ণ পৃথক্, সে কথা পূর্বেই বলা হয়েছে (দ্রষ্টব্য পৃ ২৬৯, পৃ ৩৩৩ পাদটীকা ২ এবং পৃ ৪৯১ পাদটীকা ১)। সত্যেন্দ্রনাথের উদ্‌ভাবিত মন্দাক্রান্তা ছন্দে স্বতন্ত্র কবিতা রচনা বরং চলতে পারে, কিন্তু ওই পদ্ধতিতে মেঘদূতের পদ্যানুবাদ করা অসাধ্য না হলেও অতিশয় দুঃসাধ্য তাতে সন্দেহ নাই।[১] সে দিক্ থেকে প্যারীমোহন ও রবীন্দ্রনাথের পদ্ধতিই যে প্রশস্ত, সে কথাও স্বীকার্য।

'ছন্দোহার'-এর তৃতীয় দৃষ্টান্তটি রচিত সংস্কৃত শার্দূলবিক্রীড়িত ছন্দের মাত্রা-মেলানো বাংলা প্রতিরূপ হিসাবে। এ ছন্দের ধ্বনিবিন্যাসের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হয়েছে 'সংজ্ঞাপরিচয়' বিভাগে (পৃ ৩০২-০৩)। শার্দূলবিক্রীড়িত একটি কঠিন ছন্দ। এটিকে বাংলায় রূপান্তরিত করাও সহজসাধ্য নয়। দ্বিজেন্দ্রনাথের 'স্বপ্নপ্রয়াণ' কাব্যেও এ ছন্দের নিদর্শন নেই; অথচ ওই কাব্যেই মন্দাক্রান্তার কয়েকটি ও শিখরিণীর একটি নিদর্শন আছে। রবীন্দ্রনাথও মন্দাক্রান্তার কয়েকটি ও শিখরিণীর

১ দ্রষ্টব্য প্যারীমোহন সেনগুপ্তের 'মেঘদূত' গ্রন্থের (দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৪৬) প্রবোধচন্দ্র সেন-লিখিত ভূমিকা (পৃ ২৩)। এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় এই যে, সত্যেন্দ্রনাথের এই নূতন রীতি প্রবর্তনের পরে অর্ধশতাব্দী কালের মধ্যেও কেউ এই রীতিতে মেঘদূতের পদ্যানুবাদ করতে সাহসী হননি। ইদানীং শ্রীযোগীন্দ্রনাথ মজুমদারের এই দুঃসাধ্য-সাধনের নিদর্শন প্রকাশিত হয়েছে 'সংহতি' পত্রিকায় (১৩৬৯ আষাঢ় ও শ্রাবণ সংখ্যা)।

একটিমাত্র দৃষ্টান্ত রচনা ও প্রকাশ করেন। শার্দূলবিক্রীড়িত ছন্দেরও একটিমাত্র দৃষ্টান্ত রচনা করেছিলেন। কিন্তু সেটি কোনো প্রবন্ধের অঙ্গীভূত হয়নি। অথচ এই দৃষ্টান্তটির ছন্দোগত তথা ঐতিহাসিক মূল্য কম নয়। তাই 'ছন্দোহার'-এ মন্দাক্রান্তার পরেই এটির স্থান নির্দিষ্ট হল।

সংজ্ঞাপরিচয়ে দেখানো হয়েছে যে, এ ছন্দের দুটি প্রধান ভাগ— প্রথম ভাগে বারোটি বর্ণ বা দল (সিলেব্‌ল্), দ্বিতীয় ভাগে সাতটি। লঘু দলকে এক মাত্রা ও গুরু দলকে দুই মাত্রা ধরে নিয়ে হিসাব করলে এই দুই ভাগে মাত্রাসংখ্যা দাঁড়ায় যথাক্রমে আঠারো এবং বারো। কিন্তু যতি বা বিরতি ছাড়া একটানা আঠারো বা বারো মাত্রা উচ্চারণ করা সম্ভব নয়। তাই রবীন্দ্রনাথ আঠারো ও বারো মাত্রাকে যথাক্রমে ছয়-সাত-পাঁচ এবং আট-চার মাত্রায় ভাগ করে নিয়েছেন। যেমন—

ডাকিল কি তবে : মধু বাঁশরী-রবে : একেলা যবে |
বিজন-নদী-পুলিনে : ছিনু বসে।

এই বড় ভাগ-দুটিকে আরও নানাভাবেই ছোট-ছোট ভাগে বিভক্ত করা যায় (দ্রষ্টব্য পৃ ২১৩)। বস্তুতঃ সংস্কৃতে তাই করা হয়। এস্থলে সে বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

সত্যেন্দ্রনাথও তাঁর নিজের পদ্ধতিতে শার্দূলবিক্রীড়িত ছন্দের অনুসরণে প্রয়াসী হয়েছেন একটিমাত্র রচনায়। রচনাটির নাম 'বিদ্যুৎ-বিলাস' ('বেলাশেষের গান' কাব্যের অন্তর্ভুক্ত)। সত্যেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ, উভয়ের রচনাতেই এ ছন্দের প্রথম ভাগের উপবিভাগগুলির একই রূপ ; দ্বিতীয় ভাগের উপবিভাগ রচনায় পার্থক্য আছে। তা ছাড়া, সত্যেন্দ্রনাথ যে-ভাবে ঘন ঘন মিলের ব্যবস্থা করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ সে-ভাবে তা করেননি।

নজরুল ইস্‌লামের 'পূবের হাওয়া' কবিতার ('ছায়ানট' কাব্য)

একটি অংশেও সত্যেন্দ্রনাথের পদ্ধতিতে শার্দূলবিক্রীড়িত ছন্দ অনুসরণের প্রয়াস দেখা যায়। এই প্রয়াস সফল হয়েছে বলা যায় না। বস্তুতঃ এই রচনাটির নানা অংশেই ছন্দের স্খলন দেখা যায়। সত্যেন্দ্রনাথের রচনাটিতে এই ছন্দের শাস্ত্রোক্ত নিয়ম অনুসৃত হয়েছে নিখুঁতভাবেই। কিন্তু শ্রুতিরুচির নিগূঢ় নীতির উপরে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তাই কান প্রসন্ন হয় না, অর্থাৎ এটিকেও সার্থক রচনা বলা যায় না। রবীন্দ্রনাথের রচনাটিও সম্ভবতঃ তাঁর কানের প্রসন্নতা লাভ করতে পারেনি। বোধ করি সেজন্যই তিনি এটিকে কোনো প্রবন্ধে স্থান দেননি।

শার্দূলবিক্রীড়িত ছন্দকে বাংলা রূপ দেওয়া সহজসাধ্য নয়। ছন্দ বজায় রেখে সংস্কৃত রচনাকে বাংলায় অনুবাদ করা আরও দুঃসাধ্য। তবু চেষ্টা করা যেতে পারে। গীতগোবিন্দ কাব্যের প্রথম লাইনটা[১] নিয়েই পরীক্ষা করা যাক।—

মেঘৈর্মেদুরমম্বরং বনভুবঃ | শ্যামাস্তমালদ্রুমৈঃ।

সংস্কৃত ছন্দের নির্দিষ্ট নিয়ম ও বাংলাভাষার স্বাভাবিক শ্রুতিবিধান, এই দুই দিক্ বজায় রেখে উদ্ধৃত লাইনটাকে অনুবাদ করা যায় নিম্নলিখিতরূপে।—

অম্বর মেঘলা-শ্যামল,
শ্যামল বনভুবন |
শ্যামরঙ দ্রুমের পত্রাভায়।

এই অনুবাদে অনুসৃত হয়েছে সত্যেন্দ্রনাথের উদ্ভাবিত পদ্ধতি। তাই এটিতে বারো-সাতের দলবিভাগ এবং আঠারো-বারোর মাত্রা-বিভাগ দুই-ই বজায় আছে। অথচ ধ্বনিবিন্যাসের দিক্ থেকে এটি

১ দ্রষ্টব্য পৃ ১৪৮, ২১৩ এবং ৩০২-০৩।

রবীন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথ উভয়েরই রচিত দৃষ্টান্ত থেকে অনেকাংশে পৃথক্। তা ছাড়া, বাংলার স্বাভাবিক শ্রুতিবিধানও বোধ করি এটিতে লঙ্ঘিত হয়নি। সংস্কৃত রচনাতেও অনেক সময় এ-রকম ধ্বনিবিন্যাস দেখা যায়।

চতুর্থ দৃষ্টান্তটি সম্বন্ধে মনে হয়, এটিও সম্ভবতঃ কোনো সংস্কৃত বা প্রাকৃত-ভাঙা ছন্দের নিদর্শনরূপে রচিত। এমন কি, কোনো সংস্কৃত বা প্রাকৃত রচনার অনুবাদ হওয়াও অসম্ভব নয়। এটির ছন্দস্বরূপ নিঃসংশয়ে নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি। অনেক সংস্কৃত ও প্রাকৃত ছন্দের ন্যায় এই দৃষ্টান্তটির বিভিন্ন অংশের মধ্যে মাত্রাসংখ্যার সমতা নেই। সংস্কৃত আর্যাশ্রেণীর ছন্দ এ-রকম অসমতার জন্য সুপরিচিত। পথ্যার্যার প্রথমার্ধে থাকে বারো-আঠারো হিসাবে ত্রিশ মাত্রা, আর দ্বিতীয়ার্ধে থাকে বারো-পনেরো হিসাবে সাতাশ মাত্রা (দ্রষ্টব্য পৃ ২৩৪-৩৫)। আলোচ্যমান চতুর্থ দৃষ্টান্তটির প্রথমার্ধে বারো-আঠারো হিসাবে ত্রিশ মাত্রাই পাওয়া যাচ্ছে। বলা বাহুল্য, সংস্কৃত রীতি অনুসারে পংক্তির অন্তস্থিত 'ল' ধ্বনিটিকে দ্বিমাত্রক বলে গণ্য করা হয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে আর্যার ন্যায় সাতাশ মাত্রা পাওয়া যায় না, পাওয়া যায় আটাশ মাত্রা। অতএব এই দৃষ্টান্তটি পথ্যার্যার প্রতিরূপ নয় বলেই মনে হয়। আর্যার অন্যতম প্রকারভেদের নাম 'গীতি' বা 'পথ্যাগীতি'।[১] এই ছন্দের উভয় অর্ধেই থাকে বারো-আঠারো হিসাবে ত্রিশ মাত্রা। আলোচ্যমান দৃষ্টান্তটির দ্বিতীয়ার্ধে প্রথম ও দ্বিতীয় যতির পূর্ববর্তী দুটি 'রে' ধ্বনিকেই গুরু বা দ্বিমাত্রক বলে ধরা যায় তবে উভয় অর্ধেই বারো-আঠারো

১ সংস্কৃত 'পথ্যার্যা' ছন্দকে প্রাকৃত-ছন্দশাস্ত্রে বলা হয় 'গাহা' অর্থাৎ গাথা। তেমনি সংস্কৃত 'পথ্যাগীতি'র প্রাকৃত নাম 'উগ্গাহা' অর্থাৎ উদ্গাথা। দ্রষ্টব্য 'প্রাকৃতপৈঙ্গলম্' : প্রথম পরিচ্ছেদ (মাত্রাবৃত্তম্), শ্লোকসংখ্যা ৫৪ এবং ৬৮।

হিসাবে ত্রিশ মাত্রাই পাওয়া যাবে। সে দিক্ থেকে এটিকে 'গীতি' ছন্দের প্রতিরূপ বলে মনে করা যায়। কিন্তু আর্যাজাতীয় সব ছন্দেরই প্রতি গণে বা পর্বে থাকে চার মাত্রা। কিন্তু এই দৃষ্টান্তটির দ্বিতীয়ার্ধের প্রতিপর্বে আছে ছয় মাত্রা। তাই এটিকে 'গীতি' ছন্দের প্রতিরূপ বলে গণ্য করা সম্বন্ধেও একটু সংশয় থেকে যায়।

'নয়ন-অতিথিরে' ইত্যাদি পঞ্চম দৃষ্টান্তটি রচিত হয়েছে বাংলা 'অসমান মাত্রাভাগের' ছন্দের নিদর্শনরূপে (পৃ ১৩৩)। কিন্তু এই দৃষ্টান্তটিতে ছন্দোভাগের অসমতা খুব বেশি নয়। 'মানসী' কাব্যের 'বিরহানন্দ' ও 'ক্ষণিক মিলন', 'সোনার তরী' কাব্যের 'গানভঙ্গ' এবং 'কথা' কাব্যের 'মস্তকবিক্রয়' প্রভৃতি রবীন্দ্রনাথের অনেক রচনাতেই মাত্রাভাগের অসমতা অধিকতর সুস্পষ্ট।

ষষ্ঠ দৃষ্টান্তটি যদিও ছন্দের পাণ্ডুলিপি থেকেই সংগৃহীত তথাপি এটি ছন্দের নিদর্শনরূপেই রচিত কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। রচনাটি ছন্দ-প্রবন্ধের অঙ্গীভূত নয়। এটি লিখিত আছে পাণ্ডুলিপির মলাটের ভিতরের পৃষ্ঠায়। তার পাশেই লেখা আছে 'সু'। রচনাটির বিষয়বস্তু দেখে মনে হয় এটি কারও বিয়ের আশীর্বাদ হিসাবে রচিত। পূর্বোক্ত 'সু' অক্ষরটি হয়তো তারই সংকেতসূচক।

এটি চতুর্মাত্রপর্বিক মাত্রাবৃত্ত (বা সরল কলামাত্রিক) রীতিতে রচিত। সেদিক্ থেকে এটিতে কোনো নূতনত্ব নেই। কিন্তু এর প্রথম দুই পংক্তির বন্ধ রচনায় একটু বিশিষ্টতা আছে। কেননা, এই দুই পংক্তি মাত্রাবৃত্ত রীতির 'মহাপয়ার' (পৃ ২৫৪) বন্ধে রচিত। 'অক্ষরগোনা' সাধু রীতিতে বা 'দলগোনা' লৌকিক রীতিতে মহাপয়ার রচনার দৃষ্টান্ত যথেষ্ট পাওয়া যায়। কিন্তু 'কলাগোনা' মাত্রাবৃত্ত বা সরল কলামাত্রিক রীতির মহাপয়ার রবীন্দ্রসাহিত্যেও দুর্লভ। এই বিশিষ্টতাটুকু লক্ষণীয়।

সপ্তম দৃষ্টান্তটি রচিত ষন্মাত্রপর্বিক সাধারণ মাত্রাবৃত্ত বা সরল কলামাত্রিক রীতিতে। কিন্তু এর প্রথম দুটি লাইন দলমাত্রিক রীতিতেও পড়া যায়। এই দুই লাইনের প্রতিপর্বে যুগপৎ পাওয়া যায় চার দল ও ছয় কলা। এ-রকম উভচারী ছন্দোরীতিকে বলা যায় 'দলকলামাত্রিক'। অষ্টম এবং নবম, এই দুটি দৃষ্টান্তও এই উভচারী পদ্ধতিতে রচিত। দুই দৃষ্টান্তেই পূর্ণপর্ব গঠিত হয়েছে চার দল নিয়ে। কিন্তু অষ্টম রচনাটিতে চার দলের কাঠামোর মধ্যে স্থান পেয়েছে পাঁচটি করে কলামাত্রা, আর নবম দৃষ্টান্তে ওই কাঠামোর মধ্যেই আছে ছয় কলামাত্রা। পারিভাষিক পদ্ধতিতে বলা যায় অষ্টম রচনাটি চতুর্দল-পঞ্চকলপর্বিক ছন্দে রচিত, আর নবম রচনাটি রচিত চতুর্দল-ষট্‌কলপর্বিক ছন্দে।[১] এক কলার পার্থক্যে এই দুই দৃষ্টান্তের মধ্যে শ্রুতিসুষমার যে ভিন্নতা ঘটেছে তা সামান্য নয়।

দশম দৃষ্টান্তটি রচিত সুপরিচিত দলমাত্রিক লৌকিক পদ্ধতিতে। কিন্তু সাধারণতঃ দলমাত্রিক রীতির ছন্দে যে লঘুচপলতা দেখা যায়, এই দৃষ্টান্তটিতে তা নেই। তার পরিবর্তে এটিতে যে ধ্বনির গাম্ভীর্য, ভাষা ও ভাবের বলিষ্ঠতা ও গতিভঙ্গির দৃঢ়তা প্রকাশ পেয়েছে, তাই হচ্ছে এ দৃষ্টান্তটির বিশিষ্টতা। 'খাঁটি বাংলায় সকল রকম ছন্দেই সকল কাব্যই লেখা সম্ভব' (পৃ ১৩০), এই উক্তির সমর্থন মেলে এই রচনাটিতে।

এগারো ও বারো, এই দুটি দৃষ্টান্তই ভাবের ছন্দ বা গদ্যছন্দের বিশিষ্টতার পরিচায়ক হিসাবে রচিত। এই বিশিষ্টতার পরিচয় দেওয়া উপলক্ষে এই দুটি রচনার যে-দুটি মুখবন্ধ লিখিত আছে পাণ্ডুলিপিতে, সে-দুটিও এ স্থলে উল্লেখযোগ্য। এগারো-সংখ্যক রচনাটির মুখবন্ধটুকু এই।—

১ 'স্বপ্ন আমার বন্ধনহীন সন্ধ্যাতারার সঙ্গী' ইত্যাদি দৃষ্টান্তটিও (পৃ ৬৪) এই উভচারী চতুর্দল-ষট্‌কলপর্বিক ছন্দে রচিত।

> এইখানে একটি চৈনিক কবিতার এক অংশ তরজমা করে দেখাতে লোভ হচ্ছে। এর বিষয়টি সাদাসিধে, ভাষায় কারিগরি নেই, কিন্তু একে কাব্য না বলে কী বলব।
>
> —১৯৭-সংখ্যক পাণ্ডুলিপি, পৃ ৪০

বারো-সংখ্যক আখ্যানকবিতাটির প্রাথমিক খসড়া আছে ১৯৭-সংখ্যক পাণ্ডুলিপিতে, আর তার পরিমার্জিত রূপ আছে ১৩-সংখ্যক পাণ্ডুলিপিতে। এই পরিমার্জিত রূপই সংকলিত হল 'ছন্দোহার' বিভাগে। এই রচনাটির ভূমিকাটুকুও উদ্‌ধৃতিযোগ্য।—

> ছান্দোগ্য উপনিষদে সত্যকাম জাবালের যে আখ্যান আছে সে গদ্যে লেখা। তাতে দেখতে পাই এই ভাবের ছন্দ। কথাগুলি অল্প, অতি সহজে সাজানো, তাই সমস্ত সত্য সমস্ত রস নিয়ে হৃদয়ে প্রবেশ করতে তার বিলম্ব হয় না।
>
> —১৯৭-সংখ্যক পাণ্ডুলিপি, পৃ ৪২

এই ভূমিকাটুকুর ঈষৎ-মার্জিত রূপ আছে ১৩-সংখ্যক পাণ্ডুলিপিতে। সেটুকু এখামে উদ্‌ধৃত করা অনাবশ্যক।

দুটি পাণ্ডুলিপিতে স্থান পেলেও 'বঙ্গশ্রী' পত্রিকায় প্রকাশকালে 'গদ্যছন্দ' প্রবন্ধ থেকে এই আখ্যানকবিতাটি বর্জিত হয়। 'ছন্দ' গ্রন্থেও এটি স্থান পায়নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও উপনিষদের এই গদ্যরচনাটির কাব্যসৌন্দর্যের গভীর রসোপলব্ধি তাঁর চিত্ত থেকে কখনও মুছে যায়নি। তার প্রমাণ আছে তাঁর মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্বের উক্তিতেও।—

> আমি যখনই সে কাহিনীটি পড়েছি, তার কাব্যের ঐশ্বর্য দেখে মুগ্ধ হয়েছি, অনুভব করেছি তার চমৎকার কাব্যমাধুর্য।[১]

১ দ্রষ্টব্য প্রবোধচন্দ্র সেন-প্রণীত 'ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থের (১৩৫২) 'পরিশেষ' বিভাগে 'গদ্যকবিতার ছন্দ' -নামক সংলাপ-প্রবন্ধ, পৃ ২১৩। এই প্রবন্ধটিতে গদ্যছন্দ

'ছন্দোহার'-এর তেরো-সংখ্যক কবিতাটি রচিত হয়েছিল 'গদ্যছন্দ' প্রবন্ধের উপসংহার-রূপে। এটিরও প্রাথমিক রূপ আছে ১৯৭-সংখ্যক পাণ্ডুলিপিতে, আর পরিমার্জিত রূপ আছে ১৩-সংখ্যক পাণ্ডুলিপিতে। শেষোক্ত পরিমার্জিত রূপটিই সংকলিত হল 'ছন্দোহার' বিভাগে। প্রাথমিক খসড়ার মুখবন্ধটুকু ছিল এ-রকম।—

তখনকার কালে মানুষ ছিল, যাদের ভালোবাসতুম, তাদের আসরে গান গেয়েছি। এখনকার কালেও মানুষ আছে যাদের ভালোবাসি, তাই মানতে হল এখনকার ভাষা।

তোমরা গ্রন্থি বেঁধে দিলে তোমাদের কালে আমাদের কালে
হৃদয়ে হৃদয়ে।
দিনের শেষে তাই নতুন পালা শুরু হল আমার।

—১৯৭-সংখ্যক পাণ্ডুলিপি, পৃ ৪৪

তার পরেই আছে 'ছন্দোহার'-এর তেরো-সংখ্যক রচনাটি। ১৩-সংখ্যক পাণ্ডুলিপির পরিমার্জিত রূপে এই ভূমিকাটুকু ঈষৎ-সংস্কৃত হয় এবং কবিতাংশটি থেকে উল্লিখিত প্রথম তিনটি লাইন বর্জিত হয়। বাকি লাইন-কয়টি অপরিবর্তিত রূপেই স্বীকৃত হয়। কেবল প্রথম খসড়ার 'পথিক বন্ধু'-কে বদলে করা হয় 'নবীন পথিক'।

কিন্তু পত্রিকায় প্রকাশকালে 'গদ্যছন্দ' প্রবন্ধের সমগ্র উপসংহারটুকুই বর্জিত হয় এবং তার স্থলে নূতন বক্তব্য যুক্ত হয়। 'ছন্দ' গ্রন্থেও পত্রিকার পাঠই গৃহীত হয়। বর্তমান সংস্করণেও এই শেষরূপটিই স্বীকৃত হয়েছে।

সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের বহু প্রণিধানযোগ্য উক্তি সংকলিত হয়েছে। কিন্তু প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে অনুমোদন বা সংশোধন করিয়ে নেবার সুযোগ হয়নি। তাই 'ছন্দ' গ্রন্থের বর্তমান সংস্করণের 'পরিশেষ' বিভাগে এটিকে স্থান দেওয়া হয়নি।

ছন্দ-ঝাঁপা

প্রথম পর্যায়

এই অংশটুকু রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত একটি সচিত্র পোস্টকার্ড থেকে সংকলিত। সবটুকুই কবির স্বহস্তলিখিত।

ইংরেজি রচনাটি প্রথম প্রকাশিত হয় 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকায় (১৯২১ সেপ্টেম্বর, পৃ ৩৬১) *The Song* নামে। অতঃপর এটি আবার প্রকাশিত হয় 'বিশ্বভারতী কোয়ার্টার্লি' পত্রিকায় (১৯২৫ জানুআরি, পৃ ৩৫৯) *The Song Bird* নামে। এড্ওয়ার্ড টম্সন -প্রণীত *Rabindranath Tagore* গ্রন্থের (১৯২৬) ২০-সংখ্যক অধ্যায়ে এটি সংকলিত হয়েছে ইংরেজি ছন্দে রচিত রবীন্দ্রনাথের পাঁচটি কবিতার প্রথম কবিতা-রূপে (পৃ ২৮২)।[১] এই গ্রন্থে কোনো কবিতারই নাম দেওয়া নেই। তাই এটিও নামহীন।

রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত পোস্টকার্ডটিতে নাম দেওয়া আছে 'কবি-কাহিনী'। এই নামটি এবং ইংরেজি রচনাটির আনুষঙ্গিক বাংলা উক্তিটুকু বোধ করি কোথাও প্রকাশিত হয়নি। যাঁকে উদ্দেশ্য করে মন্তব্যটুকু লেখা, পোস্টকার্ডটিতে তাঁর নাম নেই ; রচনার তারিখও নেই। শোনা যায় এটি দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্দেশ্যে লেখা। অসম্ভব নয়। পত্রিকায় প্রকাশকাল থেকে মনে হয়, এটি ১৯২১ সালে কিংবা তার আগে রচিত। বোধ হয় অধ্যাপক এণ্ডারসনের সঙ্গে ইংরেজি ও বাংলা ছন্দের প্রকৃতিগত পার্থক্য নিয়ে দীর্ঘকালব্যাপী আলোচনার (১৯১৩-১৯) অন্যতম ফল এই রচনাটি।

ইংরেজি ছন্দশাস্ত্রমতে এটিকে বলা যায় Trochaic Pentameter (আদিগুরু দ্বিদল-পঞ্চপর্বিক) ছন্দ। বাংলা মতে এটি দলমাত্রিকবর্গীয়।

১ দ্রষ্টব্য পৃ ৪৮১, পাদটীকা ১।

অর্থাৎ ইংরেজি মতে এর প্রতিপংক্তিতে পাঁচ পর্ব (foot) ও প্রতিপর্বে দুই দল, আর বাংলা মতে এর প্রতিপংক্তিতে আড়াই পর্ব ও প্রতিপর্বে চার দল। উভয় মতেই প্রতিপর্বের প্রথম দলটি প্রস্বরিত (stressed)।

ছন্দোবন্ধ বা বহির্গঠনের বিচারে এটিকে বলা যায়—

কেশে আমার পাক ধরেছে বটে,
তাহার পরে নজর এত কেন?
পাড়ায় যত ছেলে এবং বুড়ো,
সবার আমি একবয়সী জেনো।

এই রচনাটির ইংরেজি প্রতিরূপ। কিন্তু ইংরেজি রচনাটি মিলহীন, এটুকুও লক্ষিতব্য।

এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় এই যে, দীর্ঘকাল পূর্বেই (১৯১৩ সালে) অধ্যাপক এণ্ডারসন বাংলা ছন্দে রচিত ইংরেজি কবিতার একটি নমুনা উদ্‌ধৃত করেছিলেন রবীন্দ্রনাথকে লিখিত তাঁর একখানি পত্রে।[১] দুই জনের রচনার মধ্যে পার্থক্য এই যে, এণ্ডারসন সাহেব ইংরেজি রূপ দিয়েছিলেন বাংলা 'অক্ষরগোনা' সাধু পয়ার ছন্দকে, আর রবীন্দ্রনাথ ইংরেজিতে রূপান্তরিত করেছেন 'দলগোনা' বাংলা লৌকিক ছন্দকে। তা ছাড়া, এণ্ডারসনের ইংরেজি রচনাটিতে মিল রক্ষিত হয়েছিল; রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই রচনাটিতে মিল দেবার প্রয়াস করেননি।

এই প্রসঙ্গে এ-কথাও বলা প্রয়োজন যে, রবীন্দ্রনাথের মতে ধ্বনিপ্রকৃতিতে ইংরেজির সঙ্গে চলতি বাংলার যথেষ্ট মিল আছে। তাঁর এ অভিমত প্রকাশ পেয়েছে একাধিক প্রসঙ্গেই।[২] ইংরেজি ভাষার

১ দ্রষ্টব্য পৃ ৩২৮-২৯।

২ স্মরণীয়: 'বাংলা চলতি ভাষার ধ্বনিটা হসন্তের সংঘাতধ্বনি, এইজন্য ধ্বনি-হিসাবে সংস্কৃতের চেয়ে ইংরেজির সঙ্গে তাহার মিল বেশি' (পৃ ১৭), এবং 'যে বাংলা

ধ্বনি ও ছন্দের সঙ্গে বাংলা ভাষার ধ্বনি ও ছন্দের সাদৃশ্য ও পার্থক্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মতামত প্রধানতঃ প্রকাশ পেয়েছে অধ্যাপক এণ্ডারসনকে লিখিত দুখানি বাংলা ও একখানি ইংরেজি পত্রে (পৃ ১-২০ এবং ৪৮২-৮৭)।

রবীন্দ্রনাথের মতে ইংরেজির সঙ্গে চলতি বাংলার প্রধান সাদৃশ্য ব্যঞ্জনসংঘাতের আধিক্যে। তাঁর মতে এই দুই ভাষার ধ্বনিগত প্রধান পার্থক্য এই যে, ইংরেজি ছন্দে পর্বের আদি ও অন্ত উভয়ত্রই ঝোঁক (অর্থাৎ প্রস্বর) পড়তে পারে, কিন্তু বাংলা পর্বের আরম্ভে ছাড়া আর কোথাও ঝোঁক পড়তে পারে না (পৃ ১৯)।[১] সুতরাং চলতি বাংলার দলমাত্রিক রীতির ছন্দকে ইংরেজি Trochaic (আদিগুরু দ্বিদল-পর্বিক) ছন্দের রূপ দেওয়া দুঃসাধ্য নয়। এই অভিমতেরই সমর্থন পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথের 'কবিকাহিনী'-শীর্ষক ইংরেজি রচনাটিতে।

শ্রীপুলিনবিহারী সেন ও শ্রীশোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, 'পাখি আমার নীড়ের পাখি' গানটির সঙ্গে উক্ত ইংরেজি রচনাটির ভাবগত মিল আছে।[২] কিন্তু এই গানটির সঙ্গে 'কবিকাহিনী' কবিতাটির ভাবগত সাদৃশ্যের চেয়ে অসাদৃশ্যই বেশি মনে হয়। গানটিতে আছে 'ভোরের আলোর কানাকানি'র কথা, আর কবিতাটিতে আছে সন্ধ্যার ছায়ার কথা। বরং 'কবিকাহিনী' রচনাটি অনিবার্যভাবেই স্মরণ করিয়ে দেয় কল্পনা কাব্যের 'দুঃসময়' কবিতাটির কথা। দুটিতেই আছে সন্ধ্যার অন্ধকারে তারকাখচিত আকাশপথে অক্লান্ত পাখির সমুদ্রপাড়ির

আমাদের মায়ের কণ্ঠগত, জ্যেষ্ঠতাতের লেখনীগত নয়, ইংরেজির মতো তারও সুর ব্যঞ্জনবর্ণের সংঘাতে' (পৃ ১২৮)।

১ দ্রষ্টব্য পৃ ৪৮৪ পাদটীকা ৪ এবং পৃ ৪৮৯।

২ *Visva-Bharati Quarterly*, Centenary Number (1962), Vol. XXVI Nos. 3 & 4, *Tagoreana*, *p. v*.

কথা। তা ছাড়া, '*path of heaven*' কথাটাও বিশেষভাবে মনে করিয়ে দেয় যে, পাণ্ডুলিপিতে 'দুঃসময়' কবিতাটির নাম ছিল 'স্বর্গপথে'।[১] 'তবু বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর' তো কবির নিজেরই প্রতি সম্বোধন। 'কবিকাহিনী' বা '*The Song Bird*' নামের ব্যঞ্জনাও তাই। কল্পনা কাব্যের 'বিদায়' কবিতার 'পাখি উড়ে যাবে সাগরের পার' ইত্যাদি লাইনগুলিও এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

দ্বিতীয় পর্যায়

ইস্কুলের ছোটো ছেলে থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বড়ো ছাত্র পর্যন্ত কাব্যশিক্ষার্থী সকলের পক্ষেই 'ছন্দ' একটি শিক্ষণীয় ও আলোচ্য বিষয় হওয়া উচিত, এই ছিল রবীন্দ্রনাথের অভিমত। বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপকরূপে তিনি যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ছন্দের প্রকৃতি' ও 'গদ্যছন্দ' নামে দুটি প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন, তাতে এ-কথা অংশতঃ সমর্থিত হয়। বিশ্বভারতীতেও তিনি বিভিন্ন সময়ে শিক্ষার্থীদের কাছে ছন্দ নিয়ে আলোচনা করতেন। ১৯২৩ সালে বিশ্বভারতীর ছাত্রদের কাছে বাংলা ছন্দ সম্বন্ধে তিনি যে বক্তৃতা দেন তার কিছু নিদর্শন পাওয়া যায় ১৩৩০ সালের আষাঢ়-সংখ্যা 'শান্তিনিকেতন পত্রিকা'য়। কবির এক দিনের বক্তব্য শ্রীপ্রদ্যোতকুমার সেন-কর্তৃক অনুলিখিত হয়ে ওই পত্রিকায় প্রকাশিত হয় 'ছন্দ' নামে। পরবর্তী কালে এই ছন্দ-বিষয়ক ভাষণপ্রবন্ধটি 'বাংলাভাষা-পরিচয়' (১৯৩৮) গ্রন্থে একাদশ অধ্যায়ের অঙ্গীভূত হয়। অতঃপর ১৯৩৩ সালে তিনি আবার বিশ্বভারতীর ছাত্রদের কাছে ছন্দ সম্বন্ধে কয়েকটি বক্তৃতা দেন। তার উল্লেখ আছে তৎকালীন 'বিশ্বভারতী নিউজ' পত্রিকায় (দ্রষ্টব্য পৃ ৪১৪)।

১ দ্রষ্টব্য 'কল্পনা'— পাণ্ডুলিপির একটি পৃষ্ঠার মুদ্রিত প্রতিরূপ: রবীন্দ্র-রচনাবলী (বিশ্বভারতী সংস্করণ), সপ্তম খণ্ড, পৃ ১২২।

১৯৪০ সালে আবার দেখি আশি বছরের আয়ুঃক্ষেত্রে দাঁড়িয়েও তিনি বিশ্বভারতীর বড়ো ছাত্রদের কাছে ছন্দতত্ত্ব ব্যাখ্যা করছেন। ছন্দ-আলোচনার সূত্রপাত হয় 'মানসী' কাব্য পড়ানো উপলক্ষে।[১] অতঃপর তিনি কয়েক দিন রীতিমত ছন্দের ক্লাস নিতে থাকেন। এই ছন্দের ক্লাসে যাঁরা উপস্থিত থাকতেন তাঁদের অন্যতম হচ্ছেন রবীন্দ্রসদনের বর্তমান পরিচালক শ্রীমোহনলাল বাজপেয়ী। তাঁর স্মৃতির সাক্ষ্য এক্ষেত্রে লিখিত দলিলের চেয়ে কম প্রামাণিক নয়। তিনি বলেন ওই ছন্দের ক্লাসে ক্ষিতিমোহন সেন -প্রমুখ আরও অনেকেই উপস্থিত থাকতেন।

অপর পক্ষে ছোটো ছাত্রদেরও ছন্দ শেখাবার প্রয়োজন তিনি বোধ করতেন। ফলে তাদের ছন্দ-শিক্ষা দেবার জন্য তাঁকে নানা রকম উপায় উদ্‌ভাবন করতে হত। সে-রকম একটি উপায়কে প্রমথনাথ বিশী মহাশয় নাম দিয়েছেন 'মিলের খেলা'।[২] আর-এক রকম উপায় হল ছোটোদের কাছে বিভিন্ন ধরণের 'ছন্দ-ধাঁধা' উপস্থিত করে তার মীমাংসা করতে বলা। তাকে ছন্দ-ধাঁধা না বলে 'ছন্দের খেলা'ও বলা যেতে পারে।

সে প্রসঙ্গে আসার পূর্বে ছোটোদের ছন্দ শেখানো সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের সুচিন্তিত অভিমত কি ছিল তা জানা দরকার। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠিত 'ছন্দের প্রকৃতি' প্রবন্ধের প্রথম খসড়াটির উপসংহারে তিনি লেখেন—

> ছন্দ সম্বন্ধে আমার যা বলবার আছে তা শেষ হোলো। মূলকথাগুলো বেশি নয়, তার সন্ধান জানলে শাখাপ্রশাখা চিনে

১ দ্রষ্টব্য 'মানসী-কাব্যপাঠের ভূমিকা' : প্রবাসী ১৩৪৭ আশ্বিন (কষ্টিপাথর)। এই অনুলিখিত ভাষণপ্রবন্ধটিতেও ছন্দ সম্বন্ধে প্রণিধানযোগ্য কথা যথেষ্ট আছে।

২ রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন, অধ্যায় 'রবীন্দ্র-সান্নিধ্য'।

নেওয়া সহজ হয়। আমি যখন ছোটো ছেলেদের পড়াতুম তখন কাব্য পড়াবার বেলায় সবপ্রথমে কাব্যের ছন্দোরূপ নিয়ে আলোচনা করতুম। জিজ্ঞাসা করতুম বিশেষ কাব্যের লাইনে ক'টা ভাগ, আর প্রত্যেক ভাগে ক'টা মাত্রা। এই যথেষ্ট। ভালো করে বুঝিয়ে দিলে ছোটো ছেলেদের পক্ষেও এ প্রশ্ন কঠিন নয়। কিছুদিন এটা চর্চা করলে ছন্দপতন হয় কী দোষে তা তারা বুঝতে পারবে।

—১৯৭-সংখ্যক পাণ্ডুলিপি, পৃ ১৬

ছন্দের প্রাথমিক নিয়মগুলি শিখিয়ে এবং ছন্দপতন হয় কী দোষে তা বুঝিয়েই যে তিনি নিরস্ত হতেন তা নয়। ছোটোদের তিনি ছন্দ-সংগঠন ও ছন্দ-সংশোধনের অভ্যাসও করাতেন। এ বিষয়ে প্রমথনাথ বিশী মহাশয়ের একটি উক্তি স্মরণযোগ্য।—

আর-একটা খেলা ছিল— তিনি কবিতার একটি ছত্র বলিতেন, তাহার সঙ্গে মিল দিয়া অর্থের সংগতি রাখিয়া দ্বিতীয় ছত্র আমাদের বলিতে হইত।

—রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন, অধ্যায় 'রবীন্দ্র-সান্নিধ্য'

রবীন্দ্রনাথ নিজেও তাঁর ছেলেবেলায় এই খেলায় অভ্যস্ত হয়েছিলেন। সে কথার উল্লেখ আছে তাঁর 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থের 'কাব্য-রচনাচর্চা' অধ্যায়ে।

আরও একরকম খেলা তিনি উদ্‌ভাবন করেছিলেন ছোটোদের ছন্দ শেখাবার জন্য। এই খেলার নানারকম প্রকারভেদ ছিল। তার মধ্যে দুটি প্রকারভেদই প্রধান। এক, পংক্তিশেষের মিল ও কথার ক্রম ঠিক রেখে পর্বের মাত্রাপরিমাণে কমিবেশি করে দেওয়া, আর ছোটোদের কাজ পর্বের মাত্রাসমতা পুনঃস্থাপন করা। দুই, মোট মাত্রাপরিমাণ ও মিল ঠিক রেখে পর্ববিন্যাস ভেঙে দেওয়া অর্থাৎ

পংক্তির পদ্যক্রম ভেঙে দিয়ে কথাগুলিকে অনেকটা গদ্যের মতো সাজিয়ে দেওয়া, আর ছোটোদের কাজ মিল ও মাত্রাসমতা বজায় রেখে পর্বগুলিকে পুনর্বিন্যস্ত করা অর্থাৎ প্রত্যেক লাইনের কথাগুলিকে আবার পদ্যের আকারে সাজানো। কোনো কোনো ধাঁধার পরে একটি করে 'আদর্শ' দেওয়া থাকত, যাতে ছোটোরা ওই আদর্শের অনুসরণেই ছন্দভাঙা দৃষ্টান্তটিকে নূতন করে সাজাতে পারে নিখুঁত ছন্দে। এই খেলায় ছোটোরা শুধু যে আনন্দ পেত তা নয়, তাদের ছন্দবোধও পাকা হত, তা ছাড়া পদ্যরচনাতেও তারা উৎসাহিত হত।

এসব খেলার জন্য রবীন্দ্রনাথকে অনেক দৃষ্টান্ত রচনা করতে হত। দৃষ্টান্ত রচিত হত প্রধানতঃ মুখে মুখে। সেগুলির সব না হক অধিকাংশই আজ বিস্মৃত। সুখের বিষয় এ-রকম অনেকগুলি দৃষ্টান্তেরই প্রতিলিপি রক্ষিত আছে রবীন্দ্রসদনে। প্রতিলিপিগুলি পাঁচ ভাগে বিভক্ত। মনে হয় রবীন্দ্রনাথ কোনো ছোটো ছেলেকে ছন্দ শেখাবার জন্য এগুলি কিস্তিতে কিস্তিতে লিখে ডাকযোগে অন্যত্র পাঠিয়েছিলেন। অন্যদেরও ছন্দ শেখাবার কাজে লাগতে পারে, সম্ভবতঃ এই বোধেই এগুলির প্রতিলিপি রাখা হয়। এই প্রতিলিপির দৃষ্টান্তগুলিই মুদ্রিত হল ছন্দ-ধাঁধা দ্বিতীয় পর্যায় -রূপে।

এগুলি কোন্ সময়ে কার উদ্দেশ্যে রচিত তা নিশ্চিতরূপে জানা যায়নি। তবে এবিষয়ে কিছু পরোক্ষ প্রমাণের সহায়তা নেওয়া যেতে পারে। এই দৃষ্টান্তগুলির চারটি পাওয়া যায় 'ছন্দের হসন্ত হলন্ত' দ্বিতীয় পর্যায় (১৩৩৮ মাঘ) ও 'ছন্দের মাত্রা' প্রথম পর্যায়ে (১৩৩৯ কার্তিক)। যথাস্থানে দৃষ্টান্তগুলির পাশে ও পাদটীকায় তার নির্দেশ দেওয়া গেল। আর দশটি কবিতা পাওয়া যায় 'স্ফুলিঙ্গ' কাব্যে। সেগুলি নির্দিষ্ট হল তারকাচিহ্নের দ্বারা। দৃষ্টান্তগুলির পাশে ওই কাব্যের (১৩৬৭ সংস্করণ) রচনা-সংখ্যাও দেওয়া গেল। পাঠান্তর ও অন্যান্য বিষয়ে প্রয়োজন-

মতো মন্তব্য যোজনা করা গেল পাদটীকায়। 'স্ফুলিঙ্গ' কাব্যে প্রাপ্ত এই দশটি রচনা কার কাছ থেকে বা কোন্ উৎস থেকে সংগৃহীত তা জানা গেলে এগুলির রচনাকাল ও ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে আরও কিছু তথ্য জানা যেতে পারে।

এস্থলে স্ফুলিঙ্গ কাব্যের তিনটি রচনার পাঠ সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। ছন্দ-ধাঁধা দ্বিতীয় পর্যায়ে খ-বিভাগের তৃতীয় দৃষ্টান্তের প্রথম লাইনের কবি-অভিপ্রেত পাঠ যে 'মাটিতে যে দুর্ভাগার ভেঙেছে বাসা', তাতে সন্দেহ করা চলে না। অথচ স্ফুলিঙ্গ কাব্যে আছে 'মাটিতে দুর্ভাগার ভেঙেছে বাসা'। এই পাঠ যে নির্ভুল নয় তা বলাই বাহুল্য। এই লাইন-দুটিকে নির্ভুল করা যেতে পারে দুইভাবে।—

মাটিতে দুর্ভাগার ভেঙেছে বাসা,
আকাশে উচ্চ করি গাঁথিছে আশা।

অথবা

মাটিতে যে দুর্ভাগার ভেঙেছে বাসা,
আকাশে সমুচ্চ করি গাঁথিছে আশা।

বলা বাহুল্য, এ দুটি দুই রীতিতে রচিত। প্রথমটি রচিত সরল কলামাত্রিক অর্থাৎ কলাগোনা মাত্রাবৃত্ত রীতিতে, আর দ্বিতীয়টি রচিত বিশিষ্ট কলামাত্রিক বা অক্ষরগোনা সাধু রীতিতে। স্ফুলিঙ্গে এই রচনাটির দুই পংক্তি দুই রীতিতে রচিত। এ-রকম রচনা যে কবির অভিপ্রেত হতে পারে না, সে কথা বলাই বাহুল্য।

খ-বিভাগে এই তৃতীয় দৃষ্টান্তটির যে আদর্শ দেওয়া আছে সেটিও আছে স্ফুলিঙ্গ কাব্যে। কিন্তু ওই কাব্যের পাঠে ছন্দোদোষ ঘটেছে। কারণ 'ভয়ে দেয় উঁকি' পাঠে এক মাত্রা বেশি। অথচ ছন্দ-ধাঁধার আদর্শপাঠে মাত্রাসমতা অক্ষুণ্ণ আছে।

বেশ বোঝা যাচ্ছে, এই রচনা-দুটির একটিতে ঘটানো হয়েছে

মাত্রাহানি, আর-একটিতে ঘটানো হয়েছে মাত্রাবৃদ্ধি। দুটিতে আছে দু-রকম দোষ।

খ-বিভাগের চতুর্থ দৃষ্টান্তটিতে ঘটানো হয়েছে আর-এক রকম ত্রুটি। তাকে বলা যায় ক্রমব্যত্যয় দোষ। মাত্রাবিন্যাসের যে ক্রম শ্রুতিসিদ্ধ, তার বিপর্যয়ে যে ছন্দোভঙ্গ ঘটে তাকেই বলতে পারি ক্রমব্যত্যয় দোষ। মাত্রাবিন্যাসের দুই-তিন-তিন বা তিন-দুই-তিন ক্রমে ছন্দশ্রুতি পীড়িত হয়। স্ফুলিঙ্গ কাব্যের ১০-সংখ্যক রচনাটিতে এই উভয়প্রকার ক্রম-ব্যত্যয় দোষই ঘটেছে। ছন্দ-ধাঁধায় এই রচনাটির যে আদর্শ দেওয়া আছে, তার থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় ছোটোদের দিয়ে আদর্শের অনুসরণে এই দু-রকম ক্রমব্যত্যয় দোষ সংশোধন করানোই ছিল কবির অভিপ্রায়।

মজার বিষয় এই যে, এ ক্ষেত্রে ছন্দের এই বিশেষ দোষটাই বুদ্ধদেব বসু মহাশয়ের কাছে একটি অভিনব গুণ বলে প্রতিভাত হয়েছে। তাঁর মতে 'অপরাজিতা ফুটিল' ইত্যাদি রচনাটি রবীন্দ্রসাহিত্যে দুর্লভ 'মিশ্র ছন্দের' দৃষ্টান্ত।[১] তিনি মনে করেন, "দুটি স্বতন্ত্র ছন্দ যে এখানে পাশাপাশি এসে দাঁড়িয়েছে তাতে সন্দেহ নেই"। তাঁর মতে এই রচনাটির মধ্যে ছয়মাত্রাপর্বের মাত্রাবৃত্ত রীতি ও অক্ষরগোনা পয়ার-পদ্ধতির মিশ্রণ ঘটেছে। অর্থাৎ, তিনি এই রচনাটিকে বিশ্লেষণ করেন এভাবে।—

অপ -রাজিতা ফুটিল | লতিকার গর্ব নাহি ধরে—
যেন পেয়েছে লিপিকা | আকাশের আপন অক্ষরে।

১ দ্রষ্টব্য 'কবিতা' ১৩৫২ পৌষ, পৃ ১২৬ এবং ১৩৫২ চৈত্র পৃ ১৮৫; 'সাহিত্যচর্চা' (প্রথম সংস্করণ ১৩৬১), পৃ ১৩২-৩৩। এই কবিতাটি প্রথম কোথায় প্রকাশিত হয় নিশ্চিতরূপে জানি না। সম্ভবতঃ 'কৃষক' পত্রিকায়— ১৩৫২ বৈশাখ ২৫ সংখ্যা।

বলা বাহুল্য, ছন্দোরীতির এই মিশ্রণ বা সমবায় রবীন্দ্রনাথের অভিপ্রেত ছিল না। ছন্দ-ধাঁধায় এই রচনাটির যে আদর্শরূপ দেওয়া আছে, তার প্রতি দৃষ্টিক্ষেপমাত্রই তা স্পষ্ট প্রতীয়মান হবে। 'অপরাজিতা' শব্দের দুই-তিন মাত্রায় বিভাজনটাও একান্তভাবেই বাংলার উচ্চারণরীতিবিরুদ্ধ। বাঙালির উচ্চারণে এই শব্দটা স্বভাবতঃই বিভক্ত হয় তিন-দুই মাত্রায়, 'অপরা-জিতা' রূপে।

এমন হওয়া অসম্ভব নয় যে, রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন সময়ে ছন্দ-ধাঁধা হিসাবে যে-সব দৃষ্টান্ত রচনা করেছিলেন ছোটোদের দিয়ে সংশোধন করাবার অভিপ্রায়ে, পরবর্তী কালে তারই কিছু কিছু নানা সূত্র থেকে প্রকাশিত হয়েছে কবিতাকণিকা রূপে। যে-তিনটি রচনা নিয়ে এখানে আলোচনা করা গেল সেগুলি হয়তো তারই নিদর্শন। এই দৃষ্টান্ত-তিনটি থেকে আরও বোঝা যায় যে, একই রচনা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবে বিন্যস্ত হয়ে নূতন নূতন ধাঁধার রূপ নিয়েছে। তা ছাড়া, কোনো কোনো ক্ষেত্রে আদর্শ রচনাটিকেও একটু আধটু বদল করে ধাঁধার রূপ দেওয়া হত বলে মনে হয়।

সব দিক্ ভেবে মনে হয়, ছন্দ-ধাঁধা দ্বিতীয় পর্যায়ের সব না হক কিছু-কিছু দৃষ্টান্ত রচিত হয়েছিল *'ছন্দের হসন্ত হলন্ত' প্রবন্ধ* প্রকাশের অর্থাৎ ১৩৩৮ সালের কাছাকাছি সময়ে। যে দশটি দৃষ্টান্ত স্ফুলিঙ্গ কাব্যে স্থান পেয়েছে সেগুলির উৎসস্থল ও মূলরূপের সন্ধান পাওয়া গেলে এ বিষয়ে স্থিরতর সিদ্ধান্তে উপনীত হবার পথ কিছুপরিমাণে উন্মুক্ত হতে পরে।

এ সম্পর্কে আর-একটি নূতন সূত্রের কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের অল্পকাল পরেই জ্যোতির্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়া একটি ইস্কুল-পত্রিকায় "রবীন্দ্রনাথের ছন্দ-ধাঁধা" নামে একটি

ক্ষুদ্র প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এই প্রবন্ধের প্রাসঙ্গিক অংশটুকু এখানে উদ্‌ধৃত হল।—

আমার একটি বিশিষ্ট বন্ধু ও আত্মীয়কে তিনি [রবীন্দ্রনাথ] শিশু ও কিশোর মনকে আদর্শ ছন্দানুগ করবার জন্য বা সে বিষয়ে শিক্ষিত করে তুলবার জন্য কি করা যেতে পারে তার একটা পরিকল্পনা দিয়েছিলেন। আমার একটি কিশোর আত্মীয়ের সশ্রদ্ধ ও সযত্ন-রক্ষিত তহবিল থেকে তার দু-তিনটি চুরি করে আমি আজ তোমাদের উপহার দিচ্ছি। চুরি স্বীকার করছি— অতএব তোমরা এবং আমার ঐ ছোট আত্মীয়টি উভয়েই আমাকে ক্ষমা করবে এবং চুরির দোষও আমাকে স্পর্শাবে না বুঝতে পারছি।

অনেক দিনের কথা। তখন তাঁর ভক্ত ও শিষ্যদলের কতকগুলি একত্র হয়ে কলকাতায় ১০ নং কর্নওয়ালিস স্ট্রীটে আমরা বিশ্বভারতী-সম্মিলনী করতাম। কবিগুরু কলকাতায় এলে সেখানে আমাদের কবিতা ও গান শোনাতেন এবং শুনতেন। গান শেখাতেনও। তোমাদের মত যারা, তাদের মনকে ছন্দানুগ করবার জন্য তখনই এই পদ্ধতিটা দিয়েছিলেন। তোমরা সংশোধন করে আমাদের কাছে তোমাদের মিলগুলি পাঠালে পর তোমাদের ছন্দবোধের নিরিখ আমরা ঠিক করতে পারি। তাঁর দেওয়া এই ছন্দগুলিকে তোমাদের আদর্শ ছন্দে পরিণত করতে হবে।

১ জলে নয়ন ভাসিয়া যায়
পলে পলে ফিরিয়া তাকায়।

২ দেবালয়ে সাঁঝবেলা
সে ভয়ে ভয়ে চলিছে।

৩ কুসুম ফুটেছে নিশীথে শেফালি-বনে
গন্ধে কখন ভরিল বাতাসেরি ঘুম।

৪ উন্মত্ত প্লাবনে ছুটিয়া চলে তটিনী
ঝরে অজস্র বর্ষণ [অশ্রান্ত] শ্রাবণে॥

রবীন্দ্রনাথের স্বহস্তলিখিত টীকাতে আছে—"মিল বাঁচিয়ে সংশোধন করা চাই।"

—কুমার আশুতোষ ইন্‌স্টিটিউশান ম্যাগাজিন,
রবীন্দ্রস্মৃতিসংখ্যা, ১৯৪১ সেপ্‌টেম্বর, পৃ ১২।

এই প্রবন্ধে উদ্‌ধৃত চারটি দৃষ্টান্তের প্রথম দুটি নেওয়া হয়েছে ছন্দ-ধাঁধার (দ্বিতীয় পর্যায়) ঙ-বিভাগের গোড়ার দিক্ থেকে, আর শেষ দুটি নেওয়া হয়েছে ঘ-বিভাগের গোড়ার দিক্ থেকে। তাতে স্বভাবতঃই মনে হয়, এই ধাঁধাগুলির মূলতালিকা রয়েছে জ্যোতির্ময়ী দেবীর অজ্ঞাতনামা 'কিশোর আত্মীয়'-টির সশ্রদ্ধ ও সযত্ন-রক্ষিত তহবিলে। এই তালিকা কবির নিজের হাতে লেখা কিনা তা বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু তালিকার আনুষঙ্গিক টীকাটুকু রবীন্দ্রনাথের 'স্বহস্তলিখিত'। সুতরাং এই তালিকাটির প্রামাণিকতা সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না। যা হক, এই তালিকাটি পাওয়া গেলে এ বিষয়ে আরও কিছু তথ্য জানা যেতে পারে। তা ছাড়া, জ্যোতির্ময়ী দেবীর উল্লিখিত 'বিশিষ্ট বন্ধু ও আত্মীয়'-র কাছেও এই ছন্দ-ধাঁধা রচনার ইতিহাস সম্বন্ধে সন্ধান করা যেতে পারে।

ছন্দধাঁধা-প্রসঙ্গের গোড়াতেই দেখেছি শুধু ছন্দোনীতি নয়, 'ছন্দপতন হয় কী দোষে' তাও যাতে খেলাচ্ছলে আনন্দের মধ্য দিয়েই ছোটোদের আয়ত্ত হয়, তাই ছিল রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্য। এই দ্বিবিধ উদ্দেশ্য-সাধনের জন্যই ছন্দ-ধাঁধাগুলি পরিকল্পিত হয়েছিল। বলা বাহুল্য, এই ধাঁধাগুলির দ্বারা উক্ত দ্বিবিধ উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হতে পারে অতি সুষ্ঠুভাবে।

সংযোজন

মূলগ্রন্থের পাঠপরিচয়-বিভাগে ‘চলতি-ভাষার ছন্দ’ (পৃ ১৩৬-৪৩) এবং ‘বাংলা ছন্দে যুক্তাক্ষর’ (পৃ ১৮১), এই দুটি প্রবন্ধের প্রসঙ্গে কিছু কিছু জ্ঞাতব্য বিষয় অনবধানতাবশতঃ যথাস্থানে উল্লিখিত হয়নি। আলোচনার সম্পূর্ণতার খাতিরে উক্ত বিষয়গুলি এখানেই বিবৃত হল।

চলতি-ভাষার ছন্দ

এই প্রবন্ধের দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ অনুচ্ছেদ বস্তুতঃ বহুকাল পূর্বের রচনা। ১৯২৩ সালে রবীন্দ্রনাথ ছন্দ সম্বন্ধে যে ভাষণ দেন, তা শ্রীপ্রদ্যোতকুমার সেন-কর্তৃক অনুলিখিত হয়ে শান্তিনিকেতন পত্রিকায় (১৩৩০ সালের আষাঢ়-সংখ্যা) প্রকাশিত হয় ‘ছন্দ’ নামে। ভাষণটি সম্ভবতঃ প্রদত্ত হয় তৎকালীন বিশ্বভারতীর ছাত্রদের কাছে। তা ছাড়া, এই ছন্দ-বিষয়ক ভাষণটি পত্রিকায় যতখানি সংক্ষিপ্ত রূপে প্রকাশিত হয়েছিল, কবির মূল বক্তব্য ততখানি স্বল্পায়তন ছিল বলে বোধ হয় না। মনে হয়, পত্রিকায় প্রকাশের পূর্বে অনুলিখিত ভাষণটি কবিকর্তৃক সংশোধিত ও বহুলপরিমাণে খণ্ডিত ও সংক্ষিপ্ত হয়েছিল। পরবর্তী কালে ‘শান্তিনিকেতন পত্রিকা’ থেকে সংকলিত হয়ে এটি ‘বাংলাভাষা-পরিচয়’ গ্রন্থে (১৯৩৮) একাদশ অধ্যায়ের অঙ্গীভূত হয়। গ্রন্থে গ্রহণকালে এই ভাষণ-প্রবন্ধটির ভাষা অতি অল্পপরিমাণে মার্জিত হয়। ‘ছন্দ’ গ্রন্থের বর্তমান সংস্করণে এই মার্জিত পাঠই গৃহীত হল। চতুর্থ অনুচ্ছেদের দ্বিতীয় বাক্যটি ‘শান্তিনিকেতন পত্রিকা’য় ছিল এ-রকম।— “মনিব একজন চাকরকে নির্বাসিত করল— গদ্যে এই গল্পের মতো এমন গল্প তো আমরা সর্বদা পড়ছি।” এই একটিমাত্র পাঠভেদই উল্লেখযোগ্য।

কালক্রমের বিচারে এই প্রবন্ধটির স্থান 'ছন্দের অর্থ' প্রবন্ধের (১৩২৪ চৈত্র) পরেই। ভাবের বিচারেও এটি 'ছন্দের অর্থ' নামে অভিহিত হবার যোগ্য। বস্তুতঃ এটিকে 'ছন্দের অর্থ' প্রবন্ধের দ্বিতীয় পর্যায় বলে গণ্য করা যেতে পারে।

এস্থলে 'আষাঢ়ে কাড়ান নামকে' ইত্যাদি বচনটি (পৃ ১৪০) সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলা অসংগত হবে না। এই প্রাচীন বচনটি এখনও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত আছে। 'কাড়ান' মানে বর্ষণ। আষাঢ় মাসের বর্ষণে ফসল হয় নামমাত্রই, শ্রাবণের বর্ষণেই ধান জন্মায়, শ্রাবণে যথোচিত বর্ষণ না হয়ে ভাদ্রমাসে বর্ষণ হলে ধানের শুধু শিষই হয় (শস্য হয় না), আর তাও না হয়ে আশ্বিন মাসে হলে সে বর্ষণ কিসের জন্য ?— অর্থাৎ তাতে কোনো ফলই হয় না। এই হচ্ছে প্রবচনটির স্বীকৃত অর্থ।

বাংলা ছন্দে যুক্তাক্ষর

রবীন্দ্রনাথ সর্বপ্রথমে 'মানসী' কাব্যের কতকগুলি রচনায় রুদ্ধদলকে দুই মাত্রার মূল্য দিয়ে নূতন মাত্রাবৃত্ত রীতির প্রবর্তন করেন। এই নূতন রীতির জন্যই বাংলা ছন্দের ইতিহাসে 'মানসী' কাব্য স্মরণীয় হয়ে রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ নিজেও নূতন ছন্দোরীতির প্রসঙ্গে বারবার মানসীর কথা উল্লেখ করেছেন। তার কিছু নিদর্শন আছে 'ছন্দ' গ্রন্থের বিভিন্ন প্রবন্ধে।[১] মানসীর ছন্দ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের আরও দু-একটি উক্তি এখানে উদ্ধৃত করা সংগত।

রচনাবলী-সংস্করণে মানসী কাব্যের 'সূচনা'য় (১৩৪৬ পৌষ) রবীন্দ্রনাথ এই কাব্যের ছন্দ সম্বন্ধে যে সংক্ষিপ্ত মন্তব্য প্রকাশ করেন তা এই।—

১ দ্রষ্টব্য পৃ ৫, ৬৭, ১২৩।

আমার রচনার এই পর্বেই যুক্ত অক্ষরকে পূর্ণ মূল্য দিয়ে ছন্দকে নূতন শক্তি দিতে পেরেছি। মানসীতেই ছন্দের নানা খেয়াল দেখা দিতে আরম্ভ করেছে। কবির সঙ্গে যেন একজন শিল্পী এসে যোগ দিল।

এই মন্তব্য রচনার অল্পকাল পরে ১৩৪৭ সালের আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে 'মানসী' কাব্য অধ্যাপনাকালে তিনি বিশ্বভারতীর ছাত্রদের কাছে উক্ত কাব্যের ছন্দ সম্বন্ধে যে অভিমত প্রকাশ করেন তাও উদ্‌ধৃতিযোগ্য।—

তার আগে বাংলা কবিতায় এসব ছন্দের আমদানি হয়নি।··· ক্রমে যুক্ত অক্ষরকে কবিতার মধ্যে আহবান ক'রে, তার ধ্বনির পূর্ণ মূল্য দেওয়া হল। এমনি করে কাব্যে গাম্ভীর্য ও সরসতার প্রতিষ্ঠা ঘটল।···

মানুষের মনের সাধারণ দুঃখসুখের কথা নিয়েই ছন্দে বদ্ধ হয় বাণী। মনে যদি বাজাতে চাও বচনাতীত বিষয়, তাহলে ছন্দের আশ্রয় নিতে হয়। এইজন্য কবিরা তাঁদের বাণীসৃষ্টিকে রক্ষা করেছেন ছন্দে ধ্বনিতে। এই রকম করেই ছন্দের দ্বারা সৃষ্টি স্থায়িত্ব লাভ করেছে। কবিও তাঁর বাক্যকে স্থায়ী করে রাখতে চান ছন্দের দ্বারা স্পন্দিত করে।···

'মানসী' রচনার সময় আমি ছিলেম গাজিপুরে। গোলাপের জন্য গাজিপুর বিখ্যাত।···সে সময় কত রকমের ছন্দ গুঞ্জরিত হয়েছিল আমার মাথায়। এইসব ছন্দের লীলাভূমি হচ্ছে সাংসারিক বিষয়। কিন্তু তবু বিষয়টা হচ্ছে গৌণ, বলবার ভঙ্গিটাই হচ্ছে আসল। গোলাপের প্রতি টানটা শেষপর্যন্ত একটা মনের আনন্দে পরিণত হল, তার অনির্বচনীয়তায় ভরে উঠল মানসীর ছন্দের সাজি।

—'মানসী'-কাব্যপাঠের ভূমিকা :
প্রবাসী ১৩৪৭ আশ্বিন (কষ্টিপাথর)

ছন্দ-ধাঁধা

এস্থলে ছন্দ-ধাঁধা দ্বিতীয় পর্যায় সম্বন্ধে আরও কয়েকটি তথ্যের উল্লেখ করা প্রয়োজন। এই পর্যায়ের আঠারোটি দৃষ্টান্তের খসড়া পাওয়া গিয়েছে ২৮-সংখ্যক পাণ্ডুলিপিতে। এগুলির মধ্যে একটি (‘ভিড় করেছে রঙ-মশালীর দলে’ ইত্যাদি) আছে স্বতন্ত্রভাবে পাণ্ডুলিপির ২০৩-সংখ্যক পৃষ্ঠায়। বাকিগুলি আছে দুটি পৃথক্‌ গুচ্ছরূপে।

প্রথম গুচ্ছে (পাণ্ডুলিপি পৃ ২০৬-০৭) আছে দশটি দৃষ্টান্ত।—

১ তৃতীয়ার চাঁদখানি বাঁকা সে
২ অধীর বাতাস এল সকালে
৩ শরতে শিশির-বাতাস লেগে
৪ ভেসে-যাওয়া ফুল ধরিতে নারে
৫ শকতিহীনের দাপনি
৬ গোড়াতেই ঢাক-বাজনা
৭ বর্ষণগৌরব তার গিয়েছে চুকি
৮ মাটিতে সে দুর্ভাগার ভেঙেছে বাসা
৯ অপরাজিতা ফুটিল লতিকার গর্ব নাহি ধরে
১০ যখন গগনতলে আঁধারের দ্বার গেল খুলি

এই পর্যায়ক্রমের সঙ্গে ছন্দ-ধাঁধা দ্বিতীয় পর্যায়ে মুদ্রিত (পৃ ৫০৩-০৫) দৃষ্টান্তগুলির পর্যায়ক্রমের সামান্য পার্থক্য আছে। তা নিয়ে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। তবে এটুকু বলা উচিত যে, পাণ্ডুলিপির উল্লিখিত রচনাক্রম একান্তভাবেই কালানুক্রমিক, ছন্দ-ধাঁধা দ্বিতীয় পর্যায়ের তালিকা তা নয়। এ প্রসঙ্গে দুটি পাঠভেদও লক্ষণীয়।— এক, মাটিতে ‘সে’ দুর্ভাগার ভেঙেছে বাসা। দুই, সোনার সংগীতে উষা চয়ন করিল ‘তারা’গুলি। উল্লিখিত এগারোটি দৃষ্টান্তের প্রথম পাঁচটি কবির

অভিপ্রেত আদর্শ ছন্দেই রচিত। বাকি ছয়টির মধ্যে তিনটি (শক্তিহীনের দাপনি, মাটিতে সে দুর্ভাগার, যখন গগনতলে) আদর্শস্থানীয়, আর অন্য তিনটি যে ছন্দধাঁধা-রূপে পরিকল্পিত তাতে সন্দেহ নেই। 'গোড়াতেই ঢাক-বাজনা' ইত্যাদি দৃষ্টান্তটি লিখিত আছে আদর্শরূপেই, কিন্তু তার পরেই চিহ্নযোগে পদ্যক্রম ভেঙে 'ঢাক-বাজনা গোড়াতেই' -ইত্যাদি রূপে সাজাবার নির্দেশ দেওয়া আছে। 'মাটিতে সে দুর্ভাগার' -কে আদর্শরূপে গ্রহণ করে 'বর্ষণগৌরব তার' -কে রচনা করা হয়েছে ধাঁধা-রূপে। তাই 'মারিছে উঁকি' লিখেও সেটিকে কেটে করা হয়েছে 'ভয়ে দেয় উঁকি'। অনুরূপভাবে 'অপরাজিতা ফুটিল' এবং 'যখন গগনতলে' যথাক্রমে ধাঁধা ও আদর্শ রূপে পরিকল্পিত। এই প্রসঙ্গে আর-একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় এই। 'অধীর বাতাস এল' এবং 'শরতে শিশির-বাতাস লেগে', এই দুটি দৃষ্টান্তের পাশেই লিখিত আছে আর-একটি দৃষ্টান্ত।—

এই রক্ত-চন্দন তিলকে
দিক্‌ললাট আঁকিয়া দিল কে—
বরণের পাত্র হাতে
উষা এল সুপ্রভাতে
জয়ধ্বনি উঠিল ত্রিলোকে॥

এই দৃষ্টান্তটি ছন্দ-ধাঁধার তালিকায় স্থান পায়নি। কিন্তু 'ছন্দের হসন্ত হলন্ত' দ্বিতীয় পর্যায় প্রবন্ধে (১৩৩৮ মাঘ) স্থান পেয়েছে উল্লিখিত দুটি দৃষ্টান্তের মধ্যবর্তী স্থানে, কিন্তু ঈষৎ-পরিবর্তিতরূপে (দ্রষ্টব্য পৃ ৭৩)।

দ্বিতীয় গুচ্ছে (পাণ্ডুলিপি পৃ ২১০-১১) আছে সাতটি দৃষ্টান্ত— ছন্দ-ধাঁধা দ্বিতীয় পর্যায় ক-গুচ্ছের সাতটি এবং একই ক্রমে। কিন্তু এগুলির পাঠে কিছু-কিছু পার্থক্য আছে। সব চেয়ে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, দৃষ্টান্তগুলি সবই রচিত আদর্শ ছন্দে এবং তারই সঙ্গে নির্দেশ দেওয়া

আছে কিভাবে এগুলিকে 'ধাঁধা'-য় পরিণত করতে হবে। নির্দেশগুলি স্পষ্ট ভাষায় লিখিত নেই। তবে রবীন্দ্রকৃত ছন্দ-ধাঁধার সঙ্গে পরিচয় থাকলে নির্দেশগুলির ইঙ্গিত বুঝতে অসুবিধা হয় না। নীচে দৃষ্টান্তগুলির আদর্শ রূপ ও তার পরিবর্তনের ইঙ্গিতগুলি দেখানো হল।—

১ ভোর হোলো
'ফুল' তোলো। ...কুসুম

২ আকাশ ঢেকেছে মেঘে,
'বাতাস' বহিছে বেগে। ...বায়ু

৩ মুখে কথা নাহি বলে,
'চোখ' দুটি ভরে জলে। ...নয়ন

৪ শোনো না 'তবুও' 'আপনার' মনে ...তবু, আপন
কথা বলে যাই কত
বধির তীরের কাছে 'নিশি' দিন ...রাত্রি
নদীর ধ্বনির মত।

৫ সারা রাত তারা 'যতই' জ্বলে ...যত
রেখা 'নাহি' রাখে আকাশতলে। ...না

৬ চাষের সময়ে কিছু করি 'নাই' হেলা ...নি
'ভুলিয়া' ছিলাম ফসলকাটার বেলা। ...ভুলে

মূলরচনায় উদ্ধৃতিচিহ্ন-নির্দিষ্ট শব্দের স্থলে পার্শ্বলিখিত শব্দ বসিয়ে 'ধাঁধা' তৈরি করতে হবে, এই ছিল কবির অভিপ্রায়। সপ্তম দৃষ্টান্তটি একটু অন্য রকমের।—

রাতের বাদল মাতে তমালের শাখে
পাখীর বাসায় এসে "জাগো জাগো" ডাকে।

দ্বিতীয় লাইনের এক পাশে লেখা আছে 'হাওয়া'। মনে হয় 'এসে' শব্দের পরে 'হাওয়া' বসিয়ে ধাঁধা বানানোই ছিল কবির অভিপ্রায়।

ছন্দ-ধাঁধা দ্বিতীয় পর্যায় ক-গুচ্ছের দৃষ্টান্তগুলির (পৃ ৫০২-০৩) পাঠের সঙ্গে মেলালে সহজেই বোঝা যায় ২৮-সংখ্যক পাণ্ডুলিপির এই দৃষ্টান্তগুলিই ওই ধাঁধাগুলির প্রথম খসড়া। আর এগুলিরই পরিমার্জিত রূপ পাওয়া যায় রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত পূর্বোক্ত প্রতিলিপিতে (পৃ ৫৩৮)। বলা প্রয়োজন যে, রবীন্দ্রসদনে এই প্রতিলিপি আছে দুই প্রস্থ। এক প্রস্থ টাইপ-করা ; এটি অসম্পূর্ণ, ঘ ও ঙ -গুচ্ছের দৃষ্টান্তগুলি এটিতে নেই। দ্বিতীয় প্রস্থ হাতে-লেখা, কিন্তু সম্পূর্ণ ; এটিতে পাঁচ গুচ্ছই আছে। এই প্রতিলিপি-দুটির মূল কোথায় এখনও জানা যায়নি। জানা গেলে এগুলির স্বরূপনির্ণয় সহজতর হতে পারে বলে আশা করা যায়।

২৮-সংখ্যক পাণ্ডুলিপিতে ছন্দ-ধাঁধার যে আঠারোটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, সেগুলি সবই কবির স্বহস্তলিখিত। পাণ্ডুলিপিতে এগুলির রচনাকাল লিখিত নেই। তথাপি অনুমান করা যায়, এগুলি সম্ভবতঃ রচিত হয়েছিল ১৯২৮ সালের দ্বিতীয়ার্ধে। যে পাণ্ডুলিপিতে এগুলি লিখিত আছে সেটি একটি ডায়ারি-বই, এম. সি. সরকারের ‘কোহিনুর’ ডায়ারি। ডায়ারিখানি ১৯২৮ সালের। সুতরাং এই দৃষ্টান্তগুলি যে ১৯২৮ সালের পূর্ববর্তী হতে পারে না, সে বিষয়ে সন্দেহ থাকতে পারে না। এই পাণ্ডুলিপির অধিকাংশ রচনাই তারিখহীন। কোনো কোনো রচনায় যে তারিখ আছে সেগুলির পৌর্বাপর্য থেকে মনে হয় ছন্দ-ধাঁধার এই দৃষ্টান্তগুলি রচিত হয়েছিল ১৯২৮ সালের দ্বিতীয়ার্ধে। পাণ্ডুলিপির প্রথম দৃষ্টান্তটি (‘ভিড় করেছে রঙ-মশালীর দলে’) বস্তুতঃ ‘রঙীন’-নামক একটি কবিতার প্রথম স্তবক।[১] এই নামসহ সমগ্র কবিতাটিই আছে

১ ‘রঙীন’ কবিতাটি প্রথম প্রকাশিত হয় ‘বিচিত্রা’ পত্রিকায় (১৩৩৮ বৈশাখ)। অতঃপর এটি সংকলিত হয় ‘পরিশেষ’ কাব্যের ‘সংযোজন’- অংশে (বিশ্বভারতী-সংস্করণ রবীন্দ্ররচনাবলী, পঞ্চদশ খণ্ড)।

এই পাণ্ডুলিপিতে। এটির রচনাকালও লিখিত আছে— ২৬ ভাদ্র ১৩৩৫ (ইংরেজি ১১ সেপ্টেম্বর ১৯২৮)। অন্য দৃষ্টান্তগুলি তার অব্যবহিত পরে রচিত বলেই মনে হয় পাণ্ডুলিপির সাক্ষ্য থেকে।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা উল্লেখযোগ্য। পাণ্ডুলিপিতে এই আঠারোটি দৃষ্টান্তের প্রায় অব্যবহিত পরেই আছে 'সহজপাঠ' প্রথম ভাগের কবিতাংশের খসড়া। এগুলিতেও রচনার তারিখ দেওয়া নেই। 'সহজপাঠ' প্রকাশিত হয় ১৩৩৭ সালের বৈশাখ মাসে (১৯৩০ এপ্রিল)। সুতরাং ছন্দ-ধাঁধার উক্ত আঠারোটি দৃষ্টান্ত যে এই সময়ের পূর্বে রচিত, তাতেও সন্দেহের কোনো কারণ থাকতে পারে বলে মনে হয় না। বস্তুতঃ 'সহজপাঠ' প্রথম ভাগের কবিতাগুলিও ১৯২৮ সালের শেষভাগে রচিত বলে মনে হয়। আরও মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ সম্ভবতঃ ছোটো ছেলেদের ছন্দ শেখাবার জন্য 'ভোর হোলো, ফুল তোলো' -ইত্যাদিজাতীয় ছোটো ছোটো কবিতা রচনা করতে গিয়েই সহজ-পাঠের 'আলো হয়, গেল ভয়' -ইত্যাদি ধরণের কবিতা রচনার প্রেরণা লাভ করেন।[১] শিশুদের মনে ছন্দবোধ জাগাবার পক্ষে সহজপাঠের কবিতাগুলির মতো উপযোগিতা বাংলাসাহিত্যে আর কারও রচনায় আছে কিনা সন্দেহ। সহজপাঠের গদ্যাংশ কবিতাগুলির পরবর্তী রচনা। ছবিগুলি তারও পরবর্তী; সম্ভবতঃ ১৯২৯ সালের শেষভাগে অঙ্কিত।[২] তার থেকেও মনে হয় সহজপাঠের কবিতাংশ ১৯২৮ সালের শেষভাগে রচিত বলে অনুমান করা অসংগত নয়। ২৮-সংখ্যক পাণ্ডুলিপির ছন্দধাঁধাগুলি তারই অব্যবহিত পূর্ববর্তী।

১ স্মরণীয়: 'জল পড়ে, পাতা নড়ে।'— জীবনস্মৃতি, 'শিক্ষারম্ভ' অধ্যায়।

২ ১৯২৯ সালের ১৫ নভেম্বর তারিখে রথীন্দ্রনাথকে লেখা এক পত্রে আছে— 'বাংলা সহজপাঠের ব্লকগুলো পেলে অনতিবিলম্বে কাজ আরম্ভ করে দিতে পারি।'— 'চিঠিপত্র', দ্বিতীয় খণ্ড।

উপসংহার

যে যুগে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব, সে ছিল এক ছন্দবিপ্লবের যুগ। ঈশ্বর গুপ্তের ছন্দের দোলা নিঃশেষে মিলিয়ে যাবার পূর্বেই দেখা দিল মধুসূদন-প্রবর্তিত নূতন ছন্দের উত্তাল তরঙ্গ। অতঃপর হেমচন্দ্রপ্রমুখ বড়ো-ছোটো অনেক কবিই লেগে গেলেন নানারকম নূতন ছন্দের পরীক্ষায়। রবীন্দ্রনাথ ছেলেবেলায় লালিত হয়েছিলেন এই নবছন্দের দোলনাতেই। কৈলাস মুখুজ্যের মুখে মস্ত একটা ছড়া শুনে শিশু রবীন্দ্রনাথের মন যে মেতে উঠত তার কারণ ছিল তার দ্রুত-উচ্চারিত ছন্দের দোলা।[১] পরবর্তী কালেও তিনি দ্বিজেন্দ্রনাথ, অক্ষয় চৌধুরী -প্রমুখ অনেকের প্রভাবে সংস্কৃত, ইংরেজি ও বাংলার (বিশেষতঃ বৈষ্ণব-পদাবলীর ও লোকসাহিত্যের) নানা ভঙ্গির ছন্দের ঢেউ খেয়ে নিয়েছিলেন খুব করেই। তার ফলেই সে যুগের ছন্দবিপ্লবের ধারা রবীন্দ্রনাথের হাতে পূর্ণ পরিণতি লাভ করতে পেরেছিল।

ছন্দপরীক্ষণ তথা নবছন্দ-প্রবর্তনের জন্য চাই ছন্দচিন্তা। এই ছন্দচিন্তারও প্রথম পরিচয় দেন মধুসূদন। তার নিদর্শন আছে তাঁর চিঠিপত্রে। অতঃপর টুকরো-টুকরো ছন্দচিন্তার বহু নিদর্শন দেখা দিতে থাকে বাংলা সাহিত্যে। এই ছন্দচিন্তাও অবশেষে সুগঠিত ও সুপরিণত রূপ ধারণ করে রবীন্দ্রনাথকে আশ্রয় করে। তাঁর ছন্দচিন্তা পরিণতির পথে অগ্রসর হয়েছে অর্ধশতাব্দীর অধিক কাল (১৮৮৩–১৯৪০) ধরে। তারই পরিচয় পাওয়া যায় 'ছন্দ' গ্রন্থে। এই গ্রন্থের অন্যতম প্রধান গুরুত্ব এখানেই। ইস্কুলে মধুসূদন বাচস্পতি-প্রণীত 'ছন্দোমালা' বই[২] পুরস্কার পেয়ে রবীন্দ্রনাথের শিশুচিত্তে যে ছন্দচিন্তার বীজ উপ্ত হয়েছিল তারই সুপরিণত ফল এই 'ছন্দ'।

১-২ জীবনস্মৃতি, 'শিক্ষারম্ভ' ও 'বাড়ির আবহাওয়া' অধ্যায়।

কালক্রম

রবীন্দ্রনাথের ছন্দচিন্তার বিবর্তনধারা অনুসরণের সৌকর্যার্থে এই গ্রন্থভুক্ত প্রবন্ধাবলীর একটি কালানুক্রমিক তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল। যেসব প্রবন্ধ প্রথম সংস্করণে ছিল না, এই সংস্করণেই প্রথম গৃহীত, সেগুলিকে তারকাচিহ্নযোগে নির্দিষ্ট করা হল। প্রত্যেক প্রবন্ধের পাশে এই গ্রন্থের পৃষ্ঠাঙ্কও দেওয়া হল। ছন্দবিষয়ক চিঠিপত্রাদি এই তালিকায় ধরা হয়নি। এই প্রসঙ্গে ৩১২-১৭ এবং ৩৭৯-৮০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

প্রথম পর্ব

দ্বিতীয় পর্ব

তৃতীয় পর্ব

১ 'চলতি-ভাষার ছন্দ' প্রবন্ধের দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ অনুচ্ছেদ। দ্রষ্টব্য পৃ ৫৪৪-৪৫।

নির্দেশিকা

মন্তব্য

'ছন্দ' গ্রন্থে প্রযুক্ত পারিভাষিক, অর্ধপারিভাষিক বা অন্যবিধ সমস্ত নামশব্দ নির্বিচারে ও নিঃশেষে সংকলন করা এই 'নির্দেশিকা'র লক্ষ্য নয়। এই শব্দসংকলনের লক্ষ্য গ্রন্থখানিকে জিজ্ঞাসু পাঠকের পক্ষে সুগম ও সহজব্যবহার্য করা। সেই উদ্দেশ্যে শুধু বিশেষভাবে নির্বাচিত শব্দই সংকলিত হল এবং নির্বাচিত শব্দগুলিরও সমস্ত পৃষ্ঠাঙ্কের উল্লেখ করার চেষ্টা থেকে বিরত থাকা গেল। সেই দিকে দৃষ্টি রেখেই নির্বাচিত শব্দগুলিকে পরিভাষা, কবি ও কাব্য এবং বিবিধ, এই তিন ভাগে সাজানো হল।

প্রত্যেক শব্দের পরবর্তী অঙ্কগুলি পৃষ্ঠাঙ্কসূচক। দণ্ডচিহ্নের পরবর্তী পৃষ্ঠাঙ্কগুলি 'গ্রন্থপরিচয়' বিভাগের অন্তর্গত। পৃষ্ঠাঙ্কের ঊর্ধ্বকোণস্থিত বিন্দুটি পাদটীকাসূচক।

পরিভাষা

নির্বাচিত

১ দ্রষ্টব্য : উদ্‌গাথা, গগনাঙ্গ, গাথা, ঝুল্লণা, দণ্ডকল, মালা।

১ দ্রষ্টব্য : অনুষ্টুপ্, আর্যা, গীতি, ত্রিষ্টুপ্, নিশিপালক, বক্ত্র, ভুজঙ্গপ্রয়াত, মদিরা, মন্দাক্রান্তা, মালিনী, রথোদ্ধতা, শার্দূলবিক্রীড়িত, শিখরিণী, স্বাগতা।

কবি ও কাব্য

বিবিধ

সংশোধন

গ্রন্থমধ্যে কিছু-কিছু ছাপার ভুল অনিবার্যরূপেই থেকে গেছে। তার মধ্যে যেগুলিকে অপেক্ষাকৃত গুরুতর বলে মনে হয়েছে সেগুলিকে নিম্নে পৃষ্ঠা- ও পংক্তি -ক্রমে তালিকা-আকারে নিবদ্ধ করা গেল। তা ছাড়া, প্রয়োজনবোধে কিছু-কিছু বিশেষ মন্তব্য ও পাদটীকায় সন্নিবিষ্ট হল।

পৃষ্ঠা ও পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৫।৫	মহারুদ্রবেশে	মহারুদ্ররূপে[১]
৫।১৬	উড়্‌ উড়্‌	উড়ু উড়ু[২]
৬।১১	জোড়	জোর
৭।৭	গীতাঞ্জলি	গীতিমাল্য[৩]
২৩।২৪	বাতাস	বাতাসে
৫০।১৮	অনুষ্টভ্‌	অনুষ্টুভ্‌
৬৯।৪	লাইনডিঙানো	লাইনডিঙোনো[৪]
৮৬।১৫	ফিরব না	ফিরিব না
৯৩।৫	বিরহিনী	বিরহিণী
১০৩।২	হৃদয়ে | করুণা | চাকা	হৃদয়ে | করুণা | ঢাকা
১০৩।১০	সতর	উনিশ[৫]

১ সবুজপত্র এবং প্রথম সংস্করণের পাঠে 'বেশে'ই আছে। কিন্তু ভারতচন্দ্রের **অন্নদামঙ্গল** কাব্যের মূলপাঠে আছে 'রূপে'। দ্রষ্টব্য : 'ভুজঙ্গপ্রয়াত' (সংজ্ঞাপরিচয়), পৃ ২৬৫।

২ দ্রষ্টব্য : 'মন্দাক্রান্তা' (সংজ্ঞাপরিচয়), পৃ ২৬৭-৬৮।

৩ সবুজপত্রে এবং প্রথম সংস্করণেও আছে 'গীতাঞ্জলি'। কিন্তু উদ্ধৃত লাইনগুলি আসলে আছে 'গীতিমাল্য' কাব্যে। দ্রষ্টব্য : দৃষ্টান্তপরিচয়, পৃ ৪৬৫।

৪ ১৫৬, ১৮৮ এবং ২১৫ পৃষ্ঠার পাদটীকাতেও এই সংশোধন স্বীকার্য।

৫ দ্রষ্টব্য পৃ. ৪১১, শেষ অনুচ্ছেদ।

পৃষ্ঠা ও পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১০৫।১৬	কিরণ-কিঙ্কিনী	কিরণ-কিঙ্কিণী
১১০।২৬	৪১-৪৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য	৩৫-৩৬, ৪১-৪৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য
১১৬।১	জাপানের	জাপানে
১৩১।৬	খোলবিচিলি ঘাস	খোলবিচালি ঘাস[১]
১৩৯।৫	কলহীন পাড়ি	কূলহীন পাড়ি
১৭৫।৯	বলা হল না	আর বলা হল না[২]
২০১।৩	। Autumn flaunteth	। । Autumn flaunteth
২০৩।১	ধূর্জটীপ্রসাদ	ধূর্জটিপ্রসাদ
২০৬।১৯	তার	তাঁর
২১৭।১১	কালি—দাসের | কালে- |	কালি- দাসের | কালে- |
২৭৬।২৫	দিকসীমানা বেয়ে	দিক্‌সীমানা বেয়ে
৩০০।৮	পৃ ৭৬	পৃ ৫৬
৩১৭।২১	পত্রের সংখ্যা ৪৫	পত্রের সংখ্যা ৪৪
৩১৭।২২	পয়তাল্লিশখানি	চুয়াল্লিশখানি

১ 'উদয়ন' পত্রিকায় এবং প্রথম সংস্করণে আছে— 'মোরা' সব পোষা গোরু, 'খড়বিচিলি' ঘাস, ভুষি পেলেই খুশি 'র'ব', ঘুষি 'পেলে আর' বাঁচব না। বর্তমান সংস্করণে বঙ্কিমচন্দ্রের ধৃত পাঠ অনুসৃত হয়েছে ('ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত ও কবিত্ব' প্রবন্ধ, ১৮৮৫)। বিভিন্ন গ্রন্থাবলীতে ধৃত পাঠও এই পাঠেরই অনুরূপ, কেবল কোনো কোনো পাঠে দেখা যায় 'বিচিলি'। রবীন্দ্রনাথ সম্ভবতঃ স্মৃতির উপরে নির্ভর করেই এই অংশটুকু উদ্‌ধৃত করেছিলেন। হয়তো সেজন্যই কোনো কোনো অংশে পাঠান্তর ঘটেছে।

২ সুশীলকুমার দে -র ধৃত পাঠে আছে 'বলা হল না'। কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের ধৃত পাঠে আছে 'আর বলা হল না'।— দ্রষ্টব্য: ভবতোষ দত্ত -সম্পাদিত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'কবিজীবনী' (১৯৫৮), পৃ ২৩৫। রবীন্দ্রনাথের ধৃত পাঠেও (সাধনা ১২৯৯ শ্রাবণ, পৃ ২১৩) 'আর' আছে।

পৃষ্ঠা ও পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩২৫ |২৬	পাঠানো ল	পাঠানো হয়েছিল
৩৩১ |১৮	৩৩ খানি পত্র	৩২ খানি পত্র
৩৪৩ |২৩	কেঁমন… | গুণী	কেঁমন… | গুঁণী
৩৫৬ |২৬	১৩৬৪ শারদীয়-সংখ্যা, পৃ ৭-৯	১৩৬৪ শারদীয়-সংখ্যা, পৃ ৪-৯
৪৬৪ |৪	২২৪	২১৪
৪৭৭ |১৬	কাব্যশ্রেণীভুক্ত	কাব্যশ্রেণীতে ভুক্ত
৪৭৮ |১	নির্জীব	নিতান্ত নির্জীব
৪৭৮ |১২	বাংলা অনুবাদে	বাংলা পদ্য অনুবাদে